ত্রিধারা

সমরেশ বসু

ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশকাল : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫

প্রকাশক : মলয়েন্দ্রকুমার সেন
ক্যালকাটা পাবলিসার্স
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
ক্যালকাটা।
মুদ্রাকর : শ্রীইন্দ্রজিৎ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট,
কলিকাতা।
প্রচ্ছদ মুদ্রণ : দি নিউ প্রাইমা প্রেস
প্রচ্ছদ শিল্পী : গণেশ বসু

STATE CENTRAL LIBRARY
WEST BENGAL
CALCUTTA.

॥ দাম আট টাকা ॥

'দেশ' পত্রিকায় ত্রিধারা অনেকদিন আগেই শেষ হয়েছে। তারপরে প্রায় মরীচিকার মতই এতদিন আশা পোষণ করেছি, বইটি আর একবার ঢেলে লিখব।

মরীচিকাই, কেন না, দিনের মনে দিন চলে গিয়েছে, আমার প্রতিদিনের নতুন কাজের বেড়াজাল ভেঙে নতুন করে লেখার সদিচ্ছা আর পূরণ হয় নি।

হয়নি, তবু আর ত্রিধারার গতি রোধ করা গেল না। নতুন করে লেখার যাঁরা উপদেশ দিয়েছিলেন, তাঁদেরো যেন ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। সুতরাং ত্রিধারা এবার মুক্ত হল আমার সাধ অপূর্ণ রেখেই।

আশা রইল, পুনর্মুদ্রণের সময় ত্রুটি মুক্ত হব। বর্তমান সংস্করণে আমার অনেক ত্রুটি সত্বেও যদি লেখকের বক্তব্যটুকু পাঠকের চোখে সঠিক উদ্ভাসিত হয়, তবেই অনেকখানি মনে করব।

—লেখক।

বাড়িটা কেমন হয়ে গেছে আজ। কেমন একটা বিষণ্ণতা, চাপা অস্বস্তি ঘিরে রয়েছে সারা বাড়ি। শুধু এই বাড়িটি।

আর সব অস্বস্তিটুকু এসে যেন জমেছে সুমিতার মনে। ওরই পায়ে পায়ে অস্বস্তির ছায়া ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে পড়ার ঘর থেকে শোবার ঘরে। বাবার ঘর থেকে বড়দির ঘরে। বড়দির ঘর থেকে ওর আর ওর মেজদির ঘরে। উত্তরের বারান্দা পার হয়ে খাবার এবং পাশে রান্না ঘর। সবখানে কিসের একটা ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেখানে যায় সুমিতা, সেখানেই। যেন ওরই পায়ে পায়ে ফিরছে।

শুধু অস্বস্তি নয়, অশান্তিও। তার সঙ্গে কেমন একটু বুক চাপা ব্যথা ভার হয়ে চেপে আছে সর্বত্র।

রান্না ঘরের পাশ দিয়ে ছোট সিঁড়ি নেমে গেছে বাগানের মধ্যে। ছোট বাগান। সামান্য কিছু ফুলগাছ। একটি কিশোরী স্বর্ণচাঁপা গাছ আছে এক কোণ ঘেঁষে। আর নিতান্ত শখ করে লাগানো কিছু শীতের আনাজ। সযত্ন হাতের ছোঁয়ায় এ সামান্যই কেমন অসামান্য হয়ে উঠেছে সবুজের সমারোহে। আজ সেখানেও সেই বিষণ্ণতা। এই শেষ শীতের দিনেও গুটি কয়েক মাঘের ফুলকপি, হাতে গোনা দু'টি বাঁধাকপি। রূপ আছে যদিও, গন্ধহীন কিছু মরসুমী ফুলের গাছ। স্ফুটনোন্মুখ দু'টি ডালিয়া আর কেমন একরকমের গাঢ় লালে হঠাৎ কালোর ছোঁয়ায় চাপা ব্যথার রং লেগেছে কিছু ফোটা কারনেসনে। কিছু আছে ক্রিসানথিমাম। স্বর্ণচাঁপার সুদীর্ঘ কাঁচা-সবুজ রং পাতার ঝাড়। পুবে-পশ্চিমে ছড়ানো এ ফালি বাগানের অসংখ্য উন্মুক্ত চোখের মত পাতাগুলি। সবখানেই তার বিন্দু বিন্দু শিশিরে অশ্রু বিষণ্ণতা, জমাট হয়ে আছে নিঃশব্দ কান্না। ফাঁকে ফাঁকে মাকড়সার জালগুলিতে আলোর ছোঁয়ায় রং লাগেনি এখনো।

যেখানে যায় সুমিতা সবখানেই সেই অশান্তির ছায়া।

সামনের পুবদিকের তেতলা বাড়িটার ছাদ ডিঙিয়ে দেখা যাচ্ছে কাঁচা রোদের ইশারা। দক্ষিণের যাত্রা শেষ করে, উত্তরায়ণে বাঁক নিয়েছে সবে সূর্য। উত্তরে বাঁকা রেখা রোদ কাঁপছে তেতলার আলসের কার্নিশে। নতুন উত্তাপ তার কিরণে। সাগরপারের নতুন বাতাস আসবে পাগলা ঘূর্ণনে। সোনার মত মাঘের রোদে তারই আভাস ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে। এখানে দিগন্ত ব্যাপে রোদ ছড়াবার জায়গা নেই। জ্যামিতিক ভঙ্গিতে হঠাৎ সামনের রাস্তাটির কোথাও রোদ পড়েছে ত্রিভুজাকারে। কোনও বাড়ির দক্ষিণ দেয়াল রাঙিয়ে, পেছনের বাড়ির পুবদিকে চকিতে দিয়েছে ছুঁড়ে এক কণা রোদ। দেয়াল থেকে দেয়ালে, আলসেয়, জানালায়, হঠাৎ রোদ ঝলমল করছে ঋজুরেখায়। ফাঁকে তার কোথাও হঠাৎ এক কৃষ্ণচূড়া রাস্তার সীমানায়, কিংবা বাড়ির সীমানায় মাথা তুলেছে নারকেল নয় তো কলমের আমগাছ। শহরের এ দক্ষিণ সীমায় সবুজের দাক্ষিণ্য কিছু বেশী।

কেমন একটি সচকিত খুশির আমেজ ছড়িয়ে পড়েছে এই সকালের রোদে। দূর থেকে ভেসে আসছে ট্রামের ঘর্ঘর ধ্বনি। কখনো সখনো তীব্র হর্নের ক্ষীণ রেশ শোনা যাচ্ছে। কেউ শেষ অবধি ঘুরিয়ে দিয়েছে রেডিওটার ভল্যুম রেগুলেটার। হঠাৎ খুশির মত ছড়িয়ে পড়ছে গানের সুর। সামনের রাস্তায় স্বল্পজনের রকমারি পদশব্দ। পথ চলতি কিছু কথাবার্তা, হঠাৎ একটি ডাক দিল হয়তো কেউ কাউকে। সব মিলিয়ে একটি কর্মচঞ্চল খুশি খুশি ভাব দিকে দিকে।

শুধু এখানে, এই বাড়িটি স্তব্ধ ভার। একতলা বাড়িটার হলদে মাথায় পড়েছে রোদ। স্বর্ণচাঁপার আগডালে সোনার ঝিকিমিকি। তবু যেন কী এক থম্ ধরা।

যেন কিছু হয়নি, যেন প্রত্যহের মতই, সকালের রোদের আশায়, ভাল-লাগা মনটি নিয়ে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে সুমিতা। ও বেড়াচ্ছে আর ওঁরা, অর্থাৎ বাবা, বড়দি, মেজদি যেন প্রত্যহের মতই ঘরে কিংবা বাগানে লাগিয়েছে তর্ক। অদ্ভুত সব কথা। কোনো কোনো কথা শুনতে সত্যি বড় লজ্জা করে সুমিতার। মুখ লাল হয়ে ওঠে। বোঝা-না-বোঝা ভাবে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় সকলের মুখের দিকে। ও বোঝে, সব কথা ওর

শুনতে নেই, বোধহয় বুঝতেও নেই। তখন ও সরে পড়ে, ঘুরে ফিরে বেড়ায় এখানে সেখানে।

যেন তেমনিভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে স্থমিতা। বারবার বোঝাতে চাইছে মনকে, কিছু হয়নি, কিছুই হয়নি। কিছু হয়নি, ও যেন শুধু ঘুরে ফিরে বাগানে নেমে আদরের ভঙ্গিতে হাত বাড়াতে গেল ফুলগাছের দিকে। সতেজ ডালে সবুজ পাতার পাশে শুকনো মরা পাতা ভেঙ্গে দেবে বলে।

হাত বাড়াল, কিন্তু গাছে গিয়ে স্পর্শ করল না। আবার ফিরে তাকাল ঘরের দিকে। এখানে ওর মন নেই, মন পড়ে আছে অন্যত্র। বুকের মধ্যে খচ্ খচ্ করে উঠছে। মুচড়ে মুচড়ে উঠে কান্না পাচ্ছে কেবলি। শুধু তো অশান্তি নয়, অস্বস্তি নয়। একটি অদৃশ্য কাঁটা বিঁধে আছে এ বাড়িটার হৃৎপিণ্ডে। আর সেই কাঁটাটি যেন আমূল বিঁধেছে ওরই বুকে। সব খোঁচাখুঁচির রক্তক্ষরা যন্ত্রণা যেন স্থমিতারই। সারা বাড়িটার সমস্ত দুশ্চিন্তার কালো ছায়া তাকেই ঘিরে আছে।

বাগান থেকে দেখা যায়, প্রত্যেকটি ঘরের প্রতিটি জানালা বন্ধ। কাচের শার্সির আড়ালে পর্দাগুলি কোনটা গুটানো, কোনটা স্প্রিংয়ের গায়ে টান টান করে মেলা। কিছু দেখা যায় না ঘরের মধ্যে। সাড়া শব্দ নেই কারুর। এক অস্বস্তিকর স্তব্ধতা বিরাজ করছে সবখানে। কেবল রান্নাঘরে বিলাসের কাজের সামান্য শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। একটু আগেই সস্‌পেনে মাখনের ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ শব্দ শুনে স্থমিতা বুঝতে পেরেছে বাবার জন্যে পোচ্ তৈরী করছে বিলাস। জন্ম থেকে দেখে আসছে স্থমিতা, সকালবেলার চায়ের সঙ্গে ওইটি তার বাবার চিরকালের খাবার। আর তাদের তিন বোনের জন্য হয়তো রুটি সেঁকবে এবার কিংবা সেঁকা হয়ে গেছে। তার সঙ্গে আরো কিছু। আরো কিছুর পর চায়ের জল চাপবে। তারপর খাবার ঘরে ডাক পড়বে সকলের।

তখন কী হবে! একই টেবিলের এপাশে ওপাশে যখন বসবে সবাই, তখন এই নিস্তরঙ্গ স্তব্ধতা হঠাৎ কেমন করে ভাঙবে। কে ভাঙবে! সেকথা ভেবে এখনই স্থমিতার বুকের মধ্যে ধক্ ধক্ করছে। এটুকু ওর ভয় নয়, আনন্দও নয়, এক অপার বিস্ময়ের আলো আঁধার। কিছুক্ষণ পরের সেই ভবিষ্যতের বুকে উৎকণ্ঠিত কান পেতে আছে ও।

কিন্তু আজকের স্তব্ধতা ভাঙার পরই আসল কলরব উঠবে যখন, তখনই আসল ভয়টা দেখা দেবে।

গতকাল পর্যন্তও এবাড়ির আবহাওয়া যেন অনেকখানি স্বচ্ছ ছিল। মানুষগুলির চলায় ফেরায়, কাজে কর্মে, কথায় চাউনিতে বারে বারে এ দিনটির ছায়া উঁকি দিলেও প্রত্যহের জীবনে কোথাও ব্যাতিক্রম দেখা দেয়নি। তবু এ দিনটির মুখোমুখি যাতে দাঁড়াতে না হয়, সে চেষ্টা অনেক করা হয়েছে। তলে তলে নানাভাবে চেষ্টা করা হয়েছে এ দিনটিকে প্রতিরোধ করার জন্যে। কিন্তু প্রকৃতির অমোঘ নিয়মের মত এই দিন এসেছে।

এসেছে, তবু এখনো একটি ক্ষীণ আশা রয়েছে। তাই সুমিতা উৎকর্ণ হয়ে আছে, কখন বাড়ির সামনের লোহার গেটটা বিলম্বিত সুরে উঠবে ককিয়ে। শব্দটা বেশ জোরে হয়। কোনো কোনো অন্ধকার বাতাস হুতাশন রাত্রে, উত্তরের ডেপুটির বাড়ির সোহাগী বিড়ালীটা যেমন অদ্ভুত স্বরে তাদের বাগানে এসে ডাকে টেনে টেনে, ঠিক তেমনি শব্দ হয় গেটে। প্রতিদিনের শোনা সেই শব্দ, আজকে শোনবার জন্যে কান পেতে আছে সমস্ত হৃদয়। কখন শব্দ হবে, কখন দেখা যাবে রবিদা আসছেন ঠিক তেমনি মাথাটি একটু হেলিয়ে। বুদ্ধিদীপ্ত প্রশান্ত মুখে তার সেই সহৃদয় স্বাভাবিক হাসিটুকু নিশ্চয় আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে শেষ মুহূর্তের কৃতকার্যতায়। মুহূর্তে সমস্ত স্তব্ধভার অন্ধকার পালাবে মুখ ঢেকে। রবিদাকে প্রথম ছুটে গিয়ে অভিনন্দিত করবে সুমিতা। যেন তারই জীবনের এক জীবন-মরণ রুদ্ধশ্বাস সমস্যার সমাধান নিয়ে আসবেন রবিদা।

কিন্তু, সে এ বাড়ির সকলের ছোট। এখনো পর্যন্ত কোন বিষয়ে তার মতামতের দাম নেই। কোন গুরুত্ব নেই তার কথার। কোন গুরুতর বিষয়ে কেউ আলোচনা করে না তার সঙ্গে। বাবা তাকে আদর করে রুমনি বলে ডাকেন। বড়দি মেজদিকে বলেন উমনি আর ঝুমনি। সে ডাকেও আদর আছে। কিন্তু আরো কিছু আছে, যা দিয়ে সুমিতার মনে হয় ওরা বড়দি আর মেজদি, সুজাতা আর সুগতা। সুমিতা শুধুই রুমনি। এ বাড়ির ছোট মেয়েটি! যাকে আদর করা যায়, ধমকানো যায়, কাজে কর্মে ফাই ফরমায়েশ করা যায়। বিশেষ কোন কথার সময়ে বলা যায়, 'রুমনি তুমি একটু ওঘরে যাও তো এখন।' হঠাৎ বাইরের কোন নতুন লোক এলে কয়েক মুহূর্ত সুমিতা কিছু প্রাধান্য পায়। তারপর যখনই পরিচয় হয়ে যায়, সে হচ্ছে এ বাড়ির রুমনি, সেই মুহূর্তেই সমস্ত প্রাধান্য যেন যায় শেষ হয়ে। আর মানুষ কী বিচিত্র! তবুও সকলের চোখ থেকে

থেকে পড়ে ওর দিকে। পড়তে হয় বলেই বোধ হয় পড়ে। রাস্তায় ঘাটে, ট্রামে বাসে, সবাই এমন তাকায় ওর দিকে। তার কারণ আর কিছুই নয়, ওর চেহারাটার জন্যে সবাই তাকায়। হয়তো আরো কিছু মনে করে, যেমন প্রথম দর্শনে মনে করে তাদের বাড়িতে আসা নতুন লোকগুলি। যদি জানতে পারত, সে শুধুমাত্র রুমনি, তাহলে সকলের চোখের চাউনি যেত বদলে।

এ বাড়ির কোন দুঃখের ব্যাপারে ওর দুঃখিত হতে নেই। পারিবারিক কোন জটিল বিষয়ে ওর কিছু নেই চিন্তা করার। এমন কী, বড়োদের অনেক হাসির কথায় হাসাও উচিত নয়।

এ সীমারেখাটি যত না টেনে দিয়েছে বাড়ির লোকেরা, তার চেয়ে হয়তো কিছু বেশী টেনেছে সুমিতা নিজে। ও যে রুমনি, সে কথাটি নিজে ভুলতে পারে না কখনো।

কিন্তু জীবনের কোন্ ফাঁক দিয়ে, কবে কখন ওর মনটি আড়ালে আড়ালে টপ্‌কে গেছে সেই সীমারেখা, সে খবর রাখেনি নিজেই। গৃহস্থের বাড়ির পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে যেমন করে ঢোকে বনলতা, ঠিক তেমনি। যখন সে ঢোকে, তখন কারুর নজরে পড়ে না। যে ঢুকেছে, সে জীবনের স্বাভাবিক গতিতে বাড়ছে। প্রত্যহের কাজের মাঝে গৃহস্থের নজরে পড়ে না তা। তারপর আরো ঢোকে, আরো আরো। অনেকখানি ছড়িয়ে, লকলকিয়ে এপাশে ওপাশে বাড়তে থাকে। তখন নজরে পড়ে। তখন আর অন্ত থাকে না বিস্ময়ের।

ওর মনটিও তেমনি অদৃশ্যে টপ্‌কে এসেছে সেই সীমারেখা। কিন্তু সেটা নজরে পড়েনি কারুর। তাই বাড়ির আজকের অস্বস্তি ও অশান্তির মধ্যে সুমিতার কথা কারুর মনেও পড়ে না। ভাবেও নি কেউ।

কিন্তু যে দুর্ভাবনার অধিকার ওকে কেউ দেয়নি, যেটুকু আপনি এসেছে মনে, সেটুকু লুকিয়ে রাখতে হচ্ছে ওকে। যত না ভয়ে, তত লজ্জায়। আজকের ঘটনা ওকেই বিচলিত করেছে সবচেয়ে বেশী। ওর বেদনা, কান্না, অস্বস্তি অশান্তি ছাড়িয়ে গেছে সবাইকে। যে বাতাসের ঘায়ে অকম্পিত অবিচল থাকে বড় শক্ত পোক্ত গাছগুলি, সবচেয়ে কচি লতাটি সেই বাতাসেই যেন পড়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে।

সুমিতা সারা হচ্ছে ভেবে। কী হবে! কী হবে এর পরে!

বড় বড় দু'টি ব্যাকুল উৎকণ্ঠিত চোখে তাকাচ্ছে রাস্তার দিকে। এতক্ষণ

সময়ের মধ্যে মাত্র তিনবার লোহার গেটটা উঠেছে ককিয়ে। বিলাস একবার বাইরে গিয়েছিল, আবার ফিরেছে। আর ঝি এসেছে। সেই শেষবার শব্দ হয়েছে। তারপর যেন বরফের মত জমে গেছে গেটটা। আর কোনদিন বুঝি শব্দ হবে না।

কিন্তু কখন আসবেন রবিদা। আজকের এই মাঘী সকালে, উনিই. যে সত্যিকারের উত্তরায়ণের বাঁকে ফেরা সূর্য। ওই লোহার গেটের দিকচক্রবালে কখন উদয় হবেন। ওঁর সেই গম্ভীর কিন্তু অমায়িক হাসি দিয়ে ফুৎকারে উড়িয়ে দেবেন সব ভয়।

কিন্তু সুমিতার নিষ্পলক চোখ জ্বালা করে জল এসে গেল, তবু না, রবিদার চিহ্নও নেই কোথাও। রাস্তায় বাড়ছে লোক চলাচল। এত লোকের আনাগোনা। কিন্তু যাকে চাই, সে আসে না। এমনিটিই হয়। তবু রবিদার আসার সময় তো অনেকক্ষণ হয়ে গেছে।

রান্নাঘরের পাশের সিঁড়ি দিয়ে আবার বারান্দায় উঠে এল ও। এমনি করে অনেকবার করেছে ঘর বার। আবার মন টানছে ঘরের দিকে। বড়দির ঘরের দিকে। যাকে নিয়ে আজ সারা বাড়ির চেহারা গেছে বদলে। যার জীবনের একটি অধ্যায় হয়তো একেবারে শেষ হয়ে যাবে আজ। যদি না হয়, তবে হয়তো ঝুলে থাকবে ত্রিশঙ্কুর মত। আজ বিচারক রায় দেবেন ওর জীবনের। সত্যি সত্যি বিচারক, সত্যি সত্যি কোর্ট, কাছারি, মামলা। ভাবতে ভাবতে সুমিতার বুকের মধ্যে কনকনিয়ে উঠল।

আজকে বড়দির বিয়ের তিন বছর পূর্ণ হবে। পূর্ণ হবে সন্ধ্যারাত্রি আটটার কাঁটায় কাঁটায়। তার আগেই, বেলা এগারোটা থেকে চারটের মধ্যে কোনও এক সময় হয়তো বড়দির সঙ্গে গিরীনদার বিচ্ছেদের রায় হয়ে যাবে। ভীষণ রাশভারী অথচ ভারি অমায়িক মানুষ গিরীনদা। মস্ত বড় প্রেসের মালিক। সুমিতাদের তুলনায় মস্ত বড়লোক। বিয়ের বছরখানেক আগে ওদের পরিচয় প্রেমে পরিণত হয়েছিল। আর বিয়ের এক বছর পর প্রথম শোনা গিয়েছিল ওদের বিবাদের কথা। কত কথা শোনা গেছে তখন, কত ঘটনা ঘটে গেছে এতদিনে। গত বছর এমন দিনেই বড়দি চলে এল গিরীনদার বাড়ি থেকে। স্বভাবতই বাবা নিয়েছিল বড়দির পক্ষ। মেজদিও তাই। বরং কিছু বেশী। চেষ্টা চলতে লাগল বোঝাপড়ার! সেই ফাঁকেই যেন বিবাদের চেহারাটা হয়ে উঠতে লাগল

ভয়াবহ। কথা উঠল, আলাদা হওয়া যাক উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে। সেই প্রথম ভয়ে কুঁকড়ে উঠেছিল সুস্মিতা। সেই প্রথম নিজেরই অজান্তে রুমনির মন সকলের অলক্ষ্যে টপকালো তার সীমারেখা। সে সীমারেখা হল ওর ব্যথা পাওয়ার অনধিকার চর্চা। আলাদা হওয়ার কথাটা কোনো সুরাহা করল না। যে দু'জনকে নিয়ে ঘটনা, তলে তলে বাড়ল তাদের রেষারেষি। আগুন জ্বলল ভাল করে। ব্যাপারটা উঠল গিয়ে কোর্টে! ঘরের কথা বাইরে যেতে না যেতে হাটের আসর উঠল জমে। উভয়পক্ষেই ইন্ধন জোগাবার লোকের অভাব হল না একটুও। উপকারীর দল এলেন ছুটে। একটি কথাই বারবার শুনতে পেয়েছে সুস্মিতা। জুডিশিয়াল সেপারেশন। হিন্দু বিবাহ না হলে ডাইভোর্স হত।

জুডিশিয়াল সেপারেশন। আজ তার রায় পাওয়া যাবে। কী রায় পাওয়া যাবে না যাবে, সেকথা একবারও মনে হয়নি সুস্মিতার। এবার কী হবে, সেই কথা ভেবে বুকে পাষাণভার।

মানুষের জীবন মনের জটিল দ্বন্দ্ব বোঝে না সে। বড়দিকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। যেকথা মুখ ফুটে কোনদিন বলার সাহস হবে না, সেকথা হল, ওর হৃদয় মাঝের অনেক মনের একটি অস্পষ্ট মন—গিরীনদাকেও ভালবাসে। সে-ই যে ও কত বেশে কতদিন দেখেছে বড়দি আর গিরীনদাকে, কত বিচিত্র পরিবেশে, সেই ছবিগুলি আঁকা হয়ে গেছে ওর তখনকার কিশোরী বুকে। সে ছবি একটুও ম্লান হয়নি এই সবে বাড়ন্ত যৌবনের মুহূর্তে। সেই ছবিটি যেন একটি ঝকঝকে নীল আকাশ, রসসিক্ত উর্বর মাটি, একটি মসৃণ পাঁচিল, কিছু মৃদু মন্দ বাতাস। যার মাঝখান দিয়ে মনের কচি লতাটি আড়ালে আড়ালে ছড়িয়ে ছাড়িয়ে উঠেছে তরতর করে। ওদের চাউনি, হাসি, ভালবাসাবাসি, সে সবই শেষ হয়ে যাবে।

জজের বিচার কী হবে কে জানে। কিন্তু তারপরে কী করবে গিরীনদা আর বড়দি। তারপর কী হবে দু'জনের, সেই কথা ভেবে ও অস্থির হয়ে উঠেছে ভয়ে ও ব্যথায়। সেই কথা ভেবেই যত বুকের কাঁপন, যত যন্ত্রণা। সেকথা বড়দি কেমন করে ভাবছে সুস্মিতা জানে না। মেজদির বিক্ষুব্ধ মুখে সেকথার ছায়াও দেখা যায় না। কেবল বাবাকে যখন একলা বসে থাকতে দেখে, তখন ওঁর বিশাল মুখখানিতে যেন কিসের একটি করুণ ছায়া দেখতে পায়। সে ছায়া যে কেন, কিসের জন্যে; ও

তা ভেবে কুল পায় না। সব মিলিয়ে দেখতে গেলে, সবাই যেন এক। কেবল একই বাড়িতে, একই পরিবেশে ওর মনটি আলাদা হয়ে গেছে সকলের কাছ থেকে।

সত্যিই আলাদা। বাবার সঙ্গে দুই দিদির যেমন সম্পর্ক, সুমিতার সঙ্গে তেমন নয়। বাবা ওকেও ভালবাসেন, অনেক কথা বলেন। কিন্তু বড়দি মেজদি আগে জন্মেছে বলে তাদের সঙ্গে বাবার সম্পর্কটা গড়ে উঠেছে অন্যরকম। সুমিতা যখন চোখ মেলে বাবাকে দেখতে শিখেছে, তখন বাবা কিছু ক্লান্ত, সৌম্য, একটু যেন করুণ। সন্তানের প্রতি একটু বেশীমাত্রায় স্নেহপরায়ণ বিপত্নীক এক ভদ্রলোক। চলায় ফেরায় কথায় ফুটে ওঠে একটু অসহায়তার আভাস। সেই মানুষটির সঙ্গেই সুমিতার ভাব, চেনাশোনা।

কিন্তু বড়দি মেজদি আর বাবা, তিনজনে মিলে আর একরকম। যাদের সবটুকু সে চেনে না, বোঝে না। আর জানে, তা বুঝতেও নেই।

কিন্তু সময় তো চলে যায়। বাইরের ঘরের পর্দায় হাত দিতে গিয়ে ও থম্‌কে দাঁড়াল। আবার তাকাল গেটের দিকে। না, রবিদার ছায়াও দেখা যায় না। শুধুই অচেনা মানুষের যাওয়া আসা।

শেষ আশা রবিদা। উনি এ বাড়ির যেমন একনিষ্ঠ বন্ধু তেমনি অন্তরঙ্গ বন্ধু গিরীনদার। গিরীনদাদের পরিবারেরও এ ব্যাপারের এক-মাত্র বাইরের মানুষ, প্রকৃত বন্ধুর মত এ দু'য়ের ভিতরে ছুটোছুটি করছেন শেষরক্ষার জন্যে। গতকাল রাত্রেও বাবার সঙ্গে আড়ালে কথা বলে গেছেন উনি। বলে গেছেন, 'আজ রাত্রে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখব গিরীনের সঙ্গে কথা বলে। ওর পক্ষ থেকে শেষ পর্যন্ত যদি কিছু করা যায়।' শুনে সুমিতার ভীরু অস্থির অন্তরে মন্দ্রিত হয়ে উঠেছিল মহারব ভেরী। ইচ্ছে হয়েছিল, ছুটে গিয়ে দু' হাতে জড়িয়ে ধরে রবিদাকে।

সেই ধরার ব্যাকুল-খুশি-আশায় মনে মনে হাত বাড়িয়ে আছে। কখন আসবেন রবিদা! যেন ওঁর হাতেই আছে সেই প্রসন্নময়ের ঘুম ভাঙ্গানো সোনার কাঠি।

(২)

বাবার ঘরের পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকতে গেল সুমিতা। দাঁড়াল থম্‌কে। ছদ্মবেশ নিতে হবে এবার। মুখের সবটুকু ব্যথা দুশ্চিন্তা উদ্বেগের ছায়া

মুছে ফেলে ঢুকতে হবে। ও উৎকণ্ঠিত, ভয় পেয়েছে, সেই অনধিকার চর্চা দেখে আর কেউ অবাক হবে, সে-ই যে সবচেয়ে বড় সমস্যা, বড় লজ্জা।

যেন কিছু হয়নি, কোথায় কি ঘটছে জানে না কিছুই, ঠিক এমনি অবিকৃত নিঃশব্দে তড়িদ্‌গতি রুমনিটির মত ঘরে ঢুকল ও।

মহীতোষ টেরও পেলেন না। প্রত্যহের মতই, এ মাঘের সকালে, লংক্লথের পাঞ্জাবিটি পরনে। বুকের বোতামগুলি খোলা তেমনি, পাশ থেকে চওড়া কাঁধে, পাঞ্জাবির গলা সরে যাওয়া পরিসরে দেখা যায় স্যাণ্ডো গেঞ্জিটি। পায়জামা ঢাকা পা ছু'টি মাটিতে রেখে দোলাচ্ছেন একটু একটু। চশমা চোখে দিয়ে ঝুঁকে আছেন খবরের কাগজের উপর।

আজ এইটি বাবার সবচেয়ে বড় ব্যতিক্রম। কোনদিন এ সময়ে বাইরের ঘরে বসেন না কাগজ পড়তে। তেমন শান্ত মানুষটি উনি কোনকালেই নন। এতক্ষণে কত হাঁকডাক করেন। খুরপোটি নিয়ে নেমে যান বাগানে। তাতেও রেহাই নেই। ডাক পড়বে সকলের। অদ্ভুত এবং বিচিত্র সব তত্ত্ব, তথ্য আবিষ্কার করবেন গাছের পাতায়, চারায়, অঙ্কুরে, ফুলে। শুধু আবিষ্কার করলেই তো হবে না, ব্যাখ্যা করতে হবে কাউকে। সুতরাং সুজাতা, সুগতা, অর্থাৎ উমনি-ঝুমনির ডাক পড়বেই। দিদিরা হাসাহাসি করে। তার মধ্যে মেজদি তর্ক জুড়ে দেবেই। বড়দি শাসনের ভঙ্গিতে খুরপোটি কেড়ে নিয়ে সকাল বেলার খাবার টেবিলে নিয়ে যাবে ধরে।

এ সময়ে রেডিওটা বাজে হয়তো নীচু সুরে। বাবা বিষয় থেকে যান বিষয়ান্তরে। হয়তো রবিদা কিংবা বড়দি-মেজদির বন্ধুরা আসেন কোন-কোনদিন। সকাল বেলাটি জমজমাট থাকে।

আজ কিছুদিন থেকেই সেই জমাটি সকালের তলে তলে ধরেছে ভাঙন। পায়ে পায়ে এসেছে এই কালো-মুখ দিনটি।

বাবাকে এমনি করে বসে থাকতে দেখে সুমিতার বুকের ভয় ও ব্যথা আরো বাড়ছে। ও এই দেখতে না চাওয়ার জন্যেই বাইরে যাচ্ছে ছুটে ছুটে। বাইরে গিয়ে মনে হচ্ছে, না জানি কী ঘটে যাচ্ছে ভিতরে। তাই ছুটে ছুটে আসছে ঘরে।

ছুটে ছুটে আসছে, আর এ-ই শুধু দেখছে। সমস্ত কিছুর মধ্যে এ-বাড়ির মনের অন্ধকার আছে চেপে। বইয়ের ওই আলমারি ছু'টিতে, নির্বাক রেডিওতে, ঢাকনা ঢাকা মুণ্ডহীন গাধার মত অর্গ্যানটায়, সোফায়, চেয়ারে,

টেবিলে আর লাল টকটকে মেঝেয়। তার মাঝে মুখফেরানো বাবার সর্বাঙ্গ ঘিরে যেন দেখছে শুধু ব্যথা আড়ষ্টতা। মনে হল, বাবাও যেন ওর মত ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় কান পেতে আছেন লোহার গেটের উপর।

ভিতর দরজার পর্দা সরিয়ে, অন্দরের বারান্দা দিয়ে ঢুকল পাশের ঘরে। সেখানে টেবিলে মুখ দিয়ে এখনো তেমনি বসে আছে মেজদি। যেন কী ভাবছিল একদৃষ্টে চেয়ে, একমনে। সুমিতাকে দেখেই চকিতে চোখ ফিরিয়ে নিল বইয়ের উপর। যেন সে কিছুই ভাবছে না এসব, ব্যস্ত শুধু পরীক্ষার পড়া নিয়ে। এ মুহূর্তে সুমিতা না হয়ে বড়দি কিংবা বাবা হলে মেজদি এ ছলনাটুকু করত না কখনো। কিন্তু সে যে রুমনি। সে শোনে কিছু, কিছু জানে, তবু থাকে আপন মনে, কলেজের পড়া পড়ে, বেড়ায় এদিক সেদিকে। তার কাছে তো ধরা দেওয়া যায় না।

ও ঢুকল তড়িৎ পায়ে, যেমন চলাফেরা করে তেমনি। মেজদির খাটের মাঝখান দিয়ে চলে গেল দেয়াল-ঘেঁষা আলমারিটার কাছে। জানে না। যেন কিছু খুঁজছে, এমনি উঁকি-ঝুঁকি দিতে লাগল আলমারির কাঁচের ঢাকায়। ভয় হল, এ-ছলনাটুকুও ধরে ফেলবে মেজদি। কিংবা এখুনি বলে উঠবে বিরক্ত গলায়, 'ছোড়দির পরীক্ষা কী পেছিয়ে গেল নাকি?' মেজদি যখন রাগ করে, তখন রুমনির বদলে বিদ্রূপ করে বলে 'ছোড়দি'। ওর শাসনের মধ্যে একটি বিদ্রূপের হুল থাকে সব সময়ে। সেই হুলের মধ্যে জ্বালা আছে, মধুও আছে। কিন্তু তিক্ততা নেই। ও মানুষটিই এমনি। যা মনে আসে, মুখে তা-ই বলে। কখনো সেকথা সোজা স্পষ্ট, কখনো বাঁকা ও তীব্র। হঠাৎ অচেনা মানুষের মনে হতে পারে, বিষ আছে স্বগতার অন্তরে। সেজন্যে অনেকে মেজদির সঙ্গে কথা বলে ভেবে, একটু বা ভয়ে ভয়েই। কিন্তু ওকে যে চেনে, সে তার অন্ধকার মুখের সামনেও হাসতে পারে নির্ভয়ে। শাসন ও স্নেহের মধ্য দিয়ে মাঝে মাঝে ও মান-অভিমানের যে মেঘটুকু সঞ্চার করে সুমিতার মনে, সে মেঘটুকু শরৎকালের মেঘের মত এখন আসে, তখন যায়। তার মধ্যে কোন বিদ্বেষের বিষ নেই, নেই শ্রাবণ মেঘের আবর্তন।

তবু মেজদিকেই ভয় সবচেয়ে বেশি।

হয়তো এখুনি রক্তরেখায়িত তীব্র পাতলা ঠোঁট দু'টি বাঁকিয়ে বলবে, কী হল হঠাৎ তোর?

ভাবতেও কাঁপছে বুকের মধ্যে। সে যে ওর কী লজ্জা! কী ভয়!

শুধু কি তাই। ওর মনের ছোট বেড়াটিকে পাশ কাটিয়ে যার মধ্যে দেখা দিয়েছে মহা বিস্তৃতির লক্ষণ, সেই প্রাণে যে অপমান হয়ে বাজবে এবার সেটুকু। সেকি তার দোষ! সেই অপমানটুকু হয়তো বুঝবেনা কেউ, কিন্তু প্রাণের দিগন্তকে তো টেনে ছোট করে আনতে পারবে না।

মেজদির কাছ থেকে কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে এবার ভয়ে ভয়ে তাকাল ঘাড় ফিরিয়ে। মেজদি তেমনি রয়েছে বইয়ের মুখোমুখি। এক বেণী এলিয়ে পড়েছে পিঠে, বিনুনির ভাঁজে ভাঁজে বাসি চূর্ণ কুন্তল ছড়িয়ে কাঁধের পাশ থেকে আঁচল গেছে সরে। নীল সার্জের ব্লাউজ ওর গায়ে। ছোট গলা ব্লাউজ কিন্তু পিছন থেকে যেন জামাটি কেউ হ্যাঁচকা টান দিয়ে সরিয়ে দিয়েছে অনেকখানি। নিজেই হয়তো উঠতে বসতে অজান্তে বিস্রস্ত করেছে নিজেকে। মাঘের এই সকালে ঘরের মধ্যেও কম শীত নেই। মেজদির যেন শীত করছে না। পেছন থেকে দেখা যাচ্ছে ওর শক্ত চওড়া কাঁধ। নীল জামার পাশে হঠাৎ ওই খোলা কাঁধ যেন এক ঝলক রোদ। বসেছে সারা চেয়ারখানি ছড়িয়ে! সুদীর্ঘ পুষ্ট ফরসা হাত দু'খানি দেখলে এত গম্ভীর আর সুন্দর মনে হয় মেজদিকে, যেন ও এক দৃপ্ত রাজেন্দ্রাণী। তেমনি চলাফেরা। দোহারা গড়ন ওর। এক সময়ে বাঙলা দেশের বাইরে থাকতে খেলাধূলা করেছে প্রচুর। হাতে পায়ে বুকে সারা শরীর জুড়ে উদ্ধত বলিষ্ঠতা। মেজদির এ দীপ্ত স্বাস্থ্যের জন্য ওকে যত সুন্দর লাগে, সুমিতার ভয়ও করে তত। আর আশ্চর্য! মেজদির শরীরটিকে, প্রতিটি রেখাকে যখন বড় বেশী তীব্র মনে হয়, তখন কেন যেন সুমিতার লজ্জা করে। মেজদি চলাফেরা করে স্বচ্ছন্দে, কিন্তু সুমিতার মুখ লাল হয়ে ওঠে। ও আশেপাশের লোকের দিকে দেখে তাকিয়ে, কেমন করে দেখছে সবাই মেজদিকে। সেই ফাঁকে নিজেকেও বারেক দেখে নেয় লুকিয়ে। তুলনায় সে অনেক অপুষ্ট আর কাঁচা। তবু মনে হয়, ওরও শরীর যেন মেজদির মত বাঁধভাঙা দিগন্তের ঢেউ হয়ে দুলছে। এই সেদিনে নিয়মিত কাপড় পরতে শেখা শরীরে, তাড়াতাড়ি নিজেরও শাড়ি টানে, জামা ঠিক করে।

কিন্তু মেজদি তেমনি। বেচারী রুমনির এই সঙ্কোচে, অদ্ভুত সঙ্কটে ওর কিছুই যায় আসে না। এত সাবলীল, সপ্রতিভ, দৃপ্ত, অথচ উদাসীন যে লজ্জার অবকাশ ওর নেই।

চওড়া ফরসা মুখখানিতে মেজদির এই স্বাস্থ্যের দীপ্তি একটু যেন রুক্ষতাই দিয়েছে এনে। সৌন্দর্যের বাহন যে কোমলতা, তা থেকে তার মুখখানি কিছু বঞ্চিত। কিন্তু সেইটুকুই মানানসই করেছে ওকে সর্বাঙ্গে। রূপসী নয়, তবু রূপ দেখলে সবাই যেন অবাক হয়ে চায় ফিরে।

কেবল চোখ দু'টি ওর এসব কিছুর থেকে আলাদা। সেখানে কেমন এক ভাবের গভীরতা, তন্ময়তা, অতল দৃষ্টি। ওই চোখে যখন রাগ করে তাকায়, তখন মনে হয়, সব ফাঁকি ধরা পড়ে যাবে ওর কাছে।

ও বসে আছে তেমনি, সুমিতার দিক থেকে পিছন ফিরে। মুখোমুখি রয়েছে বই। পাশ থেকে দেখা যাচ্ছে মুখের একটুখানি। চোখ স্থির। পড়ছে না, বোঝাই যাচ্ছে। পাতলা তীক্ষ্ণ রেখায়িত ঠোঁট যেন খুলবে না কিছুতেই, এমনি কঠিনভাবে রয়েছে এঁটে। যতবার এসেছে সুমিতা এ ঘরে, দেখেছে, অমনি করেই বসে রয়েছে ও সারাক্ষণ। সেই যে ছোট্টকালে সিমলায় থাকতে বরফ জমে থাকতে দেখেছে, সেই যে শিশু চোখের বড় ভয়ের দেখা সেই থমথমে নিবাক কিম্ভূত আকার পাহাড়ের পাথুরে ভূত, সবাই ঠিক তেমনি হয়ে গেছে।

সুমিতা আরো ঝুঁকে, আরো বেঁকে দেখল মেজদিকে। কে জানে মেজদি কেঁদেছে কি না। মেজদিকে ও কোনদিন কাঁদতে দেখেনি। কিন্তু এমন স্তব্ধ হয়ে থাকতেও দেখেনি কোনদিন। মেজদির সর্বাঙ্গ ঘিরেও সেই আড়ষ্টতা, ঠিক বাবার মত। অথচ আজকের এই ব্যাপারে ওর শৈথিল্য ছিল না। গিরীনদার প্রতি ও বড় নিষ্ঠুর। যেন ও-ই সবচেয়ে বেশি মর্মাহত গিরীনদার ব্যাপারে। বড়দি যদিও বা গিরীনদাকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারে, মেজদি পারবে না! এইটিই তার চরিত্রের বিশেষত্ব। নিজে যাকে ফাঁকি বলে জেনেছে, জেনেছে পাপ বলে, সেখানে ওর কোন আপোস নেই। গত বছর এমন দিনেই যখন বড়দি চলে এল এখানে, তখন মেজদির এম-এ পরীক্ষা শুরু হওয়ার কয়েকদিন বাকি। কিন্তু কিছুতেই পরীক্ষা দিতে পারলে না। বাবা বলেছিলেন, বড়দিও বলেছিল, শুধু শুধু একটা বছর নষ্ট করবি ঝুমনো?

ও বলেছিল, তোমরা বলছ 'শুধু শুধু'। কিন্তু আমি যে পারব না কিছুতেই। তাইতেই বোঝা গিয়েছিল, বড়দির জন্যে ওর আঘাত বেজেছে কতখানি।

বড়দি আর গিরীনদার বোঝাপড়ার ব্যাপারে, এদিকে গিরীনদা যতই

জেদ করেছেন, ততই নির্দয় হয়েছে মেজদি। ওর নির্দয়তা দেখে বড় কান্না পেয়েছে সুমিতার। কেবলি ভেবেছে, মেজদি ইচ্ছে করলেই বুঝি সব মিটিয়ে দিতে পারে। ও মেজদির উত্তেজনা দেখেছে, থমথমানি দেখেছে। মেজদির ওই চোখ দু'টির মত হৃদয়ের অতলে আর কিছু আছে কিনা, তাতো ও জানে না। তাই কেবলি ভেবেছে, মেজদি যদি ওর সমস্ত ব্যক্তিত্ব দিয়ে সব অন্ধকার দূর করে দিত, তবেই যেন চারদিকের সব বিবাদ-বিসম্বাদ যেত কেটে।

কিন্তু আজ সব বোঝাপড়ার, সব ভাবা-ভাবির, সব কথাবার্তার শেষ দিন। আজ কেন ও অমন স্তব্ধ হয়ে আছে বসে। যেন ওরও সমস্ত উত্তেজনার, সমস্ত যুক্তিতর্কের শেষ দিন আজ।

রাত পোহানো থেকে সুমিতা যেমন করে বার বার এমনি ঘরবার করেছে, গেছে প্রত্যেকের কাছে কাছে, তেমনি এ-ঘর থেকে পা বাড়াল বড়দির ঘরে। যে ঘরে গেলে ওর বুকের ভয় সশব্দে চীৎকার দিয়ে উঠতে চায়। উদ্বেল হয়ে ওঠে কান্না। তবু না গিয়ে পারে না। ওর ছোট বুকে যে আশা বাসা বেঁধেছে, তার মধ্যে তো কোন ছলনা নেই।

ছলনা যেটুকু, সেটুকু তো ভাবের বহিরাঙ্গনের ছদ্মবেশ। বড়দির ঘরে পা বাড়াবার আগে, আরেকবার তাই ও ছদ্মবেশ ফিরিয়ে আনল। সেই কিছু না-জানা, কিছু-না-বোঝা রুমনির ছদ্মবেশ। ও জানে না, যদি ওকে তেমন করে কেউ লক্ষ্য করত, দেখতে পেত, যতই ছদ্মবেশ ধারনের চেষ্টা করছে, ততই প্রকাশ করে ফেলছে নিজেকে। আগুন লাগা আঁচলে ঝাপটা দিলে তো সে নেভে না, আরো বাড়ে।

ঘরের ভেতর দিয়ে ঘরে যাওয়ার দরজা রয়েছে। মাঝখানে রয়েছে পর্দা। খাটের পাশ দিয়ে ঘরে ঢুকতেই চোখাচোখি হয়ে গেল বড়দির সঙ্গে। মেজদি যেমন চকিতে নিয়েছিল চোখ ফিরিয়ে, বড়দি তা নিতে পারল না। যেমন তাকিয়েছিল, তাকিয়ে রইল তেমনি। কেবল একবার চোখাচোখি হল সুমিতার সঙ্গে। চোখে শূন্য দৃষ্টি। যেন কী এক ভাবের ঘোরে ও মগ্ন রয়েছে। মনের পায়ে পায়ে চলে গেছে অন্য জগতে। সেখানেই নিবদ্ধ রয়েছে চোখ। তার মাঝখান দিয়ে কে চলে গেছে, কার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয়েছে এক মুহূর্তের, তা মনে গিয়ে ছোঁয়নি। তার ওপরে যে গেছে, সে রুমনি। সে অনেকবার গেছে, এসেছে আবার।

ত্বরিত-পায়ে এসে সুমিতা চলে গেল, বড়দির খাটের পাশতলার দিকে,

ড্রেসিং টেবিলের কাছে। এলোমেলো ড্রেসিং টেবিল। আজ কিছুদিন থেকেই এমনটি হয়ে রয়েছে। জায়গা বদলে সব শিশি কৌটোগুলো ছড়িয়ে রয়েছে অজায়গায়! আয়নাটি কেমন যেন বুক-চিতিয়ে হয়ে রয়েছে উর্ধ্বমুখ। অর্ধেক বুক জুড়ে তার প্রতিবিম্বিত শুধু ছাদের কড়িবরগা। হঠাৎ নিজের ছায়া দেখলে মনে হয়, মাথাটি গিয়ে ঠেকেছে বুঝি কড়িকাঠে। পুঁতির ঝালর দেওয়া আয়নার জাল পর্দাটি অসম্বৃত ঘোমটার মত একপাশে রয়েছে ঝুলে। হয়তো গতরাত্রে বড়দির আর ঢাকনাটিও টেনে দিতে ইচ্ছে হয়নি। বারে বারে, ঘুরতে ফিরতে নিজের ছায়াটি চোখে পড়েছে বলে, হঠাৎ বিরক্ত হয়ে আয়নাটিকে ঠেলে দিয়েছে উঁচু মুখ করে। পাশে একটি ছোট লেখবার টেবিল। এগুলি বড়দির ব্যবহারের। হয়তো কাল রাত্রে কিছু লিখেছে বড়দি। ফাউন্টেনপেনটি পড়ে রয়েছে খোলা অবস্থাতেই। কাগজপত্রও ছড়ানো। ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে পড়ে রয়েছে অনেকদিনের পুরনো একটি বিলাতী ম্যাগাজিন। ম্যাগাজিনটি এ বাড়ির নয়, গিরীনদা হাতে করে এনেছিলেন। সেই থেকে ঘর আর জায়গা বদলে বদলে পত্রিকাটি ওইখানে গিয়ে ঠেকেছে। হয়তো ইচ্ছে করেই বড়দি ম্যাগাজিনটাকে কখন ফেলে দিয়েছে ওখানে। ছোট টেবিলের পাশে দু'টি চেয়ার। ঘরের মাঝখানে টি-পয়। একপাশে পাশাপাশি জামাকাপড় আর অন্যান্য জিনিসের দু'টি আলমারি। খাটের শিয়রের কাছে আর একটি ছোট টেবিল, পাশে একটি ছোট বইয়ের শেল্ফ। সেখানেও এলোমেলো অবস্থা। দেয়ালে আছে দেশী ও বিলাতী ছবি, মা বাবার ফটো। আর ফটো ছিল বড়দি-গিরীনদার। কিন্তু ওদের সমস্ত ব্যাপার যেদিন চাপা থাকতে থাকতে শেষপর্যন্ত ভেরী বাজিয়ে ছড়িয়ে পড়ল বাইরে, সেদিন স্মিতা দেখল, দেয়ালে ছবিটি নেই। কে সরিয়ে নিয়েছে, কোথায় রেখেছে ও কিছুই জিজ্ঞেস করতে পারেনি।

ভিতর বাড়িতে এ ঘরটি সবচেয়ে বেশী সাজোনা। কেমন একটি মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে থাকে ঘরটির মধ্যে। আগে অবশ্য এতখানি ছিল না। বড়দির বিয়ের পরেই, এ ঘরটিরও যেন বিয়ে হয়েছিল। এ ঘরের ফুলদানি থেকে দেয়ালের ছবি, সবকিছুর মধ্যেই একটি বিয়ে বিয়ে ছাপ পড়েছিল। সেটাকে ঠিক বিলাসিতা বলা চলে না। মেয়েরা বড় হলে যেমন তার ভাবে ও কথার মধ্যে ওঠে ফুটে কেমন একটি নতুন ভাব, বিয়ে হলেও বোধহয় তাদের মনের মুকুরে কী এত নতুন রূপের আবির্ভাব হয়। যে রূপ স্মিতা সঠিক উপলব্ধি

করতে পারে না। কিন্তু ভাবতে গেলে ও একলাই বিচিত্র লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। সেই নতুন রূপেরই ছাপ সারাটি ঘরে।

তখন গিরীনদা আসতেন প্রায়ই। থাকতেনও এখানে। যখনই বড়দি আসত, তখনই। এ ঘরে গিরীনদার ছোটখাটো অনেক চিহ্ন খুঁজলে পাওয়া যাবে এখনো। মলিয়েরের ওই হ্যান্ড-ইন্-কুশনটি যেদিন টাঙানো হল দেয়ালে, সেদিন শঙ্কিত লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল মেজদি। নিজের নামটি শুনে সুমিতা থমকে দাঁড়িয়ে, বাইরে থেকে শুনেছিল ওদের কথা। মেজদি বলেছিল, রুমনিটা এখনো বড্ডো ছোট। না জানি কী মনে করবে। জবাব দিয়েছিলেন গিরীনদা। উনি ঠাট্টা করে মেজদিকে কখনো মিস্ বিবেকানন্দ, ব্রহ্মচারিণী, কিংবা মেজদির রাজনীতি করার দিকে একটা খোঁচা দিয়ে বলতেন, ছাত্র দলনী, নয়তো সোজাসুজি মেজদিও বলতেন! বলেছিলেন, দেখ মেজদি, এটা তোমরা বড় ভুল কর। দেখতে না দিলে মানুষ দেখতে শেখে না! তখন লুকিয়ে দেখতে হয়! নইলে তো ওদের দেশে এত বড় বড় শিল্পীদের ছবিগুলি যখন ভারতবর্ষে পাঠায়, তখন নীচে লিখে দিতে হয়, ফর অ্যাডালটস্ ওন্‌লি!

কথা শুনে হেসে উঠেছিল ওরা তিনজনেই। বড়দি মেজদি গিরীনদা।

ফটোশিল্পী নবীন হালদারের ওই ট্রাইবদের দু'টি ফটোও তখুনি টাঙানো হয়েছিল। তখনো প্রশ্ন উঠেছিল, সেই একই। ট্রাইবদের একটি বিবস্ত্র মেয়ে-পুরুষদের নাচের ফটো, অন্যটিতে গাছপালা পাহাড় পর্বত নদনদীর মতই উন্মুক্ত দেহ একটি যুবতী দু' পা ছড়িয়ে রং দিয়ে অলঙ্কৃত করছে তার নাভিমূল।

এ সবই বড়দির বিয়ের পর। বাবার ঘরে তো শুধু মায়ের ফটোটি আছে। ওর আর মেজদির ঘরে আছে আয়ারল্যাণ্ডের দু'জন বিপ্লবীর ছবি, মহাত্মা গান্ধীর সমুদ্রযাত্রা আর গতবছর যে মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে, সেই যুদ্ধে মুক্ত লেনিনগ্রাডের উপর একজন বিজয়ী সৈনিকের ছবি। আর শুধু বই। ও ঘরে প্রসাধন সামগ্রীও কিছু নেই। সেসবও বড়দির ঘরেই। এ ঘরেই এক কোণে, ওই ছোট্ট কুঠরী। ওরা তিন বোন ওখানেই কাপড় পরে। এই আয়নার সামনে দাঁড়িয়েই ঠিক করে নেয় বেশবাস।

এ বাড়িতে প্রসাধন সামগ্রী সাজানো থেকেছে, বড়দির বিয়ের পর সেসবের আমদানীও হয়েছে সুপ্রচুর। কিন্তু এ বাড়িতে প্রসাধনের বাড়াবাড়ি হয়নি কোনদিনই। একটু স্নো, পাউডার, শীতের ক্রীম, চুলের শ্যাম্পু, এ

বাড়ির প্রথানুযায়ী নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস। বড়দির বিয়ের পরেই নতুন নতুন জিনিসে ভরে উঠেছে ড্রেসিং টেবিল। নতুন সাজে সেজেছে এ-ঘর।

কিন্তু সব সজ্জা-ই আজ এ-বাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মুখ ঢেকেছে অন্ধকারে। কেমন বিবর্ণ, শ্রীহীন, রুদ্ধশ্বাস অস্বস্তিতে ভরে আছে সারাটি ঘর। এ-ঘরের অগোছালো জিনিস প্রতিদিন ঝি অচলা দিয়ে যায় গুছিয়ে। তবু যেন সবই অগোছালো, তবু যেন সবই এলোমেলো, বিশৃঙ্খল, বিষণ্ণ আর একটি অস্পষ্ট অপমানের ক্ষুব্ধ ব্যথায় গুমরোচ্ছে।

বড়দিকে সকাল থেকে সেই একইভাবে এলিয়ে এলোমেলো শুয়ে থাকতে দেখে আরো বেশী করে মনে হচ্ছে সেকথা। ওরই মুখের ছায়া সারাটি ঘরের মধ্যে ওই ভাঙ্গা সাজের রুদ্ধ যন্ত্রণা মূর্তি ধরছে। স্মৃতি দংশন করছে প্রতি কোণে কোণে, বিছানায়, টেবিল-চেয়ারে, সবকিছুতে, সবখানে। সবখানে, অনেক দুপুর, অনেক সন্ধ্যা, অনেক রাতের অলি-দংশিত-স্মৃতির অলক্ষিত ফোটা-ফুলগুলি বাসি আর বিবর্ণ হয়ে পড়ছে ঝরে ঝরে। অনেক মিষ্টি-হাসি, আবেশ-দৃষ্টি, এখন বিদ্রূপ আর শ্লেষ কষায়, জ্বালা ছড়াচ্ছে ব্যথা ও অপমানের।

বিনুনির বাঁধন খুলতে খুলতে, বড়দির দিকে লুকিয়ে দেখতে দেখতে হাত কাঁপছে সুমিতার। ও যত খুলছে, জট পাকাচ্ছে তত।

বড়দি ঠিক তেমনি এলিয়ে কাত হয়ে শুয়ে আছে ওর লাল আভাসিত রং-শাড়িটি দলিত করে। কেমন করে শুয়ে আছে, সে খেয়ালটুকুও নেই এখন। ওর বাঁ পায়ের উপর থেকে শাড়িটি উঠে গেছে খানিকটা। আঁচলটি চাপা পড়ে গেছে শরীরের তলায়, একটুখানি টেনে দেওয়া রয়েছে বুকের উপর দিয়ে। বিলাতী লিনেনের জাম-রং-ছাপা ব্লাউজ কুঁচকে কোমরের কাছ থেকে সরে উঁচুতে উঠে গেছে। বড়দির জামার কাঁধও বড়। কাঁধ, গলা, সবই যেন দিগন্তকে বাড়িয়ে, পোশাকের বিস্তৃতিটুকু দিয়েছে সংক্ষিপ্ত করে। একমাত্র ওরই জামার ছাঁট-কাট একটু এই রকমের। আগেও প্রায় এমনিই ছিল। বিয়ের পরে আরো বদলেছে। বিশেষ, গরমের দিনের জামাগুলি তো কাঁধের প্রান্তে ডানা ছুঁয়ে বিস্তৃত বাঁকে দিশেহারা গতিতে নেমে যায় বুকের দিকে। যেন সেই দুর্জয় গতি থামবেনা। তারপরে হঠাৎ একসময়ে থামে, যখন সুমিতা, রুদ্ধশ্বাস হয়ে ওঠে মনে মনে। পরে নিশ্বাস যদিও বা পড়ে, তবু এক সংশয়ে মন বিলুলিত হতে থাকে। যেখানে এসে থেমেছে,

সেখানেও কেমন এক বাঁধভাঙ্গা অস্পষ্টতা। সুমিতা-ই লাল হয়ে ওঠে মুগ্ধ-লজ্জায়। মুগ্ধ হয় ও, ওই সময়ে বড়দিকে অদ্ভুত সুন্দর লাগে। কিন্তু ওর এই নতুন বয়সের লজ্জা ছাপিয়ে ওঠে সেই মুগ্ধতাকে। বড়দি যত চলাফেরা ওঠাবসা করে, ততই ধুকধুক করে ওর বুকের মধ্যে। তাকায় সকলের চোখের দিকে, যদি কেউ থাকে আশেপাশে, বিশেষ পুরুষদের। কিন্তু সবাই হাসে, কথা বলে, বড়দিও সমান তালে চলে সকলের সঙ্গে। কোথাও কোন অস্বাভাবিকতা নেই। ও-ই শুধু মরে ভেবে ভেবে।

কিন্তু বড়দি এমনি চিরদিনই। ওর বড় হওয়ার সব কালটুকুই কেটেছে বাংলার বাইরে। লেখাপড়া শিখেছে কনভেণ্টে। বি এ পাশ করেছিল লাহোরে। বাংলার কোনো সমাজের সঙ্গেই পরিচয় ঘটেনি ওর সে পর্যন্ত। মেজদি কনভেণ্টে ছিল কয়েক বছর। কিন্তু পুরোপুরি নয়। ওর কলেজ জীবনের সবটাই কেটেছে প্রায় কলকাতায়। কলকাতার ছাত্রী জীবনের রুচি বোধটাই রপ্ত হয়েছে ওর। তবু ওর সচকিত বলিষ্ঠতা একটু চোখে পড়ে বেশী। সেদিক থেকে সুমিতা একেবারেই কলকাতার মেয়ে। ঘরে বাইরে, মনে, শিক্ষায় দীক্ষায়, চলাফেরায়, সবকিছুতে। কলকাতার এই পাঁচমিশেলী আধুনিক ঝঙ্কার ও শোনে, ভালও লাগে মাঝে মাঝে। কিন্তু বড়দির মত জামা পরার কথা আজো ভাবতে পারেনা।

মেজদি কখনো সখনো প্রায় ওই রকমের জামা পরে। বড়দির বিয়ের সময় পরেছিল। বড়দি-গিরীনদার সঙ্গে কোনো কোনোদিন বেড়াতে যাওয়ার সময় হয়তো পরেছে। গিরীনদা বলতেন, তুমি তোমার ওই স্বদেশী পোশাকগুলো দয়া করে ছেড়ে নিও মিস্ ঝুমনো। লোকে ভাববে, আমি দুই বাড়ির দুই মেয়েকে নিয়ে চলেছি।

মেজদি বলত, যাচ্ছি বেড়াতে। তোমার জন্যে তো যাচ্ছিনে।

গিরীনদা বলতেন, তা বললে তো হবে না। যতক্ষণ আমার সঙ্গে আছ, ততক্ষণ আমারই।

মেজদি পাতলা ঠোঁট দু'টি বাঁকিয়ে বলত, ইস্।

ঠিক সেই মুহূর্তে মেজদিকে মনে হত, বড়দির মতই রহস্যপ্রিয় তরল।

এখন বড়দির ওই বড়-গলা জামা আরো অনেকখানি নেমে এসেছে সব সংশয় পার হয়ে। সেদিকেও ওর খেয়াল নেই। অন্য সময় হলে এতক্ষণে

লজ্জায় মরে যেত সুমিতা। কিন্তু নিয়ত ফিটফাট বড়দিকে এমন বিস্রস্ত অবস্থায় দেখে সমস্ত ব্যাপারটি ওকে আরো শঙ্কিত করে তুলেছে।

গলায় সোনার চেন-হার গলা থেকে পিল্‌পিল্‌ করে নেমে এসেছে ডান-দিকের বুকে। হাতে মাত্র দু'টি সোনার চুড়ি। কানে দু'টি বড় বড় লাল পাথর সোনার সরু আংটায় আটকানো।

কিন্তু সব মিলিয়ে ও যেন কেমন দলিত মথিত হয়ে পড়ে রয়েছে। ওর পাশের লাল টকটকে কম্বল, ওর লাল আভাসিত-রং-শাড়ি, জাম রং-ছাপা ব্লাউজ, তার ফাঁকে ফাঁকে ওর উন্মুক্ত ফর্সা ধবধবে নিটোল পায়ের গোছা, কোমরের উপরিভাগ, কাঁধ আর বুকের একটি অংশ যেন রং-বেরংএর নিস্পেষিত ফুলের মত রয়েছে ছড়িয়ে। চুলের খোঁপাটি পড়েছে শিথিল হয়ে। চোখের চারপাশে ভিড় করেছে ছায়া। মাঝখানে অকম্পিত দীপশিখার মত চোখ জ্বলছে। ফুলে ফুলে উঠছে নাকের পাটা। আর লাল টকটকে ঠোঁট হঠাৎ নড়ে উঠছে। কী যেন ভাবছে ও। যেন সারা রাত ধরেই ভেবেছে। তাকে এই বেশে, প্রায় এমনিভাবেই, গতকাল থেকে দেখছে সুমিতা।

বড়দি, মেজদির মত দোহারা নয়, কিন্তু ঠিক একহারা বলতে যেমন ছিপছিপে বোঝায়, ও তাও নয়। ওর হাতে পায়ে, চোখে মুখে এক অপূর্ব রূপের দীপ্তি। কিন্তু সেই রূপ যেন মেজদির মত গম্ভীর হয়ে ওঠেনি। বরং বড় হয়েও বড়দি সদা-সচকিত তরল স্রোতের মত তর্‌তর্‌ করে চলেছে। ঠোঁটের কোণে নিয়তই একটু হাসি আছে লেগে। যখন ও অভিমান করে, দুঃখ পায়, রাগ করে, তখনো লেগে থাকে ওই হাসিটুকু। কেবল মুখখানি লাল হয়ে ওঠে। যখন সেটুকুও থাকেনা, বুঝতে হবে, তখন দুঃখ বড় গভীরভাবে বেজেছে। এমনিতে চোখে মুখে চলায় ফেরায় গাম্ভীর্যের লেশমাত্র নেই। হঠাৎ দেখে মনে হয়, ব্যক্তিত্ব বুঝি নেই। কিন্তু যখন রাগ করে, তখন অনর্থ ঘটে যায়। অন্যথায়, ওর এই অপরূপ রূপের মাঝে একটি সহজ মানুষ, কথায় কথায় গুনগুন করে ফেরে অনুক্ষণ। মনের কোথায় যেন একটু শৈথিল্যও আছে। এ-কাজে সে-কাজে কেবলি মেজদিকে জিজ্ঞেস করবে, 'আচ্ছা এটা কি করব বলতো ঝুমনো ?' কিংবা, 'এটা ঠিক হয়েছে ঝুমনি ?'

তখন গম্ভীর চিন্তাশীল মেজদির সামনে বড়দিকে রূপসী আদুরে মেয়েটি মনে হয়। মেজদি যদি বলে এইটি কর, নিশ্চিন্ত খুশিতে ও তাই করে। আবার

ঝগড়া হলে কথা বন্ধ হতে দেরি হবে না। ওরা দু'জনে যখন পথ চলে, তখন মেজদি চলে সামনের দিকে তাকিয়ে। বড়দি যায় চারদিকে চোখ বুলিয়ে। মেজদি যদি বলে, এটি খারাপ, এ চলবে না। বড়দি বলবে, একটু দেখলে কেমন হয় ?

ওদের মিলের চেয়ে অমিল বেশী। কিন্তু ওদের ভাবও বেশী, যে ভাবের মধ্যে ছোট রুমনির জায়গা নেই।

বাবা বলেন, রুমনিটাও দেখছি উমনির মত হয়ে উঠছে। অর্থাৎ বড়দির মত। কিন্তু কোথায়, কোন্‌খানে, সঠিক বুঝতে পারে না সুমিতা। এমন কী, বড়দি ওর কাছে কেমন যেন অচেনা, দূরে দূরে রয়ে গেছে। শুধু যে বয়সের অনেক তফাত, তা নয়। আরো কোনো কোনো জায়গায় বড়দিকে সবটুকু চিনে উঠতে পারেনি।

এক জায়গায় বড়দি ওর বড় চেনা। সেখানে এক স্নেহময়ী বড়দি, যে রুমনিকে মাঝে মাঝে সাজায়, আদর করে কিনে দেয় এটা সেটা। খেতে দেরি হলে বাবাকে ধমকায়, রবিদাকে ক্ষেপায়, বিলাসকে তাড়া দেয়, রান্নাঘরে গিয়ে নিজে নতুন নতুন খাবার তৈরী করে। মুখ গোমড়া করে ধমকাতে জানে না ও। মেজদি যদি গম্ভীরভাবে বলে, 'রুমনি চুল বেঁধে নাওগে।' বড়দি সেখানে বলবে, 'এ কি ? চুল বাঁধিস্‌নি ?' বলে নিজেই চিরুনি নিয়ে, ওর ছোটকালে শেখা মেমসাহেবদের মত অদ্ভুত ভঙ্গিতে চুল বেঁধে দেবে।

তারপর এমন ভুলে যাবে যে, তিনদিন হয়তো রুমনির সঙ্গে কোন কথাই হবে না। চোখেই পড়বে না। যেন রুমনি এ বাড়িতে নেই, কিংবা বড়দি এখানে থেকেও ঘোরাফেরা করছে আর এক জগতে।

তখন বড় কষ্ট হয় সুমিতার মনে। অবাকও হয়, আর দূর থেকে দেখে বড়দিকে। তখন আর বড়দিকে ও কিছুতেই চিনে উঠতে পারে না।

সেই বড়দি কেমন এক স্বপ্নময়ী। নিজের ভাবেই বিভোর। আড়ালে আঁচল ঠিক করছে, ব্লাউজটি টেনে দিচ্ছে, সারা মুখে একটি রহস্যের ঝিকিমিকি। যেন ও কী এক গোপন রসের হিল্লোলে বিজয়িনীর মত ফিরছে নিঃশব্দ হাসির রেশ ঠোঁটে নিয়ে। বিয়ের অনেক আগের থেকে, সুমিতার চোখে যখন সবেমাত্র এ সংসারের বৈচিত্র ফুটেছে তখন থেকেই দেখছে এমনি। যেন বড়দি কী একটি বস্তু পেয়েছে, কী নিয়ে কী যেন রচনা করছে মনে মনে।

ওদের বাড়িতে চিরকালই অনেক ছেলের আনাগোনা। তখন বড়দি সব সময়েই কারণে অকারণে বাইরের ঘরে যেত। ছেলেরা যখন আসত, তখন ওকে আরো বেশী ভাবে বিভোর রহস্যময়ী মনে হত। পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেও চিনতে পারত না রুমনিকে। বাবা কাছে বসে থেকেও পড়ে থাকতেন বহু-দূরে। সবাই ওর সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত। ও যেন মহারাণী, ওকে ঘিরেই সবাই।

বাবাও রুমনির মতই কাছে থেকেও দূর থেকে দেখতেন উঁকি মেরে। ওঁরও যেন বুকের মধ্যে রুমনির মত একটি অস্পষ্ট ব্যথা। বাবার জন্যে কীরকম কষ্ট হত মনে মনে। কিন্তু বাবা ঠিক কথা বলতেন, হাসতেন, তবু ওই রকম মনে হত।

তারপরে রবিদার সঙ্গে প্রথম এলেন গিরীনদা। তখন থেকে বড়দিকে ওর আরো বিহ্বল আচ্ছন্ন মনে হত। কী এক আবেশে বড়দি হাসছে, কথা বলছে, চলছে, ফিরছে, নিজেই বোধহয় জানত না। অথচ চোখের তারা তেমনি সচকিত, স্রোতস্বিনীর মত এদিকে ওদিকে প্রবাহিত।

তখন প্রায় মাসখানেকের মধ্যে একটি কথাও বড়দি বলেনি সুমিতার সঙ্গে। কিন্তু আশ্চর্য! এতবড় একটি বিচিত্র ঘটনা কারুর যেন চোখেই পড়েনি এ বাড়ির। শুধু সুমিতাই এক অবাক ও অবুঝ ব্যথা নিয়ে সব লক্ষ্য করেছে।

তারপরে, বছর ঘুরতেই ও দেখল, বড়দির সঙ্গে গিরীনদার বিয়ে। ওকে কেউ কিছুই বলেনি। যে বলতে পারত, সে মেজদি। কিন্তু মেজদি কোনো প্রয়োজন বোধ করেনি। বাবার তো সময়ই ছিল না। বিয়ের পূর্বমুহূর্তে রহস্যমিশ্রিত দূরাগত বাজনার মত একটি শব্দ পাচ্ছিল সুমিতা। বিয়ের মুহূর্তেই ওর এতদিনের সব সংশয়, কৌতূহল ব্যথা এক চকিত খুশির কল্লোলে গেল ভেসে। হঠাৎ যেন ও বড়দিকে আবিষ্কার করল নতুন করে। এত ভাল লাগল ওর বড়দিকে! কেন, ও তা নিজেই জানে না। বড়দি যে এত সুন্দরী, এমন রূপসী, তা ওর চোখে এমন করে ধরা পড়েনি।

হঠাৎ বাড়িতে কী ঘটে গেল। সারা বাড়ির কোণে কোণে কেমন এক নিঃশব্দ উল্লাসের বান ডেকে উঠল। ওর ভাব হয়ে গেল গিরীনদার সঙ্গে। গিরীনদা এমন করে বড়দির দিকে চায়, এমন কাছে কাছে থাকে, দেখে-শুনে ওর প্রাণের প্রথম নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয়ে গেল। সেই প্রথম নির্ঝর হল

ওর সেই সময়ের কৈশোরের অন্তিম মুহূর্তে ছু'টি আপন জনের মিলন দেখা। সেই সময়টা আর কাউকে দেখেনি, বড়দি আর গিরীনদাকে ছাড়া। দেখে দেখে, কী যে ভালবেসেছিল দু'টিকে! যেন ছোট্ট মেয়েটির দু'টি প্রাণের পুতুল।

যে অস্পষ্ট ব্যথা ও কৌতূহল নিয়ে ও আগে বড়দিকে দেখত, তখন ওই অস্পষ্ট ব্যথাটুকু চাপা-খুশি-কৌতূহল হয়ে উঠল। দেখল, বড়দির সেই ভাববিহ্বলতা আরো গভীর হয়েছে। লাল ঠোঁট দু'টি আরো রাঙা হয়ে থাকে সব সময়। ঠোঁটের কোণে যে হাসিটুকু কী কারণে বন্দী হয়েছিল, সেটুকু মুক্তি পেয়ে অনাবিল হয়ে উঠল।

সুমিতা তখনো তেমনি বড়দির কাছ থেকে দূরে দূরেই। ওই দু'জনকে মিলিয়ে ভালবেসেছে ও দূর থেকেই।

ওর এই খুশির আসরে মেজদির ভূমিকা কম। তবু মেজদিও ওদের কাছে গেলে অন্য রকম হয়ে যায়। বড়দির মত মেজদিও সশব্দে হেসে ওঠে খিল্ খিল্ করে। বাবাকে মনে হত, পুতুল খেলার আসরে এসেছেন বয়স্ক মানুষটি। দেখেশুনে মজা পাচ্ছেন খুবই, তবে কিছুই করার নেই, বড় একলা।

সুমিতার এই খুশির কথাটুকু জানতেন সবচেয়ে বেশী রবিদা। বারে বারে জিজ্ঞেস করতেন, তাহলে তুমি খুবই খুশি হয়েছ রুমনি?

—খু-উ-ব।

—কেন বলতো!

সুমিতা অবাক হয়ে বলত, 'বা রে! আপনি যেন কী।'

রবিদাকে সুমিতাই বলত, কেমন করে বড়দির ঘর সাজানো হয়েছে। গিরীনদা কী বলেছেন। বড়দিকে নিয়ে কোথায় গেছেন। রবিদা বলতেন, তাই নাকি? ও, আচ্ছা? কখনো কখনো মনে হত রবিদা যেন বড় বেশী গম্ভীর হয়ে উঠছেন শুনতে শুনতে। কিংবা শুনছেন না, দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবছেন কিছু। বড়দি যখন গিরীনদাদের বাড়ি যেত, তখন রবিদার সঙ্গে সুমিতা বেড়াতে যেত ও-বাড়িতে। সে-বাড়িও যত বড়, সাজানো গোছানো ততই সুন্দর।

তারপরে, বছর ঘুরতেই একদিন দেখল, বড়দি লুকিয়ে কাঁদছে ওর ঘরে। বাবা গম্ভীর মুখে বসে আছেন সামনে। সেদিনটি ছিল আজকের

এই দিনের প্রস্তাবনা। তারপরেও বড়দি এক বছর যাতায়াত করেছে গিরীনদাদের বাড়িতে। গিরীনদাও এসেছেন। গত বছর থেকে সবই বন্ধ হয়েছে।

বাকী আছে শুধু এই দিনটি। সুমিতা চেয়েও দেখল না ওর চুলের দিকে। দু'টি বিনুনি যেমন ছিল, তেমনি আছে। ও দেখছে শুধু বড়দিকে। আজো বড়দি নিজের ভাবে বিভোর। কিন্তু এমন বিষণ্ণ ক্ষুব্ধ সেদিন ছিল না। কোথায় গেল সেই সদা-সচকিত হাসিটি। বড়দি সেই তরল স্রোতের সব প্রবাহটুকু যেন রেখে এসেছে গিরীনদাদের বাড়িতে।

এইখানে গিরীনদা বসতেন, ওইখানে শুতেন, এইটি, ওইটি, সেটি গিরীনদা এনেছিলেন এ ঘরে। তার মাঝে ওইভাবে শুয়ে আছে বড়দি। সারা ঘরের মধ্যে একটি তীব্র ব্যথা আবর্তিত হয়ে উঠছে। আজ সব শেষ, আজ এই শেষ দিনেই যেন সবচেয়ে বড় ঝড়ের প্রাক্ মুহূর্তের নিস্তব্ধতা এসেছে নেমে। চারদিকে এখন মেঘের সমারোহ। ভয়ে বিলুলিত শুধু এ বাড়ির অলক্ষিত লতাটি।

মাতৃহীন ছোট্ট মেয়ে রুমনির অনেক সুখ দুঃখ, এ বাড়ির মধ্যে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছিল ওকে বড়দি আর গিরীনদা। ওর সেই দিগন্তই আজ নিদারুণ বিদ্রূপ করে ফিরে এসেছে ভয়াল কুটিল বেশে।

সুজাতা ডাকল, রুমনি!

ধক করে উঠল সুমিতার বুকের মধ্যে। চোখাচোখি হল বড়দির সঙ্গে। বলল, অ্যাঁ?

ওর চমকানি দেখে বোধ হয় চকিতে একবার সুজাতার ভ্রূ কেঁপে উঠল। বলল, রবি এসেছে?

তখনো সুমিতার বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটি লাফাচ্ছে। বলল, না তো!

বলতে বলতে ও প্রায় টেনে ছিঁড়তে লাগল বিনুনি। কিন্তু বড়দি আর কিছুই বললে না। তবু মুহূর্তের মধ্যে যেন কী ঘটে গেল। সুমিতার হৃৎপিণ্ডের দামামা থামল না। ও যেন কিসের এক আলোকময় ইশারা পেল দেখতে। আজকের ছায়া অন্ধকারে, এক ঝলক বিদ্যুতের মত বড়দির প্রশ্নটি ওকে দেখিয়ে দিল নতুন পথ।

বড়দিও তবে রবিদার পথ চেয়ে আছে। জানতে চায়, কী সংবাদ আনবেন রবিদা। যেন স্পষ্টই দেখতে পেল, ব্যথায় বুক চেপে বড়দিও

উৎকর্ণ হয়ে আছে ওই লোহার গেটের দিকে। এই শেষ মুহূর্তে তবে বড়দি শেষ কথাটি জানতে চায়! এখনো তবে সব বিবাদ বিসম্বাদ মিটতে পারে।

ও যেমন ত্বরিত পায়ে এসেছিল, তেমনি ত্বরিত পায়ে সামনের দরজা দিয়ে চলে গেল বাইরে। মনটা নিঃশব্দে গুনগুন করছে, যেন বাইরের ঘরে গিয়ে দেখতে পায় রবিদা কথা বলছেন বাবার সঙ্গে। যেন দেখতে পায়, যেন দেখতে পায়······

॥ ৩ ॥

মহীতোষ তেমনি কাগজ পড়ছেন একাকী। দ্বিতীয় প্রাণী নেই সেখানে। এক মুহূর্তে থম্‌কে পর্দা সরিয়ে সুমিতা বাইরের বারান্দায় ছুটে এল। কেউ নেই গেটে। নিঃশব্দ পাষাণপুরীর লৌহনিগড়। ঘুম ভাঙানো সোনার কাঠি নিয়ে সেই রাজপুত্র এসে দাঁড়ায়নি সেখানে। কুতূহলী জনতার কেউ কেউ বারেক চোখ ফিরিয়ে গেল ওর দিকে। শুনতে পেল, বিলাস ডাকতে এসেছে বাবাকে বাইরের ঘরে। খাবার দেওয়া হয়েছে।

সুমিতা দাঁড়িয়ে রইল বারান্দায় অনেকক্ষণ ধরে। রাস্তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে জ্বালা করে উঠল চোখ দু'টি। হঠাৎ রবিদার উপরেই বড় অভিমান হতে লাগল ওর।

বিলাস ডাকল, আসুন ছোড়দিমণি খাবার দেওয়া হয়েছে।

সুমিতা ফিরে তাকিয়ে বলল, ওরা সবাই গেছে।

বিলাস বলল, হ্যাঁ।

সুমিতা বলল, যাচ্ছি।

বিলাস চলে গেল। সুমিতা দাঁড়িয়ে রইল তেমনি। কিছুতেই যেতে পারছে না। অথচ এখন আবার ঘরে যাওয়ার জন্যে প্রাণটা ছটফট করে মরছে। শেষ পর্যন্ত গেটের মায়া ছেড়ে ও খাবার ঘরে এসে ঢুকল। ততক্ষণে মেজদির খাওয়া হয়ে গেছে। ও ওর হাতের ঘড়িটি দেখে বলল, বাবা, আর দেরি করো না তোমরা। সময় বিশেষ নেই।

মেজদির গলায় কথাটি যেন একটি নির্মম দৈববাণীর মত শোনাল। কারুর আসার জন্যে, কোন সংবাদের জন্যেই আর সময় নেই। সুমিতার দিকে

একবার দেখে বেরিয়ে গেল মেজদি। অন্যদিন হলে নিশ্চয় জিজ্ঞেস করত, কোথায় ছিলে এতক্ষণ খাবার ফেলে?

জবাব দিতেন হয়তো বাবা, রুমনো সাহেবার দেখছি খাবার কথা মনেই থাকে না।

মুখোমুখি বসেছে বড়দি আর বাবা। অস্থির ছটফটে মানুষ হয়েও বাবা আজ একেবারে শান্ত হয়ে গেছেন। বাবার সেই আড়ালের অসহায় করুণ অবস্থাটা আজ যেন প্রকাশ হয়ে পড়েছে অনেকখানি। তবু বাঁ হাতের পাঁচটা আঙ্গুলে চলেছেন টেবিল ঠুকে, আর চেয়ে চেয়ে দেখছেন বড়দিকে। ডান হাতে ওভ্যালটিনের কাপ ধরে রয়েছেন।

বেশ বোঝা যায়, বড়দি কোনরকমে স্যাণ্ডেলটি পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে এসেছে। কপালের উপর এসে পড়েছে রুক্ষ চুলের গোছা। সিঁথিতে সিঁদুরের আভাস। মাথা নীচু করে নিঃশব্দে চুমুক দিচ্ছে চায়ের কাপে। চুমুক দেওয়ার সময় ওর ঘাড়েব নীচে অনেকখানি উন্মুক্ত পিঠ দেখা যাচ্ছে।

বাবা আর বড়দি যেন দু'টি নতুন মানুষ। কেউ কাউকে চেনেনা, অথচ মুখোমুখি বসতে হয়েছে, কিন্তু অপরিচয়ের সঙ্কোচে, যেন দু'জনেই আড়ষ্ট। কে আগে কথা বলবে, সেইটিই সমস্যা।

সুমিতার কী বিড়ম্বনা! বেচারীকে এই নির্বাক আড়ষ্ট আবহাওয়ার মধ্যেও প্রত্যহের মতই খেতে হবে হাপুস-হুপুস করে, নিশ্চিন্ত ছোট মেয়েটির মত। বড়দির খাবার প্রায় তেমনি পড়ে আছে। কেবল রুটির কোণটি একটু ভাঙ্গা! তারপর হঠাৎ মনে হল, হয় তো ওর জন্যেই বাবা বড়দি কথা বলতে পারছে না। ওর উপস্থিতিই বোধ হয় কাজের কথায় বাদ সাধছে। ভাবতেই ও বড়দির পাশে বসে গোগ্রাসে গিলতে লাগল খাবার। কিন্তু সে যে ওর গলা দিয়ে নামবার আগেই বুক থেকে কী একটি বস্তু ঠেলে উঠতে লাগল ওপরে। ঠেলে উঠতে লাগল আর টনটন করে উঠল চোখের শিরাগুলি, তবু জোর করে চোয়াল নেড়ে চিবুতে লাগল।

ও জানে না, এই ভঙ্গিই ওর ধরা পড়ার পক্ষে কতখানি। বোঝেনি, এ বাড়িতে আজ সবাই যতখানি অস্বাভাবিক হয়ে উঠছে, ও হয়ে উঠেছে তার চেয়ে অনেক বেশী। সকলের ঝড় উঠেছে বুকে, ওপরে রয়েছে নিথর। ওর থরথরানি ভিতরে বাইরে।

মহীতোষ হঠাৎ বললেন, সকালবেলা শুধু ওই জামাটা গায়ে দিয়েছিস? ঠাণ্ডা লাগবে যে?

সুমিতা চোখ তুলে তাকাল। না, ওকে বলছেন না। বাবা তাকিয়ে রয়েছেন বড়দির দিকে।

বড়দিকে এতক্ষণ পরে হঠাৎ বড় লজ্জিত হয়ে উঠতে দেখা গেল। বলল, না, এ জামা বেশ গরম আছে।

যেন অনেক দূর থেকে কথা বলছে বড়দি। সুমিতা তাকাল মহীতোষের দিকে! কিন্তু মহীতোষ তখন মাথা নীচু করে, আরো জোরে দ্রুত টেবিল ঠুকছেন। ওঁর গোঁফ দাড়ি কামানো প্রশস্ত মুখের পেশী দীপ্ত স্ফীত হয়ে উঠেছে। সারা মুখটি হয়ে উঠেছে আরো বিশাল রক্তাভ। যেন কী কথা রয়েছে মনের মাঝে। তারই বোবা অভিব্যক্তি উঠেছে ফুটে, ফুলে ফুলে উঠছে ভিতর থেকে। সহসা সুমিতার দৃষ্টি পড়ল, ওদের দু'জনের কাপ-ই শূন্য হয়ে গেছে। তবু আছে বসে। ওর বসে থাকাটা দৃষ্টিকটু হয়ে উঠল হঠাৎ নিজের কাছেই। গরম চা-ই চোখ কান বুজে গিলে ও উঠে দাঁড়াল। কিন্তু ডাইনে বাঁয়ে সামনে, কোনদিকেই যাওয়ার পথ খুঁজে পেল না পিছন দিকে বাগানে যাওয়ার ছোট দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে গিয়েও নেমে যেতে পারল না। একটু পাশে সরে দাঁড়িয়ে রইল বারান্দার উপর। কে যেন পায়ে এঁটে দিল স্ক্রু। কান পেতে রইল ঘরের গহন হৃদয়ে।

কিন্তু ওঁরা দু'টিতে তেমনি নীরব মুখোমুখি। কতক্ষণ থাকবে। থাকতে তো পারবে না। সুমিতা এই বয়সের মন দিয়ে অনুভব করেছে, ওঁদের দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব কত গভীর। ওঁরা তো শুধু বাপ আর মেয়ে নয়, আরো কিছু। কথায়-গল্পে কাজে, সুখে-দুঃখে, পরস্পরের সঙ্গী। সেই সঙ্গে মেজদিও অবশ্য আছে। তিনজনের কত অতীত দিনের গল্প ও কাহিনী, পুরনো দিনের কত কথা, কত জায়গা, কত বন্ধু জুড়ে আছে মনে। সুমিতার কাছে সেগুলি সবই অচেনা বিস্ময়কর গল্প। শেষের দিকের দু' একটি অস্পষ্ট ছায়া হয়তো ভেসে ওঠে ওর চোখে। বাবার চাকরির শেষ কয়েকটি বছরের দিল্লী, তার আগে সিমলা প্রবাসের অস্পষ্ট ছবি সে-সব। বড়দি মেজদি বাবার কাছে সে-সব জীবন্ত। যেন সেদিনের কথা।

সেই সব দিনগুলিই ওঁদের পরস্পরকে অনেকখানি কাছাকাছি ও ঘনিষ্ঠ করে দিয়েছে। এই বন্ধুত্বে সুমিতার ঠাঁই যেমন নেই, তেমনি মনে মনে বড়দি মেজদির প্রতি ওর হিংসেও একটু আছে। এই হিংসে তখুনি কান্নায় উদ্বেল হয়ে ওঠে, যখন ওঁরা মায়ের কথা বলেন। কত হাসি, কত কান্না, কত ঝগড়া কত খুঁটিনাটি ছোটখাটো বিচিত্র সব ঘটনায় পরিপূর্ণ ওদের জীবন।

বাবা যদি বলেন, সেবারে মনে আছে তো উমনি, যেবারে আমাদের ডিপার্টমেণ্টের খোদ কর্তা হয়ে এলেন মিঃ ওয়েবস্টার—

বড়দি চোখ বড় করে বলবে, ওয়েবস্টার ?

বাবা : হ্যাঁরে সে-ই যে সিমলায়—

মেজদি একটু গম্ভীরভাবে হেসে বলবে, তুমি বোধ হয় মিঃ ওয়াইলডেভের কথা বলছ ?

বাবা যেন দুই দিদিরই সমবয়সী এমনিভাবে ঘাড় দুলিয়ে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ…

অমনি ওঁরা সবাই হেসে উঠবে। বড়দি বলবে, তুমি আজকাল সব ভুলে যাচ্ছ বাবা। বাবা সেটা স্বীকার না করে বলবেন, তোর মনে আছে, ওয়াইলডেভটা কী পরিমাণ পাগল ছিল!

মেজদি তেমনি গম্ভীর স্বরেই হেসে বলবে, নইলে আর মাকে চেয়েছিল নাচ শেখাতে ?

তখন চকিতে একবার বড়দির দিকে তাকিয়ে বাবা বলবেন, তোর মাকে না পেরে শেষটায় উমনিকে নিয়ে পড়ল।

বড়দির মুখে একটু হালকা লাল রং-এর ছোঁয়া লাগবে। বলবে, ওয়াইলডেভ মানুষটি কিন্তু খুব খাঁটি ছিল। নেটিভ বলে কোনদিন নাক সিঁটকোয়নি আমাদের।

বাবা—হ্যাঁ, তোকে বেশ নাচ শিখিয়ে তুলেছিল। তোর মা খালি আমাকে বলত, কী বিপদ! মেয়েকে তো নাচ শেখাচ্ছ, ওদিকে সাহেব যে তোমার মেয়েকে ছেড়ে থাকতেই চায় না।

আর একবার বড়দির মুখটি একটু লাল হবে। মেজদি ওয়াইলডেভের সেই গানটি সুর না করে বলে উঠবে, আই লকড মাই হার্ট অ্যাণ্ড থ্রু ভার দি কী…

ওই ছোট্ট গানের কলিটি বলার মধ্য দিয়ে কী যে ঘটে যাবে! সুস্মিতা কিছু বোঝবার আগেই ওঁরা তিনটিতে খুন হয়ে যাবে হেসে। মেজদি আবার বলবে, বেচারী ওয়াইলডেভ!

হাসিটি উচ্চকিত হয়ে উঠবে আবার দ্বিগুণ স্বরে।

তারপর যেন খানিকটা করুণ করেই সুস্মিতার দিকে তাকিয়ে বাবা বলবেন, রুমনো তখন হাঁটি হাঁটি পা পা। সাহেব দেখেছে তো দশবার আছাড় খেয়ে, চেঁচিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরত ওর মাকে।

কিন্তু ওই তিনজনের মাঝে তাতে একাত্ম হতে পারে না সুস্মিতা। সেই বাবা আর বড়দি বসে আছে মুখোমুখি। কিন্তু কথা নেই কারুর মুখে। এতবড় ব্যথার নির্বাক মূহূর্ত বোধ হয় কোনদিন আসেনি ওঁদের জীবনে।

কিন্তু কেউ কথা না বলুক, বাবা না বলে পারবেন না। সুস্মিতা যে বাবাকে দূর থেকে দেখেছে, তা-ই ও মহীতোষকে চিনেছে আরেকরকমভাবে। ওঁর এই অবসরপ্রাপ্ত জীবনে কলকাতায় বন্ধুর সংখ্যা খুবই কম। তাঁর সবচেয়ে বড় সঙ্গী বড়দি আর মেজদি। আর বাবার কী গভীর ভালবাসা! সে ভালবাসার মধ্যে বাবার যত আনন্দ, ঠিক ততখানি যেন বেদনা আছে মিশে। বড় বেশী ঘনিষ্ঠতার মধ্যে সেটুকু দিদিরা কতখানি অনুভব করেছে, ও জানে না। কিন্তু বাবাকে বড় কাঙ্গাল মনে হয়েছে ওর। দিদিদের এই দ্বিপ্রহরের রৌদ্রালোকে বাবা ওঁর সায়াহ্নের ছায়াটিকে আলো মাখামাখি করে রাখতে চেয়েছেন। চেয়েছেন, কিন্তু সব সময়ে পারেননি। বড়দির বিয়ের পর সেই সায়াহ্নের ছায়ায় সন্ধ্যার গাঢ়তা দেখা দিয়েছিল। যখন বড়দি গিরীনদাদের বাড়ি চলে যেত। মেজদি চলে যেত কলেজে কিংবা ওদের ছাত্র আন্দোলনের কাজে, তখন বাবার সঙ্গে মুখোমুখি হত সুস্মিতা। এ সেই বড়দি মেজদির বাবা নন, রুমনির বাবা। সকাল বেলার দেখা সন্ধ্যার সঙ্গে। দু'জনের মাঝে কেমন একটি স্বল্প কথার প্রসন্নতা বিরাজ করে তখন। একজনের কাছে পড়ে আছে অনাগত সারা বেলার সুখ-দুঃখের বিচিত্র জীবন। আরেকজনের সামনে আগতপ্রায় রাত্রির নিস্তব্ধতা। এক জন ফিরে তাকান শুধু পিছনের দিকে, সামনের দিকে আরেকজন। কেবল পার্থক্য ঘটে গেছে একটি বিষয়ে। সুস্মিতা বাবার এই রূপের সঙ্গে একাত্ম করতে পেরেছে নিজেকে। সবদিক দিয়ে সেজন্যে সে একটু চাপা হয়ে

গেছে বেশী। আর ঠিক সেই কারণেই তার অনুভূতির তীব্রতাও বেশী।

কিন্তু সেদিনের সায়াহ্নের বেদনার মধ্যে মহীতোষের এই জীবনের একটি স্বাভাবিক আনন্দ ছিল। সেটুকুর চিহ্নও আজ নেই।

সুজাতার দিকে তেমনি করেই দেখছেন মহীতোষ। ওঁর ব্যথা-আড়ষ্ট মুখে একটি অস্পষ্ট অপরাধের ছায়া পড়েছে যেন। খানিকক্ষণ পর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, উমনো ঘুমোসনি মনে হচ্ছে সারা রাত।

মহীতোষের গলায় কেমন একটু শঙ্কার আভাসও রয়েছে। সুজাতা এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বলল, ঘুমিয়েছি তো!

বাইরের জীবনের রীতি-নীতি যা-ই থাক, বাপে-মেয়েতে কোনদিন এবাড়িতে মন নিয়ে লুকোছাপা হয়নি। রাত্রি জাগরণ চিহ্নিত যে মুখ সুজাতা বিশ্বের কোথাও লুকিয়ে রাখতে পারবে না, সেই মুখ নিয়ে আজ সবচেয়ে কাছের মানুষকে ও সত্যি কথা বলতে পারছে না। সে-ই তো সবচেয়ে বড় শঙ্কা মহীতোষের। বললেন, দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে না।

বলে এক নিমেষ জবাবের অপেক্ষা করে আবার বললেন, উমনো, তুই যদি বলিস, তবে আমি নিজেই একবার গিরীনের কাছে না হয় যেতুম।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠল সুজাতা। সোজা হয়ে বসতে গিয়ে আঁচল লুটিয়ে পড়ল টেবিলের উপর। বুকের উপর চিকচিক করে উঠল সোনার হারটি। সারা মুখে রক্ত ছুটে এল। বলল, কেন?

পেছনের খোলা দরজার পাশে, বাগানের বারান্দায় ঠিক বড়দির মতই চমকে উঠল সুমিতাও। এ যে ওর কাছে আশাতীত। এ যেন সেই সায়াহ্নের বাবার কথা। বিষণ্ণ করুণ অসহায়।

মহীতোষ বললেন, হয়তো বড় দেরি করে ফেলেছি, তবু মনে হচ্ছে, আমি আমার কর্তব্য বোধ হয় ঠিক করে উঠতে পারিনি।

এবার আর তেমন করে চমকে উঠল না সুজাতা। বলল, কেন তোমার মনে হচ্ছে একথা?

কেন তা জানিনে। কেবলি ভাবছি, তোর মা থাকলে কি করত। আমি তো তার কিছুই বুঝিনে। আমি শুধু তোর অপমান অভিমানের মুখ চেয়েই এতদিন চলেছি। তোর জীবনের আর একটি দিক তো আমি ভেবে দেখিনি উমনো।

সুজাতা বিস্মিত অনুসন্ধিৎসু চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, জীবনের সেই দিকটা কি অপমান মেনে অভিমান পুষে বজায় রাখতে হবে বাবা ?

সহসা কোন কথা জোগাল না মহীতোষের মুখে। মেয়ের মুখ থেকে ওঁর নিজেরই সংশয়ান্বিত প্রশ্নটি যেন প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। উনি নিজে ছিলেন এক নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের দরিদ্র কেরানীর ছেলে। ওই জীবনটি পার হয়েছিলেন এক অভাবিত অধ্যবসায়ের ভিতর দিয়ে। সে অধ্যায়ের হৃদয়ের গোপন রক্তক্ষয়ের কথা ওঁর সন্তানেরা কেউ জানে না। এখনো উত্তর কলকাতায় ওঁর বিধবা বড় বউদি আছেন, আরো আছেন কিছু জ্ঞাতি-গোষ্ঠী। সেখানে ছেলে-বউ, মেয়ে-জামাই, সব মিলিয়ে এক জীর্ণ দেয়াল-ঘেরা নিশ্চুপ আশাহীন জীবনের ছায়ার সমারোহ দেখেছেন। মহীতোষ যে দিগন্তে পাড়ি দিয়েছেন, সেখানকার সঙ্গে উত্তর কলকাতার বাড়ির কোন মিলই নেই। সেই দিগন্তের পরিণতি ওঁর এই জীবন, এই রুচিবোধ, এই স্বাধীন সত্তা। একদিন যখন উনি ভেবেছিলেন, সুজাতা রবিকে বিয়ে করতে চায়, তখন সেখানে হস্তক্ষেপের কোন প্রয়োজন বোধ করেননি কিন্তু নিজের মনের কাছে তো নেই কোন ফাঁকি। রবি উচ্চ সমাজের ছেলে, কিন্তু প্রাইভেট কলেজের গরীব অধ্যাপক। তা ছাড়া রাজনীতিও করে। তারপর সুজাতা যখন বেছে নিল বড়লোক গিরীনকে, তখন মনে মনে তারিফ করেছিলেন। এই তারিফের মধ্যে কতখানি সমাজ-মন, কতখানি স্নেহের মন ছিল ভেবে দেখেননি। কিন্তু এ জীবনে অপমানের সঙ্গে আপোস না করার যে রীতি, তাকেও অস্বীকার করতে পারেননি।

সুজাতার কথায় কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, কিন্তু উমনো, অপমান চিরকাল থাকে না।

সুজাতা বলল, চিরকাল থাকবে কিনা সে ভরসা তো আমি পাইনি বাবা।

মহীতোষ জানেন, সে ভরসা দেওয়ার মালিক একমাত্র গিরীন। বললেন, উমনো, জীবনে ক্ষমা জিনিসটি কিন্তু ছোট নয়।

কয়েক নিমেষ সুজাতার রক্তাভ ঠোঁট দু'টি চেপে শক্ত হয়ে রইল। বাবার দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে নিল অন্যদিকে। ওর স্নিগ্ধ চোখের পরিধার ওপরে বিষাদ কিন্তু কেমন একটি শ্লেষের ঝিলিক হানছে। বলল, 'ক্ষমা তো আমার কাছে কেউ চায়নি।'

'সে কথা এত সহজে বলা যায় না উমনো। এখানে ক্ষমা কেউ ঘটা করে, দশজনের সামনে চাইতে পারে না, কিংবা এক কথায় ছুটে এসে হাত ধরে ক্ষমা চাওয়া যায় না, করাও যায় না। সেটা ভাঁড়ামি হয়ে যায়। তোদের দু'জনের ঘর করার মধ্য দিয়ে ক্ষমা চাওয়া, ক্ষমা করা কখন হয়ে যেত, তা হয়তো তোরাও জানতে পারতিসনে।'

সুজাতার মুখ আরো গম্ভীর হয়ে উঠল। ভ্রূ কুঁচকে টেবিলের দিকে তাকিয়ে বলল, সেই ঘটনার পরেও এক বছরতো আমি সেখানেই ছিলুম। কই, তখনতো তেমন কিছু ঘটেনি। তারপরেও কেটেছে অনেক দিন। এখনকার চিঠিপত্রগুলির কথা তো ভুলে যাওনি! তোমার এ কথার আভাসও তাতে একবিন্দু পাইনি আমি!

তখন তোমাদের দু'জনেরই মন বিদ্বেষে ভরা।

আজ-ই বা মিতালী কোথায় দেখলে?

মহীতোষ দেখলেন, সুজাতার নাসারন্ধ্র উঠছে ফুলে ফুলে। কঠিন রেখায় বেঁকে উঠেছে ঠোঁট। চোখ দু'টি দপ দপ করছে। আবার বলল সুজাতা, বাবা, সবটাই শেষ পযন্ত ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন অন্যায় তো আমি করিনি। তবে আমি কেন যেচে মান, কেঁদে সোহাগ করতে যাব?

মহীতোষের এক চোখ করুণ, আরেক চোখে দ্যুতি। মেয়ের এই দৃপ্ত তেজস্বিনী মূর্তি ওঁর স্নেহান্ধ হৃদয়কে গর্বিত করে তোলে। সবকিছুর ওপরে দাঁড়িয়ে আছে ওঁর স্নেহ ও ভালোবাসা। এত কথা বলছেন, ওরই দুঃখের ভয়ে, সুখের আশায়। তাঁর রক্তমাংসের আত্মজন এই মেয়েদের সুখ সান্নিধ্যের আশাতেই নিজের জীবনের এই শেষ প্রহরের হেঁকে ডেকে ছুটে বাঁচবার বাসনাটুকু নিহিত রয়েছে। সুজাতার চোখে মুখে বিতৃষ্ণার বহ্নিচ্ছটা দেখে উনি সহসা আর আগের কথার পুনরাবৃত্তি করতে পারলেন না।

এমন সময় সুগতা এল সময়ের তাড়া দিতে। এসে কিছু বলতে পারল না। মহীতোষ তখন স্নেহ-শঙ্কিত গলায় বলছেন, কিন্তু তুই কাল সারা রাত ঘুমোসনি উমনো। তোকে দেখে যে আমি শান্তি পাচ্ছিনে।

সুজাতা ওর বাবার দিকে ফিরে তাকাল না। মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে বলল, ঘরে বাইরে এ অপমান তো একটুখানি নয়। তাকে আমি সহ্য করে উঠতে পারছিনে।

কথাটি শুনে মহীতোষের বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। সহ্য করতে না পারার কষ্ট যদি এমনি করে ফুটে ওঠে সুজাতার মধ্যে তাহলে আগামী দিনের অবস্থা কী হবে।

কিন্তু সুজাতার কণ্ঠের মধ্যে বিক্ষোভের সুরটুকু ওঁর কানে ঢোকেনি। কথার মধ্যেকার জ্বলুনিটুকু পারেননি ধরতে। আজকে যাকে ওর জীবনের একটি অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ধরে নিয়েছে, তার মধ্যে যেন নিজের মনের তীব্র ধিক্কারকে প্রতিফলিত হতে দেখেনি।

সুজাতা আবার বলল, তাছাড়া আমি এখনো নিশ্চিন্ত হতে পারছিনে, জজ শেষ পর্যন্ত কী রায় দেবেন। যদি আমার বিপক্ষে যায়—

মহীতোষ দ্রুত ঘাড় নেড়ে উঠলেন। বললেন, অনিলবাবু আমাকে সে ভরসা খুব জোরের সঙ্গেই দিয়েছেন। রায় যে তোর পক্ষে আসবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই! জজ মিঃ ব্যানার্জির মর‍্যালিটির বিষয়ে সবাই সশ্রদ্ধ।

অনিলবাবু সুজাতার পক্ষের উকিল।

সুজাতা বলল, কিন্তু ধর, যদি অন্য রকমই ঘটে।

তার জন্যে অন্যরকম ব্যবস্থাও আছে।

ঠিক এই মুহূর্তেই টেবিলে লুটনো আঁচলটি ঘাড়ের উপর ফেলে সুজাতা দ্রুত রুদ্ধ গলায় বলে উঠল, কিন্তু তুমি রবিকে কেন পাঠিয়েছ ওর কাছে?

চকিতে পাংশু হয়ে উঠল মহীতোষের মুখ। তারপর ফ্যাকাশে করুণ অসহায় হয়ে উঠল ওঁর বিশাল মুখটি। কী বলবার জন্যে মুখ তুলতেই সুজাতা আবার বলে উঠল, কেন তুমি এমন করে আমাকে হীন করে দিলে? বলতে বলতে ওর বড় বড় কালো চোখের কোণে জল জমে উঠল। অশ্রুরুদ্ধ গলায় ফিসফিস করে বলতে লাগল না থেমে, হয়তো রবি ভেবেছে, আমি বলেছি, তাই তুমি ওকে যেতে বলেছ।

মহীতোষ অসহায়ভাবে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে বললেন, না উমনো, রবি সেকথা ভাববে না।

রবি না ভাবুক যার কাছে পাঠিয়েছ সে তা-ই ভাববে। হাসবে মনে মনে, বিদ্রূপ করবে। ভাববে আমিই কেঁদে কাঙাল হয়ে পাঠিয়েছি, আমিই ভেঙে পড়তে চেয়েছি তার অন্যায় অহঙ্কারের কাছে।

মহীতোষকে যেন কেউ গলা টিপে ধরেছে। ওঁর গলায় মুখে পেশী ও

শিরা স্ফীত আকুঞ্চিত হচ্ছে। চোয়াল কাঁপছে, কিন্তু কিছু বলতে পারছে না।

স্বল্পবাক গম্ভীর সুগতা কারুর পক্ষেই কোন কথা বলতে পারছে না। স্নান করতে যাওয়ার আগে ওর বাঁধনখোলা বিনুনি এলো-চুল ছড়িয়ে পড়েছে ঘাড়ে পিঠে। ও সুজাতার অপমান অনুভব করছে তীব্রভাবে। আর বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সুমিতা কাঁপছে থরো থরো। ওর মনের আকাশ জুড়ে মেঘের পরে মেঘ এল ধেয়ে। অলক্ষ্যের এই লতাটি বিস্মিত কান্নায় উঠল চমকে চমকে। এ কী হল! যে বাতাসটুকু আঁচ করেছিল ও কিছুক্ষণ আগে, সে শুধ্ নতুন মেঘের আমন্ত্রণের জন্যে! যে আশাটুকু ছিল তাতো হলই না, এবাড়ির এই ছায়ার কোলে কোলে দেখল নিঃশব্দে পা বাড়িয়েছে আর এক ছায়া। বিভীষিকার মত দেখল, ওদের ত্রিপদী ছন্দ অবিন্যস্ত হয়েছে।

বুকের শঙ্কা ও ভার নিয়ে পালাবার জন্যে পা তুলল ও। আবার শুনতে পেল বড়দি বলছে, তুমি হয়তো তোমার কর্তব্য ভেবে পাঠিয়েছ। কিন্তু তা কর্তব্য হবে না। তুমি আমাকে বড় করেছ, মানুষ করেছ, সেইটুকু তো তোমার কর্তব্য করেছ। তুমি তো আমাকে কারুর গলগ্রহ তৈরি করনি। তবে তোমার ভাবনা কি?

বাবা যেন চাপা গলায় প্রায় কেঁদে উঠলেন, কি বলছিস তুই উমনো। আমি তোকে কার গলগ্রহ ভাবব।

যারই হোক, আমি কারুরই গলগ্রহ হব না বাবা।

উমনো, তুই আমার গলগ্রহ হবি ভেবে আমি রবিকে পাঠিয়েছি? তুই একথা বিশ্বাস করিস?

জবাবে শুধু অস্ফুট একটু কান্নার শব্দ শোনা গেল। বড়দির গলার শব্দ। আবার কান্নাভাঙ্গা গলা শোনা গেল, না, তা ভাবিনি।

তারপর গাঢ় স্তব্ধতা। সুমিতার মনে হল, এখুনি ওর রুমনি জীবনের সমস্ত বেড়াটি ভেঙ্গে ওঁদের কাছে গিয়ে পড়ে ঝাঁপ দিয়ে।

মেজদি বলল, তোমরা ওঠ, বিলাস আসছে।

সুমিতা দ্রুত কম্পিত পায়ে নেমে গেল বাগানের মধ্যে। ঘুরে, বাইরের ঘরের দিকে যেতে গিয়ে দাঁড়াল থমকে। দেখল, লোহার গেট খোলা হয়েছে নিঃশব্দে। রবিদা দাঁড়িয়ে আছেন ওর দিকে চেয়েই। নিমেষে কী

ঘটে গেল ওর বুকে। দারুণ ভয়ের মাঝে নির্ভয়ের দেখা পেয়ে, দুই বেণী দুলিয়ে ও ছুটে গেল রবিদার দিকে।

রবিদাও পা দিয়েছিলেন বাগানের দিকেই। মাঝপথে ও দু'হাতে সাপটে জড়িয়ে ধরল রবিদাকে।

উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ দোহারা পুরুষ রবি। গায়ে ঢিলে-হাতা খদ্দরের পাঞ্জাবি। বুদ্ধি দীপ্ত কমনীয়তা সারা মুখে। কিন্তু বড় শান্ত, সময়ে সময়ে কেমন যেন সুন্দর হাসির মাঝে একটু বিষণ্ণতার ছোঁয়াচ থাকে লেগে।

রবির কাছে ওর মনের কোন সঙ্কোচ নেই। লজ্জা নেই কোন এই সবে-বাড়ন্ত দেহের। দু'হাত দিয়ে রবিদাকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করল উৎকণ্ঠাভরে, কী বলেছেন গিরীনদা?

রবি চমকে উঠল যেন একটু। তারপর মুখখানি ভরে উঠল নিরাশায়। সুমিতার মাথায় হাত রেখে বলল, ভাল কিছু বলেননি রুমনি।

সুমিতার চোখ ফেটে জল এসে পড়ল। বলল, তবে কী হবে রবিদা?

রবির বিস্ময়ের চমক কাটল না। এমন করে কোনদিন সুমিতাকে কথা বলতে শোনেনি। না শুনুক, কিন্তু এমন করে অলক্ষ্যের বেদনা চেপে রাখা যায় না আর। একমাত্র রবিদা ছাড়া তার আর কেউ যে নেই।

রবি বললে, সে তো এখন কিছু বলা যাবে না। দেখি কি হয়।

ও বলল, রবিদা আমার একটু গিরীনদাকে দেখতে ইচ্ছে করছে।

রবি এক মুহূর্ত ভেবে বলল, বেশ তো যেয়ো!

তারপর ও রবির পিছন পিছন ঘরে গিয়ে ঢুকল। নিজে ছুটে গিয়ে খবর দিল, রবিদা এসেছেন।

মেজদি বললেন, ডেকে নিয়ে এস।

রবি এসে দেখল, বড়দি মেজদি বাবা তিনজনেই দাঁড়িয়ে আছেন চুপচাপ।

বাবা বললেন, কী খবর রবি?

রবি কী ভেবে বললে, গিরীনের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি কাকাবাবু।

সকলেই মুখ চাওয়াচায়ি করল, বড়দি ছাড়া। সকলের আগে বেরিয়ে গেল বড়দিই। তৈরি হওয়ার পালা এবার সবারই।

সকলের পরে স্নান সেরে সুমিতা বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতেই মেজদি প্রথমে বলল, রুমনি, তুমি তৈরি হয়ে নাও, আমাদের সঙ্গে যাবে।

মেজদির মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকাতে গিয়ে হঠাৎ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল ও। কাপড় পরতে পালাল বড়দির ঘরের দিকে।

(৪)

বিলাস ট্যাক্সি নিয়ে এল ডেকে। সবাই তৈরী হয়েছে বেরুবার জন্যে। বিলাসের রান্না করাই সার হয়েছে। খাবার টেবিলে কোনরকমে সবাই বসেছিল একবার। কিন্তু খাওয়া কারুরই ঠিক হয়নি। যার কোনদিকে না তাকিয়ে খাবার কথা ছিল মন দিয়ে, সেই সুমিতাও পারেনি খেতে।

ওর মন জুড়ে যে এত উৎকণ্ঠা, এত অস্বস্তি ছিল, রবিদাকে পেয়ে কয়েক মুহূর্তের কান্নার আবেগে সেই বন্ধ হৃদয়ের দরজাটি গেল খুলে। যা উপচে পড়েছে, তাকে লুকিয়ে রাখার কোন প্রশ্ন নেই। লুকিয়ে রাখতেও পারেনি।

কিন্তু ওর স্নান করতে যাওয়ার ফাঁকে যেন কী একটা ঘটে গেছে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতেই মেজদির চাউনি ও কথা শুনেই বিস্মিত লজ্জায় হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে পালাতে হয়েছিল। কিন্তু পালাবার উপায় ছিল না। সকলেই ওর দিকে ফিরে ফিরে দেখেছে কয়েকবার। বড়দি, মেজদি, বাবাও। কী যে ছিল সেই দেখার মধ্যে! তখন মনে হচ্ছিল, রবিদার পিঠে গুপ্‌ করে একটি কিল মেরে, ওঁরই বুকে মুখ লুকিয়ে বলে, 'কী বলেছেন আপনি ওদের।' যেন সেই অলক্ষিত লতাটির সন্ধান পেয়ে গেছে ওরা। তাতে সবাই খুশি হয়েছে কিনা বোঝা গেল না। অবাক যে হয়েছে, সেটুকু চাপা থাকেনি।

সুমিতা যেটুকু জানে না, সেটুকু হল, ওর অনুপস্থিতিতে রবি বলেছিল সুগতাকে, তোমরা সবাই চলে গেলে, সুমিতা একলা এ বাড়িতে থাকতে পারবে না।

রবিদার কথার মধ্যে কী ছিল, সহসা আর প্রতিবাদ করতে পারেনি কেউ। মহীতোষ বলে উঠেছিলেন, ঠিকই বলেছ রবি, ঝুমনো তো মাঝপথে নেমে যাবে। ওদের কি জরুরী সভা আছে উনিভার্সিটিতে। ঝুমনোটা ওর বড়দির সঙ্গে থাকতে পারবে।

ট্যাক্সিতে ওঠার সময়ে রবিদা দাঁড়িয়ে রইলেন। সুমিতা ততক্ষণে

বড়দি মেজদির মাঝখানে গিয়ে বসেছে জড়োসড়ো হয়ে। মহীতোষ উঠতে গিয়েও দাঁড়ালেন থম্‌কে। বললেন, কই রবি, তুমি সামনের দিকে ওঠ।

সুমিতা লক্ষ্য করে দেখেছে, রবিদা অনেকক্ষণ থেকেই কেমন বিমর্ষ হয়ে উঠেছেন। বাবার কথা শুনে চকিতে একবার দেখে নিলেন বড়দিকে। কুন্ঠিত হেসে বললেন, আমার যাওয়ার কি দরকার আছে কাকাবাবু? রবিদার কথা শুনে বাবাও একবার বড়দির মুখের দিকে দেখলেন। বললেন, তোমার নিজের দিক থেকে যদি কোন বাধা থাকে, তা'হলে কিছু বলার নেই। কিন্তু আমি ভেবেছিলুল, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে।

কিন্তু এই কথার মাঝখানে বড়দি একটি কথাও বললে না। ও তাকিয়ে আছে সামনের দিকে, স্থির চোখে। বাবার সঙ্গে কথা বলার পর, সে-ই যে নীরব হয়েছে, তারপর থেকে মুখ খোলেনি একবারও। অন্যান্যদিন রবিদার সঙ্গে এতক্ষণে কত কথা হয়ে যায়। কত কথা যে ওরা বলে। চিরদিন ভেবে ভেবে অবাক হয়েছে সুমিতা, ওদের দু'জনকে কথা বলতে দেখে। যেন দু'জনের কথা বলা কোনদিন শেষ হবে না।

কিন্তু, এ পরিবারের অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত আজো রবিদা খাবার ঘরেই বসেছিলেন সকলের সঙ্গে। বাবা আর মেজদির সঙ্গে কয়েকটি কথা হয়েছে। সেই কথার ফাঁকে ফাঁকে সবাইকে লুকিয়ে অনেকবার রবিদা বড়দির দিকে তাকিয়েছেন। সুমিতার মনে হয়েছে, বড়দির আনত চোখও যেন লক্ষ্য করছিল সেটুকু। এমনকি, রবিদার ভাব-ভঙ্গি দেখে দু' একবার ওকে তাকাতেও হয়েছে। তবু বড়দির গলা থেকে একটি কথাও বেরোয়নি। যেন সে নিজেকে ক্রমেই শক্ত করেছে।

মেজদি বলে উঠল, তুমি চল রবিদা। বলছিলে, সাড়ে বারোটায় তোমার ক্লাস আছে। ওখান থেকে চলে যেও কলেজে।

মেজদির দিকে তাকাতে গিয়ে আর একবার চোখ পড়ল সুজাতার দিকে। তার দিকে তখন সকলেরই চোখ পড়ছে গিয়ে। বোঝা গেল, বড়দিরও অস্বস্তি হচ্ছে। স্থির চোখের পাতা নড়েচড়ে উঠল কয়েকবার। বাঁ হাত থেকে ভ্যানিটি ব্যাগটি ডান হাতে নিয়ে, রবিদার দিকে তাকিয়ে কোন রকমে বলল খুব নীচু গলায়, চল না!

লোহার গেট ধরে দাঁড়িয়েছিল বিলাস। আরো দূরে লক্ষ্য করলে দেখা যেত, বাইরের ঘরের জানালার পর্দার আড়ালে ঝি অচলার মুখখানি। বিকৃত

মুখে তার একটি অশ্রদ্ধার ভাব। বিলাসের কাছে শুনেছে যে, বড় মেয়ে তার স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ির জন্যে কোর্ট কাছারি করছে। ভাবছিল, হবে না! এত বাইরের ছেলে ছোকরার ভিড় যে বাড়িতে, সে বাড়ির মেয়েরা ছাড়াছাড়ি না করবে কেন?

ওপাশে, ডেপুটি বাড়ির দোতালার বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল প্রৌঢ়া গিন্নী আর ছোট মেয়ে। মেয়েটি সুমিতারই সহপাঠিনী। বয়সে দু' এক বছরের বড়। নাম তাপসী। তাকিয়ে যেন মজা দেখছে।

রবিদা উঠে গিয়ে বসলেন ড্রাইভারের পাশে। সুমিতা জানত, বড়দির ওই বলাটুকুর জন্যই দাঁড়িয়েছিলেন রবিদা। ওদের দু'জনের মধ্যে ওটা ভদ্রতা কিংবা সামাজিকতার ব্যাপার নয়, সম্পর্কের সঙ্কোচ ও আড়ষ্টতা। বাইরে মস্তবড় মানুষ রবিদা। অধ্যাপনা আর রাজনীতির ক্ষেত্রে অনেক সম্মান ওঁর। যখন বড়দির সামনে এসে দাঁড়ান, তখন আর বাইরের সেই মানুষটিকে চেনা যায় না। মনে হয়, বড়দির একটি অঙ্গুলি সঙ্কেতের জন্য সর্বক্ষণ অপেক্ষা করে আছেন উনি। এর মধ্যে সুখ ও আনন্দ আছে কতখানি তা' জানে না সুমিতা। কিন্তু, দু'জনের মাঝখানে, কোথায় কোন্ অদৃশ্যে একটি ব্যথার ছোট কাঁটা যেন আছে লুকিয়ে। তাকে চোখে দেখা যায় না। তাকে অনুভব করা যায় না বড়দির দিকে তাকিয়ে। রবিদার সান্নিধ্যে এলে খচখচানিটুকু টের পাওয়া যায়।

গাড়ি এসে পড়েছে ট্রাম রাস্তার উপরে। রোদে স্নান করে উঠেছে সারা শহরটি। ট্রামের ঘর্ঘর, বাসের চীৎকার, প্রাইভেট গাড়ির হর্ন, রিকশার ঠুনঠুন, মানুষের কলরবে কেমন এক সচকিত উল্লাসে উদ্দাম হয়ে উঠেছে রাস্তাঘাট। যুদ্ধের পর দাঙ্গার অবরোধ সবে কাটিয়ে উঠেছে শহর। তার ছাপ লেগে আছে এখনো এখানে সেখানে। দেয়ালে দেয়ালে, দাঙ্গা আর সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পোস্টারে গেছে ছেয়ে। কোনটিতে গান্ধীজীর শান্তির বাণী, কোনটিতে সাম্প্রদায়িক রণহুঙ্কার, ক্রিপস মিশনের বিরুদ্ধে জেহাদ কোনটিতে। এ-আর-পি ওয়ার্ডেন্ পোস্টগুলির সামনে সেই নীল কুর্তা মানুষগুলির জটলা নেই আর। শুধু সরিয়ে নেওয়ার অবসর পাওয়া যায়নি এখনো সাইনবোর্ডগুলি। এখানে সেখানে এখনো জরুরী শেল্টারের প্রাচীরগুলি রয়েছে দাঁড়িয়ে।

গাড়িতে সবাই চুপচাপ। সবাই বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

আড়চোখে দেখল একবার বড়দিকে। বড়দি স্নান করেনি। আঁচড়ে নিয়েছে সামনের চুলগুলি। সাবান ধোয়া মুখে একটু হিমানীর প্রলেপ মাত্র। সাদা রংএর কাশ্মীরী সার্জের ব্লাউজের সঙ্গে পরে এসেছে আঁসপাড় সাদা তাঁতের শাড়ি।

বিয়ের এক বছর আগে এমনি সাদা জামাকাপড় খুব পরত বড়দি। সে সব খদ্দরের জামাকাপড়। তখন সুমিতা সবদিক থেকেই অনেক ছোট। ওর স্কুলের বইয়ের আশেপাশে আর যে সমস্ত ভগবতী আর দেশনেত্রীদের বহু বিচিত্র চমকপ্রদ কাহিনীগুলি থাকত, সেইসব নায়িকাদের সঙ্গে হুবুহু মিশিয়ে ফেলত বড়দিকে। বড়দি মেজদি আর রবিদার মুখে নানান কথা শুনে শুনে, ওর বুকের মধ্যে এক অস্পষ্ট আগুনের আঁচ লেগেছিল। কেমন একটি অস্পষ্ট ঘৃণা ও বিদ্বেষে ফুলত মনে মনে। কে যে শত্রু, কার বিরুদ্ধে এত রাগ, তা-ই ভাল করে জানতনা সুমিতা। এই উত্তাপের পিছনে বড়দির সেই মূর্তিখানি আসল! বড়দি তখন ধ্যানের নায়িকা।

তখন রবিদার সঙ্গে রোজ বাইরে যেত বড়দি। রবিদার সঙ্গেই সারাক্ষণ। সেই স্রোতে মেজদিও ভেসে গিয়েছিল। কত ছেলে আসত বাড়িতে। সকলের মধ্যে বড়দিকে দেখাত রাণীর মতন। সেদিনের রবিদা আর বড়দি, আর আজকের এই দুই বন্ধুতে কত তফাত।

সবচেয়ে চরম হয়েছিল, বড়দির জেলে যাওয়া। সারা কলকাতাটাই যেন বড়দির জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। বাড়িতে পুলিস তছনছ করছে। মেজদি গেছে পালিয়ে। কী ভাগ্যি, বাবা তখন অবসর নিয়েছেন চাকরি থেকে। জেল হয়েছিল রবিদারও।

পনর দিন পরেই জেল থেকে বেরিয়ে এল বড়দি। ছ' মাস পরে রবিদা। গিরীনদার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বড়দির, জেলে যাওয়ার আগেই। রবিদা এসে দেখলেন, গিরীনদা এ বাড়ির প্রত্যহ আসরের একজন। রবিদা আসার পরেই তো পাকাপাকি হল বিয়ের কথা।

তখনো সুমিতা রবিদার হাসির দিগন্তে বিষণ্ণতার অস্তাভা দেখেছে। যেটুকু ও আজো জানে না, সেটুকু সেদিনও জানত না যে, রবিদার দীপ্ত চোখের কোণ থেকে কোন্ শিখাটি নিভে গেছে একেবারে। সে শিখাটি নিভে গেলে বাইরটাকে তো অন্ধকার করে না। যেখানটাতে ঘনীভূত হয় অন্ধকার, সে জায়গাটি থাকে সকলের অগোচরে। যেখানে বেদনা যত, তত

জমে নিজের ধিক্কার। রবিদার মত মানুষেরা সেইখানটি ঢেকে রেখে হেসে বেড়ান দশজনের সামনে।

সুমিতা জানত না, বিয়ের আগে যেদিন বড়দি রবিদাকে বলেছিল, রবি, আমি তোমার ওপর অন্যায় করছি না তো ?

তীব্রবেগে রক্ত প্রবাহ ছুটে এসেছিল রবির মুখে। কী তীব্র হাসি ফুটেছিল তার ঠোঁটে। যেন আগুন জ্বলছিল দপ্‌ দপ্‌ করে। বলেছিল, আমার ওপর ? না, না, তেমন দুরাশা তো আমি কোনদিন করিনি উমনো। তা হলে তো স্পষ্ট করে তোমাকে বলতে পারতুম কোনদিন।

ঠিক সেই মুহূর্তেই ওরা দু'জনেই চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল দু'জনের কাছ থেকে। সেই দুরাশা থাকলে স্পষ্ট করে বলতে পারত রবি ? এত বড় মিথ্যে কথাটা কেউ বোধ হয় চোখে চোখে তাকিয়ে বলতে পারেনি, শুনতেও পারেনি।

এর বেশী বলতে পারেনি কেউ কিছু। রবি বাইরে বেরিয়ে এসে দেখেছিল, রাত্রের নির্জন রাস্তায়, একটি বাড়ির ছায়ায় যেন ঘাপটি মেরে পড়ে আছে গিরীনের মস্তবড় গাড়িটি।

বড় রাস্তায় এসে আর একবার হেসেছিল রবিদা। ভুল, সবটাই একেবারে ভুল। চোখে আগুন, ঠোঁটে আগুন যে রুদ্রাণীর হাতের পতাকা নিয়ে সবার আগে রবিদা মৃত্যু-উল্লাসে যাবেন ছুটে, সেই রুদ্রাণী ধরেছে রাণীর বেশ। সত্যি, একটুও বিদ্বেষ হয়নি রবির। ভেবেছিল, এছাড়া কী উপায় আছে সুজাতার। ও যেভাবে মানুষ হয়েছে, যে মন নিয়ে বেড়েছে, ঠিক সেই পথই নিয়েছে বেছে। ওইদিকেই সুজাতার সীমান্ত। তার ওপারে রবির আগুনের শিখায় কাঁপা অস্পষ্ট দিগন্তে কী আছে, কে জানে। বুকের মধ্যে কেঁপে উঠেছিল রবির। কী এক সর্বনাশের হাত থেকেই না সুজাতা বাঁচিয়ে দিয়েছে তাকে, বেঁচেছে নিজে। হয়তো, পরে না পেত ওর রুদ্রাণীকে, না পারত রাণীর মত সমাদর করতে। তখন ধুলো মাখামাখি করে দাঁড়াতে হত দু'জনকে দশজনের সামনে। কী অপমান !

আজ তো সুজাতা ধুলো মেখে দাঁড়ায়নি। দাঁড়িয়েছে রাণীর মতই। রবিকে সে ধরেওনি, ছাড়েওনি। নিজের মনকে চোখ টিপে ছলনার মধ্য দিয়ে ও স্বীকার করেনি গিরীনকে। ও যেন চিরকাল ধরেই প্রতীক্ষা

করছিল গিরীনের। যেদিন এসে গিরীন চাইল, দু' হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল।

রাণী বলেই, রাণীর মত বেরিয়ে এসেছে আজ।

এলোমেলো হয়ে উঠেছিল সুমিতার অস্পষ্ট মন। কোন্ বেশটি যে বড়দির সত্যি, সেটা বুঝে উঠতে পারেনি। ওই জেলে যাওয়ার বেশ, না গিরীনদার সামনের বেশ। যদিও কোনটাই ওকে ক্ষুণ্ণ করেনি। মনে হয়েছিল বড়দি যেন একটি স্বাধীন সুন্দর পুতুল। কখনো এই বেশে, কখনো ওই বেশে বেড়ায় সেজে।

কিন্তু কোথা থেকে কী ঘটে গেল। সুমিতার মনে পড়ল সেই বিশ্রী সংবাদটির কথা। গিরীনদার চেহারার সঙ্গে কোনদিন ঘটনাটির মিল খুঁজে পায়নি। স্পষ্ট মনে পড়ছে, বড়দিকে লেখা, সুমিতার লুকিয়ে দেখা গিরীনদার সেই পত্রটি। —"তোমাকে প্রতারণা আমি কোনদিন করতে চাইনি। যার বিষয় নিয়ে তুমি এতটা ক্ষিপ্ত হয়েছ, সে আমার বিবাহিতা স্ত্রী নয়।" তখন আর সামনাসামনি নয়, দূর থেকে ওরা পত্রে পত্রে আয়ুধ নিক্ষেপ করছে পরস্পরের প্রতি।

আর একটি গিরীনদার পত্র—"তার সঙ্গে তো আমি কোন সম্পর্কই রাখিনি। তোমার হিতৈষী সংবাদদাতারা আমার নামে মিথ্যে কথা বলছেন তোমাকে।"

"স্ত্রীর অধিকারে যেসব গালাগাল আমাকে দিয়েছ, আমার অতিবড় শত্রুও কোনদিন তা দেয়নি। সেই জন্যই বলছি, ছোট মুখে বড় কথায় আমার বড় ঘৃণা।"

পড়তে পড়তে মনে হত, সুমিতার বুকের তন্ত্রী ছিঁড়ে পড়বে। একে তো লুকিয়ে দেখার কাঁপুনি, তার ওপরে সেই ভয়ঙ্কর কথাগুলি। এলো-মেলোভাবে মনে পড়ছে সেই সব পত্রের কথা—"হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কেরই শৈথিল্য ছিল না। সেকথা এখনো বলছি। তাতে তোমার যত ঘৃণা এবং রাগই হোক, এ সত্য স্বীকার না করে পারছিনে। কিন্তু সে সুন্দরী এবং বিদুষী কিনা, অনর্থক এ প্রশ্ন করে আমাকে খোঁচা দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। হ্যাঁ, সে আমার রক্ষিতা ছিল। তুমি লিখেছ, আমার মত নীচ সবই করতে পারে। তা ঠিক, সুতরাং তার রূপ ও বিদ্যার কথা থাক। তোমাকে

যে পেয়েছিলুম, সেটা তো অস্বীকার করতে পারবে না। একটি কথা, পত্র লেখালেখি পরস্পরের প্রতি ঘৃণাটাই বাড়াচ্ছে। সুতরাং আর থাক। তবে আমার বিশ্বাস, তোমার অধিকারে আমি কোনরকমেই হস্তক্ষেপ করিনি। তোমার ফিরে আসার পথ পরিষ্কার। আর তা না চাইলে সেটাকেও অপরিষ্কার করে রাখতে রাজী নই আমি।"

আবার—

"তার কাছে আর যাব কি না যাব, কিংবা, আমি আমার পুরনো জীবন ত্যাগ করব কিনা, তোমার ওই ক্ষিপ্ত ক্রুদ্ধ প্রশ্নের মুখে আমি তার কোন জবাবদিহি করতে পারব না। হ্যাঁ, যতদিন প্রয়োজন বুঝব, ততদিন তাকে আর্থিক সাহায্য না করে পারব না। তবে এতদিনে তোমার সঙ্গে আমার ব্যাপারটা পারিবারিক অপমানের শেষ সীমায় এসে পড়েছে। তুমি ফিরে না এলে আমাদের বংশে একটি নতুন অধ্যায় রচনা করতে হবে আমাকে। আমি কোন কিছুকেই আর ঝুলিয়ে রাখতে পারব না।

কত কথা সেই পত্রাবলীর। তারই পরিণতির সর্পিল পথ বেয়ে এখনো চলতে হচ্ছে।

হঠাৎ গাড়িটি দাঁড়াল। চমকে তাকাল সুমিতা। মেজদি নেমে যাচ্ছে। ব্যস্ত ছুটন্ত চৌরঙ্গী। ইংরেজী ছবিঘরের ভিড়। ভিড় চারদিকে সাদা, কালো মেয়ে পুরুষের। মাথার উপরে গম্বুজের কপালে ঘুরছে সময়ের কাঁটা। কাঁচের গায়ে গায়ে ঝুলছে রকমারি জামা ও প্রসাধন সামগ্রী।

গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল মেজদি। বেশে ওর বৈরাগ্য, ভঙ্গিতে রাজেন্দ্রাণী। নেমে দাঁড়াতেই দেখা গেল, হাতের জলন্ত সিগারেটটি ফেলে দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে আসছে মৃণাল। মেজদির বন্ধু, একসঙ্গে পড়েছে। গত বছর পাশ করেছে মৃণাল। মেজদি পরীক্ষা দিতে পারেনি।

সে এসে আগে রবিদার দিকে চেয়ে হাসল একটু। তারপরে হঠাৎ মুখখানি করুণ করে তাকাল বড়দির দিকে। যেন শবযাত্রার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বড়দিও হাসল একটু। মেজদি বলল বড়দিকে, দিদি, আমি তা হলে যাচ্ছি।

বড়দিকে কেমন অন্যমনস্ক লাগছিল। ঘাড় কাত করে বলল, আচ্ছা। মহীতোষ ফিরে তাকিয়ে বললেন, আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরিস ঝুমনো।

মৃণালের পাশ ঘেঁষে ফিরতে গিয়ে মেজদি বলল, চেষ্টা করব বাবা।

বাবা ওদের দু'জনকেই দেখছিলেন। মৃণাল আর মেজদিকে।

গাড়ি বেরিয়ে গেল। হঠাৎ সমস্তটাই যেন সুমিতার স্বপ্নের ঘোরে ঘটে গেল। বাবা, বড়দি, মেজদি, রবিদা, সবাইকেই ভালবেসেছিল সুমিতা। তার জন্যে ওর জীবনে নিরঙ্কুশ সুখ ছিল না। কীভাবে, কোন্‌দিক দিয়ে কতগুলি বিচিত্র সুখ-দুঃখ গড়ে উঠেছিল ওর মনে। সেই মন, মানুষের এমন বৈচিত্র্য দেখে সভয়ে কেঁদে উঠেছে, কেঁপে উঠেছে। আজ মৃণালকে মেজদির পাশে দেখে, অন্যদিনের মত খুশিতেও উপচে উঠতে পারল না। এখনো বিত্ত ও অবস্থা দিয়ে সুখ-দুঃখ রচনা করার পথে পা বাড়াতে পারেনি সুমিতা। খালি ভয় আজ, মানুষ তার নিজের হাসি নিজেই দেয় ধুয়ে শেষ করে। মানুষের জীবনধারণের মধ্যে কোথায় কতগুলি মহাসর্বনাশ আছে লুকিয়ে। আর মানুষ তাকে কেমন করে যেন নিজেই ডেকে নিয়ে আসে। কী করে বলবে ও, মৃণালকে দেখলে মেজদির গম্ভীর পাতলা ধারালো ঠোঁটের কোণে একটি বিচিত্র হাসির রেখা দেখতে পায় কেন? একদিন পেয়েছিল গিরীনদার সামনে বড়দিরও। তারপর ওই পত্রগুলি। যার প্রতিটি লাইনের ফাঁকে ফাঁকে অদৃশ্য রয়ে গেছে আসল কথাগুলি। ফুটে উঠেছে শুধু ক্ষিপ্ত, অবুঝ, অপমানকর কতগুলি মিথ্যাকথার সারি।

রাস্তাঘাট, গাড়ির গতি, ভেতরে বাবা, বড়দি, রবিদা, সব মিলিয়ে ঘোর কাটল না ওর স্বপ্নের। কেবল একটি মর্মভেদী কান্না ঠেলে উঠতে লাগল বুক থেকে।

সুমিতার গল্প-সাহিত্য, হাসি-খেলা-গানের সহজ পথ দলে দুমড়ে ভাঙছে চোখেরই সামনে। সবটাই এতবড় মিথ্যে এই সংসারে?

এই ঘোরের মধ্য দিয়েই গাড়ি কোর্টে এল। কখন উঠে গেল বারলাইব্রেরীতে। উকীল অনিলবাবু বক্‌ বক্‌ করে গেলেন। কালো গাউনপরা শকুনের মত উড়ে উড়ে যেন চলেছে কতগুলি মানুষ। আশেপাশে ডাইনে বাঁয়ে, সর্বত্র তাদের ছায়া। জোড়া জোড়া চোখ এসে গিলছে বড়দিকে, সুমিতাকে, সবাইকে। আলমারীতে, বইয়ে, আলোছায়াতে সর্বত্রই যুদ্ধমান তীক্ষ্ণদৃষ্টি। চারদিকের এক মহাসমারোহ এখানে যেন ঘিরে

আসছে এক বিশালকায় খড়্গ নিয়ে। বড়দি আর গিরীনদার মাঝখানের সমস্ত তন্ত্রীকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে।

ভয় নিয়ে, কান্না চেপে, কখন রবির সঙ্গে এসে দাঁড়াল সুমিতা নীচের গাড়ি ভিড়-করা লনের একপাশে, সে খেয়ালটুকুও নেই। তারপর হঠাৎ ও চমকে দেখল, একটি গাড়ির দরজা খুলে নামছেন গিরীনদা। ও অস্ফুট গলায় বলে উঠল, গিরীনদা।

রবি বলল, কই ?

তারপর দু'জনেই নিঃশব্দে চেয়ে দেখল, গিরীনদা নেমেছেন গাড়ি থেকে। সেই গিরীনদা! দেখে কাঁপছে সুমিতার বুকের মধ্যে। হয়তো ডাক দিয়ে বসবে। ঠিক তেমনি, টাই আঁটা, কোট পরা, ফিটফাট গিরীনদা। তবু যেন সব মিলিয়ে কিছু অবিন্যস্ত। চোখ থেকে গগলস নামিয়ে, ড্রাইভারকে কি বলে চলে গেলেন ওপরে। দেখতেও পেলেন না ওঁর রুমনো সাহেবাকে, বন্ধু রবিকে।

হঠাৎ রবির গলার স্বরটি কেমন গাঢ় হয়ে উঠল। সুমিতার ঘাড়ে হাত দিয়ে বলল, আমরা এখানেই দাঁড়াই রুমনি কেমন।

—হ্যাঁ।

আবার বলল, কি ভাবছ রুমনি ?

কি ভাবছে সুমিতা ? বড় ভয় পেল, চোখ ফেটে জল আসবে এখুনি। তবুও হাসল। হেসে রুদ্ধ গলায় বলল, বলব রবিদা ?

অবাক হয়ে বলল রবি, বল না।

সুমিতা সেই অসহজ পথের নির্মমতার যন্ত্রণা নিয়ে, সহজ পথের কথাটাই বলে ফেলল নির্ভয়ে। ঢোঁক গিলে, হেসে বলল, আচ্ছা রবিদা, যদি গিরীনদা এখুনি বড়দির কাছে গিয়ে দাঁড়ান হেসে ?

রবি চমকে উঠে বলল, অ্যাঁ ?

কিন্তু সুমিতা তখন ফিস্‌ফিস্ করে যেন স্বপ্নের ঘোরে বলেই চলেছে, যদি গিরীনদা গিয়ে বড়দির হাত ধরে টেনে নিয়ে যান। যদি বড়দিটা কেঁদে ফেলে সত্যি সত্যি গিরীনদার সঙ্গে চলে যায়। ওরা সব ঝগড়া ভুলে যদি সেই আগের মত হয়ে যায়। সেই আগের মত হাসতে হাসতে, ঠিক আগেরই মত ওই গাড়িতে চলে যায়।......

সমস্ত গলাটি ভরে উঠল সুমিতার হাসি কান্নার সুধায়। রবি

কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারল না। খানিক্ষণ নীরবতার পর সুমিতাকে কাছে টেনে. মাথায় হাত বুলিয়ে, চাপা স্বরে বলল, ঠিক বলেছ রুমনি, ঠিক। এর চেয়ে ভাল আর কিছু হয় না।

রবিদা আর সুমিতা দু'জনেই আচ্ছন্ন হয়ে রইল ওদের ঘোরে। কতক্ষণ এমনি আচ্ছন্ন হয়েছিল কে জানে। সময়ের মনে সময় পার হয়ে গেল। এই দু'জনে নিঃশব্দ অথচ দ্রুত নিজের নিজের মনে অদৃশ্য ধারায় চলে গেল কোন্ সুদূরে। চমক যখন ভাঙ্গল, দেখল গিরীনদা চলে যাচ্ছেন গাড়ি নিয়ে। তবে? তবে কি হল? একটু পরেই নেমে এল বড়দি বাবার সঙ্গে। পাশে পাশে উকিল অনিলবাবু। দেখল, বড়দির রংহীন সাদা শাড়িটাতে আগুন লেগেছে যেন। ওর সারা চোখে মুখে একটি অস্বাভাবিক দীপ্তি। একটি অদ্ভুত চাপা তীব্র হাসির ধারে চমকাচ্ছে ওর চোখ মুখ। এমন কী, ওর চলবার ভঙ্গিটি পর্যন্ত আরো দৃপ্ত খরো হয়ে উঠেছে।

অনিলবাবু বিদায় নিলেন হাসতে হাসতে। কিন্তু বাবাকে তেমনি অসহায় করুণ দেখাচ্ছে।

কাউকে কিছুই বলতে হল না। বোঝা গেল, সেই অমোঘ পরিণতি ঘটে গেছে। সুমিতার সব স্বপ্ন ভেঙ্গে, একটি ছিন্ন পত্রের মত নেমে এল বড়দি। গিরীনদা গেছেন তার আগেই। রাজশক্তি দিয়ে ওদের বিচ্ছেদ আজ সম্পূর্ণ হয়েছে। বড়দি বলল, তোমরা বাড়ি যাও বাবা, আমি এক জায়গায় ঘুরে যাব।

বাবা যেন ভয় পেয়ে চমকে উঠে বললেন, কোথায়?

বড়দি : অনেকদিন অমলাদের বাড়ি যাইনি। আজ একটু ঘুরে যাব।

বাবা ছেলেমানুষের মত করুণ গলায় বললেন, আজ থাক উমনো, অন্যদিন যাস্।

বড়দি ওর সেই দীপ্ত হাসিমুখেই বলল, না বাবা, আমার বাড়ি যেতে এখুনি ইচ্ছে করছে না। তোমরা যাও আমি সন্ধ্যার আগেই ফিরব।

তারপর রবিদার দিকে ফিরে, নিজের হাতঘড়ি দেখল। বলল, এ কি, তুমি কলেজ কামাই করে ফেললে? সাড়ে বারোটায় তোমার ক্লাস ছিল যে?

রবিদা অপ্রস্তুত গলায় বললেন, হ্যাঁ, আজ আর যাওয়া হল না।

বড়দি একমুহূর্ত দূরের দিকে তাকিয়ে আবার বলল, বাবা, তুমি চলে যাও, আমি পরে যাচ্ছি ?

বলে ও চলে গেল। দৃপ্তপদক্ষেপে, ওর সাদা শাড়িতে আগুন ছড়িয়ে যেন গেল চলে। একটু পরে, এরা তিনজনেও অগ্রসর হল। খানিকটা এগিয়ে রবিদা বললেন, আমি আজ চলি কাকাবাবু। কাল পরশু বাড়িতে যাব। তারপর স্থমিতা বাবার পাশাপাশি হেঁটে চলল।

তখনো অফিস আদালতের ছুটি হতে কিছু বাকী। মাঘের রোদে কাঁপছে অনাগত চৈত্রের দীপ্তি। রাস্তায় ভিড় কম। ট্রামবাসগুলি ফাঁকা ফাঁকা।

বাবা বললেন, রুমনো, চ', বাগবাজারে তোর জ্যাঠাইমার কাছে যাই আজ একটু।

রুমনির কথা বলতে ভয় হল। অন্যকিছু নয়, ওর সমস্ত রুদ্ধ-কান্না ভেঙ্গে পড়বে বলে। সম্মতি জানাল ঘাড় কাত করে।

(৫)

সারাটি রাস্তা মহীতোষ চুপ করে রইলেন। স্থমিতা শূন্যদৃষ্টিতে দেখছিল দুপুরের ভিড়হীন রাস্তা। আর থেকে থেকে, লুকিয়ে দেখছিল মহীতোষকে। যেন এক মহা দুর্দৈবের পর, নতুন করে আবার সবটুকু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পর্যালোচনা করার সময় এসেছে।

ট্রাম মেডিকেল কলেজ ছাড়াতেই দেখা গেল পুলিস ভ্যান রয়েছে দাঁড়িয়ে মীর্জাপুর স্ট্রীটের মধ্যে। কোমরে রিভলবার গুজে দু'জন অফিসার দাঁড়িয়ে রয়েছে স্কোয়ারের রেলিংএর কাছে। পুলিস বাহিনী রয়েছে একটি আলাদা গাড়িতে। হেলমেট্ রাইফেলে রীতিমত যুদ্ধের সাজ তাদের সর্বাঙ্গে। কিন্তু আশ্চর্য রকম অলস চাউনি তাদের চোখে! যেন তন্দ্রালু অথচ অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকিয়ে দেখছে স্কোয়ারের দিকে! মুখগুলি ভাবলেশহীন! কেবল অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান অফিসার দু'জনকেই যা একটু বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে। সেটাও বুদ্ধি ঠিক নয়, ক্রোধের দীপ্তি। দু'জনেই তাকিয়ে আছে স্কোয়ারের ভিড়ের দিকে।

সবই দেখা হয়ে গেল চোখের পলকে। স্কোয়ারের ছাত্রছাত্রীদের জটলা। মিটিং হচ্ছে, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে, কোন উত্তেজনা নেই। উত্তেজনা যেটুকু,

সেটুকু রাইফেল হেলমেটেই সীমাবদ্ধ। এখন আর এসব দেখে ভয় বিস্ময়, কিছুই হয় না। ট্রাক, ট্যাঙ্ক, কামান, কনভয়ের সারি, সৈন্যবাহিনী পুরনো হয়ে গেছে। গতবছর গোড়ার দিকে সারা কলকাতার অলিতে গলিতে গুলিবৃষ্টি হয়েছে। আগে দাঙ্গা উপলক্ষেও পুলিস মিলিটারী অবরোধ করে রেখেছিল কলকাতা। এখন মুখ না খুলতেই এরা হাজির হয়।

ভয় নয়, দুর্ভাবনা হচ্ছে। স্কোয়ারের ওই ভিড়ের মধ্যে মেজদি রয়েছে। হয়তো কলেজে এলে, স্মিতাও পায়ে পায়ে চলে যেতো ওখানে। কিন্তু এখানে এই চলন্ত ফাঁকা ট্রামে অশেষ বেদনায় নির্বাক দু'জনের চোখে দুশ্চিন্তার ছায়া এল ঘনিয়ে। কিছুই বলার নেই। যার জন্যে দুশ্চিন্তা, সেই মেজদিকে ডেকে আনা যাবে না কোনক্রমেই।

তারপর বাগবাজারের মোড়ে নেমে দু'জন হেঁটে এসে দাঁড়াল সেই বাড়িটির সামনে। আজ আর মহীতোষ কোথাও যাবার জায়গা খুঁজে পাননি, এ বাড়ি ছাড়া। স্মিতা আরো কয়েকবার এসেছে এ বাড়িতে।

এখানে কলকাতার আর এক রূপ, আর এক রস, আর এক গন্ধ। গত শতাব্দীর নির্জীব ভাঙ্গা জীর্ণ কলকাতা বুড়ো চোখে তাকিয়ে আছে এখানে। দক্ষিণের নতুন কলকাতা এখানে এসে করুণা ও বিতৃষ্ণা বোধ করে। কেমন যেন হতশ্রী, রূঢ় এখানকার পরিবেশ। এখানকার বাড়ি, এখানকার রাস্তা, দোকানপাট, লোকজন, রকের আড্ডা, ভ্রাম্যমাণ ষাঁড়, সবকিছুর মধ্যে একটি ভিন্ন চরিত্রের ছাপ রয়েছে। অন্তত তার বাইরের বেশ দেখে তাই মনে হয়। এখানে মানুষ বাস করে চেঁচিয়ে হেঁকে ডেকে। পুরনো বাঙ্গালীর আস্তানা এখানে। অথচ শহুরে জীবনের বাঁধনটি আছে আষ্টেপৃষ্ঠে।

এখানেই মানুষ হয়েছে মহীতোষ, এ পাড়াতেই বড় হয়েছে। যে বাড়িতে ঢুকলেন, জন্মেছেনও সেই বাড়িতেই। তবে সে বাড়ি এ বাড়িতে এখন অনেক তফাত হয়ে গেছে। তখন এত নতুন ছোট ছোট ঘর উঠে ঘিঞ্জি হয়ে ওঠেনি, এত লোকের বাস ছিল না। এখন দিনের বেলায় আলো জ্বালিয়ে না রাখলে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠা যায় না। নীচের উঠোনটার দিকে তাকাতেও ভয় করে। প্রচুর ভাড়াটের ভিড়। তাদের ব্যবহৃত সমস্ত জল দিনরাত্রি অন্ধকার উঠোনটিকে ভয়াবহ রকম পিছল করে রেখেছে। তেতলায় ঘেরাও থেকে এখানে আলোটুকু এসে পৌছুবার আগেই অন্ধকার জাঁকিয়ে

বসে মুখ ভেংচায় আকাশটাকে। অনেক লোক, তাই অনেক গণ্ডগোল, চীৎকার। সব সময়েই ভিড়ের মধ্যে বাস।

বাড়ির মালিক যারা, মহীতোষের ভাইপো, তারা থাকে তেতালায়। তারা এ সব ভিড়ের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে আছে অনেকখানি। যেটুকু সহ্য করতে হয়, সেটুকু আয়ের কথা চিন্তা করে করতেই হয়। সব মিলিয়ে মাসে তিনশো টাকা ভাড়া পায়।

সুমিতা ভেবে পায় না, মানুষের নিজের এত বড় বাড়ি থাকতে কেন তারা আকাশের টংএ, পায়রার খোপের মধ্যে থাকে গদাগাদি করে।

দু'জনে তেতালায় এসে দাঁড়াতেই একটি বছর দশেকের ছেলে উঠল চীৎকার করে, ঠাকমা, বালীগঞ্জের দাদু এসেছে।

বলেই, খালি গা' ছেলেটি চকিতে একবার বাপ-মেয়েকে দেখে উধাও হল। মহীতোষের মৃত দাদার বড় ছেলে নবগোপাল আর রামগোপালের ছেলে মেয়েদের কাছে বালীগঞ্জের দাদু বলেই তাঁর পরিচয়। আশেপাশে নড়বার জায়গা নেই। রেলিংএ, বারান্দায়, সর্বত্র কাপড় কাঁথা শুকাচ্ছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সুখদা। মহীতোষের বৌঠান, সুমিতার জ্যাঠাইমা। বয়স প্রায় মহীতোষের মতই। দু' একবছর বেশীও হতে পারে। দেখায় আরো বুড়ি। কিন্তু এখনো বেশ চলা ফেরা করতে পারেন। ছ্যাচা পানের দলা মুখে পুরে, বলিরেখাবহুল ঠোঁটের কষ রেখেছেন রক্তাক্ত করে। একটু চাপা গলাতেই বললেন, কী ভাগ্যি। ঠাকুরপো যে, একেবারে মেয়ে নিয়ে। এস ভাই, এস।

সুমিতার বড় অদ্ভুত লাগে বাবা আর জ্যাঠাইমার এই সম্পর্ক। বাবার সঙ্গে বড়দি মেজদির যেমন বন্ধুত্ব আছে, এখানে ঠিক তেমনটি নয়। তবু যেন জ্যাঠাইমার সঙ্গে বাবার কেমন এক রকমের একটি বন্ধুত্ব আছে।

জ্যাঠাইমার চাপা গলা শুনে বাবা একটু বিস্মিত হলেন মনে মনে। বললেন, এসে তোমাদের বিব্রত করলুম না তো বৌঠান?

জ্যাঠাইমা ওঁর কুঞ্চিত গাল কাঁপিয়ে, ঘোলা চোখ দু'টি কুঁচকে বললেন, ও মা! কী যে সাহেবীপনা কর ঠাকুরপো। ঘরের ছেলে ঘরে আসবে, তার আবার ওসব কী বলছ।

কিন্তু বাবার মুখের বেদনা-ভার-গাম্ভীর্য জ্যাঠাইমা তাকিয়ে দেখেননি

এখনো। সুমিতার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, আয়রে, আয়। কী নাম বাপু তোদের, আমার আবার মনেও থাকে না।

অন্যদিন হলে মহীতোষ জবাব দিতেন, নেহাতই বাংলা নাম বৌঠান। সুজাতা, সুগতা, সুমিতা।

কিন্তু আজ কিছু বললেন না। সুমিতার হঠাৎ মনে পড়ে গেল অনেকদিন আগের একটি ঘটনা। প্রায় দু' বছর আগের কথা। কলকাতায় ফিরে বাবা বড়দি মেজদি আর ওকে নিয়ে এসেছিলেন এ বাড়িতে। বড়দি মেজদিকে শিখিয়ে রেখেছিলেন জ্যাঠাইমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে। তখন সুমিতা অনেক ছোট। ইচ্ছে হয়েছিল, বড়দি মেজদিকে নকল করে প্রণাম করবে জ্যাঠাইমাকে। কিন্তু সেরকম কোন অনুমতি বা নির্দেশ ছিল না ওর প্রতি।

এ বাড়িতে ঢুকলে যেমন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, তেমনি মানুষগুলিকেও খুব একটা নিজের বলে ভাবতে পারে না সুমিতা। সবাইকেই কেমন যেন একটু গায়ে পড়া গায়ে পড়া লাগে। পরিচয়ের অপেক্ষা না করেই ছেলেমেয়ে-গুলি কাছ ঘেঁষে আসে ওর। সুমিতার সামনেই হয়তো সংসারের খুঁটিনাটি বিষয় আলোচনা আরম্ভ করে দেয় বাড়ির লোকেরা। ছেলেমেয়েরা চেঁচিয়ে খেতে চায়, ঝগড়া করে। বাপ মা ছাড়া বাকী সবাইকে করে তুই তোকারি। কেমন যেন অভব্য রুক্ষ বেয়াড়া মনে হয় সবাইকে। তবু কি মনে হল, সুমিতা আজ হঠাৎ ওর জ্যাঠাইমাকে একটি প্রণাম করে বসল।

জ্যাঠাইমা একটু চমকে উঠে পরমুহূর্তেই বলে উঠলেন, আহা, মা আমার সোনা মানিক! এস মা, এস।

মহীতোষও একমুহূর্তের জন্যে কেমন বিমূঢ় হয়ে গেলেন। ভাবতেই পারেননি, রুমনি এমন একটি কীর্তি করে বসবে। সেই লজ্জাতেই সুমিতা বাবার দিকে আর তাকাতেই পারলে না। কিন্তু জ্যাঠাইমার 'আহা, সোনা-মানিক' শুনে হঠাৎ যেন জল এসে পড়ল ওর চোখ ফেটে। বুকের মধ্যে উঠল টনটনিয়ে। জ্যাঠাইমার এই সুরের মধ্যে কী যেন আছে, যা এ বাড়ির এই পরিবেশ ও জীবনধারণের উর্ধ্বে একটি মায়ার সঞ্চার করে রেখেছে। অন্যদিন হলে একথা শুনে হয় তো হেসেই ফেলত সুমিতা। বড়দি মেজদিরও হাসি পেয়েছিল একদিন। কিন্তু আজ ওর নিজের ঘরের অন্ধকার থেকে এসে, এই স্নেহ আপ্যায়নের জন্য লালায়িত হয়ে উঠেছিল যেন। কতকাল ধরে যেন এই অপরিচিত আদরের তৃষ্ণা ছিল বুকে।

অথচ এ ব্যাপারের জন্যে একটুও তৈরী হয়ে আসেনি। হঠাৎ ওর ছ' বছরের একটি নিরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষার শোধ নিয়ে নিল এমনি করে। শুধু এইটুকু বুঝল না, ওকে এমনি করে প্রণাম করতে দেখে, অনেক বেদনার মধ্যেও বাবা কতখানি বিচলিত হয়ে উঠলেন। সেটুকু বিরক্ত নয়, রাগও নয়, ছোট মেয়েটির জন্যে হঠাৎ বাবার মন চিন্তা-ব্যাকুল হয়ে উঠল। কী হয়েছে রুমনিটার।

তারপর ঘরের মধ্যে। কী ঘর! তেতলার ঘর, তবু যেন অন্ধপুরী। তিনটি এমনি ছোট ছোট ঘর। ছোট বড় নিয়ে পনেরটি মানুষ থাকে। তেলচিটে তোশক গুটানো। ছেলেমেয়েগুলি খালি তক্তাপোশে মেঝেয় ছুটোছুটি গড়াগড়ি করে। বিছানামাদুরগুলি ময়লা শ্রীহীন। দু' তিনখানা চেয়ার ছড়ানো এদিকে ওদিকে। ছেলেপুলেরাই কখন টানাহেঁচড়া করে রেখে দিয়েছে। আয়না আছে, টেবিল আছে। সবকিছুই যেন কি রকম। এসব দেখে বাড়ির কর্তাব্যক্তিরা যখন বিরক্ত হয়, মেয়েরা বলে, তা কী করা যাবে। ছেলে-মেয়ের ঘর কত সাজিয়ে রাখা যায়।

মহীতোষ এখানে এসে অবশ্য সঙ্কোচ না করারই চেষ্টা করেন। চেষ্টা করেন, যেখানে হোক এক জায়গায় বসে সুখদার সঙ্গে দু'চারটি কথা বলতে।

সুখদা বললেন তেমনি একটু চাপা গলায়, বসো ভাই ঠাকুরপো, একটু পা ছড়িয়ে তক্তাপোশে বসো।

সুমিতাকে বললেন, তুই একটা চেয়ার টেয়ার টেনে বোস্ মা।

এ ঘরের থেকে পাশের ঘরে যাওয়ার দরজায় এক রাশ ছেলে-মেয়ে রয়েছে ভিড় করে। সঙ্গে নবগোপালের স্থূলাঙ্গী স্ত্রীও রয়েছেন। অর্থাৎ সুমিতার বউদি। মহীতোষকে দেখেই, একটু ঘোমটা টেনে এসে প্রণাম করল। মহীতোষ এখন এসব বিষয়ে একটু বিব্রতই বোধ করেন। তাড়াতাড়ি নিজেও কপালে হাতটি ঠেকিয়ে বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা—

এ বেলা আর সুমিতার খেয়াল নেই যে, প্রণাম করলে, গুরুজন সবাইকেই প্রণাম করতে হয়। সেটাই রীতি।

পাশের ঘরে পুরুষের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। বড় ছেলে নবগোপালের কণ্ঠই বিশেষ করে। সেদিকে কয়েক মুহূর্ত উৎকর্ণ থেকে সুখদা ওঁর লোলচর্ম গালে একটি অপূর্ব হাসি ফুটিয়ে মহীতোষের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, আজ আমাদের শিবানীকে দেখতে এসেছে।

দেখতে এসেছে! কথাটির সঙ্গে একটি অস্পষ্ট পরিচয় আছে স্থমিতার। কোনদিন চাক্ষুষ দেখেনি। শিবানীকে কে দেখতে এসেছে! নবগোপালদাদার বড় মেয়ে শিবানী। বাবার নাতনী, আর স্থমিতাকে ডাকে ছোট পিসি বলে। স্থমিতারই সমবয়সী হবে। ক্লাস নাইন্ অবধি পড়েছিল স্কুলে। ওকে দেখতে এসেছে।

ভাবতেই বুকের মধ্যে ছটফট করে উঠল স্থমিতার, পাশের ঘরে যাবার জন্যে। সে যেন কোন এক নতুন জীবনের রঙমহাল। কী এক বিচিত্র ঘটনা-ই না জানি ঘটছে ওখানে।

কিন্তু কিছু না বলে কয়ে হঠাৎ ও ঘরে যাওয়াটাই বা কেমন দেখায়। কেউ না বললে যায় কেমন করে। হয়তো যাওয়াই রীতিবিরুদ্ধ।

ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলি পড়েছে মহাফাঁপরে। ওদের মনের যত টান পাশের ঘরে, তত টান এ ঘরের বালীগঞ্জের দাতু আর ছোট পিসির দিকে। ওদের কাছে এ দু' তরফের প্রতিই এক অনাস্বাদিতলোকের আকর্ষণ আছে।

এমন সময় কী করে নবগোপাল খবর পেল মহীতোষের আসার কথা। অমনি ভারি আপ্যায়িত হয়ে, প্রায় চীৎকার করতে করতে ছুটে এল এ ঘরে। যেন মহীতোষের পায়ে কিছু ছিল, এমনি করে চোখের পলকে হাত দিয়ে পা ছুঁয়ে বলল, কখন এলেন কাকাবাবু।

বোঝা যাচ্ছে, এসময়ে এসে পড়ে মহীতোষও অস্বস্তি বোধ করছেন। বললেন, এই তো আসছি।

স্থমিতার মনে হল, নবগোপালদাদা যেন প্রায় বাবার বয়সী। জার্ডিন কোম্পানীতে ক্লার্কের চাকরি করে। এর মধ্যেই মাথার চুলে ধরেছে পাক। পান খেয়ে খেয়ে দাঁতগুলি দেখাচ্ছে ক্ষয়াটে লাল। গায়ে একটা গেঞ্জি, পরনে ধুতি, কিন্তু একটি আণ্ডারওয়্যারও পরেনি। বাবার সঙ্গে কথার এক ফাঁকেই স্থখদাকে কানে কানে বলল, বোধ হয় পছন্দ হয়েছে, জানলে?

স্থখদা বললেন, ভগবান যদি মুখ তুলে চান।

স্থমিতা যতই দেখে, ততই দুর্বোধ্য বিস্ময়ে অবাক হয়ে দেখে সব। আর আড়ষ্ট হয়ে থাকে শরীর ও মনের মধ্যে। এরা কী কথা বলছে, কখন কেন যে হাসছে, সহসা সব ধরে উঠতে পারে না।

নবগোপাল বলল, চলুন কাকাবাবু, আপনি একটু ও-ঘরে চলুন।

সুমিতা দেখলে, বাবা একেবারে লাল হয়ে উঠেছেন। বললেন, আর থাক্ না নবগোপাল। এমনি হঠাৎ এসে পড়েছিলুম, বোঠানের সঙ্গে একটু দেখা করে যাব বলে। আমি আর ওখানে গিয়ে কী করব।

নবগোপাল পানখাওয়া দাঁতে, একটি বিচিত্র ধরনের আব্দারের হাসি হেসে বলল, তা' বললে হবে না কাকাবাবু। আজ আমার কী ভাগ্য, আপনি এসে পড়েছেন। আপনি থাকতে শিবানীকে আমি একলা বসে দেখাব, এটা হয় না। বাবা থাকলে আজ নাতনীকে বসে দেখাতেন। বাবার হয়ে আজ আপনি রয়েছেন।

সুখদা বলছেন, হ্যাঁ, তুমি যাও ভাই একবার ঠাকুরপো, মনে মনে নাতনীটাকে একটু আশীর্বাদ কর, যেন মেয়েটার একটা গতি হয়ে যায়।

মহীতোষ চকিতে একবার সুমিতার দিকে তাকালেন। সুমিতাও তাকিয়েছিল। মেয়েটার গতি আবার কী! ওর মনে হচ্ছিল, বাবা নিশ্চয়ই একবার এদিকে তাকাবেন। আর কার দিকে এখন তাকাবেন। বড়দি মেজদি তো কাছে নেই, যাদের দিকে তাকান অসহায় হয়ে। বাবার অস্বস্তি দেখে, সুমিতাও বিব্রত বোধ করল। কিন্তু এখানে তো ওর বলার নেই কিছু।

মহীতোষকে যেতে হল। সুখদা যেটুকু ভাবেননি হয়তো, সুমিতাও ভাবেনি, হয়তো মহীতোষও সম্যক ধারণা করতে পারেননি, সেটুকু হল নবগোপালের এক নিগূঢ় সম্মানবোধে। আজকে নিজের বাবা নেই বলেও যেমন সে মহীতোষকে পেয়ে খুশি হয়েছে, তেমনি এতবড় একজন অবসরপ্রাপ্ত চাকুরে আত্মীয়কে পেয়েও বুক ফুলে উঠেছে তার। যেন তার মেয়েকে পছন্দ করার ব্যাপারে ছেলেপক্ষ একটি নতুন আলো পাবে।

সুমিতা বেচারীর কী দুর্দশা! ওকে তো কেউ যেতে বলছে না। একটি আলগা চেয়ারে প্রায় আলগা হয়ে বসে ও ধৈর্যের বাঁধটাকে ঠেকিয়ে রেখেছে। দেখছে, জ্যাঠাইমা কেমন এক স্বপ্নঘোরে কান পেতে আছেন পাশের ঘরে। তারপরে হঠাৎ নজরে পড়ল সুমিতাকে। বললেন, যাবি ও-ঘরে?

অমনি টুক্ করে ঘাড় নেড়ে দিল সুমিতা, হ্যাঁ যাবে।

বলেই কিন্তু জ্যাঠাইমাকে নিমেষের জন্যে চিন্তিত দেখাল। বুঝল না, জ্যাঠাইমা ওর দিকে চেয়ে ভেবে নিচ্ছেন, ছেলে-পক্ষ ওকে দেখে না আবার শিবানীকেই নাকচ করে দেয়। বোধ হয় পরমুহূর্তেই মহীতোষের মেয়ে ভেবে

লজ্জায় মরে গেলেন অন্তরে অন্তরে। ও যে সাহেবের ছোট্ট মেয়ে! বললেন, যা না, যা। বড় বউমা, ওকে একটু যেতে দাও তো ও-ঘরে।

চারজন ভদ্রলোকের সামনে সেজেগুজে জড়োসড়ো হয়ে বসেছে শিবানী। সুমিতাকে দেখেই বেচারীর লজ্জারুণ মুখখানি আর এক দফা লাল হয়ে উঠল। মেয়ে দর্শকেরাও সকলে একযোগে একবার তাকিয়ে দেখল সুমিতাকে। বোধ হয় একটু অবাক হয়েই দেখল। এ বাড়িতে এ মেয়েকে বড় বেমানান লেগেছে। এ আসরে সব চেয়ে বেমানান লাগছে মহীতোষকে। এসব যেন ওঁর গত জন্মের ব্যাপার।

সুমিতা দেখছে আর শুনছে। নাম কি মা? কদ্দুর পড়েছ? কী রান্না জান? গান গাইতে পার? নামটি নিজের হাতে লিখে দাও তো। লজ্জাভরা গলায় সবই জবাব দিচ্ছে শিবানী। যা বলছে, তাই করছে।

হঠাৎ কেমন যেন বড় রাগ হতে লাগল সুমিতার, লোকগুলির ওপর। কী বিশ্রী! ওর কোন আদর্শ নেই, নীতিও নেই, ঐ বিষয়ে কোন শিক্ষাও নেয়নি নিজেদের সমাজের কাছ থেকে। সমস্ত ঘটনাটির মধ্যে ওর বিরক্তি ও বিস্ময় বাড়ল। আর বড় দুঃখ হতে লাগল শিবানীর জন্য। নিজের অবচেতন মনে যেমন বড়দির সচেতন দীপ্ত-বহ্নি ওকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে, এখানে শিবানীর এই দীপ্তিহীন নিস্তেজ বাধ্যতা ততখানি রুষ্ট করে তুলেছে।

লোকগুলি মহীতোষকে হঠাৎ বড় খাতির করতে আরম্ভ করেছে। মহীতোষও যেন সে বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছেন।

কিছুক্ষণ পর মেয়ে দেখার পালা চুকল। মিষ্টিমুখ করে বিদায় হল বাইরের লোকেরা। মহীতোষ বললেন সুখদাকে, এবার চলি বৌঠান।

সুখদা বললেন, এখুনি কি? যেয়ো, বসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে। বলেই প্রায় চিল-গলায় হাঁকার দিলেন, এই দস্যিগুলো, গেলি এ ঘর থেকে? সঙ্গে সঙ্গে নবগোপাল চেঁচিয়ে উঠল।

বেচারীরা বালীগঞ্জের দাদুকে দেখার লোভ সম্বরণ করে পালাল। গিয়ে জুটল পাশের ঘরে। সেখানে রয়েছে শিবানী আর সুমিতা।

দু'জনের কেউ-ই তখনো কোন কথা বলেনি। ভিড় দেখে শিবানী বলল সলজ্জ গলায়, চল ছাদে যাই।

দু'জনে সিঁড়ির দিকে যেতেই, ছোটরা পিছন নিল। ধমকে উঠল শিবানী, দেখবি, ডাকবো বাবাকে? যা বলছি।

আজকে দিদির হুকুম মানতে হবে, এটাই ছিল ওদের বিশ্বাস। অগত্যা থামতে হল। দু'জনে ওরা উঠে এল ছাদে। কিছুক্ষণ সময়ের জন্যে, সুমিতার আজকের ভয় বেদনা আড়াল হয়ে রইল। মাঘের ঢলে পড়া সূর্যের চিকন রোদে ভরা ছাদে এসে দাঁড়াল দু'জনে। শিবানীর চোখে মুখে, সাজা-গোজা, সব কিছুতেই একটি বিচিত্র লজ্জা যেন রোদের মতই ঝিকমিক করছে। আলাপ আছে দু'জনেরই কিন্তু কেউ-ই কথা বলতে পারছে না। সুমিতার খোলা চুলে পড়েছে রোদ। বড় বড় চোখে অবাক বিস্ময়ে দেখছে শিবানীকে। এ যেন সেই আগের শিবানী নয়। যে শিবানী ওকে সভয়ে সসঙ্কোচে জিজ্ঞেস করে পড়ার কথা, কলেজের কথা, দাদু অর্থাৎ মহীতোষের কথা, সুজাতা আর সুগতা, বড় আর মেজ পিসির কথা। এমনি জিজ্ঞেস করে, আর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে সুমিতাকে। যেন ওর এই সচকিত কিশোরী প্রাণের কোথায় একটি দীর্ঘশ্বাস জমা হয়ে ওঠে ছোট পিসিকে দেখে। এই দেখার মধ্যে, শিবানীর প্রতি কেমন একটু মমত্ব বোধ এসে পড়ে সুমিতার। এ সংসারে, ওর নতুন কথা শোনাবার পাত্রী শিবানী। ছোট পিসি ডাকের মধ্যে যেমন একটু অস্বস্তি মেশানো খুশি অনুভব করে, তেমনি নিজেকে শিবানীর সামনে একটু বড় বড় লাগে। অথচ বয়সে ওরা সমান।

কিন্তু আজ শিবানীকে ঠিক চিনে উঠতে পারছে না। ওর জন্যে যে সুমিতা এত দুঃখ পাচ্ছিল খানিকক্ষণ আগে, তার কোন চিহ্ন তো এ মুখে নেই। এ তো আলাদা শিবানী। ওর ঠোঁটের এই হাসি, নত চোখের ওই চাউনি, অন্য বেশে, অন্য কোথায় দেখেছে সুমিতা। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সেই প্রথম গিরীনদার আবির্ভাবে বড়দি হেসেছিল এমনি করে। মৃণালের সামনে দু' একবার এরকমভাবে হাসতে দেখেছে মেজদিকে। আজ সমবয়সী শিবানীও হাসছে এমনি করে। একে তো এই আধা-চেনা পরিবেশ, তার ওপরে এ ব্যাপার দেখে একেবারে নির্বাক হয়ে রইল। নিজের মুখ নিজে দেখতে পায় না সুমিতা। জানে না, এমন হাসি কোনদিন ফুটেছিল কিনা ওর মুখে।

শিবানী বলল অস্ফুট লজ্জায়, এই ছোট পিসি, কিছু বলছ না যে?

নিজেকে কি রকম অসহায় মনে হল সুমিতার। বলল, কী বলব?

শিবানী বলল হাসির নিক্কণে, কী আবার। এই……মানে……ওই সব।

ওই সব? একবার মনে হল স্নমিতার, বুঝি বড়দির কথা বলতে বলছে শিবানী। কিন্তু তারপরেই মনে হল, না, তেমন কোন দুশ্চিন্তার ছাপ তো নেই মুখে। এতদিন স্নমিতা এসেছে অন্য রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে। শিবানী দেখেছে এবং শুনেছে। আজ শিবানীর মধ্যে আর এক রাজ্যের বিপুল বিস্ময়, সেখানে থৈ পাচ্ছে না স্নমিতা। বলল, কোন্ সব বল তো?

শিবানী হেসে উঠে তাকাল স্নমিতার মুখের দিকে। কী এক বিচিত্র ছটায় চকমক করছে ওর চোখ দু'টি। বলল, কেন, এই যে দেখলে এতক্ষণ, এই সব দেখা ট্যাকা, সেকথা।

সহসা যেন সম্বিৎ ফিরে পেল স্নমিতা। সত্যি, কিন্তু কী বলবে? চকিত মুহূর্তে একবার ওর সেই অদৃশ্য লতার অনধিকারের ভয় হল।

তারপর বলল, এবার তোমার বিয়ে হয়ে যাবে তো?

শিবানীকে লাল দেখাচ্ছে রোদে। বলল, যদি পছন্দ হয়।

স্নমিতা: কাদের পছন্দ। ওই লোকগুলোর?

বুঝল না, ওর গলার সামান্য অশ্রদ্ধার স্বরটুকুও ব্যথা দিচ্ছে শিবানীকে। বলল, হ্যাঁ।

স্নমিতা: তারপর?

শিবানী: তারপর? তারপর ওই যা বললে, তা-ই হয়ে যাবে।

স্নমিতা বলল, বিয়ে হয়ে যাবে? তোমার যদি সেই লোকটিকে ভাল না লাগে?

সেই লোক, অর্থাৎ বর। শিবানী অবাক লজ্জায় বলল, যাঃ!

শিবানীর এ বিচিত্র অভিব্যক্তিতে আরো বেশী অবাক হল স্নমিতা। বলল, ভাল লাগবেই?

শিবানীর লজ্জার চেয়ে এখন যুক্তিটাই বড় হয়ে উঠল। বলল, নয় কেন?

আশ্চর্য! একটি লোককে ভাল না লাগার কত কারণ থাকতে পারে। এর মধ্যে আবার কেন কিসের? তারপর কী যে হল স্নমিতার, হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল, ধরো, তার যদি আর কেউ থাকে?

শিবানী অবাক হয়ে বলল, আর কেউ? মানে,—

বেচারী ঢোঁক গিলছে। বুঝতে পেরেছে, ছোট পিসি 'আর কেউ' বলতে কি বোঝাতে চাইছে। স্নমিতা বুঝল না, কী তীব্র ব্যথার কষাঘাত করছে শিবানীর নতুন দেখা স্বপ্নে। অভিমানের সুরে বলল, ইস্!

কিন্তু সুমিতা বেচারীরও বুকখানি ফুলে ফুলে উঠছে কান্নায়, কৌতূহলে। ওই কথাটি জানতে চায় ও এখন। বলল, তখন তুমি কী করবে?

শিবানীর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এল। বলল, কী আবার? তা হবে কেন? তা হবে না।

শিবানীর দৃঢ়স্বর শুনে একটু থতিয়ে গেল সুমিতা। বলল, কেন?

শিবানী আবার লজ্জিত হয়ে উঠল। অনেক কষ্টে বলল, আমাকে তো সে ভালবাসবে।

কথাটি বলে এবং শুনে দু'জনেই একেবারে চুপ হয়ে গেল। সুমিতার অন্তর্স্রোতের একমুখো গতিটিকে হঠাৎ আর এক পথে ভাসিয়ে দিলে শিবানী। যেন ওর বরের ভালোবাসার কাছে আর কিছু থাকা না থাকা সব তুচ্ছ হয়ে গেল। বড়দি গিরীনদা, কাউকেই স্পষ্ট খুঁজে পেল না এখানে।

সোনা-চিকন রোদ রক্তিম হয়ে উঠেছে। ছাদের পরে ছাদ, উঁচুনীচু বন্ধুরতার মধ্যেও কোথায় একটি কংক্রীট ইঁট কাঠের সামঞ্জস্য রয়েছে। কোথাও জলের ট্যাঙ্ক, রেডিও এরিয়ালের আকাশ খোঁচানো সরু বাঁশ। নীচে ও দূরে কোলাহল শহরের।

আর এখানে, দুই ভিন্ন মনের দুই কিশোরী দু'টি ঝুঁটি পায়রার মত দাঁড়িয়ে রইল মুখোমুখি। এই বিস্ময়কর রক্তিমাভাব মধ্যে ওদের দু'জনেরই মন কোন্ সুদূরে, কোন্ অতলে, কোন্ আলোতে, কোন্ অন্ধকারে, কোন্ আনন্দে ও বেদনায় গেল হারিয়ে। সুমিতার অদৃশ্য লতায় কোথায় আজ একটি নতুন কুঁড়ির সন্ধান পেল ও নিজে।

নীচের ঘরে সুখদা আর মহীতোষ তখন বসে আছেন গম্ভীর মুখে। নবগোপালের সময় নেই, সে গেছে বাজারে। রামগোপাল তো অফিস থেকেই আসেনি। নীচের থেকে ধোঁয়া উঠতে আরম্ভ করেছে ওপরে।

সুখদা তখন বলছেন, ঠাকুরপো, তোমার মেয়েকে তুমি মানুষ করেছ। তুমিই তাকে চেন ভাল। কিসে তোমাদের ভাল, কিসে মন্দ, তাও ছাই বুঝিনে আমি। চিরকাল জানি, তুমি সাহেবসুবো মানুষ। তোমাদের দেখে ভেবেছি, আমরা তোমার কাছে কিছু নই। লোকের কাছে বলেছি, আমার দেওর এতবড়।

মহীতোষ বেদনার মধ্যেও বিব্রত হয়ে বললেন, কী যে বল বৌঠান।

না ভাই, সত্যি বলছি। তা সে যাক। সে এক কথা, কিন্তু আমার এই

সংসার দেখছ তো? তোমাদের সঙ্গে কোন মিল নেই, বুঝিওনে। কিন্তু মেয়েটার কথা ভেবে যে বড় অশান্তি হচ্ছে।

মেয়েটা অর্থাৎ সুজাতা। মহীতোষ বললেন, কিন্তু এছাড়া আর কী করার ছিল বৌঠান?

সুখদা—তা-ই কি ছাই জানি। তবে তোমার জামাই ছিল মস্ত বড় লোক। টাকা পয়সা ঘর বাড়ি, অটুট লক্ষ্মী ঘরে। মিটমাট করে ফেলতে পারলেই ভাল হত।

মহীতোষ—তা'তো হল না বৌঠান। উমনোকে তো তুমি চেন। ওরা লেখাপড়া শিখেছে, বড় হয়েছে, তার ওপরে বড় জেদী মেয়ে। গিরীন হার মানলে না তো, উমনোও মানলে না।

সুখদার মুখের আঁকাবাঁকা রেখাগুলি যেন জায়গা বদল করে বসল। বলল, না ঠাকুরপো, তোমার মেয়েকে আমি চিনি, তা ঠিক নয়। যতদূর শুনেছি, উমনোকে বিয়ে করার আগে স্বভাব চরিত্র ভাল ছিলনা জামায়ের। বিয়ের পরে কেমন ছিল তা' জানিনে। জানিনে, কত অপমান উমনো সয়েছে। অপমান আমরা তার চেয়ে ঢের সয়েছি।

মহীতোষ বললেন, বিয়ের পরেও গিরীনের চরিত্র কেমন ছিল সেটাই তো পরিষ্কার হল না। সেটাই তো সংশয় থেকে গেল। তবে উমনো তার সঙ্গে ঘর করেছে, সে-ই বুঝেছে সবচেয়ে ভাল। পুরুষ যদি অন্যায় করে, তাকেও হার মানতে হয় বৌঠান।

সুখদা—হার মানে বৈকি! তার একটা সময় আছে ঠাকুরপো। সেই জন্যেই তো বলছি, তোমাদের সমাজের কথা আমি বুঝিনে, কিছু বলতেও পারিনে। কিন্তু একটি কথা বলে যাও ঠাকুরপো, তোমার মেয়ে এখন কী করবে?

মহীতোষ সহসা চমকে উঠলেন। বললেন, কেন, আমি তো মরিনি এখনো। তাছাড়া মেয়েদের তো আমি কারুর গলগ্রহ করে তৈরি করিনি বৌঠান যে, তাকে বাপের হাতে, স্বামীর হাতে, তারপর ছেলের হাতে ফিরে বেড়াতে হবে।

সুখদা ওঁর ঘোলাটে চোখে সুদূরে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। কে জানে, মহীতোষের কথার অন্তর্নিহিত খোঁচাটুকু ওঁর নিজেরই লেগেছে কিনা।

বললেন, তা ঠিক ঠাকুরপো। তবে, তুমি মরোনি, মরবে তো বটেই। তোমার মেয়েও হয়তো চাকরি করে খাবে, লাখ টাকা তো তুমি রেখে যাবে না। তারপর?

তারপর কী বৌঠান?

ঠাকুরপো, উমনো তোমার সন্তান, তার ওপরে মেয়ে মানুষ। সে কী নিয়ে থাকবে? তার কি শরীর নেই, মন নেই, তার কি সাধ নেই, আহ্লাদ নেই।

আচমকা বৃশ্চিক দংশনে পাংশু হয়ে উঠলেন মহীতোষ। সন্তান, সন্তান। ঠিক ঠিক, বড় ঠিক কথা বলেছেন বৌঠান। আজ যদি সুজাতার হিন্দু বিয়ে না হয়ে রেজিস্ট্রি বিয়েও হত, মেয়ের জন্যে একথা তো না ভেবে পারতেন না। সুজাতা যদি আর একটি বিয়েও করবার আইনত অধিকার পেত, তবু মহীতোষের পিতৃমনের উৎকণ্ঠা বেদনা তো দূর হত না। সে যে ওঁর সন্তান, মেয়ে। তাকে তো উনি কোন অনাচারের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিতে পারেন না।

যে কথা ছিল মনের অন্ধকারে, তাকেই সুখদা সামনে টেনে দিলেন প্রকাশ্যে। সবই হবে, কিন্তু সাধ আহ্লাদ, জীবনে সুষ্ঠু সুশৃঙ্খলভাবে বেঁচে থাকা! সব পিতৃমনই চায় তার সন্তানকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে। সেইটিই যে আসল বেদনা ও ভয় মহীতোষের।

বিদায় নিলেন উনি। যাবার সময় সুখদা বললেন, যদি পার তো একদিন বড় মেয়েকে নিয়ে এসো ঠাকুরপো।

সুমিতা শিবানীর কাছে বিদায় নেওয়ার সময় কোন কথা বলতে পারলে না। ওরা শুধু পরস্পরের হাতে হাত দিয়ে বিদায় নিল। প্রায় সন্ধ্যার মুহূর্তে বাপ-মেয়ে হেঁটে চলল ট্রাম স্টপেজের দিকে।

(৬)

একটি কথা, এক অভূতপূর্ব নতুন সমস্যা নিয়ে এল সুমিতার জীবনে। সে কথাটি, ভালবাসা! ভালবাসা! ভালবাসা!

অবশ্য বাইরে থেকে মনে হচ্ছে কিছুদিনের জন্যে সুমিতা কোনদিকে চেয়ে দেখবার অবসর পাচ্ছে না। হঠাৎ একযোগে সকলেরই মনে পড়ে গেল,

রাত পোহালেই রুমনির ইণ্টারমিডিয়েট ফাইনাল পরীক্ষা। যদিও রাত পোহালেই নয়। তখনো দেরি ছিল প্রায় দিন আঠারো। কিন্তু আঠারো দিন কাটল দেখতে দেখতে। এক মুহূর্ত এদিক ওদিক করবার সময় পায়নি। পরীক্ষার হলের মধ্যে এসে ওর বুকের ভিতর দুরু দুরু করে উঠল। কোনদিন এরকম হয়নি। জীবনে এই একটি জায়গাতে ও চিরকাল নির্ভয় ও চিন্তাহীন ছিল। এখানে সবকিছুই সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো ছিল পরের পর।

এখন দেখল, সবকিছুই কখন লণ্ডভণ্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। যেটাকে শুধু ভয় ও কান্না বলে মনে হয়েছিল, সেটা আসলে ঝড়। সেই ঝড়ে কিছু খোয়া গেছে কিনা টের পাওয়া যায়নি, কিন্তু চোখের ও হাতের সামনে চেনা জিনিসগুলি একটিও পেল না খুঁজে। সবই ইতস্তত, বিক্ষিপ্ত ছড়ানো।

চেনা জিনিসগুলি তো পরীক্ষার তালিকার বিষয়বস্তু শুধু নয়। সেগুলি প্রত্যহের জীবনধারণের ওর নিত্যধন, নিত্যজন, নিত্যকাজ। আঠারো দিন ধরে যতই সেগুলি কুড়িয়ে নিতে গেল পড়ার ফাঁকে, ততই ফাঁকি গেল পড়া। অঙ্ক, সাহিত্যের ফাঁকে ফাঁকে দেখল, এবাড়ির সবকিছুতেই কোথায় একটি ভাঙ্গন ধরে গেছে। ওপর থেকে বোঝা যাচ্ছে না তাকে, ভিতরের স্বরূপটিও ধরা পড়ছে না ঠিক।

বাবা ঠিক তেমনি ভোরবেলা বাগানে ঢোকেন, ডাকেন বড়দি মেজদিকে। নানান কথা হয়। তবু আগের মত যে আর এই তিনজনের জমে না, সেটুকু ধরা পড়েছে সুমিতার চোখে।

একদিন ওদের তিনজনের মিলিত গলার হাসিতে হঠাৎ চমকে উঠল সুমিতা পড়ার ঘরে। উঁকি দিয়ে দেখল, বিলাসটা দাঁড়িয়ে আছে বোকা-হাসি মুখে। আর বলছে, আঁজ্ঞে হ্যাঁ, ওগুলোকে তো মেড়ো পোকাই বলে।

আবার হেসে উঠল তিনজনেই। বাবা বললেন, মেড়ো পোকা কিরে? এক তো মেড়ো কথাটা-ই পশ্চিমের লোকের পক্ষে অপমানকর। তার ওপরে এই পোকাগুলোর নামও তোরা ওই বলবি?

মুখ দেখে মনে হল, বিলাস বেচারীও কেমন যেন নিজেকে অপরাধী বোধ করছে। সত্যি, কপির পাতায় বিন্দু বিন্দু কালো পোকাগুলিকে কেন যে ওই নামে ডাকা হয়, তা'তো সে জানে না।

হঠাৎ হাসির একটি কারণ খুঁজে পেয়ে তিনজনেই হাসিটা আর সহজে

ছাড়তে চাইলে না। ডাকা হল ঝি অচলাকে। অচলা বলল, হ্যাঁ, একে মেড়ো পোকা-ই বলে।

কেন?

তা কী জানি!

আবার হাসি। এ হাসির জন্যে একসময়ে পাশের বাড়ির ডেপুটি গিন্নী ঠোঁট বাঁকিয়ে আড়ালে গালাগালি দিতেন। মেয়ে তাপসী অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখত। আর ওর এম-এ পাশ দাদা নবেন্দু ওর পেছনে, একটু আড়াল নিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে বলত, ননসেন্স। বলেও অবশ্য সুজাতা সুপ্তাকে দেখত তাকিয়ে তাকিয়ে। দেখতে যে খারাপ লাগত তা নয়। কিন্তু বড় অহঙ্কারী বলে মনে হত নবেন্দুর।

সেদিনের হাসি শুনে তাপসী পর্যন্ত উঁকি মেরে দেখল। নবেন্দুও। কিন্তু, সুমিতা স্পষ্ট দেখল, সবটাই মিথ্যে, একেবারে ফাঁকি। এত বড় ফাঁকি যে, চেঁচিয়ে কেঁদে উঠে বলতে ইচ্ছে করল, ফাঁকি, ফাঁকি, ফাঁকি দিচ্ছ তোমরা নিজেদের। তোমাদের হাসিকে তো আমি চিনি। কী নিষ্ঠুর হাসি তোমাদের, রুমনির কথা একটু মনেও থাকত না। তোমাদের ওই হাসি বাগান থেকে শুরু হয়ে হয়ে বাইরের ঘর, শোবার ঘর, খাবার টেবিল, বারে বারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে গিয়ে। কোন ছল খুঁজতে হত না। বিশ্বজোড়া হাসি তোমাদের ঠোঁটের কোণে এসে দাঁড়িয়ে থাকত দীনের মত। আর আজ বিষয় পাওয়া যায় না হাসির। ছল খুঁজতে হয়, জোর করে হাসতে হয়, টেনে রাখতে হয়। কী বিশ্রী আর খাপছাড়া।

কে যে কী ভাবছিল, সেটা সঠিক আন্দাজ করা সম্ভব ছিল না সুমিতার পক্ষে। কিন্তু ভাবান্তরটা পরিষ্কার। মেজদির বৈরাগ্যের মাঝে যে একটি নতুন রং-এর স্পষ্ট ছোঁয়াচ লেগেছে, সেটা মেজদি নিজেই বোধ হয় জানে না— যে রং ওর ভাব-গম্ভীর মুখে কখনো কখনো দেখেছে সুমিতা আড়ালে আবডালে। মনে হয়, সব সময়েই মেজদি মৃণালের কথা ভাবছে। কেন যে একথা সুমিতার মনে হচ্ছে, তার কোন যুক্তি নেই। অথচ মেজদির পাশে পাশে সবসময়েই সেই আজানুলম্বিত বাহু দীর্ঘ একহারা সুন্দর মৃণালের ছায়া দেখতে পাচ্ছে। এ ছায়া স্পষ্ট। আর একটু দূরে আর একটি অস্পষ্ট ছায়া রাজেনদার। মেজদিদের ছাত্র নেতা বলা যায় রাজেনদাকে। মৃণাল

সুন্দর। রাজেনদাও সুন্দর। কিন্তু কেমন একটি রূঢ় তীব্রতা রাজেনদার চোখেমুখে। মেজদির পাশে মৃণালের ছায়া দেখলেই রাজেনদার মুখটিও আপনিই ভেসে ওঠে সুমিতার চোখে।

আর এই দু'জনের মাঝখানে যখন মেজদিকে দেখতে পায়, তখন কেবলি মনে হয়, মেজদি যেন জোর করে ওর গাম্ভীর্যকে রেখেছে ধরে। তার পাতলা লাল ঠোঁট দু'টির কোণে হাসির আভাস দেখা যায় না বটে। সাজহীন বেশের মধ্যে একটি আত্মভোলা চিন্তাশীল মেয়ে যেন সব সময়েই গুরুতর কিছু ভাবছে। কিন্তু সুমিতার মনে হচ্ছে, ওই ভাবের তলে এক ফল্গুধারা উচ্ছ্বাসে উঠছে ছাপিয়ে। সেখানে তরতর গতি নির্ঝরিণী দুলে দুলে এঁকে-বেঁকে চলেছে খিলখিল করে হেসে। সেখানে কী এক বিচিত্র খেলা। যেন দু'টি আদিগন্ত মনের মাঝে মেজদি এক নির্ঝরিণী। কার তটে যে ঢেউ লেগেছে বেশী, সেটা সহসা বোঝা যায় না।

কিন্তু মেজদি, বড়দি নয়। একটু চাপা মেয়ে। সহসা কিছু বোঝা যায় না দেখে। মেজদি ওর ফল্গুধারার উচ্ছ্বসিত প্রাণ নিয়ে কেবলি বাইরে ছুটে যেতে চাইছে। বড়দি আর বাবার মাঝখানে যে এক ভুলের কাঁটাতার জুড়ে বসেছে, সেখানে সহজ হতে বাঁধছে মেজদির। তা-ই কেবলি পালাচ্ছে। যেন জোর করে ওকে ধরে রেখেছে কেউ এ বাড়িতে। এখানকার কোন কিছুতেই তেমন মনযোগ নেই। তাই মেজদির হাসি, কথা যে জমে না, তার কারণ জমাবার ইন্ধনটা রেখে এসেছে অন্যত্র।

জ্যাঠাইমার সঙ্গে কথা বলে আসার পর বাবার ভয় ও সংশয় বেড়েছে নিদারুণভাবে। খেয়ে পরে বেঁচে থাকাটাই বড় কথা নয়, তার বাইরেও জীবন অনেকখানি। সেই অনেকখানি জীবনটাকে নিয়ে সুজাতা কী করবে! অশৈশব যে মানুষ হল ওঁর নিজের হাতে, যার সঙ্গে ভাবের মধ্যে কোন ফাঁকি ছিল না বলে জানতেন, তাকেই আজ সবচেয়ে বেশী ঝাপসা মনে হচ্ছে। সুজাতাকে আর একটুও বুঝতে পারছেন না উনি। অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে মেয়েদের যে বলিষ্ঠ জীবনের কল্পনা করেছিলেন, সেখানে এমন ভয়াবহ অন্ধকার গর্তটি যে হা করে আছে, তাকে একবারও দেখতে পাননি।

ওঁর চোখে মুখে যত উৎকণ্ঠা ভয়, বড়দি ততই যেন গুটিয়ে শক্ত করে নিচ্ছে

নিজেকে। নিজকে অপমানিতা বোধ করে, নিয়ত ফিরছে ও একটি নিষ্ঠুর শ্লেষ নিয়ে। বাবার ব্যথাটা বুঝতে পারছে না বলেই লোকটিকে ভুল বুঝে অকারণ জ্বলে মরছে নিজে। ভাবছে, বাবার এত কিসের উৎকণ্ঠা, এত ব্যাকুলতা কিসের। কী দেখছেন আমার দিকে চেয়ে চেয়ে অমন ভীত সন্দিগ্ধ চোখে। যত ভাবছে, ততই ভিতরের জ্বালাটা একটি অদ্ভুত তীক্ষ্ণ ধারে ফুটে উঠছে তার চোখে, ঠোঁটে, চলায় ফেরায়।

কিন্তু বড়দি তো ঠিক এমনটি ছিল না। সেই যে কোর্ট থেকে বেরিয়ে এসেছিল এক তরল আগুনে ডুব দিয়ে, সেই গলিত আগুনের ঢেউ নিয়ে ফিরেছে ঘরে। আজো তা ধুয়ে শীতল হয়নি, বরং বেড়েছে। কোথায় যায়, কাউকেই কিছু বলে না। জিজ্ঞেস করলে, যা হোক একটা কিছু বলে দেয়। সুমিতা বোঝে, তার মধ্যে সত্য খুব কম আছে।

এ সব কথা ভাবতে ভাবতেই, শিবানীর সেই কথাটি মনে পড়ে সুমিতার। শিবানী আর ও, দু'জনে ওরা দু'টি নদী। ভিন্ন গতিতে চলেছে, ভিন্ন পথে। স্রোতে, বাঁকে, গভীরতায়, কোথাও মিল নেই দু'জনের। কিন্তু শিবানীর একটি কথা সুমিতার সবকিছুই একেবারে গণ্ডগোল করে দিয়েছে। শিবানী বলেছিল, "তা কেন হবে। সে তো আমাকে ভালবাসবে।" যেন ওই একটি কথা, সব কথা, সব সমস্যা, সমস্ত প্রশ্নকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে। এর ওপরে সুমিতার নিজেরও কোন যুক্তি নেই। যদি ভালবাসা থাকবে, তবে আর বাকী রইল কী। সে তো সবার ওপরে।

গিরীনদা আর বড়দির মাঝে এই ভালবাসা কি ছিল না তবে? ভেবে ও অবাক, কান্নার সীমা নেই ওর। এতদিনের এত হাসি, এত কথা, সে সব তবে কি।

সুমিতা জানে না, ওই কথাটিই আরেকরকমের জ্বালাধরা যন্ত্রণায় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে বড়দিকে। ঘরে বসে, বড়দির জন্যে যখন এত ভেবে ওরা আকুল হচ্ছে, তখন, সেই চৌরঙ্গীর দিনান্তের রূপোপজীবিনী-সাজ সন্ধ্যায় একটি দিশেহারা মেয়ের মত সুজাতা ঘুরে মরছে একাকিনী। বাবার উপরে রুষ্ট হয়েছে যতখানি, ঠিক ততখানি বিমুখ হয়েছে ওর মন রবির প্রতি। কেবলি মনে হচ্ছে, ওর এই দুর্দশায় খুশি হয়েছে রবি। খুশি হয়ে ভাবছে নিশ্চয়, এতদিনে বুকের কাঁটাটি খসে গেল সব বিষ নিয়ে। সুজাতাকে পাবে এবার আরো কাছাকাছি। এ ভাবার মধ্যে কোন যুক্তি নেই, কিন্তু মন

সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করেছে। রবির বিষণ্ণ চোখের চাউনির অর্থ তো অস্পষ্ট নয়। বাড়িতে যাওয়া আসার মধ্যে তার কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। আগেও যেমন এসেছে, এখনো আসে তেমনি। কিন্তু এখন যেন রবি আসে কোন বিশেষ আশা নিয়ে। না-ই বা সেটুকু দশজনের সামনে ধরা পড়ল—যত ছদ্মবেশ নিয়েই থাকুক রবি সুজাতার সামনে, নিজে কি কিছুই বুঝছে না। রবিকে ও মনে মনে ধুলোয় লুটিয়ে দিল। সারাগায়ে কাদা মাখিয়ে বিকৃত করে ফেলল একেবারে। তাতেও বিতৃষ্ণাটুকু পূর্ণ হয় না। রবির হীনতার কোন শেষ দেখতে পাচ্ছে না।

বিরক্তি ও বিদ্রূপে রবিকে আঘাতের পর আঘাত করছে আর ভাবছে, আমি আমার নিজের জন্যে যা করেছি, তা নিজেরই শান্তি ও সম্মানের জন্যে। যে মূর্খ এবং হীন এর মধ্যে নিজের ছায়া দেখতে পেয়েছে, সেখানে ঘৃণা ছাড়া আর কি থাকতে পারে।

কিন্তু এ সব ছাড়াও, জীবনের আর সবটাই কেমন অর্থহীন হয়ে গেছে। মন কী চায়, কী পেলে যে ঠিক সহজভাবে চলতে পারত, সে সবই এলোমেলো হয়ে গেছে মাথার মধ্যে। গিরীনকে ছেড়ে আসার মধ্যে যুক্তির কোন অভাব নেই। সেখানে সম্পূর্ণ অবিচল। যুদ্ধের সময়ে একটি মেয়ের উপকার করতে গিয়ে, তার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মত বাস করেছে গিরীন। সুজাতার কাছে, এটাই একটি মস্তবড় অপমান। বিয়ের আগে একটুও জানতে পারেনি। আরো জানতে পেরেছিল, চরিত্রের কোনো বালাই নেই তার। সহসা জানতে পেরে, নিদারুণ ধাক্কায় স্বপ্ন ভেঙ্গে গিয়েছিল। মানুষের এই মুহূর্তে বেদনাটা তো বড় হয়ে দেখা দেয় না। প্রথমে ছুঁড়ে দেয় ক্রোধের অগ্নিবাণ। গিরীনের অহমিকায় আবার লেগেছিল সেটা। কোণঠাসা হতে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়েছিল ক্ষেপে। সেই মুহূর্তেই মনে হয়েছিল, একেবারে ভুল করে ফেলেছে ও গিরীনকে বিয়ে করে। অর্থ ও প্রতিপত্তির দম্ভে গিরীন ওর কাছে ক্ষমা চাইতেও ভুলে গিয়েছিল। শেষ মুহূর্তে সন্ধির যে ক্ষীণ চেষ্টা করেছিল সে, সেটুকুও নিতান্ত পারিবারিক সম্মান রক্ষার্থে।

ভালবাসা! কী জানি! কিছুই আজ আর বুঝতে পারছে না সুজাতা। ও নিজে ভালবেসেছিল কি না, গিরীন ভালবেসেছিল কিনা, এ সবই ওর কাছে এক অস্পষ্ট ধোঁয়াটে রুদ্ধশ্বাস অথচ যন্ত্রণাদায়ক

প্রশ্ন। আগাগোড়া ভাববার ক্ষমতা নেই সুজাতার। শুধু এক রক্তক্ষয়ী বেদনা অভিমান ও অপমান ঘিরে আছে ওকে। এই যন্ত্রণাকে বাড়িয়েছে আরো অমলা।

অমলা অনেক দিনের বন্ধু। তাই কোর্ট থেকে সেদিন প্রথমে সে সত্যি ছুটে গিয়েছিল তার কাছে। মাঝে বহুদিন অমলার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না। সেদিন সুজাতার নিয়তি যেন টেনে নিয়েছিল সেখানে।

অমলার স্বামী একটি অর্ডন্যান্স ডিপোর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। বাড়ি গাড়ি, সবই আছে। কিন্তু জানত, অমলার স্বামী পুরোপুরি বিশ্বাসী ছিলেন না। দুঃখে ও অপমানে, অমলার জীবনে গৃহকোণটাই একমাত্র ঠাঁই হয়েছিল। কিন্তু সেদিন অন্য এক অমলাকে দেখতে পেল ও।

সেদিন সুজাতাকে দেখে অমলা ওর লিপ্‌স্টিক্ ঘষা ঠোঁট বিস্ফারিত করে বলে উঠল, এসেছিস? খালি মনে হত, তুই আমার কাছে আসবিই একদিন।

সুজাতা বিষণ্ণ হেসে বলল, কেন বল্‌তো?

অমলা কাজল টানা চোখে বিচিত্র কটাক্ষ হেনে বলল, তার আগে বল্, তোর স্বামীর সঙ্গে ব্যাপার কদ্দূর গড়াল।

সুজাতা: যতটা গড়াবার, ততটাই গড়িয়ে গেছে।

ভ্রু কুঁচকে বলল অমলা, মানে?

সুজাতা নরম স্বরেই বলল, মানে, আজই সব শেষ হয়ে গেল।

অমলা ডুকরে উঠল প্রায়, সেপারেশন? ফিনিশ?

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল দু'জনেই। অমলার বাইরে বেরুবার সাজ-সজ্জা রয়েছে বেশে। নিপুণভাবে রং মেখেছে ঠোঁটে, চোখে দিয়েছে কাজল। গলাবন্ধ ব্লাউজের বুকটা স্তনান্তরের কাছে খানিকটা কেটে দিয়ে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। যেন হঠাৎ একটি শ্যামচিকন বঙ্কিম-রেখা-আলোর জানালা দিয়েছে খুলে। চাঁদহার পরেছে গলায়। আলুলায়িত চুল শুধু ফিতে দিয়ে রেখেছে বেঁধে, স্কুলের মেয়েদের মত।

নীরবতা ভেঙ্গে বলল, এটা কিন্তু ছেলেমানুষি করে ফেলেছিস সুজাতা।

শুনে নিজেকে বড় দুর্বল মনে হল সুজাতার। বলল, ছেলেমানুষি?

নয়? তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বলল, কার জন্যে এ সব করতে গেলি, শুনি?

সুজাতা বিস্মিত হয়ে বলল, ছিঃ! কী যে বলিস্। কার জন্যে আবার! নিজের জন্যেই, এ ও আবার জিজ্ঞেস করতে হয়?

কিন্তু অমলার যেন সন্দেহ ঘুচল না। বলল, তোদের সেই রবির কোন উৎসাহ ছিল না?

অমলার কথার মধ্যে কী একটা বিশ্রী সুর ছিল। অস্বস্তিতে উঠে দাঁড়াতে হল ওকে। বিরক্ত হয়ে বলল, কী যা তা বলছিস্ অমলা।

অমলা জবাব দিতে গিয়ে থেমে গেল। নয়? তা হলে তো আরো ছেলেমানুষি বলতে হবে।

সুজাতা এবার সোজাসুজি তাকিয়ে বলল, কেন বল্ তো?

অমলা জবাব দিতে গিয়ে থেমে গেল। ঘরের দরজাটি বন্ধ করে দিয়ে যখন ফিরে দাঁড়াল, তখন ওর কাজলমাখা চোখ জলছে দপ্‌দপ্ করে। বলল, দ্যাখ্, সুজাতা, যে পুরুষ মেয়েদের ঘরে এনে পুরে বাইরের মেয়েদের কাছে ঘোরে, তাদের কাছে ঘরের আর স্ত্রীর কোন আদর্শের বালাই টালাই নেই। ওসব এককালে বিশ্বাস করা যেত, এখন আর যায় না। কিন্তু তুই যেরকম আদর্শবতীর মত জবাব দিয়ে এসেছিস্, সেটা আরো ভুল। তাতেও ওদের কিছু যায় আসে না। রাগের বশে শুধু শুধু যেটা করলি, সেটা সেই চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়ার মত। কী দরকার ছিল তার?

অমলার কথার অলিগলিগুলি এমন চোরাপথে চলেছে যে, কিছুই বুঝতে পারছিল না সুজাতা। বলল, তবে কি করব?

অমলার রাঙানো ঠোঁট বিদ্বেষ ও শ্লেষে যেন লক্‌লক্ করছে। বলল, জীবনে বেঁচে থাকার জন্যে গাড়ি বাড়ি টাকা সবই দরকার। কিন্তু কি করতে হয় জানিস্? ওদের মত করেই ওদের শোধ নিতে হয়।

আচমকা আঘাতে পাংশু হয়ে উঠল সুজাতার মুখ। শিউড়ে উঠে বলল, ওদের মত?

অমলা: হ্যাঁ, ওদের মত। ঠিক ওদের মত, ছদ্মবেশ, ছলনা, সবকিছু। পুরুষ পারে আর মেয়েরা পারে না? পারে আরো বেশী করে পারে।

সুজাতা রুদ্ধশ্বাস হয়ে বলল, একসঙ্গে থেকে?

সাপিনীর মত ফণা কাত করে বলল অমলা, হ্যাঁ, ঠিক ওদের মত। একসঙ্গে, এক ঘরে, এক বিছানায় থেকে ওরা যা করে, ঠিক তেমনি।

সুজাতা : তা' কী করে হয় ?

রক্তমাখা ছুরির মত ঝিলিক দিয়ে উঠল অমলার ঠোঁট। সুজাতার প্রশ্নের শাণিত সুস্পষ্ট জবাবের মত অমলা নিজেকে যেন দেখিয়ে দিল ওর হাসি দিয়ে, কোন ইঙ্গিত না করেও। আবার বলল, কী দরকার ছিল গিরীনকে ঘাঁটিয়ে। ওইটিই বেশী অপছন্দ করে ওরা। তুই অকারণে বিড়ম্বনা ডেকে আনলি। কী করবি তুই এখন। পায়ে ধরে ফিরে যাবি, নাকি আবার প্রেমে পড়বি, নাকি চাকরি করে বিবাগী হয়ে জীবন কাটাবি চিরকাল ?

অপমানে অস্বস্তিতে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল সুজাতার বুকের মধ্যে। এ কোথায় এসে পড়েছে ও। এর পরে আরো না জানি কী জিজ্ঞেস করবে অমলা। কিন্তু সমস্ত অনুভূতি মূর্ছিত হয়ে পড়ার পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট। কাঁপছে সুজাতার বুকের মধ্যে। ভয় করছে অমলাকে। সত্যি কী করবে এবার, কী করবে সুজাতা।

তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গে এসে পড়ল সুজাতা। বলল খানিকটা কপট ভীতস্বরে, তোর স্বামী আসবেন কখন ?

অমলা এবার সশব্দে হেসে উঠল। বলল, যখন তাঁর প্রাণ চাইবে। কিন্তু তুই খুব ভয় পেয়ে গেছিস্, না ?

ঢোঁক গিলে বলল সুজাতা, না, ভয় পাইনি। কিন্তু তুই কিরকম বদলে গেছিস্ একেবারে। তবু অমলার আর ওর স্বামীর কথা, সম্পর্কের কথা জিজ্ঞেস করতে সাহস করল না।

অমলা বলল, ভেবেছিলি, এসে দেখবি, যক্ষিণীর মত বসে আছি চোখে জল নিয়ে, না ? তাও তো ছিলুম অনেকদিন। বোধহয়, মরেই যেতুম অমনি করে। তারপরে, সবটাই কেমন যেন ন্যাকামো বলে মনে হতে লাগল নিজের কাছেই। দেখলুম, সংসারে আমারও অনেক বন্ধুবান্ধবী আছে।

কথার মধ্যেই ফিক্ করে হেসে উঠে বলল, আর তারা সকলেই সমব্যথী। কী দুঃখ আছে আমার। বেশ আছি, বেশ আছি।

বলে সারা ঘরে ওর লাল টকটকে শাড়ির রক্তাভা ছড়িয়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। কোন দুঃখ, বেদনার চিহ্ন নেই অমলার কোথাও। অনেক হাসি, অনেক আলো ওর চারপাশে আছে ঘিরে। যদিও তার মধ্যে রয়েছে

কেমন একটি রহস্যের আমেজ। সেইটিই যেন সুজাতার দিশেহারা অর্থহীন জীবনে একটি তীব্র আকর্ষণের মত বোধ হল।

দরজা খুলে দিয়ে অমলা বলল, হিন্দু বিয়েতে ডাইভোর্সও নেই।

সুজাতা বলল, সেসব কথা আমি ভাবছিনে।

তবে এখন কি করবি ?

আবার সেই এক সুর, এক কথা। বলল, এখনো স্থির করিনি কিছু।

সুজাতার চোখের দিকে তাকিয়ে, ঢুলু ঢুলু চোখে একটু হাসল অমলা।

সুজাতা বলল, কী হল ?

অমলা বলল, না, দেখছি তোকে। তুই হয়তো ভাবছিস, এ দুঃখের সময় এলুম, অমলাটা কোথায় একটু সান্ত্বনা-টান্ত্বনা দেবে—

না না, ওসব মোটেই ভাবিনি।

ভাবলেও অন্যায় হত না কিছু। কিন্তু আমি ভাই জীবনটাকে চিনে নিয়েছি অন্যভাবে। তোকে দেখে, নিজের কথাটাই ভেবে নিলুম আর একবার। আর দেখছি, সত্যি, রূপসী বটে তুই।

অমলার চাউনির মধ্যে কিসের একটি অদৃশ্য ইশারা দেখে লাল হয়ে উঠল সুজাতা। এই দু'জনের বন্ধুত্বের মধ্যে এক সময়ে অমলা সুজাতাকে খানিকটা শ্রদ্ধাও বোধ হয় করত। আজ সেসব কোথায়। কোথায় চলে গেছে অমলা, কোন্ এক বিচিত্রলোকে। বড় কৌতূহল হচ্ছে সুজাতার। অমলা যেন কত অভিজ্ঞ, তীক্ষ্ণ, তীব্র হয়ে উঠেছে।

তেমনি ঢুলু ঢুলু চোখেই, ভ্রু কাঁপিয়ে বলল অমলা, রবিটা কিন্তু বেশ। একটু বেশী সিরীয়স, এই যা।

রবির ওপর একটি অবুঝ তিক্ততা পেয়ে বসেছে সুজাতাকে। কঠিন গলায় বলল, বোধ হয় রবিও তাই ভাবছে।

বলে হাসতে গিয়েও রাগে ও বিরক্তিতে লাল হয়ে উঠল। তারপর আবার প্রসঙ্গ ফিরিয়ে বলল, কিন্তু তোর কথা তো কিছু বললিনে। স্বামীর সঙ্গে তোর যে—

সঙ্গে সঙ্গে অমলা বলে উঠল, কিছু না, কিছু না—বোঝাবুঝিতে একটু ভুল হয়েছিল। বুঝতে পারিনি, ওরা মানুষগুলি একদিকে বেশ উদার। কোন বাঁধাবাঁধি নেই। সুখ নিয়ে কথা। যে যেখানে সুখ পাও, টেনে নাও, ছিনিয়ে নাও, যেমন প্রাণ চায়। তবে তোর মত সব ভেঙেচুরে ফেললে হবে না।

বলছে অমলা, হাসছে, কিন্তু চোখ যেন জ্বলছে দপ্ দপ্ করে। মনে মনে পালাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল সুজাতা।

অমলাও বেরুল ওর সঙ্গে। সন্ধ্যার মুহূর্তে একটি রেস্তোরাঁর দরজায় সুজাতাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল অমলা।

আলো আর মেয়ে, পুরুষ আর গাড়ি, চৌরঙ্গীর সেই সবে ঘোমটা খোলা মুখের মাঝে দাঁড়িয়ে নিজেকে বড় একলা মনে হতে লাগল সুজাতার। ওর গলার কাছে একটি কথা এসেও আটকে ছিল। মাতালের গলায় যেমন মদ আটকে থাকে, বমি হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছিল অমলাকে ; তুই কি তোর স্বামীকে ভালবাসিস্‌নে ?

পারেনি জিজ্ঞেস করতে। প্রশ্নটা যদি পাল্টা আসত ! ভালবাসা !

ওর নিজের কি ভালবাসা ছিল গিরীনের প্রতি ? কই, কিছুই তো মনে হচ্ছে না। কাকে বলে ভালবাসা ? ভালবাসা ! ভালবাসা !

ওর রূপ, ওর শুভ্র-সজ্জা, মুক্ত বাহু, উন্মুক্ত কাঁধ আর পোশাকের অন্তরালে নিটোল শরীর, অজস্র চোখ নানান স্বাদে লেহন করে করে কুঁকড়ে তুলল আজ। দূরে মাঠের অন্ধকারে দিগন্ত উঠছে ভেসে। এই চোখ ধাঁধানো আলোর কাছ থেকে মাঠের গাছগুলিকে দেখাচ্ছে অন্ধকারের আততায়ীর মত। আরো দূরে ফোর্ট উইলিয়মের আভাস। সুজাতার চোখ দু'টি জ্বালা করে উঠছে। তখনো ওই কথাই ভাবছে। কিন্তু, ভালবাসাটা অর্থহীন শব্দের মত ভাসছে ওর কানের পর্দায়। আর কত কথাই যে মনে পড়ছে এই সঙ্গে, আর কত মুখ পড়ছে মনে। আর একটি মুখ বারে বারে উঁকি দিচ্ছে মনে। সুজাতা তাকে ফুঁসে উঠছে, চোর, চোর ! চোরের মত উঁকি মারছ তুমি এখানে।

সেই মুখটি রবির।

দিনের পর দিন সুজাতা ওর যত বন্ধুর কাছে গেল, সবাই ওকে দেখলে করুণভাবে হাসে। বিষণ্ণভাবে কথা বলে। রাগে দুঃখে অপমানে, সমস্ত বন্ধুবান্ধব সমাজটার প্রতি বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছে ওর মন। আর চারদিক থেকে একটি অর্থহীন শূন্যতা আসছে ওকে ঘিরে। আজকে যদি সবই এমন অর্থহীন, তবে সেদিন গিরীনকে কী ভেবে বরণ করেছিল। না, কিছুই বুঝতে পারছে না আজ।

যাকে ওর সবচেয়ে বেশী ভয়, সেই অমলার প্রতি তীব্র আকর্ষণ কিছুতেই রোধ করতে পারছে না। কী এক দুর্নিবার আকর্ষণ যে অমলা। অমলার

অলোক দীপ্ত, ভয় ধরানো, সুখের এক রাজ্য বার বার টেনে নিয়ে যায় সুজাতাকে।

অমলা ওর স্বামীকে ভালবাসে কিনা, সেকথা যেমন কিছুতেই জিজ্ঞেস করতে পারল না, নিজের কথাটাও কিছুতেই পরিষ্কার করতে পারল না মনের সামনে এনে। কোন কার্যকারণ বিচারশক্তিটাই যেন চলে গেছে নাগালের বাইরে। কেবল কানের কাছে দিনের পর দিন বাজতে লাগল, ভালবাসা! ভালবাসা!

কী করে জানবে সুমিতা ওর বড়দির কথা। কী করে সবটা বুঝবে! কী কথা যে বলল শিবানীটা! ওই কথাটি দিয়ে, যতই ও বড়দিকে বিশ্লেষণ করতে গেল, ততই অবুঝ ভয়ে ও দুঃখে, ব্যাকুল কান্না নিয়ে লুটিয়ে পড়ল ওর অ্যাডিশন্যাল সবজেক্টগুলোর উপরে। আর অলক্ষিত ভয়-বিলুলিত লতাটি এবার উন্মুক্ত করতে বসল নিজেকে।

(৭)

সুমিতা যে নিজেকে উন্মুক্ত করতে বসল, সেটাও ইচ্ছে করে নয়। কী এক অপ্রতিরোধ্য দুর্বার শক্তি ওর ভিতর-দুয়ারের কপাট খুলে দুর্বিনীতের মত সব ছড়িয়ে উড়িয়ে তছ্‌নছ্‌ করে দিলে। কত কাজ, কত কর্তব্য। কোনটাকেই রেয়াত না করে যেমন বড়দির ব্যাপারে ভয় জুড়ে বসেছে বুকে, কান্না উঠছে ঠেলে ঠেলে বাড়ির সবাইকে দেখে, এ-ও ঠিক তেমনি এসেছে। অথচ এর সঙ্গে লেখাপড়া, পরীক্ষা, ভয়-বেদনা-কান্না, কোনটিরই যেন সাক্ষাৎ মিল নেই।

এখানে দোলা লেগেছে ওর রক্তের মধ্যে। কাঁচা রক্তের শিরায় শিরায় কী এক বিচিত্র শিহরণ। কী এক অভূতপূর্ব ঝঙ্কারে সেখানে নতুন সুরের ঢেউ লেগেছে। ভেবে ভেবে সুমিতার নিজেরই বিস্ময়ের সীমা নেই। এ কেমন সৃষ্টিছাড়া মেয়ে ও। মানুষের মনে যখন এত দুর্ভাবনা, ভয়, ব্যথা, ঠিক তখুনি তার রক্তের মধ্যে নতুন সুরের গুঞ্জন। এই নতুন সুরই আরো বেশী করে সব ভণ্ডুল করে দিলে। সেই জন্যেই চেনা জিনিসগুলি সব হারিয়ে গেছে হাতের কাছ থেকে।

এই সুর নিয়ে ফিরেছিল সুমিতা, শিবানীর কাছ থেকে। যার সঙ্গে জীবনের কোথাও মিল নেই, অথচ ছোঁয়াচে কীটের মত কখন সে সুমিতার ডালপালায় ছড়িয়ে পড়ছে। সেই ছাদ, সেই পড়ন্ত বেলার রক্তিম রোদ।

সেই রোদের আভায় উদ্ভাসিত শিবানীর দু'টি চোখের বিচিত্র ঝিকিমিকি, রহস্যঘন হাসি, কুহেলী-মাখা লজ্জাজড়িত ভঙ্গি আর একটি কথা ভালবাসা।

সুমিতার মনে তখন বড়দির দুর্ঘটনার বেদনাময় সুরই ছিল বাঁধা। শিবানীর কথাগুলি ভাবিয়ে তুলেছিল বড়দির জন্যেই। কিন্তু সে কখন ওর নিজেরই ভিতর দরজার আগল খুলেছে, টের পায়নি। আসলে, শিবানীকে দেখে যতই বিস্ময় জুড়ে বসেছিল ওর মনে, ততই ভাবছিল, শিবানী তো সব বিষয়েই কত ছোট। কিন্তু সুমিতার চেয়ে এতবড় হয়ে গেছে ও কবে। সুমিতা নিজেই জানে না, নতুন যৌবনের অন্তস্রোতে এই প্রথম ও যুদ্ধ ঘোষণা করে বসল। এই প্রথম ওর যৌবন, শিবানীকে উপলক্ষ্য করে নামল প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। যে মন বাইরের জগতে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছিল, সে-ই মন শামুকের শুঁড়ের মত ভিতরে ঢুকিয়ে হাতড়ে বেড়াতে লাগল। কোথায় শিবানীর সেই হাসি, চাহনি, ভঙ্গি। কোথায় সেই ভালবাসা!

যত খুঁজল, তত ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। এত রকমের ভয়ও আছে এই সংসারে। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে, মনের মধ্যে এ কী বিচিত্র খুশির গুঞ্জন। এ কিসের নেশায়, কোন্ আমেজে নাচে রক্তধারা। ভাল লাগে, ভয়ও লাগে।

ভাল লাগাটাকে সুমিতা একটি অবৈধ অনুভূতির পর্যায়ে ফেলে দিলে। ছি ছি ছি। এ কোন ছোঁয়াচে রোগ নিয়ে এল শিবানীর কাছ থেকে। বাবা, বড়দিদের জন্যে যে দুর্বহ বেদনা রয়েছে বুকে, তাতে সংসারের পক্ষে সেটা অবৈধ হতে পারে, ওর নিজের কাছে নয়। কিন্তু তার মাঝে এই দুর্বহ আনন্দ সব-কিছুকে আরো জটিল আরো বিস্মিত লজ্জিত করে তুলল। ছি ছি, একটি মানুষের কতগুলি মন থাকে। সুমিতার মনে হল, ও মন্দ হয়ে গেছে। ওর সবই অমিয় গরল ভেল।

কিন্তু সে ছাড়বার পাত্র নয়। যে দুর্বিনীত অনুভূতিটা নিজে সৃষ্টিছাড়া, তার রীতিনীতি কাউকে মানে না। সে ওর পড়ার ফাঁকে ফাঁকে, পরীক্ষার ফাঁকে, বেদনার ফাঁকে, জায়গা করে নিয়েছে অসীম শক্তিতে। ঘেঁটে ঘেঁটে বেড়াচ্ছে বুকের চারপাশে। কোথায়, কোথায় সেই লজ্জার জড়িমা, কুহকী হাসির রেশ ওর নিজের প্রাণে। কোথায় সেই, সেই···কী যেন বলে! হ্যাঁ, ভালবাসা, ভালবাসা! এই তো লজিক, ওই তো ফিজিকস্, ওই যে সাহিত্য, এই যে বসে আছেন বাবা, ওই চলে যায় বড়দি, এই ভিড়ের মধ্যেই কে ওকে টেনে এনে দাঁড় করিয়ে দিলে আপনার কাছে!

নিজের দিকে চেয়ে হেসে ফেলল সুস্মিতা। হাসিটা লজ্জা ও বিরক্তি মেশানো। কিন্তু এত ভাল লাগছে কেন নিজেকে দেখতে। ওর চেয়ে সংসারে সুন্দরী বুঝি কেউ নেই আজ আর! ওকে যে দেখবে, সে-ই······?

অমনি বৈধ মন উঠল চোখ রাঙিয়ে। ছি! ও কী হচ্ছে। সব কিছুরই সময় আছে একটা। কিন্তু কে বলে দেবে সেই সময়ের কথা। সুস্মিতা? তা তো হয় না। আসলে, মনে যত বেদনা বাড়ে, দুঃখ বাড়ে, পরের জন্য বাড়ে কান্না, ওই অনুভূতিটুকু ততই ওঠে মাথা চাড়া দিয়ে। সেই অদৃশ্য লতা, যখন ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে দিগদিগন্তে, তখনি তার ডগায় শীর্ষবিন্দুর মত ধরেছে কুঁড়ি। সৃষ্টি সুখের মধ্যেই যত বেদনা সংশয় ভয়।

আয়নাতে নিজেকে দেখে, নিজেই বিহ্বল হয়ে পড়ল সুস্মিতা। একি সে-ই? ওই রক্তাভ তীক্ষ্ণ রেখাঙ্কিত ঠোঁট, নিখুঁত উন্নত নাক, ঈষৎ প্রশস্ত কপালের দু'পাশ দিয়ে বেয়ে পড়া স্বল্প কুঞ্চিত চুলের রাশি। ওই নিটোল গ্রীবা, প্রশস্ত কাঁধ, পুষ্ট দু'টি হাত। তরল চোখের কালো মণি দু'টি ভয়ে ও আনন্দে দেখতে লাগল নিজেকে। কাপড়ের আঁচল গেল খসে। স্বপ্নাচ্ছের মত দু'চোখ বুজে, দু'হাত রাখল বুকে।

এক তীব্র অনুভূতি ওর সর্বাঙ্গে কিলবিল করে বেড়াতে লাগল সাপের মত। সহসা আয়নার দিক থেকে ফিরে তাকাল দেয়ালের ছবির দিকে। মনিয়েরের গ্লাড-ইন-কুশান্। প্রশস্ত কাঁধের নীচে, ওখানে কোন বুটি-ছাপা ঘটি-হাতা ব্লাউজ নেই। লাল শাড়ি নেই কলকাতা-ছাপা। উত্তুঙ্গ উদ্ধত বুক, অস্পষ্ট উতরাই নেমেছে নাভিস্থলের দিকে। সুনাভা নিতম্বিনী অসঙ্কোচ উরুতের বাঁক সীমায়, একটি পা ফেলে দিয়েছে কুশানের নীচে।

আবার আয়নার দিকে তাকাল ভ্রূ কুঁচকে হেসে। এত সুন্দরী ও নিজে! ওকে যে দেখবে, সে-ই নয়, যে দেখেছে, সে-ই······আঃ, সে-ই কী দেখেছে? শিবানীর ওই হাসি ও ভঙ্গি দেখেছে নাকি? ছি!

ছি বললে কি হবে। যৌবনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা তার নিজের অধিকারে দেখতে লাগল সব উল্টে পাল্টে। সহসা মনে হল সুস্মিতার, কবে কোন্ এক কুয়াশাঘন ভোর থেকে নিজেকে দেখছে এমন করে। কিন্তু তার ছিল রকমফের।

আপনা থেকেই ওর মনে পড়ে গেল সেই দিনটির কথা। ম্যাট্রিক পরীক্ষার কিছুদিন আগে। ডাচ্-লেডী-ফ্রকটি উড়িয়ে বাগান থেকে ছুটে

আসছিল ঘরে। কী একটা জিনিস নিতে এসেছিল। হঠাৎ মাকড়সার মুখের কাছে আটকা পড়া মাছির মত দাঁড়াতে হল মেজদির সামনে। কেমন একরকম স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল মেজদি ওর দিকে। কোমরে ছিল না বেল্ট আটকানো। ভাবল, মেজদি ধমকে উঠবে এখুনি।

কিন্তু মেজদি সুমিতার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে বলল, পাশের ঘরে চল।

কী ভয় পেয়েছিল সুমিতা। পাশের ঘরে এসে মেজদি বললে, ফ্রক পরা আর তোর চলবে না।

ফ্রকের দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে বলল, কেন মেজদি ?

মেজদি গম্ভীর গলায় বলল, কিছু নয়, তুই বড় হয়েছিস।

বড় হয়েছে! এ কেমন বড় হওয়া! আলমারি খুলে কী খুঁজতে খুঁজতে মেজদি খাপছাড়াভাবে কয়েকটি কথা বলে গেল। তারপর হঠাৎ একটি শাড়ি বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এটা পরে নিস্।

বলে, ঘর থেকে বেরুতে গিয়ে আবার বলল, এরকম হয়।

কিন্তু বিস্ময় তখন কিছুতেই গেল না সুমিতার। মেজদির কথামত সব করেও সহস্র প্রশ্ন উঠতে লাগল বুক ঠেলে। একলা একলা শাড়ি পরতে গিয়ে কেঁদে আকুল হল। কিছুতেই ঠিক হয় না। শেষ পর্যন্ত হাত লাগাতে হল মেজদিকেই।

শাড়ি-পরা রুমনোকে দেখে বাবা তো হেসেই খুন। বললেন, নাইস্, ইয়ং লেডী। হাউ বিউটিফুল ইউ আর।

সেইদিন বাবার দিকে তাকিয়ে কি সুমিতা শিবানীর মত হেসেছিল লজ্জাজড়িতভাবে! সেদিন বাবাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে বলেছিল, যাঃ!

সেই তো একজন প্রথম পুরুষ বাবা, যাঁর সামনে ও ত্রিভঙ্গ হয়ে উঠেছিল লজ্জায়। তারপর রবিদা, গিরীনদা, মৃণালদা, রাজেনদা··· কত, কত ছেলে। তখন মনে একটি তীব্রতা এসেছিল ওর। সব বিষয়ে ওর অনুসন্ধিৎসা, সকলের সুখে দুঃখে ওর নিজের সুখ দুঃখানুভূতি, তেমন করে আগে আর বাড়েনি। নিজেকে এসে দেখেছে তখন আরশিতে। দেখেছে শরীরের বৈলক্ষণ্য। কিন্তু সুপ্ত ছিল আজকের এই মন। শুধু বড়দির ঘরের ছবিগুলি দেখে, নিজের দিকে চেয়ে দেখতে লজ্জায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এসেছে। মেজদি বলেছিল, তুই বড় হয়েছিস। দু'দিন বাদেই ভুলে গিয়েছিল সুমিতা সেই কথা। ভুলে

গিয়েছিল বাড়ির লোকেরাও। যে ছোট সেই ছোট রুমনিই থেকে গিয়েছিল ও।

কিন্তু মেঘসমারোহ এই ঝড়ের দিনে, ব্যাকুল ভয় ও কাজের মাঝে শিবানী দিলে সব উতল এলোমেলো করে। শিবানী বলে, ভালবাসা! ওকে ভালবাসবে একজন। কিসের একটি স্বাদ পেয়েছে ওর মন। যেন বলছে ঠোঁট উল্টে, ছোট পিসি তুমি এখনো কিছুই বোঝ না।

অমনি সুপ্তোত্থিতের মত জেগে উঠেছে মন। মন ঢুকিয়ে দিয়েছে মত্ত-হস্তীর শুঁড় বুকের মধ্যে। কোথায়, কোথায় ভালবাসা। কাকে বলে? কে ওকে ভালবাসবে। নাকি ভালবেসেছে! সে কে, কে? কার সামনে ওর ভিতর-দুয়ারের রং হয়ে উঠেছিল শিবানীর মত রহস্যময়ী, লজ্জাবিব্রত বিচিত্র ভঙ্গি।

নিজেকে দেখল সুমিতা কলেজ প্রাঙ্গণে। ওই যে, ওই হিরণ্ময় নাকি! সেই ছেলে? থার্ড ইয়ার, বিজ্ঞানের হিরণ্ময়, অবাক মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখছে সুমিতাকে। চোখাচোখি হতেই মুখ ফিরিয়ে নিল। ও তো রাজেনদার চেলা। ছাত্র ইউনিয়নের নেতা। ওদের নেত্রী সুগতাদির বোন বলে কেমন যেন একটু সম্ভ্রম করে সুমিতাকে। কখনো জামার হাতা বন্ধ করবে না, রাখবে হাত গুটিয়ে। চুলগুলি ওর চরিত্রের মত, আচড়ালেও সাপের মত ফণা তুলে থাকবে কপালের কাছে। সব সময়েই দ্রুত, ব্যস্ত, বক্‌বক্‌ করছে। হাত মুঠি পাকিয়ে উত্তেজিতভাবে বলছে, কলেজ কর্তৃপক্ষের এ বিজাতীয় মনোবৃত্তি আমরা কিছুতেই সহ্য করব না।

সুমিতার দিকে চোখ পড়লেই ঠোঁটের কোণে একটি অস্পষ্ট হাসির আভাস ফুটে ওঠে। অনেকদিন নিজে এসেছে সুমিতার সই নিতে, কলেজের বিষয় বলতে। ডেকে নিয়ে গেছে কফি হাউসে। কফির গন্ধে, সিগারেটের ধোঁয়ায় রুদ্ধ বাতাস, অজস্র কণ্ঠের কলবলানির মধ্যে হিরণ্ময়ের দীপ্ত স্বর হঠাৎ মিষ্টি হয়ে উঠেছে, কফি খাবে তো?

আগে হিরণ্ময় আপনি বলত। কী যে হাসি পেত সুমিতার। সুমিতা কফি খেয়েছে, আর হিরণ্ময় বক্‌বক্‌ করে গেছে। কী যে বলেছে, মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝেনি সুমিতা। হিরণ্ময়ের দৃষ্টির সামনে লজ্জবিব্রত হাসি নিয়ে, চোখ নামিয়ে রেখেছে ও। যদি সে সময়ে পড়ন্ত বেলার রোদ পড়ত ওর

মুখে, তা হলে কি শিবানীর মত দেখাত ওকে। ও বলত নাকি, সে তো আমাকে ভালবাসবে।

কিন্তু কই, শিবানীর মত বুকের ভিতর থেকে তো কেউ কিছু বলে ওঠে না। কিছুই তো মনে হয় না ওর হিরণ্ময় সম্পর্কে। কেবল হঠাৎ লজ্জা করে ওঠে।

তবে কি সুমিতারই সহপাঠী সেই বিনয়, সে খুব সেজেগুজে আসে; কোঁচা লুটিয়ে অধ্যাপকদের মত পাঞ্জাবি পরে। কলেজের অনুষ্ঠানে গান গায় গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে। আর এদিক-ওদিক খুঁজে ঠিক সুমিতার কাছে বসে বলে, আপনার ভাল লেগেছে?

সুমিতা লজ্জায় হাসে নিঃশব্দে। ঘাড় নেড়ে জানায়, হ্যাঁ। গলার কাঁপানো শুনে সত্যি কেমন মজা লাগে সুমিতার। যখন হ্যাঁ বলে, তখন সুমিতার দিকে কেমন বোকার মত হাঁ করে তাকিয়ে থাকে বিনয়। তখন আরো লজ্জা করে সুমিতার। পায়ের স্লীপার দিয়ে মাটি ঘষতে থাকে নীচু চোখে। আর বিনয় গান সম্পর্কে নানান কথা যায় বলে।

এই কি তবে সেই? কিন্তু কই, বুকের মধ্যে তো সুমিতার কোন সাড়া-শব্দ নেই। ওর নম্র লজ্জা তো উচ্চারিত হয়ে উঠছে না সেই ভাষায়, ভাল-বাসা! তবে ফোর্থ ইয়ারের সেই গল্প লিখিয়ে ছেলেটি নাকি? যার চোখের দিকে তাকালে সুমিতাকে আঁচল কষতে হয় বুকে। কী চাউনি। কী নাম যেন ওর। আশীষ! চিলের মত ছোট চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কিন্তু ভাবে ঢুলুঢুলু। ওর সামনে পড়লেই লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে সুমিতা। আর সেই মুহূর্তে কেমন একটু হাসি স্ফুরিত হয়ে ওঠে ঠোঁটের কোণে। তারপর আড়ালে এলেই ভ্রূ কুঁচকে ওঠে ওর। আলাপও আছে আশীষের সঙ্গে। কিন্তু কেন ও তাকায় অমন করে?

ও-ই কি সেই? কিন্তু কোন উচ্ছ্বাস তো নেই। বরং বিব্রত বিরক্তি বোধ করে। তবে তো কত লোকই ওইরকম করে তাকিয়েছে, ট্রামে-বাসে।

আচ্ছা, সেই লোকটি নয় তো, গত বছরে যে ট্রামের ভিড়ে ওর বুকের কাছ ঘেঁষে, মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েছিল সারাক্ষণ। কিংবা যে ছেলেটি ওর দিকে তাকিয়ে বাসে জায়গা ছেড়ে উঠে পড়েছিল? একটি সশ্রদ্ধ মিষ্টি গলা, আপনি বসুন। সে?

বেচারী সুমিতার এ কি দুর্দৈব জীবনের ও মনের। ছুটে গেল পড়ার টেবিলে। আড়াল থেকে দেখল বাবার ভীত ব্যাকুল মুখ, বড়দির দৃপ্ত গতিভঙ্গি, দিকহারা স্রোতস্বিনী মেজদিকে। এ সবকিছুর মধ্যে বুকের চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়েছে পুরুষেরা।

বুকের ওই দুর্বিনীত অনুভূতি দাঁড় করিয়ে দিল সুমিতাকে, মৃণালের সামনে। মৃণালদা! সুদীর্ঘ একহারা, টানা টানা চোখ মৃণালদা ওকে অনেকটা বন্ধুর মত দেখে। বলে, তোমার চেহারাটি ঠিক সুজাতাদির মত হয়ে উঠেছে।

সুমিতা হাসে লজ্জিত মুখে। মৃণালদা বলে, বড় হয়ে উঠলে তুমি। কীসব অর্থহীন কথা। বলে, সেদিন তোমাকে স্কোয়ারের সামনে, স্টপেজে দেখে চিনতেই পারিনি।

কথার মধ্যে কী একটা সুর, যেন মৃণালদার সামনে সুমিতা মেজদির মতই একটি বড় মেয়ে। বলে, চল, সংসদের সাধারণ সভায় যাই, যাবে?

লজ্জিত হেসে ঘাড় নাড়ে সুমিতা, যাব।

বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী মৃণালদা। ওর নামে নানান রকমের কানাঘুষা চলিত আছে ছাত্রদলে। হিরণ্ময় বলেছে, মৃণাল মদ খায়, পিছনে ঘোরে মেয়েদের। ওর স্বদেশী করার পিছনে কোন উদ্দেশ্য আছে নিশ্চয়ই। হঠাৎ একেবারে সাধু সেজে বসেছে লোকটা।

হিরণ্ময়ের কথা শুনে রাগ হয়েছিল ওর। মৃণাল যে মেজদির সঙ্গে সুমিতাদের বাড়ি যায়। বাবার সঙ্গে, রবিদার সঙ্গে, বাড়ির সকলের সঙ্গেই ওর কিছু অন্তরঙ্গতা আছে। মিটিং করে, বক্তৃতা দেয়, ছাত্র নেতাদের মধ্যে নামও দেখা যায়।

তবু ওর বুকের ভিড়ে যখন মৃণালদার মূর্তি দেখতে গেল, অবাক হল, ভয় পেল, মাথা নেড়ে উঠল হেসে, না না না। মৃণালদাকে ও শ্রদ্ধা করে, কথা শুনলে লজ্জা পায়। কিন্তু ওর সুপ্তোত্থিত বুকের আলোয় মৃণালদা নেই একেবারেই। সেখানে অস্পষ্টতা আর অপরিচয় ছাড়া আর কিছু নেই।

তবে কে? রাজেনদা? শান্ত কিন্তু রূঢ়। চোখের চাউনিতে কেমন একটি কঠিন নিষ্ঠুরতা, তবু যেন বিষণ্ণ। রাজেনদা হাসলে অবাক হয়ে দেখতে হয় সেই হাসি। এমন শিশুর সারল্য লুকিয়ে থাকে কোথায়? মেজদি ওর সামনে যেন ভক্তিমতী শিষ্যা, কিংবা দু'জনের বন্ধুত্বের তল অতল গভীরে। ওই

একটিমাত্র লোক যার সামনে মেজদিকে কেমন যেন বিব্রত, অপ্রতিভ, কোমল এবং থরো থরো মনে হয়। মেজদি যখন রাজেনদার কাছে, মৃণালদা তখন অস্পষ্ট ছায়ার মত মেজদির পেছনে। যখন একলা মৃণালদার সঙ্গে মেজদি, তখন মেজদি সেই রাজেনদার সামনের মেয়েটি নয়। আরো গম্ভীর, কিন্তু একটি অস্পষ্ট হাসির আভাস কাঁপে ওর পাতলা রক্তাভ ঠোঁটের কোণে। তখন রাজেনদাকে অস্পষ্ট দেখে স্নমিতা!

ছি ছি, স্নমিতার বুকের মত্ত রক্তধারা রাজেনদাকেও বাদ দিলে না। যাকে ও দূর থেকেই দেখেছে বেশী, যে ওর সঙ্গে আজ পর্যন্ত তিনটি চারটির বেশী কথাও বলেনি। স্নমিতার উত্তাল হৃদয়, সভয় শ্রদ্ধায়, পাশ কাটিয়ে এসে, দূর থেকে তাকিয়ে দেখল পর্বতপ্রমাণ বিশাল রাজেনদাকে। মনের কোথাও তো শিবানীর সেই ভালবাসার লজ্জা-জড়িত হাসির ছোঁয়া নেই স্নমিতার মুখে।

যত ভয়, যত কান্না, ততই এই প্রমত্ত খেলায় কেউ বাদ গেল না। কেউ নয়। এমন কি, পাশের বাড়ির তাপসীর দাদা নবেন্দুও নয়। তাপসীদের বাড়িতে কয়েকবার গিয়েছে স্নমিতা। নবেন্দু ওকে তাকিয়ে দেখে দূর থেকে। বয়স খুব বেশী নয় ওর, ভাবটা মস্তবড়। সামনে গেলে এমন অদ্ভুতভাবে তাকায়, যেন দার্শনিকের স্থির ভাবলেশহীন ঠাণ্ডা দৃষ্টি। স্নমিতা ওর চেয়ে অনেক ছোট। কিন্তু নবেন্দুর ভাবখানা যেন, ছোটর সঙ্গে ছোট কথা ওর মুখেই আসে না। তবে ওরকম করে কী দেখে তাকিয়ে তাকিয়ে। চশমার লেন্সের ফাঁকে কেমন একটি বোবা দূর্বোধ্য দৃষ্টি, অথচ ঠোঁটের কোণটা বেঁকে থাকে একটু হাসির মত। কিংবা, ছেলেটার ঠোঁটই অমনি, কে জানে।

তাপসী একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, কেমন লাগেরে আমার দাদাকে?

স্নমিতা অবাক হয়ে বলেছিল, আমার? কেমন আবার ভালই।

অথচ স্নমিতা কেমন একটি অস্বস্তি বোধ করে নবেন্দুর সামনে। কিন্তু তার মধ্যে হৃদয়ের কোন আবেগ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে না। যাকে খুঁজছে মনের গোপন গুহায়, তার দেখা পাওয়া গেল না। যাদের মূর্তি নানান রকমে ভেসে উঠল চোখের সামনে, তারা সকলেই ওর পরিচিত। কেউ কেউ নিকটতম, আপনজনের মত। কিন্তু সেই মানুষটির দেখা পেল না।

ভাবল, তবে কে, কে সেই মানুষ। কোন্ জনারণ্যের ভিড়ে মিশে আছে সে।

তাকে দেখতে পেল না সুমিতা, চিনতে পারল না বটে। কিন্তু, এতগুলি ছেলের একটিকেও হারাতে পারল না মন থেকে। সবাই রইল ভিড় করে ওর চারপাশে। নতুন যৌবনের খেলাঘরে এরা যেন সব এক একটি পুতুল। সাজানো রইল সব সুমিতার মনের রংএ রঙ্গীন হয়ে। কাউকে যেন প্রাণ ধরে ছাড়তে পারবে না।

শেষ পরীক্ষা শেষ করে যেদিন সুমিতা বেরিয়ে এল কলেজ থেকে, ফাল্গুন শেষ হয়ে এসেছে। বাতাসে চৈত্রের উম্মাদনা। কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাথেও শুকনো পাতা এসেছে উড়ে। রাস্তার ধারে, পার্কে, কলেজে, হাসপাতালের গাছগুলি প্রায় পত্রহীন। তাতে আসলে নীল আকাশটাকেই কেমন ন্যাড়াবৈরাগী মনে হচ্ছে।

সুমিতার চোখে মুখে ক্লান্তি মাখানো। কিন্তু চলার ভঙ্গিতে তার চিহ্নও নেই! বাস স্টপেজে এসে দাঁড়াতেই, বিনয় এসে দাঁড়াল ছুটে। গায়ক বিনয়। বাসে উঠে বসল ওর পাশেই। বলল, আপনাকে দেখেই উঠলুম। একটু এস্প্লানেডে যাব। কেমন হল পরীক্ষা?

সুমিতার লজ্জা করছিল। বলল. ভাল নয়। আপনার?

বিনয় খুব গম্ভীরভাবে বলল, ফেল করব।

বিনয়ের বলার ভঙ্গিতে সুমিতার হাসি পেয়ে গেল। কিন্তু কোনরকমে চেপে বিনয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। ভীষণ ছেলেমানুষ মনে হতে লাগল বিনয়কে। কি যেন বলতে চাইছে সুমিতাকে। ওর আঁচলটা বারবার বিনয়ের গায়ে পড়ছে। কপালের সামনের চূর্ণকুন্তল প্রায় সুড়সুড়ি দিচ্ছে বিনয়ের মুখে।

হঠাৎ বিনয় বলল, আমার দ্বারা লেখাপড়া কিছু হবে না। যদি পাশ করি, পড়ব। ষোল আনাই ফেল করবার চান্স। তা'হলে এই শেষ। আর কোনদিন···

বিনয়ের নিম্নস্বর কেমন ভারি শোনাল। ওর দিকে কাত হয়ে ফিরে তাকাল সুমিতা। দু'জনের দেহের ঘনিষ্টতা বেড়ে উঠল। বড় করুণ আর দুঃখী মনে হচ্ছে বিনয়কে।

বিনয় আবার বলল, আর হয় তো আপনার সঙ্গে দেখা-ই হবে না।

অবাক হয়ে বলল সুমিতা, কেন?

বিনয় : আর তো কলেজে আসব না।

সুমিতা : কলকাতায় তো থাকবেন?

বিনয় করুণ গলায় বলল, থাকলেও আপনার সঙ্গে তো দেখা হবে না।

সুমিতা এবার সত্যি হেসে ফেলল। বিনয়কে ওর 'তুমি' করে বলতে ইচ্ছে করছে। হয়তো বিনয় ওর সমবয়সী, কিংবা বছরখানেকের বড়। কিন্তু ছেলেরা সবাই এত ছোট। একটি জায়গায় ওরা কোনসময়েই বোধহয় বড় হয় না। বলল, কেন, আমাদের বাড়িতে আসবেন আপনি।

বিনয় : আমি?

বিনয়ের কপালে কোঁচকানো বিস্ময় দেখে অবাক হল সুমিতা। বলল, তাতে কি হয়েছে? আমাদের বাড়িতে তো সবাই যায়।

হঠাৎ কৃতজ্ঞতায় কেমন ছটফট করে উঠল বিনয়। কী বলবে ভেবে পেল না। একটু পরে বলল, সুগতাদি কিছু মনে করবেন না তো?

আরো অবাক হয়ে বলল সুমিতা, কেন?

সহসা নতুন অনুপ্রেরণায় বিনয় ওর গানের বিষয় তুলে ফেলল। বেশীদূর এগুবার আগেই, এসে পড়লো এস্‌প্ল্যানেড্। তাতে ওর ক্ষোভ হল না। যেন কী পেয়েছে বুক ভরে। তাকে বুকে নিয়ে পালাতে পারলেই বাঁচে। নামবার আগে, বিদায় নিল সুমিতার কাছে।

সুমিতার বুকের ভিতরে বিস্মিত হাসির নিঃশব্দ নিক্কণ। কী হয়েছে বিনয়ের। এমন করে তো কোনদিন আসেনি সুমিতার কাছে।

ভালবাসা! এই কী ভালবাসা। আশ্চর্য। সে যে কী এক অস্পষ্ট দুর্বোধ্য জিনিস, যার স্বরূপ কিছুতেই ধরা পড়ছে না ওর কাছে। সে কেমন করে, কখন আসে, কেমন করে তাকে টের পাওয়া যায়, হৃদয়ের কী বৈলক্ষণ্য ঘটে, কিছুই বোঝে না। বুঝলে, ওর নিজেকে চিনত, বড়দিকে বুঝত। বুঝত, কী ছিল বড়দির আর গিরীনদার মাঝে। ভালবাসাকে জানতে চায় সুমিতা।

বাড়ি এসে দেখল, বাবা আর রবিদা বসে আছেন বাগানে দু'টি চেয়ার নিয়ে। মুখোমুখি দু'জনে। কথা নেই কারুর মুখে। যেন কিসের এক উৎকর্ণ প্রতীক্ষায় নীরব দু'জনেই।

সুমিতার মনে হয়, ওঁদের দু'জনের এই মুখোমুখি নৈঃশব্দের মধ্যে ভালবাসা একটি গূঢ় অর্থ নিয়ে রয়েছে দাঁড়িয়ে। ওদের গভীর নৈঃশব্দের অতলান্তিক শূন্য পরিবেশের সবটাই যেন ভালবাসায় ভরা।

সহজের সাধনা যে কি বস্তু, সুমিতা তা জানে না। জীবনকে সহজভাবে গ্রহণ করা যে আবার সাধনার বিষয়বস্তুও হতে পারে, এ ধারণাও নেই। কিন্তু নিজের জীবনকে, মনকে, হৃদয়ের অনুভূতিকে বড় সহজ বলে মনে হল। আর যত অসহজ সর্পিল, ঘোরালো প্যাঁচালো জীবন ওর চারপাশে রয়েছে ঘিরে। এই অসহজ জীবন ছড়িয়ে আছে ঘরে বাইরে। বাবা, দিদিরা রয়েছে ঘরে, বাইরে রয়েছে যুদ্ধ ও দাঙ্গা-প্রহার-জর্জরিত, ভারত স্বাধীন হওয়ার সংশয় ও উত্তেজিত সংসার, বিচিত্র ও অচেনা সব মানুষ, যাদের কথা ও কাজ সুমিতা ভাল বোঝে না। আর একদিকে নিজের গোপন কাঁচা প্রাণের সরলতা। সেখানে সবই সহজ। কোনকিছুই ধরা ছোঁয়ার বাইরে নয়। কোন অন্ধকার নেই, অস্পষ্টতা নেই, নেই কোন দুঃখ কষ্ট ভয়। এখানে ওর বিবেক বুদ্ধি সবই কখনো মুগ্ধ, বিহ্বল। এ যেন সব কর্তব্যের বাইরে, কিসের এক খেলা। এখানে আছে কখনো খেলার আমেজ ও উত্তেজনা। এখানে মনের এই বক্ষমাঝে জুড়ে আছে বিনয় হিরণ্ময় আশীষেরা। সুমিতা নিজে এখানে যা বোঝে, তাই বলে। যতখানি খুশি, ততখানি হাসে। যা করতে ইচ্ছে করে, তাই করে। ভাবছিল, এইটিই বুঝি ওর ভালবাসার স্বরূপ উদ্ঘাটনের ক্ষেত্র।

এ দু'য়ের মাঝে, কোনখানেই মনের ফাঁকি ছিল না একটুও। সংসারের অসহজ কঠিন বেড়া থেকে নিজেকে মুক্ত করে আনতে পারেনি, কোনদিন চায়নি। সেখানে রয়েছে ওর স্বজনেরা। আর এই সহজ জীবনের অদৃশ্য নির্মেঘ আকাশের আকর্ষণটাও রেহাই দিল না।

এ দু'য়ের মাঝে দাঁড়িয়ে, চারপাশের কঠিন পরিবেশের মধ্যে ও একটি সতেজ পাতাবাহারের গাছ। সূর্যস্নাত সেই গাছের পাতায় পাতায় কত রং। এই তো স্বাভাবিক, পাতাবাহারের এ বর্ণবাহুল্য। ওর এই বর্ণাঢ্য ঝাড়ে উড়ে উড়ে আসে কত ছোট বিহঙ্গেরা। যার যা রং, সবই এখানে এসে মিশে যায়। সবাই উড়ে আসে, দল বেঁধে কিংবা একা একা। খানিকক্ষণ কিচিরমিচির করে, একটু মন-কাড়া শিস দেয়। তারপর, চারপাশের কঠিন বেড়াটির দিকে নজর পড়লেই পালায়। কিংবা অল্প বাতাসেই যখন পাতাবাহারের ঝাড় দোলে, পালায় তখন ভয়ে। আবার আসে, হয়তো

স্বপ্ন দেখে, বাসা বাঁধবে জোড়া শাখার সঙ্গমে। বাসা আর বাঁধা হয় না। স্বপ্ন-ই থেকে যায়। তবু, যতবার আসে, স্বপ্ন দেখতেই থাকে।

কিন্তু, এ দু'য়ের মাঝে দাঁড়িয়ে সুমিতা নিজে কোন স্বপ্নই দেখে না। কোন স্বপ্নই দেখা দেয় না এসে। শুধু হাসে, খেলার হাসি।

পাতাবাহারের এই বর্ণালী সমারোহ নিয়ে কবে যে সুমিতা এ খেলায় মেতে গেছে, নিজেরই খেয়াল নেই। শুধু জানত না, আসলে এটা ওর যৌবনের প্রাক্‌মধ্যাহ্নের বাঁকা ছায়ার লুকোচুরি খেলা। এখন সবটাই বাঁকা। কারুর চোখে চোখ পড়লে, চাহনি বেঁকে যায়। বেঁকে যায় হাসি। এমন কি, চলনটুকুও বাঁকা হয়ে যায়।

ওর বয়সী সব মেয়েরই এমন হয় কিনা, তা ও দেখেনি, জানেও না। নিজেরই বাঁকা ভঙ্গিটুকু নিজে জানে না। এ যে ওর সেই রাশ না মানা হৃদয়ের কারসাজি। একে রুখতে জানে না, এর স্বরূপও চেনে না। কিন্তু ভালবাসার স্বরূপটি সুমিতা আবিষ্কার করতে চায় নিজে।

পরীক্ষার ফলাফল বেরুবার আগেই বিনয় এসে পড়ল একদিন। কী বিপদ সেই বেচারীর। যাকে সবচেয়ে বেশী ভয়, সেই সুগতার সামনেই পড়ে গেল প্রথমদিন। সুগতা তো অবাক। ওদের ছাত্রসংঘে কমবেশী যাতায়াত বিনয়ের। তা' ছাড়া, ছাত্রসভায় কয়েকবার গানও শুনেছে। তাই পরিচয় কিছুটা ছিল। তবে, এই ধুতি-পাঞ্জাবির বহর দেখে, একটুখানি বোধ হয় বিরক্তিই বোধ করত সুগতা। বললে, বিনয় যে? কি মনে করে?

যেন বাঘিনীর মুখে পড়েছে। তার উপরে মুখ হয়ে উঠেছে লাল। কোনরকমে বলল, এই এলুম একটু—

সুমিতা তখন শোবার ঘরে, ওর খাতার পাতা বিচিত্র সব লিখনে ভরে তুলেছে। ওইটি নিরালায় সবচেয়ে বড় সঙ্গী। অথচ তার মধ্যে কোন ধারা নেই, ছন্দ নেই, কাহিনী গল্প কিছু নয়, কিছু আঁকাবুকি মাত্র। কোথাও হঠাৎ লেখা হয়েছে, আমার পিতা শ্রীযুক্ত মহীতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরেই রবিদার নামটিই হয়তো লেখা হয়ে গেছে চারবার। পরমুহূর্তেই 'বড়দি ও গিরীনদা।' তারপর উল্টোদিকে হয়তো মেজদির নাম, আবার বড়দি তারপরেই পর পর রাজেনদা, মৃণালদা। ঝোঁকটা সেখানেই থেমে থাকেনি। বিনয় হিরণ্ময় আশীষ নবেন্দু তাপসীতে গিয়ে ঠেকেছে। এক কোণে ছোট্ট

করে শিবানীর নামটিও লেখা হয়ে গেছে। এমনি আঁকাবুকির মাঝখানে, বাগানের দিকে জানালায় দৃষ্টি পড়ে গেছে স্থমিতার। বাগানের ছোট লোহার দরজা, তারপরে সরু একটি গলি পশ্চিমদিকে, উত্তর দক্ষিণে লম্বা। যেখানে জানালার মুখোমুখি একটি ঝাড়ালো কতবেল গাছের ছোট ছোট পাতার ঝালরে হেলে-পড়া সূর্যকিরণ! অপরাহ্নের সোনালী রোদ সেখানে হাসছিল যেন চোখের জল চেপে। অমনি ওর বাবার কথা মনে পড়ে গেছে। এইবার বাবা আসবেন ঘরের বাইরে। বসবেন হয়তো বাগানে কিংবা বারান্দায়, আর বারবার চোখ তুলে তাকাবেন গেটের দিকে। স্থমিতা আপনমনে কলম চালিয়ে লিখে গেছে, 'বড়দি! তুমি যেন কী!' আবার 'বড়দিটা যেন কী!'

ও যখন এমনি করে নিজের মনকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে খাতার পাতায়, সেই সময় বাইরের ঘরে বিনয় দরদর করে ঘামছে স্থগতার সামনে। কে জানত, এমনি হঠাৎ বিনয় এসে পড়বে। পরে বুঝেছিল স্থমিতা, মেজদি ওকে এমনি এমনি আটকে রাখেনি। আশা করছিল, বিনয়কে দিয়ে হয়তো রাজেনদা কোন সংবাদ পাঠিয়েছে। কিংবা মৃণালের কোন খবর নিয়ে এসেছে বিনয়। হিরণ্ময়কে দেখলে সে বিস্মিত হত না, কিন্তু একথাই ভাবত। আশীষকেও তাই। কিন্তু বিনয়কে কোনদিনই আসতে দেখেনি।

স্থগতা উদগ্রীব হয়ে উঠল ভিতরে ভিতরে। সলজ্জ বিনয়কে দেখে সে কিছুই বুঝতে পারলনা। বলল, বস।

বিনয় খুব সন্তর্পণে বসল একটি চেয়ারে। প্রায় এক মিনিট নীরবতার পরেও যখন মুখ খুলল না তখন পাখা খুলে দিয়ে মেজদি জিজ্ঞেস করল, কিছু বলবে বিনয়?

সহসা যেন চমকে উঠে বিনয় বলল, হ্যাঁ, স্থমিতার সঙ্গে একটু দেখা করতে এসেছিলুম।

চকিতে একটু বিস্ময়ের ছায়া খেলে গেল মেজদির মুখে। বলল, ও! বসো তুমি, আমি ডেকে দিচ্ছি।

খবর পেয়ে স্থমিতাও একটু অবাক হল। খবর দিয়ে মেজদিও যে ওর দিকে একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে, সেটুকু বুঝে লজ্জা গেল বেড়ে। খাতাখানি ডেক্‌সের মধ্যে বন্ধ করে চলে যাচ্ছিল। মেজদি বলল, ও কি হচ্ছে? কাপড় চোপড় একটু ঠিক ঠাক করে যা।

তাও তো বটে। অথচ সুমিতা যে খুবই ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, তা নয়। এখানে ওর ভয় নেই, ভাবনা নেই। গভীর গুরুতর কিছু ভাবতেও পারেনি। তাই নিজের দিক থেকে সাবধান হওয়ার কোন কথাও মনে হয়নি। কিন্তু স্পষ্ট না হলেও, মেজদির ভাবখানা যেন সেই ডাচ্-লেডী ফ্রকটি ছেড়ে ফেলা দিনের মত নতুন কিছু। ওইটুকু ওকে বেকুব করে তুলল। কে অত সাবধানী মন নিয়ে ঢোকে খেলার আসরে।

বাইরের ঘরের পর্দা সরিয়ে দেখল, মাথা নীচু করে বসে আছে বিনয়। সুমিতার মুখ দিয়ে আপনি বেরিয়ে এল, কতক্ষণ এসেছ?

বলে ফেলেও কী লজ্জা! বিনয়কে তো তুমি বলেনি কোনদিন। কেমন করে ওর মুখ দিয়ে 'এসেছ' বেরিয়ে এল। এক মুহূর্তের জন্যে বিনয়ের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারলনা। কিন্তু কী দোষ ওর। বিনয়কে দেখে ওর আপনি কিছুতেই আসলনা যে মুখ দিয়ে। আর ঠিক, এই মুহূর্তে তো একবারও 'আপনি' শব্দটি মাথায় উদয় হয়নি।

বিনয় উঠে দাঁড়িয়েছে সুমিতাকে দেখে। কেমন একটু অপরাধের স্বরেই বলল, এই আসছি। হঠাৎ কি মনে হল—

সুমিতা বলল, তাতে কি। বসুন।

বিনয়ের লজ্জা-দীপ্ত মুখখানিতে হঠাৎ ছায়া ঘনিয়ে এল। কেমন একটি বিষণ্ণ অথচ থরোথরো ভাব। বলল, তুমি বললে ক্ষতি কি?

ভীষণ হাসি পেতে লাগল বিনয়ের ভাবভঙ্গি দেখে। ও যদি ধুতিপাঞ্জাবি না পরে, হাফ প্যান্ট আর শার্ট গায় দিয়ে আসত, তা' হলে ঠিক মানাতো বোধ হয়। তবু নিজের লজ্জা ও অপ্রতিভতা কিছুতেই চেপে রাখতে পারছেনা সুমিতা। বলল, ক্ষতি আবার কি। কোনদিন বলিনি, তাই—

বিনয় তেমনি মাথা নীচু অবস্থায় চকিত চোখে তাকিয়ে বলল, আজ একবার তো বলা হয়ে গেছে।

সুমিতা নিঃশব্দে হাসল। তারপর বসল দু'জনেই। কিন্তু কারুরই কোন কথা নেই মুখে।

এই নৈঃশব্দের মধ্যে শুধু যে কুণ্ঠা ও সঙ্কোচ রয়েছে, তা নয়। এও যেন একটি খেলা। ভালবাসার খেলা কিনা, সুমিতা জানেনা। ভাল লাগার খেলা। দু'জনেই আড়ষ্ট। সুমিতা একটু কম। উত্তেজনা ও আবেগের কেন্দ্র বিন্দুটি আসলে বিনয়।

আবার চোখোচোখি হল দু'জনের। দু'জনেই হাসল। হেসে বিনয় উৎসুক কুণ্ঠিত চোখে দেখতে লাগল ঘরের চারপাশে। বইয়ের আলমারি, রেডিও, পর্দা ঢাকা অর্গ্যান। অর্গ্যানটির দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বিনয় জিজ্ঞেস করল, কে গান করেন ?

সুমিতা অবাক হয়ে বলল, কোথায় ?

: এ বাড়িতে ?

: কেউ নয় তো।

অর্গ্যানের দিকে তাকিয়ে বলল বিনয়, তবে ওইটি কী জন্যে ?

সুমিতাও আজ অর্গ্যানটির দিকে তাকিয়ে অবাক হল। সত্যি, ওটা যে কার, কেন, সুমিতা নিজেও তা পরিষ্কার জানেনা। শুনেছে, বড়দি একসময়ে বাজাতো। কিন্তু কোনোদিন গান গাইতে শোনেনি। ওইটি চিরদিন ধরেই সাজানো আছে বাইরের ঘরে। এক সময় গিরীনদা অপটু হাতে বিচিত্র রাগিণী তুলেছেন। সেটুকু নেহাত-ই হাসাবার জন্যে। কেউ বেড়াতে এলে হয়তো গান করেছেন। উপরোধে পড়ে বড়দিকে দু' একবার বসতে দেখেছে। তা ছাড়া, লখনৌয়ের বুটি-পর্দা ব্যতীত, ওখানে আর কোনদিন উল্লেখযোগ্য কিছু চোখে পড়েনি।

খানিকটা বিব্রত, লজ্জিত হয়ে হেসে বলল সুমিতা—কারুর জন্যেই নয়, এমনি আছে। তুমি বাজাবে ?

মুহূর্তে পাংশু হয়ে উঠল বিনয়। সন্ত্রস্ত গলায় বলে উঠল, না না, আমি ওসব বাজাতে শিখিনি এখনো। তা ছাড়া—আমার ওসব বাজাতে একদম ভাল লাগেনা।

কেন ?

বিনয় গম্ভীর গলায় বলল, আমাদের দেশের গানের সঙ্গে, এই যন্ত্র ঠিক খাপ খায়না।

বিনয়ের গাম্ভীর্য দেখে সুমিতার হাসি সহসা যেন বাঁধভাঙা হয়ে উঠতে চাইল। মনে হচ্ছে, ও যেন গম্ভীরভাবে বইয়ের পড়া বলছে। তবু একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল সুমিতা, আমাদের দেশের গান মানে ?

বিনয় তেমনি গম্ভীর গলায় বলল, আমাদের দেশ, মানে, এই দেশ, এই বাংলা। অর্থাৎ ভারতবর্ষ।

বিনয়ের সমস্ত কথার মধ্যেই কেমন একটু বালকের আড়ষ্টতা। কথা বলে চারদিকে তাকিয়ে, আবার বলল, চল বাইরে যাবে ?

সবটাই কেমন ছেলেমানুষিতে ভরা। কিন্তু, ভাল লাগছে বিনয়কে। মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝল, বড় অস্বস্তিবোধ করছে ও। সুমিতার কথা বলবার আগেই এমনভাবে বাইরে যাওয়ার কথা বলল যে, না গেলেও কিছুতেই মুখ খুলতে পারছেনা। সুমিতার চোখের উপর দিয়ে চকিতে ভেসে গেল বাবা আর মেজদির মুখ। লজ্জার সঙ্গে একটু ভয়ও যে না ছিল, তা নয়। তবু দাঁড়িয়ে উঠে বলল, বসো, আমি জামাকাপড় পরে আসি।

ভিতরে এসে দেখল, মেজদি বাইরে বেরুবার জন্যে তৈরী হয়ে খাবার টেবিলে বসে চা খাচ্ছে বাবার সঙ্গে। ওদিকে এক ঝলক দেখে, ফিরতে গিয়ে হঠাৎ সুমিতার মনটা যেন ফিক্‌ ব্যথায় আড়ষ্ট হয়ে গেল। বাবাকে ছেড়ে ও যাবে কেমন করে ? বড়দি বেরিয়ে গেছে সেই বেলা তিনটের সময়। মেজদিও বেরুবে। বাবা বসে থাকবেন একলাটি।

সুমিতা তো জানে, বড়দি মেজদির কাছে থাকার জন্যে বাবা কেমন লালায়িত হয়ে থাকেন। যখন দু'জনেই চলে যায়, তখন নজর পড়ে রুমনির দিকে। ওকে কাছে ডেকে নিয়ে, দু' এক কথার পরেই ঘুরে ফিরে আসে সেই বড়দি মেজদির কথা। মেজদির চেয়েও বড়দির-ই বেশী। তার মাঝে যদি এসে পড়েন রবিদা, বাবা যেন স্বর্গ পান হাতে। অথচ দু'জনের কেউ-ই যে খুব বেশী কথা বলেন, তা নয়। যা-ও বা বলেন, সেগুলি রবিদার রাজনীতির কথাই অধিকাংশ। বাবা সেসব কথা শোনেন এক শিশুর বিস্ময় নিয়ে। নিজেই বলেন, আশ্চর্য রবি, আমার জন্ম বটে কলকাতায়, কিন্তু এ দেশের আমি কিছুই প্রায় জানিনে।

আর কখনো কখনো আসেন তাপসীর বাবা, রিটায়ার্ড ডেপুটি।

হয়তো সব শেষে বাবার মনে পড়বে সুমিতাকে। কিন্তু এই সব-শেষের জন্যে ও নিজেও থাকে উন্মুখ হয়ে। কেমন করে যাবে বাড়ি ছেড়ে।

কিন্তু বিনয়কে বসিয়ে রেখে এসেছে বাইরের ঘরে। এখন যদি গিয়ে বলে, যাবনা, তবে কী ভাববে ও। ভাববে, আমাকে বুঝি বাড়ি থেকে বেরুতে দিতে চায়নি। ছি ছি, সে যে বড় বিশ্রী।

এই দোটানার মাঝে, সুমিতা জামাকাপড় বদলে নিল। দু' পাশের এলায়িত বিহুনি দু'টি খুলে খোঁপা বাঁধতে গিয়েও থেমে গেল। আর সেই

মুহূর্তে আয়নার দিকে তাকিয়ে মনে হল, বিনয়ের চেয়ে ও অনেক, অনেক বড়।

জামাকাপড় পরে বেরিয়ে আসতেই শোবার ঘরে মুখোমুখি হল মেজদির সঙ্গে। একটু অবাক হয়ে বলল, কোথায় যাচ্ছিস্ ?

ঈষৎ রক্তাভা দেখা দিল সুমিতার মুখে। বলল, একটু বেরুব।

মেজদি বিস্মিত নিরাশার সুরে বলল, ও!

সুমিতার সবচেয়ে বড় লজ্জা, মেজদি না জানি কি ভাবছে। বলল, কিছু বলছ মেজদি ?

মেজদি চিন্তিতভাবে বলল, মৃণালের আসার কথা ছিল একবার।

সুমিতা সহজভাবে বলল, কিছু বলতে হবে ?

মেজদি ঠিক বিরক্ত নয়, একটু অস্বস্তির সঙ্গে বলল, না, তুই যা আমি মৃণালের বাড়ি হয়েই যাব একেবারে।

বলে বেরিয়ে গেল। সবদিক থেকেই সুমিতার চারপাশের সর্পিল ও কঠিন সংসারের মাঝে খেলার মাধুর্যটুকু ম্লান হয়ে এল। এক মুহূর্তের জন্যে বিনয়ের কথাও গেল ভুলে।

নিজের মনের সবটুকু সুমিতা আজো বুদ্ধি দিয়ে অনুভব করতে পারছে না। জানেনা, নিজের জীবনকে কোন্ প্রান্তরে, কোন্ বেড়ায় দিয়েছে লতিয়ে। জীবনের আঁকাবাঁকা সর্পিল শিকড়খানি বিস্তৃত হয়েছে কোন্ গভীরতর প্রদেশে। সেখানে আর যাই হোক্, বিনয়কে দেখতে পাচ্ছেনা ও। কয়েক মুহূর্তের জন্যে ওর চারপাশে ভিড় করে এল অন্য জগৎ। কিন্তু সুমিতার এ বয়সের একটি দাবী আছে। সে দাবী ওর 'প্রাক্' মধ্যাহ্নের সকালবেলার চঞ্চলতা।

নিজেকে ঠেলে নিয়ে এসে দাঁড় করালে বাবার কাছে। বাবা বললেন, কোথায় যাচ্ছ রুমনো সাহেবা ?

সুমিতা বলল, আমি একটু বিনয়ের সঙ্গে বেরুচ্ছি।

বিনয় ? অবাক হয়ে বললেন মহীতোষ, সে আবার কে ?

: আমাদের সঙ্গে পড়ে। যাব বাবা ?

মহীতোষ যেন চিন্তিত অনুসন্ধিৎসু চোখে কয়েক নিমেষ দেখলেন সুমিতার মুখের দিকে। পরমুহূর্তেই প্রসন্ন হেসে বললেন, যাও, ঘুরে এস।

সুমিতা করুণ চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার বড় একলা একলা কাটবে বাবা।

মহীতোষের বুকের মধ্যে কতখানি টনটন করে উঠল, সেকথা জানে না সুমিতা। খালি দেখল, বাবার সেই ব্যথাচাপা হাসিটুকু। বললেন, বেশ তো, তুমি কাছে পিঠেই বেড়িয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে এস, কেমন ?

ঘাড় কাত করে চলে গেল সুমিতা। বিনয় ততক্ষণে আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে প্রায়। সুমিতাকে দেখেই, বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠে দাঁড়িয়ে বলল, যাবে ?

সুমিতা বলল, তবে ?

মাথা নিচু করে বিনয় বেরিয়ে পড়ল তাড়াতাড়ি। রাস্তায় পড়তেই খই ফুটতে লাগল বিনয়ের মুখ দিয়ে। বলল, পরশু দিনই তো পরীক্ষার রেজাল্ট আউট হবে। ফেল করব নিশ্চয়ই। মাকে বলে রেখেছি, পড়াশুনো আমার হবেনা। আমি গান নিয়েই থাকব।

যেন একটি শিশু বলছে, আমি শুধু খেলা নিয়ে থাকব। কত যে বক্ বক্ করতে লাগল বিনয়, সব কথার খেই ধরাও সম্ভব হল না সুমিতার পক্ষে। খানিকটা এসেই একটা পার্কের এক কোণে বসে পড়ল দু'জনে। তখনো কথা বলেই চলেছে বিনয়, জানো, আমি বীরভূমে ঘুরে এলুম সাতদিন।

: কেন ?

: গান সংগ্রহ করতে গেছলুম। বাউল গান। রাজেনদা আমাকে বলেছেন—

রাজেনদা ? চমকে উঠল যেন সুমিতা। কোন্ রাজেনদা ?

বিনয় অবাক হয়ে বলল, আমাদের রাজেনদা, মানে, সুগতাদি, রাজেনদা, মৃণালদা—

বুঝেছে, বুঝেছে সুমিতা ; সেই মুহূর্তেই ওর মনে একটু সন্দেহ হল, মেজদি আর রাজেনদা আর মৃণালদাকে নিয়ে বোধহয় আজকাল আলোচনা হচ্ছে ছাত্রমহলে। হয়তো অনেকদিন থেকেই হচ্ছে। হিরণ্ময়ের সঙ্গে কথার ফাঁকে এ সন্দেহ পূর্বেও হয়েছে সুমিতার।

রাজেনদার কথা ওকে বেশী উৎসুক করে তুলল। বলল, কি বলেছেন রাজেনদা ?

বিনয় যেন ভক্তিতে কেমন গদ্‌গদ্ হয়ে উঠল। বলল, আমি রাজেনদাকে সব বলেছি, কি আমি চাই, কি আমি করব। রাজেনদা আমাকে বললেন,

দেখ বিনয়, আমি নিজে গান গাইনে, শুনতে ভালবাসি। এক সময়ে এসব বিষয় নিয়ে কিছু পড়াশুনো করেছি। তাতে বুঝেছি, ওটি একটি সাধনার বিষয়বস্তু। তুমি সম্পন্ন ঘরের ছেলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, গানের নামে এরা শেষ পর্যন্ত বদখেয়ালী হয়ে যায়। শিখতে চাও শেখ। আমায় যখন বলছ, তখন আমি সব সময়েই বলব, যদি ভালবাস, পবিত্রভাবে নিতে পার, তবে এ বৃত্তি নাও। আর ভালবাসা পবিত্রতা, এ-সব কোনকিছু দিয়েই লোকের কাছে প্রমাণ করা যায় না। ওটা তোমার নিজের মনের অনুভূতির বিষয়।

ঠিক যেন মুখস্থ বলছে বিনয়। রাজেনদাকে সুমিতা চেনে, কিন্তু জানেনা। বিস্মিত কৌতূহলে কথাগুলি শুনছিল। কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল, ওদের দু'জনের কেউ-ই রাজেনের কথার মর্ম উপলব্ধি করতে পারছে না। বিনয় আবার বলল, আমি বললুম, রাজেনদা, আমি খুব সীরিয়াস্‌লি এ পথে আসতে চাই। রাজেনদা বললেন, 'বেশ তো, তবে দেখো ভাই, এদেশে অনেক গান পাগলা ছেলের ভিড়। ওই পাগলামির বিড়ম্বনাটা আর বাড়াতে যেও না। আর গানের পথে যাওয়াটা 'কিন্তু ঘরে বসে পড়া মুখস্থ করা নয়। হা হা করে গলা সাধলেই গান হয় বলে আমার মনে হয় না।' বললেন, 'কিছু বুঝতে হয়। অতুলচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, এঁদের যোগাযোগ ছিল এদেশের মাটির সঙ্গে। ভালবাসতেন এদেশের ধূলিকণাটিকেও। দেশের মর্মোপলব্ধি যার হয়না, চারটে রেকর্ডের পুরনো ভাঙ্গা শব্দতেই সে দু'দিনে শেষ হয়ে যায়। সে বড় বিশ্রী! যার মূল নেই, তার আগাও নেই। এই যে কীর্তন বাউল, এগুলো শুধু সম্প্রদায়ের গান নয়। এর মধ্যে যে তত্ত্ব আর আবেগের মিলন হয়েছে, সেটুকু এদেশের মানুষের অন্তর্নিহিত মনের রস দিয়ে তৈরী হয়েছে। ওসব আর ভক্তির ডোরে বাঁধা নেই। এগুলো আমাদের স্বদেশের। ক্লাসিকও তাই। অনেকে বলে, ক্লাসিকে যেমন বুদ্ধির গতি আছে, বাউল কীর্তনে তা নেই। আমার মনে হয়, একথা ভুল। বুদ্ধি এতে খুব আছে, না হলে তত্ত্বের বুলিকে কেউ অমন আবেগের সুরে ঢেলে দিতে পারে! অবশ্য এইটুকুই সব নয়। এইটুকু বললুম, তোমার আপন সত্তাকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যে। যদি এপথে আসতে ইচ্ছে হয়, এসব বোধহয় তোমাকে ভাবতে হবে। বাঙ্গালীর পুরনো জাত্যভিমান যেমন ভাল নয়, শুধু ইঙ্গ-বঙ্গগিরি তার চেয়ে বেশী অসহ্য। দেশের এই অন্তর্নিহিত মন-সন্ধানের দায়টা

তোমার বিবেকের। সেই বিবেকটার কথাই বললুম, তাকে কোন্‌দিকে চালাবে, সেটা এখন তুমিই জান। কিন্তু খবরদার, তোমার গানের বিষয় নিয়ে আমি এসব বলেছি, তা যেন আর কাউকে বলো না। জিজ্ঞেস করলে তাই বললুম।'

বিনয় থামল। কিন্তু সুমিতার বিস্মিত শ্রদ্ধাভরা বুকে এক বিচিত্র আলো-ছায়ার খেলা। কী যেন বুঝতে চাইছে এ কথাগুলি থেকে, বুঝতে পারছে না।

পরমুহূর্তেই ওর বুকের মধ্যে এক ছোট মেয়ে নেচে উঠল করতালি দিয়ে। ভাবল, রাজেনদা তো আমাদেরই ঘরের মানুষ হবে। মেজদি নিশ্চয়ই রাজেনদাকে বিয়ে করবে। নিশ্চয় নিশ্চয়! মেজদি যেমন মেয়ে, তার সঙ্গে রাজেনদাই উপযুক্ত। একবার ভেবেও দেখল না, শুধুমাত্র একজনের মুখের দু'টি কথা শুনে, তাকে ও মেজদির স্বামীরূপে চিন্তা করতে আরম্ভ করেছে।

আবার হিংসে হতে লাগল বিনয়কে। যে মানুষ ওর আপনজনের এত ঘনিষ্ট, তাকে সুমিতার চেয়ে বেশী চিনে নিয়েছে বিনয়। কিন্তু সেদিন কি খুব বেশী দূরে, যেদিন ও অনেক বেশী জেনে নিয়ে শোধ তুলবে বিনয়ের উপর? এ সংসারে পুরুষদের মধ্যে বাবাকে ছাড়া, রবিদা ওর মনের কথার মানুষ। সেই রবিদার পাশে রাজেনদাকে দাঁড় করিয়ে দিলে।

তারপরে হঠাৎ সুমিতা ঠোঁট টিপে হেসে বলল, কিন্তু রাজেনদা বলতে বারণ করেছেন, তুমি বলে ফেললে যে?

বিনয় এতক্ষণ ছাত্রের মত কথা বলেছে। এবার লজ্জিত কিশোরের মত বলল, তোমাকে ছাড়া তো কাউকে বলিনি। বলার জন্যেই তো এসেছিলাম। কিন্তু বীরভূমে গিয়ে আমার কিছু হল না। প্রথমে গিয়ে শিউড়িতে—

সেকথা শুনল না সুমিতা। জিজ্ঞেস করল, তুমি রাজেনদার কথা সব বুঝেছ?

ওর বিস্মিত কৌতূহল দেখে লজ্জা পেল বিনয়। বলল, না।

: তবে এত কথা মনে রাখলে কি করে।

ভীষণ বেকায়দায় পড়ে গেল বিনয়। ভাবেনি, এমন প্রশ্ন আবার কেউ করতে পারে।

অসহায় বিস্ময়ে বলল, কী জানি!

সুমিতা এক নিমেষ বিনয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, তবে তুমি যে বলছ পরীক্ষায় নিশ্চয়ই ফেল করবে ?

: কেন ?

: যার এত মুখস্থ হয়, সে বুঝি ফেল করে ?

: না, সেজন্যে নয়।

: তবে ?

বিনয় মাথা নীচু করে বলল, তোমাকে বলব বলে মুখস্থ করে ফেলেছিলুম।

উদ্গত হাসিটা কিছুতেই চাপতে পারল না সুমিতা। বিনয়ও হাসল। পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠল ওদের, সব সঙ্কোচ কাটিয়ে রাজেনদার কথা-গুলিই যেন কাছাকাছি করে দিলে দু'জনকে।

ইতিমধ্যে আলো জ্বলে উঠেছে রাস্তায়। পথে ভিড় বেড়েছে, পার্কে জমছে গুচ্ছ গুচ্ছ নরনারীর জটলা। সারাদিনের দাবদাহের পর সবাইকে ঘর খালি করে বার করে নিয়ে এসেছে দক্ষিণা বাতাস। কুলপী বরফ আর বাদাম-ভাজাওয়ালারাও ছুটে এসেছে, সন্ধ্যার সঙ্গী হয়ে।

ওদের দু'জনের গায়ে পড়েছে রাস্তার আলোর একটু রেশ। সুমিতা লক্ষ্য করছিল, এই অস্পষ্ট আলোয় কেউ কেউ বিস্মিত-মুগ্ধ চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে যাচ্ছে ওকে। কিছু অনুসন্ধিৎসাও আছে সেই চোখগুলিতে। সুমিতার ঠোঁটের কোণ দু'টি কেঁপে কেঁপে উঠছে। ওর সেই প্রাক্‌মধ্যাহ্নের বাঁকা ছায়ার খেলা এইটি। এই চাউনি দেখলে, বাইরে বিব্রতবোধ করে। ভিতরে একটি দুর্বোধ্য খুশির হাসি কিছুতেই চেপে রাখতে পারে না।

মুখ ফেরাতেই চোখোচোখি হল বিনয়ের সঙ্গে। বিনয় ওই পার্কচারীদের মতই বিস্মিত-মুগ্ধ চোখে তাকিয়েছিল। সেখানে কোন কৌশল নেই, প্রচেষ্টা নেই চেপে রাখবার। সুমিতার চোখের সামনে এখন সারা বিশ্বটা-ই এমনি বিস্মিত-মুগ্ধ। আর ও সেই বিশ্বের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সলজ্জ হাসি নিয়ে।

বলল, চল, যাওয়া যাক।

চমক ভাঙল বিনয়ের। বলল, হ্যাঁ, চল।

উঠল দু'জনেই, তবু সুমিতার মনে হল, কী যেন বলা হল না বিনয়ের। রাস্তার মোড়ের কাছে এসে থামল দু'জনেই। সুমিতা বলল, আবার এস একদিন।

সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল বিনয়, কবে?

সুমিতা বলল, যেদিন তোমার খুশি। তা' ছাড়া এবার তো কলেজেই দেখা হবে।

আর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে, ঘাড় নেড়ে চলে গেল বিনয়।

গেটের কাছে এসে অবাক হয়ে দেখল সুমিতা, সারা বাড়িটা অন্ধকার। বারান্দায় আলো নেই। ঘরের জানালাও অন্ধকার। কেউ বাড়ি নেই নাকি?

গেট পার হয়ে বারান্দায় উঠে ঘরের দিকে পা বাড়াতে যাবে। ডাক শুনতে পেল, রুমনো এলি?

চমকে ফিরে দেখল, বারান্দার এক কোণে বাবা একলা বসে আছেন ইজিচেয়ারে। সামনে টি-পয়ের উপরে শূন্য কাপ। সুমিতা কাছে গিয়ে বলল, হ্যাঁ বাবা।

বাবা ওকে টেনে নিলেন কাছে। ইজিচেয়ারের হাতলের উপরে বাবার গা ঘেঁষে বসল সুমিতা। কী যে ছিল বাবার এই কাছে টেনে নেওয়ার মধ্যে। সুমিতার বুক ঠেলে কান্না উঠতে লাগল। জিজ্ঞেস করল, বাবা, কেউ আসেনি বাড়িতে?

বাবা বললেন সস্নেহ হেসে, এই যে তুমি এসেছ রুমনো সাহেবা। তোমার বন্ধু চলে গেছে?

: হ্যাঁ।

: কদ্দুর গেছলে?

: এই সামনের পার্কে বসেছিলুম।

কিন্তু, এসব কথাতেও সুমিতার মন প্রবোধ মানল না। ওর বুকের মধ্যে আবর্তিত হয়ে কী একটি কথা উঠে আসতে চাইছে বারবার! কিন্তু সাহসে কুলোচ্ছে না। সেই অদৃশ্য ছোট লতাটির ভয় লেগে রয়েছে মনে। তবু, ওর রক্তের মধ্যে তোলপাড় করে উঠল। নিজেরই অজান্তে ডাক দিয়ে বসল, বাবা।

: বল রুমনো।

এ যেন খাদের কিনারায় এসে টলোমলো ভাব। পতনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারল নিজেকে সুমিতা। বলল, বাবা, বড়দির জন্যে তোমার বড় কষ্ট।

মহীতোষ সুমিতার পিঠে হাত রেখে বললেন, তোমাদের সকলের জন্তেই আমার কষ্ট হয়।

: তুমি বড়দিকে কিছু বল না কেন?

: কী বলব বল। সে কতবড় আঘাত পেয়েছে তার জীবনে। তুই এখন হয়তো সব বুঝবিনে। উমনো যে কিছুই স্থির করতে পারছে না, কী করবে ও? সেই তো আমার ভয়, ও কী করবে? ও যে আমাকে কিছুই বলে না।

বলে অনেকক্ষণ চুপচাপ রইল ছু'জনেই। তারপর আবার বললেন মহীতোষ, তোমরা সবাই বড় হয়ে যাচ্ছ। এখন ভাবি রুমনো সাহেবা, তোমাদের প্রতি আমার যা কর্তব্য ছিল, ঠিক করেছি কিনা। খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখা শুধু নয়, তোমরা জীবনটাকে ঠিক গড়তে পেরেছ কিনা।

বলে এক মুহূর্ত নীরব থেকে আবার বললেন, এখন আমি শুধু চেয়ে চেয়ে দেখব, তোমরা সবাই কে কোন্ ধারায় চলেছ। তুমি, তোমার মেজদি, বড়দি। তোমাদের ছুঃখ দেখলে আমার লাগবে। কিন্তু বড় হয়ে যখন তোমাদের নিজেদের মতামত তৈরী হবে, তার উপরে তো আমি সব সময়ে কথা বলতে পারব না। কেবল তোমাদের বুঝতেই চেষ্টা করব।

সুমিতার চোখের জল বাধা মানল না। আবার লজ্জা করতেও লাগল, যদি এ কান্না বাবা টের পেয়ে যান। ভাবল, কেউ-ই জানে না, কে কোথায় চলেছে। ওদের তিন বোন, তিনদিকে চলেছে। নিজের কথাও যেমন সুমিতা জানে না, কোন্‌দিকে ওর গতি, তেমনি জানে না দিদিদের প্রবাহপথ।

(৯)

তারপর আবার অপেক্ষা।

ছোট্ট পরিবার, চারজন মানুষ। সকল কাজের মাঝেও সারাদিনে ছু'বার খাবার টেবিলে চারজনের দেখা হওয়াটা এ পরিবারের নিয়ম। সে নিয়মে ফাটল ধরেছে বেশ কিছুদিন ধরেই। দিনের বেলা যদিও বা দেখা হয়, রাত্রি বেলার ভাঙ্গা আসর তার শোধ তুলে নেয়। নিয়মটি আসলে নিয়ম নয়। খাবার টেবিলের সভা ছিল এ বাড়ির সব আনন্দ ছাপিয়ে ওঠা

নিত্য উৎসবের হিল্লোল। না ছিল তার সময়ের হিসেব, না বিষয়-বস্তুর অভাব। এখন বড়দি-ই এ আসরে অনুপস্থিত থাকে অধিকাংশ দিন। মাঝে মাঝে মেজদিও। কিন্তু চারজনের উপস্থিতি সত্ত্বেও উৎসবের সুরটি আর বাজে না তেমন করে। কথা হয়। একথা-সেকথা। তাও শোনা যায়। কিন্তু সুমিতা জানে, ওগুলি আসলে ছলনা।

এ বাড়ির কাছ থেকে একটু দূরে কর্পোরেশনের গ্যাসপোস্ট। সে আলো এসে পড়েনি কাছেপিঠে। পথচারীরা যেন কোন্ অদৃশ্যলোকের অধিবাসী। ছায়ার মত অস্পষ্ট মূর্তি চলাফেরা করছে। কোন্ বাড়িতে রেডিও বাজছে গাঁক গাঁক করে। যেন বাড়ি নয়, দোকানঘর। তবু এরই ফাঁকে শোনা যাচ্ছে ঝিল্লিরব। বাতাসে ছড়াচ্ছে স্বর্ণচাঁপার তীব্র গন্ধ। চাঁপার এ তীব্র গন্ধের মধ্যে কোথায় যেন লুকিয়ে থাকে একটু চাপা ব্যথা। কেন যে এমন হয়, তা জানে না সুমিতা। মনে হয়, সব ফুলের গন্ধেই বুকের মধ্যে কেমন একটু আশ্চর্য বেদনার আভাস থাকে মিশে।

হঠাৎ একটি গাড়ি এসে দাঁড়াল গেটের সামনে। গাড়ির দরজা খোলার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে-গলা শোনা গেল, না ভাই, আজ আর নয়। এমনিতেই রাত্রিবেলা ড্রাইভ করতে বড় ভয় লাগে। আর তুই তো এখন··· অস্পষ্ট হয়ে গেল গলার স্বর। তারপর একটু চাপা হাসির ওপ চানো ঝঙ্কার। আবার, টা-টা—

সুমিতা বলে উঠল চাপা গলায়, বাবা, অমলাদির গলা শোনা গেল। বড়দি এসেছে।

সুমিতার গলায় কৌতূহল ও ব্যাকুলতা। বাবাও যেন চমকে উঠে মুহূর্তের মধ্যে উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন, সেটুকু টের পেল না ও। মহীতোষ শান্তভাবে বললেন, হ্যাঁ। তুমি উঠে বারান্দার আলোটা জেলে দাও।

আলো জেলে দিতেই বড়দি চমকে তাকাল সুমিতার দিকে। কি এক ভাবনার ঘোরে যেন ও ধীরে ধীরে মাথা নীচু করে আসছিল। এক মুহূর্তের জন্যে অপ্রস্তুত ও বিব্রত হয়ে পড়ল বড়দি। বলল, কি করছিলি ওখানে?

বলতে বলতেই দৃষ্টি পড়ল বাবার দিকে। আর একবার চকিত লজ্জায় ও অস্বস্তিতে একটু ছায়া ঘনিয়ে এল সুজাতার মুখে।

সুমিতার জবাবের আগেই বাবা বলে উঠলেন, বসেছিলুম আমরা। আয়, আজ একটু তাড়াতাড়ি এসেছিস্।

বাবা সহজ হওয়ার চেষ্টা করেন, বড়দি পারে না কিছুতেই। অন্ধকারে লক্ষ্য পড়েনি আগে। বাবার ইজিচেয়ারের পাশে ছিল হাতীর পায়ের আসনটি। বড়দি গিয়ে বসল সেখানে।

সেই যে বড়দি কোর্টে যাওয়ার দিন সাদা শাড়ি-ব্লাউজ পরেছিল, তারপর থেকে রঙ্গীন কিছু গায়ে ওঠেনি আজ পর্যন্ত। এটা চোখে ঠেকেছিল সকলেরই। কিন্তু বলেনি কিছু কেউ। যে জিজ্ঞেস করতে পারত সোজা-সুজি সেই মেজদিও কিছু বলেনি।

অথচ জোড়-মেলানো জামা-শাড়ির অভাব নেই। নিরঙ্কুশ শুভ্রতায় বড়দি কোন দিন খুশীও ছিল না। প্রচুর সাপ্তাহিক আর মাসিকে এখনো জবরজং হয়ে আছে ওর বেঁটে পুরনো আলমারিটা। সে সবই দেশী-বিদেশী জামাকাপড়ের হাল-ফ্যাশান, নতুন ডিজাইন, কলার কম্বিনেশন আর আধুনিক স্টাইলের ছবিতে ভরা। তার কাট-ছাঁট, তার আসল সৌন্দর্যের সিক্রেসী, (কিসের যে আবার সিক্রেসী আহা! একেবারেই জানে না বুঝি সুমিতা?) নিপুণভাবে আঁকাজোকা লেখা আছে ম্যাগাজিনগুলিতে।

কিন্তু সে সব রঙ্গীন জামাকাপড় হঠাৎ একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে বড়দি। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে অনেকদিন টের পেয়েছে সুমিতা, উনি দুঃখ পান। আর রবিদার বড়দি, যিনি বিধবা হয়েছেন, তাঁর মূর্তিটা বারবার ভেসে ওঠে কেন যেন সুমিতার চোখে। যদিও তিনি ঘুরিয়ে পরেন সাদা সিল্কের কিংবা সূতীর থান। বড়দি পরে পাড়জোড়া সাদা শাড়ি। তবু সেই চিরদিনের চেনা বড়দি বলেই কিসের একটি উদ্দেশ্যমূলক অসামঞ্জস্য বুকের মধ্যে ব্যথার চমক দেয়।

বাবা বললেন, অমলা এসেছিল বুঝি?

বড়দি হাতের ভ্যানিটি ব্যাগে নখ ঘষতে ঘষতে জবাব দিল, হ্যাঁ।

বাবা: ওকে ডেকে আনলিনে কেন? অনেক দিন আসেনি আমাদের বাড়িতে।

বড়দির মুখ ক্রমেই লাল হচ্ছে। সুমিতা জানে, বড়দি আর অমলাদির সম্পর্ক নিয়ে একটি ভীত-বিস্মিত প্রশ্ন প্রতিনিয়ত দাঁড়িয়ে আছে নিঃশব্দে। শুধু বাবা নয়, ব্যাপারটি মেজদি নিয়েছে আরো তীব্র সংশয়ান্বিতভাবে।

ওর কথা থেকেই টের পাওয়া গেছে, বিষয়টি এখন আর শুধু ঘরের নয়, বাইরের সকলেই, চেনা অচেনারাও নাকি কথা বলছে এই নিয়ে। আশ্চর্য বাইরের লোক! তারা কেন বলছে, কি বলছে, কিছু জানে না সুমিতা। শুধু শুনতে পাচ্ছে, স্ক্যাণ্ডাল! স্ক্যাণ্ডাল! কিসের স্ক্যাণ্ডাল, কে জানে।

সংসারে এত ভয়, এত সংশয়! বড় অল্পদিনের মধ্যে এই জগৎ তার বিচিত্রের দরজাগুলি একটি একটি করে খুলে দিচ্ছে সুমিতার চোখের সামনে। বোধ হয় এমনি হয়। যখন খোলে তখন পর পর খোলে অনেকগুলি। সেগুলি পার হয়ে মানুষ আবার দাঁড়ায় এসে নতুন দরজার সামনে।

বড়দি জবাব দিল বাবাকে, ওর একেবারে সময় নেই হাতে, তাই চলে গেল। সুমিতা বুঝতে পারছে, বাবা ছটফট করছেন অনেক কথা জিজ্ঞেস করবার জন্যে। কিন্তু বড়দি কেমন যেন নিরুৎসুক, নিরাসক্ত। বাবার ভয় করছে। সহজভাবে জিজ্ঞেস করে, কোথায় আবার বড়দির মনকে দেবেন আরো কঠিন করে, সেই ভয়। তবু বললেন, অমলার স্বামী ভাল আছেন?

বড়দি: হ্যাঁ।

সুমিতা দেখতে পাচ্ছে ওর দুরুদুরু বুক নিয়ে, বাবার হাত বারবার মুঠি পাকাচ্ছে আর খুলছে। বড় অসহায় মনে হচ্ছে বাবাকে। অথচ বড়দির কি সংক্ষিপ্ত নিরাসক্ত জবাব। তবু বাবা জিজ্ঞেস করলেন, শুনেছিলুম ওর স্বামীর ব্যবহার খুব ভাল নয়। এখন কেমন যাচ্ছে জানিস্?

বড়দি যেন খুব স্বাভাবিকভাবে হেসে বলল, কই, অমলাকে দেখে তো কিছুই বুঝতে পারিনে।

এমন সময় মেজদি ওর মস্ত বড় ব্যাগটি কাঁধে ঝুলিয়ে ঢুকল বাড়িতে। অমনি হাসি ও শঙ্কার একটি যুগপৎ আলোছায়া খেলে গেল বাবার মুখে। হাসিটুকু মেজদির আগমনে। শঙ্কাটুকু অমলাদির প্রসঙ্গ। বাবা যেন মেজদির সামনে সেটুকু চেপে রাখতে চান। এ প্রসঙ্গ উঠলে এখুনি কোন্ কথায় কোন্ কথা দাঁড়িয়ে যাবে। ভয় মেজদির জন্য নয়। বড়দি যদি ব্যথা পায়! বাবা বলে উঠলেন, আজ দেখছি সন্ধ্যাবেলাতেই ফুলহাউজ। বড়দির দিকে ফিরে বললেন, যা দু'জনে জামাকাপড় ছেড়ে নিগে যা।

মেজদি বড়দির দিকে তাকিয়ে বলল, বড়দিও এসে পড়েছ?

দু'জনে হাসল চোখোচোখি করে। দু'জনে এক সঙ্গে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বড়দি বলল, তুই বোধ হয় এবারো ফেল করবি ঝুমনো ?

মেজদি বলল, মাথা খারাপ তোমার !

বড়দির তরল গলা শোনা গেল, যা চড়কিবাজী চলছে তোর এখনো।

এমনি দু' চারটে কথাবার্তা হয় প্রায় নিত্যই। আর এখন পর্যন্ত সত্যি সন্ধ্যাবেলাও নয়। রাত্রি প্রায় আটটা বাজে। তবু এত শীঘ্র এমন করে ভরে উঠল বাড়িটি যে, লহমার মধ্যে একটি খুশির আবহাওয়া পড়ল ছড়িয়ে। বাবার মুখের হাসিটুকু হয়ে উঠেছে অনাবিল।

বাবা বলে উঠলেন, যাও রুমনো সাহেবা, তুমিও বাইরের জামাকাপড় ছেড়ে নাওগে। বিলাসকে বল খাবার দিতে।

খাবার টেবিলে বসে পুরনো কথা উঠতে লাগল। প্রবাসের বন্ধু-বান্ধবী, তাদের নানান গল্প। সুমিতা নিজেই এক ফাঁকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল রেডিওর বোতামটা। তারপর একে একে যে যার ঘরে চলে গেল শুতে।

সুমিতা ঘুমোতে পারছে না কিছুতেই। ও আজ কথা বলতে চায়। এখুনি বলতে চায়। মেজদির কাছেই বলতে চায়। ভয় ঠিক লাগছে না মেজদিকে। অভ্যাসের সঙ্কোচটা কাটিয়ে উঠতে পারছে না। ভিতরের লজ্জারুণ হাসিটুকু কাঁপছে ঠোঁটের কোণে। উস্‌খুস্‌ করছে শুয়ে-বসে। কখনো আঁচল কষছে কোমরে। গলায় ফাঁস কষছে বিনুনি টেনে।

মেজদি বইয়ে মুখ দিয়ে পড়ছে। ওরই টেবিল-লাইটের ঢাকনা ফুঁড়ে প্রদোষের অস্পষ্টতা ছড়িয়ে পড়েছে ঘরে। কিন্তু মেজদির মুখখানি দেখতে পাচ্ছে সুমিতা পরিষ্কার। মেজদি কি পড়ছে ? যেন মনে হচ্ছে, কিছু ভাবছে বইয়ের উপর ঝুঁকে। ভেবেছে হয়ত রুমনি ঘুমোচ্ছে কিংবা চোখ বুঁজে চেষ্টা করছে ঘুমোবার। এত উস্‌খুস্‌ একটুও টের পাচ্ছে না।

একটু টের পেয়েছে সুগতা, কিন্তু বিশেষ কিছু ভাবেনি। তারপর এক সময়ে জিজ্ঞেসও করল, কিরে রুমনি, ঘুমোচ্ছিস না ?

বুকের ভিতরে দুরুদুরু করে উঠল সুমিতার। বলল, না, ঘুম আসছে না।

মেজদি বইয়ের দিকে চোখ রেখেই বলল, দিনের বেলা ঘুম দিয়েছিস বুঝি কষে !

সুমিতা ভ্রু তুলে জবাব দিল, বা-রে ! তুমি তো এলে বেলা তিনটেয়। তখন কি আমি ঘুমোচ্ছিলুম ?

—তবে ?

তবে ? এইটুকুনি তো শুনতে চেয়েছিল সুমিতা। তবে ? তারপর… তারপর তো সুমিতার পালা। কিন্তু বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। একটি চরম প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে সুমিতা। ও কিছু জানতে চায় মেজদির কাছে থেকে। সেটা আসলে ওর অনধিকার এবং দুঃসাহসের বিষয়। সোজাসুজি নয়। মেজদির কাছে প্রসঙ্গটা উত্থাপন করতে চায় খালি। তার মাঝখান দিয়ে জেনে নিতে চায় মেজদির মন। আর মনের এই চাতুর্যটুকু বোধ হয় নিজেও জানে না। তা'হলে ভাবত, ছি! আমার সকলি গরল ভেল।

উপুড় হয়ে দ্রুত-স্পন্দিত বুক বালিশে চেপে বলল, জানো মেজদি, বিনয়টা এমন অদ্ভুত কথা বলে।

মেজদির চোখে একটি চকিত তীক্ষ্ণতা ঝিলিক দিয়ে উঠল। জিজ্ঞেস করল, কি বলে ?

সুমিতা যে মেজদিকে একটুও বোঝেনি তা জানে না। মেজদি যে ওর কথা ভেবেই অবাক হয়েছে তা বোঝেনি।

সুমিতা বলল, বিনয় বলছিল, ও গান শিখবে।

কিন্তু এর মধ্যে অদ্ভুত কি আছে, বুঝতে পারল না সুগতা। ওর ভ্রূ দু'টি কুঁচকে উঠল। সুমিতা আড়ষ্ট বোধ করছে। আসলে বিনয়ের কথা তো বলতে চায়নি। অদ্ভুত কথাগুলি রাজেনদার। মেজদি বলল, তাই নাকি ?

সুমিতা : হ্যাঁ। আর জান, রাজেনদার কথা বলছিল।

বলে মেজদির দিকে তাকাল। সুগতাও অবাক অনুসন্ধিৎসা নিয়ে বলল, রাজেনের কথা ? কি বলল ?

সুমিতা হঠাৎ উঠে বসে রাজেনদার কথাগুলি এলোমেলোভাবে বলতে লাগল। বিনয়ের মত সুমিতার মুখস্থ হয়নি। অর্থ বুঝলে নিজের মত করে বলা যায়। অর্থও বোঝেনি। কথার সঙ্গে কথার কোন মিল নেই, মানেও বোধ হয় হয় না।

তারপরে বলল, আমি রাজেনদার কথা ঠিক বুঝতে পারিনি মেজদি। কিন্তু বিনয়ের মুখ থেকে শুনে আমার এমন অদ্ভুত লাগল।

সহসা মেজদিকে কেমন একটু বিব্রত বোধ হল। রাত্রের অস্পষ্টতা না

থাকলে সুমিতা দেখতে পেত মেজদির মুখের রক্তাভা। রাজেনদার কথা যে ও কেন সহসা এমন করে মেজদির কাছেই পেড়ে বসেছে, সেইটি বুঝেই সুগতার এত লজ্জা। সুমিতা চোখ ফেরাল না মেজদির মুখ থেকে। ওই বিব্রত ভাবটাই যেন অনেকখানি নির্ভয় করে দিল সুমিতাকে। আবার বলল, আচ্ছা মেজদি, রাজেনদাকে দেখে কেমন রাগী লোক মনে হয়। বিনয়কে এতকথা কেমন করে বললেন ?

সুগতা বিস্মিত হেসে বলল, রাজেন রাগী লোক তোকে কে বললে ?

সুমিতা বলল সলজ্জ হেসে, কেউ বলেনি। আমি ভেবেছিলুম তাই।

আশঙ্কা ছিল সুমিতার, হয়তো এক কথায় ওকে নীরব করে দেবে মেজদি। কিন্তু রাশভারী মেজদির অন্তস্রোতের যে নির্ঝরিণীটার সন্ধান পেয়েছিল, তাকে এখন নানান ভঙ্গিতে বয়ে যেতে দেখল মেজদির চোখে-মুখে, হাসিতে, কথায়। মেজদির সঙ্গে দূরত্বটুকু দূর হয়ে গেছে। অনেক কাছাকাছি এখন দু'জনে।

বাতির ঢাকনার অস্পষ্ট আলোয় সুমিতার মত মেজদির চোখ দু'টিও চক্ চক্ করছে। দু'জনেই এখন সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে দু'জনকে। বাইরে নিঝুম হয়ে এসেছে শহর। ঝিল্লিস্বর তীব্র হয়েছে। যেন ওটা এই কলকোলাহলমুখর শহরের বিদেহী আত্মা। সুবিশাল এই নগরীর ভারে ও পেষণে তার অহর্নিশ ক্রন্দন দিনের কোলাহলে থাকে ঢাকা পড়ে। যত রাত্রি বাড়ে, ততই তার কান্না ওঠে সপ্তমে। দূর রাস্তায় মাঝে মাঝে ছুটন্ত গাড়ির শব্দ আসছে ভেসে। সুগতার চোখে-মুখে চমকাচ্ছে সকৌতুক হাসি। আবার বলল, কেন ও রকম ভাবলি ?

এবার লজ্জার পালা সুমিতারই। বলল, কি জানি! এমন গম্ভীর আর এমন একদৃষ্টে তাকান। কথাগুলো যেন কেমন করে বলেন।

সুগতা নিঃশব্দে হেসে উঠল ভারি মিষ্টি ভঙ্গিতে। বলল, সে বোধ হয় তুই ওকে কাজকর্মের সময় দেখেছিস। একদৃষ্টে ও কারুর দিকেই তাকায় না, চিন্তিত হলে রাজেনকে ওরকম মনে হয়। ও তো খুব হাসে।

বলতে বলতে এক মুহূর্তের জন্যে সুগতা যেন মনের কোন্ অতলে ডুবে গেল। তারপরেই যেন হঠাৎ বড় লজ্জা করে উঠল। বলল, নে রুমনি, হয়েছে, এবার শুয়ে পড়।

অমনি শুয়ে পড়ল সুমিতা। বালিশে-চাপা মুখের একপাশ থেকে ওর একটি চোখ তবু মেজদিকে নিরীক্ষণ করতে লাগল।

বাইরে ঝিঁঝির ডাক। ভিতরে কড়িতে ঝোলানো পাখা ঘোরার ফরফর শব্দ। সুমিতা দেখল মেজদির রুক্ষ চুল উড়ছে। গায়ের আঁচলটি অনেকখানি টেনে নামিয়েছে বাতাস। এখনো যেন টানছে একটু একটু করে। রাত্রের ঢিলে জামা বেশ খানিকটা ঝুলে পড়ে বুকের অন্তবাসের বাতাস-কাঁপুনিটুকুও দেখা যাচ্ছে। দেখছে, আস্তে আস্তে ছায়াঘন হয়ে উঠছে মেজদির মুখ। কিংবা ওর নিজেরই চোখে ঘনিয়ে আসছে ঘুমের ছায়া। কেন যেন মনে হতে লাগল সুমিতার, প্রকৃত ভালবাসা প্রত্যক্ষ করছে ও।

হঠাৎ মেজদি আবার ডাকল, রুমনি।

—বল।

—মৃণাল এসেছিল কি না সন্ধ্যায় শুনেছিস?

—না তো। বাবা তো কিছু বলেননি। সুমিতার চোখ দু'টি তখন সত্যি জুড়ে আসছে। কিন্তু মেজদির গলার স্বরে কেমন একটি দ্বৈত সুরের রেশ ওর কানে বাজতে লাগল। কেমন একটু আনমনা, অস্বস্তি, সংশয়ের সুর কথার মধ্যে।

কতক্ষণ কেটে গেছে জানে না সুমিতা। হঠাৎ পাশ ফিরতে গিয়ে চোখে লাগল আলোর রেশ। তাকিয়ে দেখল, বাতি জ্বলছে তেমনি। কিন্তু মেজদি নেই চেয়ারে। ঘাড় কাত করে দেখল, বাগানের দিকে জানালা খোলা। মেজদি দাঁড়িয়ে আছে সেখানে।

বাইরে দেখা যাচ্ছে সেই কতবেল গাছটি। বাইরে কি চাঁদের আলো উঠেছে! না কি রাত্রি গভীরে গ্যাসপোস্টের আলো আপনাকে ধীরে ধীরে বিস্তৃত করে দেয় রহস্যময়ীর মত। স্বর্ণচাঁপার গন্ধ তীব্রতর হয়ে উঠেছে। তীব্র সুখ ও তীব্র বেদনার গন্ধ।

মেজদি দাঁড়িয়ে আছে জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে। অবাক হল সুমিতা। কি করছে মেজদি ওখানে। ডাকতে গিয়েও চুপ করে গেল সুমিতা। একেবারে অকস্মাৎ ওর বুকের মধ্যে টন্‌টন্ করে উঠল। মনে হল, মেজদি যেন এক অশেষ বেদনার ছায়ামূর্তি। ওর রুদ্ধদ্বার হৃদয়ের ঝরনা কোথায় এক জায়গায় এসে ঘূর্ণিপাকে আবর্তিত হয়ে উঠছে।

সুমিতার মনে হল, পাশের ঘরে বড়দিও ঠিক এমনি করেই দাঁড়িয়ে আছে জানালার গরাদ ধরে। মনে হয়, কে আসে রাত্রি করে। মানুষ নয়, অদৃশ্য এক বিচিত্র আত্মা। নিশীথের সুপ্তিমগ্নতাকে ছিঁড়ে ফেলে মানুষকে জাগিয়ে ফেরাই তার কাজ। সে এ ঘরে, পাশের ঘরে, হয়তো বাবার ঘরেও ঘুরে ফিরছে। হয়তো বাবাও এমনি করেই দাঁড়িয়ে আছেন জানালায়। জীবনের বহু দুরান্তের পথ পার হয়ে এসে পথ ঠেকে গেছে এই সায়াহ্নে।

হঠাৎ সুমিতার মনে হল হয়তো তাপসীও জেগে আছে পাশের বাড়িতে। বাগবাজারে জেগে আছে হয়তো শিবানী। আশ্চর্য! বড় বিচিত্রভাবে গোটা কলকাতার নানা দৃশ্য ওর চোখে ভাসতে লাগল। পথের ভিক্ষুক থেকে প্রাসাদপুরীর সুখী মানুষের ছবি। মনে হল একটি কলকাতা ঘুমোয় আর অনেকগুলি কলকাতা জেগে থাকে।

জীবন যেন ক্রমেই বহুব্যাপ্ত, সুদূরবিস্তৃত হয়ে পড়ছে সুমিতার কাছে। তার শেষ নেই, সীমা নেই। শেষ পর্যন্ত সে দৃষ্টিও স্পর্শের অগোচরে কোন্ মহাদিগন্তে কুয়াশা ঢাকা রয়েছে অশেষ রূপ নিয়ে।

সুমিতার বিশ্বাস, মানুষ এই মহাজীবনের আদিগন্ত রাস্তাটি ধীরে ধীরে পার হয়ে যায়। ও নিজেও যাবে। মেজদি যাচ্ছে, বাবা, আর বড়দিও।

চোখে ওর অবোধ অশ্রুর ইশারা, অথচ ঘুম ঘুম অচেতন আমেজ। মেজদি যেন টের না পায়, এমনি নিঃসাড়ে নিজের বেণী দু'টি ঢাকা দিয়ে দিল চোখের ওপর।

(১০)

তিন দিন গেল না। নতুন ঘটনা ঘটে গেল।

বাইরের ঘরে বসে আনমনে খবরের কাগজ ওল্টাচ্ছিল সুমিতা। বেলা প্রায় দশটা। বাবা ওঁর নিজের ঘরে বসে একটি অফিশিয়াল পত্রের জবাব দিচ্ছিলেন। এতদিন বাদে আবার হঠাৎ কি প্রয়োজন পড়েছে, কতগুলি বিষয়ের অনুসন্ধান করছে গভর্নমেণ্ট। বাবার কাছে ফিরিস্তি চেয়ে পাঠিয়েছে। মেজদি বড়দি দু'জনেই বাড়িতে।

বাইরের ঘরে দরজায় খট্ খট্ শব্দে সুমিতা ফিরে তাকাল। দেখল পর্দার আড়ালে মুখ বাড়িয়েছে ডাকঘরের পিওন। কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, একটা রেজিস্টারি চিঠি আছে।

—কার নামে?

পিওন ভিতরে এসে চিঠিখানি বাড়িয়ে দিল সুমিতার হাতে। নাম দেখে একটু অবাক হল। বড়দির চিঠি, শ্রীমতী সুজাতা দেবী। কেয়ার অব্ মহীতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। রেজিস্ট্রি স্লিপটা ওল্‌টাইতেই ধক্ করে উঠল সুমিতার বুকের মধ্যে। গিরীনদার এটর্নী পাঠাচ্ছেন চিঠিখানি। পিওনকে বলল, একটু দাঁড়াও, সই করিয়ে নিয়ে আসছি।

পিওন গম্ভীর কোমল গলায় বলল, মা'জীকে সই করে দিয়ে যেতে বলুন এখানে। চোখে তার সসঙ্কোচ অসম্মতি রয়েছে চিঠি নিয়ে যাওয়ার।

চিঠি রেখে সুমিতা বড়দিকে ডেকে দিলে। তারপরে বাবার ঘরে গিয়ে চিঠির কথাটা না বলে পারল না।

বাবা এক মুহূর্ত চশমার ফাঁকে চেয়ে রইলেন চিন্তিতভাবে। তারপর হঠাৎ তাড়াতাড়ি উঠে বললেন, ও! এসেছে চিঠি? আচ্ছা—

বলে তাড়াতাড়ি পায়জামাটা একটু টেনে তুলে বাইরের ঘরে এলেন। সুমিতাও এসে দাঁড়াল দরজায়। বড়দি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছে খামের উপরের লেখাগুলি। সহসা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিয়েছে ওর মুখে। টানা চোখের তরল স্রোতে অদ্ভুত দীপ্তি ঝক্‌ঝক্ করছে। চিঠি থেকে দৃষ্টি গিয়ে আটকে পড়েছে মেঝের উপর। মুখে দেখা দিয়েছে রক্তাভা। ঠোঁটের দু' পাশ হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠেছে। চোখ তুলে তাকাতেই চোখোচোখি হল বাবার সঙ্গে।

নিমেষমাত্র বড়দিকে লজ্জিত মনে হল।

চিঠিখানি বাড়িয়ে দিল বাবার হাতে। বাবা দেখলেন। মনে হল, দেখা হয়ে গেছে, তবু দেখছেন। সকলেই চুপচাপ, কতগুলি অস্বস্তিকর মুহূর্ত।

বাবা বললেন, সই করে দাও উমনো।

আবার চোখোচোখি হল দু'জনের। লখনৌ সাদার ওপরে সাদা বুটি শাড়িটি বড়দির একেবারে বাঁয়ে সরে গেছে। তাতে যেন ওকে কেমন সুস্পষ্ট উদ্ধত মনে হচ্ছে। মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে বলল, তার কি দরকার আছে বাবা!

বাবাকে কেমন অপ্রতিভ করুণ মনে হচ্ছে। বললেন, দরকার আছে উমনো। আমাদের জানা দরকার, কিসের চিঠি এসেছে।

আর একবার চোখোচোখি হল পরস্পরের। বড়দির চোখে বিস্ময় ও বিতৃষ্ণা। বাবার চোখে অনুনয়। যেন জানে দু'জনেই, কী আছে চিঠিতে। বড়দি বলল, যা-ই থাকুক, আমার তাতে কোন প্রয়োজনই নেই। আমার বিশ্বাস, সমস্ত কিছুরই শেষ হয়ে গেছে, আর কোন লেখালেখির দরকার নেই। জের টানলেই টানাটানি হবে। তাতে আমি আর কিছুতেই রাজী নই বাবা।

বড়দিকে কেমন শক্ত নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে। বাঁ হাতের ওপর দিয়ে এলিয়ে পড়েছে আঁচল। মুখ ওর ক্রমেই যেন দপ্‌দপিয়ে উঠছে। কিন্তু বাবাকে ভীরু আর আহত দেখাচ্ছে। মুখের রেখাগুলি উঠছে কেঁপে কেঁপে। বললেন, জের না টানলেও এ চিঠি তোমার দেখা কর্তব্য উমনো।

—কর্তব্য ?

হ্যাঁ।

সুমিতার ভয় করছে। মেজদি এসে দাঁড়িয়েছে তখন দরজায়, সুমিতার পাশে। বড়দি আঁচলটি ঘাড়ের উপর তুলে দিয়ে ডেস্ক থেকে পেন্সিল নিয়ে সই করে দিল। পিওনটি যেন বাঁচল। পালাল রিসিট নিয়ে, সেলাম দিয়ে।

বড়দি উত্তেজিত হাতে চিঠি খুলতে খুলতে দ্রুত তীব্র অথচ চাপা গলায় বলতে লাগল, জানিনে তুমি কোন্ কর্তব্যের কথা বলছ। যেখানে আমার কোন কর্তব্যের লেশমাত্র নেই, সেখানে কেন তুমি কর্তব্যের কথা বলছ বুঝিনে। আমি জানি, কী এসেছে এই চিঠিতে—

বলতে বলতে খাম খুলেই বার করে একটি টাইপ-করা চিঠি। তার সঙ্গে পিন দিয়ে গাঁথা একটি বেয়ারার চেক। হাতের ওপর চলকে-পড়া বিছের মত সেগুলি ফেলে দিল বড়দি টেবিলের উপর। অপমানাহত ক্রোধরক্তিম মুখে, অসহ্য উত্তেজনায় পাশ ফিরে গিয়ে বসল সোফায়। বলল, আমি জানতুম, ও ছাড়া আর কিছু আসতে পারে না।

সুমিতা ভাবল, এসময়ে ওর এ ঘরের মধ্যে ঢোকা উচিত নয়। কিন্তু মেজদির সঙ্গে পায়ে পায়ে চলে এল ও টেবিলের কাছে। বাবা দেখছেন ঝুঁকে। মেজদিও দেখছে। সুমিতাও দেখল, ন'শো টাকার একখানি

চেক, রেভেনিউ স্ট্যাম্প লাগানো একটি রিসিভ লেটার। আর এটর্নীর চিঠিটার বাংলা মানে হল, সুজাতা দেবীর স্বামীর নিকট থেকে খোরপোষের টাকা তিন মাসের একসঙ্গে পাঠানো হচ্ছে।

সুমিতা দেখল, বাবা যেন অসহায়ভাবে গলায় শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করছেন। বললেন, উমনো এতে তো অনুচিত কিছু হয়নি। এ তোর অনধিকারের বিষয়ও নয়। কোর্টের জাজমেণ্ট তো উভয় পক্ষই মেনে চলতে বাধ্য।

বড়দি তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠল, আমি বাধ্য নই বাবা। কোর্টের জাজমেণ্ট আমার যতক্ষণ মেনে চলার চলেছি। এটা মানা না মানায় কোর্টের কোন হাত নেই।

বাবার গলা ক্রমেই ভারি ও ভীরু হয়ে আসছে। বললেন, তা ঠিক। উমনো, নেহাত রাগে আর আবেগে কিছু করে বসতে নেই বাবা! সসম্মানে বাঁচবার জন্যে ওটা তোর প্রয়োজন।

রুদ্ধ-অস্থির গলায় বলে উঠল বড়দি, না-না-না, বাবা। আইন আমাকে যা দিয়েছে, তা অনেক কম। আমাকে ত্রিশঙ্কু করে রেখেছে। আজকে যা এসেছে, সেটুকু আইনের ফাঁকে খানিকটা বাড়তি অপমান।

বলতে বলতে দু'হাতে মুখ ঢাকল বড়দি। বাবা গিয়ে বসলেন ওর পাশে। মেজদি একবার তাকাল সুমিতার দিকে। সুমিতার বেদনাবিহ্বল মন চমকে উঠল। ভাবল, বুঝি ওর উপস্থিতিটা ভ্রু দিয়ে বিঁধছে মেজদি। কিন্তু মেজদি সেই চিঠিটা তুলে নিল হাতে।

বাবা বড়দির পিঠে হাত বুলিয়ে সস্নেহ ভারি গলায় ডাকলেন, উমনো।

বড়দি কান্না-জড়ানো গলায় বলল, এ আমি নিতে পারব না বাবা। যার সঙ্গে আমার কোনই সম্পর্ক নেই, শুধুমাত্র আইনের সুযোগে তার এ অবহেলার দান আমি নিতে পারব না।

দুশ্চিন্তায়, ভয়ে ও ব্যথায় বাবা যেন কেমন হয়ে গেলেন এর মধ্যেই। আর একবার বললেন অনেক চেষ্টা করে, অবহেলা না হয়ে তার কর্তব্যবোধও হতে পারে উমনো।

তার এ কর্তব্যবোধে আমার কি যায়-আসে। তুমি কি একটুও বোঝ না বাবা, এ আমার বড় অপমান। রফা আমি চাইনি কারুর কাছে।

সুমিতার উত্তেজিত মন বার বার বড়দির কথাতেই সায় দিচ্ছিল। আর গিরীনদার সেই মুখখানি মনে করে তীব্র অভিমানে কান্না আসছিল ওর।

হঠাৎ মেজদি ডাকল, বাবা।

—বল্।

—থাক্। এটা বড়দির ওপরেই তুমি ছেড়ে দাও।

বাবা চশমাটি খুলে হাতে রেখেছিলেন। আবার চোখে পরে একবার মেজদির দিকে তাকালেন। কিসের এক গাঢ় ছায়ায় ঢেকে গেছে বাবার মুখ। লেন্সের আড়ালে বড় বড় চোখ দু'টির দৃষ্টি ঠিক মেজদির ওপরে নয়। কোথায় কোন্ সুদূর অন্ধকারে যেন কী খুঁজছেন। বললেন, আচ্ছা। তোমরা যা ভাল বুঝবে, তাই করবে। আমার কথায় যেন রাগ করো না। উঠে বললেন, আমি যাই, চিঠিগুলি সেরে ফেলি।

বাবা চলে গেলেন। তিন বোন রইল। কেউ কারুর দিকে তাকাতে পারছে না। বাতাসে উড়ছে দরজার পর্দাটা।

সুমিতার মনে হল, একটি ভূতুড়ে স্তব্ধতা নেমে এসেছে ঘরে। অস্পষ্ট, অর্থহীন তীক্ষ্ণ ব্যাকুল জিজ্ঞাসায় সেই স্তব্ধতা পাক খাচ্ছে। ওর সেই সুবৃহৎ জগৎ প্রতি পদক্ষেপে এত সর্পিল, চোরাবালি, ঘূর্ণাবর্তের আবর্তনে কম্পিত।

তিন বোন, তিনজনের সবটুকু জানে না। কিন্তু একই রক্তের বেদনা এ-সংসারে ওদের এখন একশা করে দিয়েছে।

বাতাস আসছে ঘরে। আর আসছে তার সঙ্গে উত্তাপ। হাল্কা গন্ধ ফুলের আর শহরের কংক্রীটে ঘা-খাওয়া-পাখা ভ্রমরের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে বাতাসে।

হঠাৎ মেজদি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে, গম্ভীর গলায় বললে, আমাদের কথাই সব নয়। তুমি একবার—একবার তোমার বিশেষ বন্ধু অমলাদির সঙ্গে আলাপ করে নিও।

বলে মেজদি বেরিয়ে গেল। সুমিতা দেখল, বড়দির মুখখানি আচমকা ভয়ে ও ব্যথায় পাংশু হয়ে উঠল।

(১১)

ঝড় এল।

তখনো বাগানের একপাশ জুড়ে সোনার আঁচলখানি বিছানো ছিল অস্তোন্মুখ সূর্যের। মরসুমের সংক্ষিপ্ত জীবনোত্তীর্ণ সারা বছরের মরসুমী

ফুলের গাছগুলি তখনো মুখ ঘষছিল সোনার আঁচলে। একহারা স্বর্ণচাঁপা গাছটি, পাঁচিলের বাইরে কতবেল গাছটি মাখামাখি হয়েছিল রক্তিম রোদে। পশ্চিমের বাড়িগুলির অপ্রশস্ত ফাঁকে ফাঁকে, একটু ছোট বাড়িগুলির শির পেরিয়ে, তখনো যত সুদীর্ঘ ছায়ার মেলা তত সুদীর্ঘ আলোর রেশ কাঁপছিল চিক্-চিক্ করে।

তখনো যেন রবিবারের বৈকালিক আনাগোনাটুকু পুরোপুরি ছড়িয়ে পড়েনি পথে-ঘাটে। সবে তার শুরু হয়েছিল। এ বাড়িরই দু' পাশের রাস্তায়, কোথাও চলছে দু'হু দু'হু। সদলে সপরিবারে কোথাও। প্যারাম্বুলেটার আর ট্রাইসাইকেলের পিছনে পিছনে ছুটেছে ঝি-আয়ারা।

তখনি এলেন তাপসীর বাবা এ বাড়িতে। রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মিত্র সাহেব। প্যাণ্টের সঙ্গে হলুদবর্ণের গলাবন্ধ কোট। লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এলেন তখনি। এরকম এসে থাকেন মাঝে মাঝে, বাবার সঙ্গে গল্প করার জন্যে।

সুমিতা তখন বেরিয়েছে বাথরুম থেকে। দেখে নিয়েছে একলহমায়। যা-হোক, সঙ্গী একজন জুটে গেছেন বাবার।

আজ সুমিতার মস্ত বড় ডাক রয়েছে বাইরে। কেউ ওকে হাত বাড়িয়ে ডাক দিয়ে যায়নি। বাইরের এক বিশাল সমারোহ যেন আজ কেমন এক বিচিত্র বেশে ডাক দিয়েছে। দক্ষিণ কলকাতায় আজ ছাত্রসমাবেশ। সমাবেশের কোনো একজন ডাক দেয়নি সুমিতাকে হাতছানি দিয়ে। মেজদি বেরিয়ে গেছে কখন, সেই দুপুরে, প্রায় বেলা বারোটার সময়। তখন থেকে ওর বুকের মধ্যে ব্যাকুল বাতাসের ঝড় লেগেছে। ওই সমাবেশের মধ্যে কোথায় একটুখানি যেন জায়গা রয়েছে ওর জন্যে। শুধু সুমিতারই জন্যে সে জায়গাটুকু। আর কেউ সেটুকু পারবে না ভরে দিতে।

কেমন করে যে কেটেছে সারাটি দুপুর। মাঝে মাঝে বুকের ব্যাকুল বাতাসে একটি অনড় নিশ্চল গুমোট আবহাওয়ার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। সেটুকু বাবার জন্যে। বাবা একলা থাকবেন, সেই ভাবনা। কিন্তু মনের গভীরে মাঝে মাঝে কেমন যেন একটি দুর্দৈবের আবির্ভাব ঘটে যায়। এ সেই দুর্দৈব। এর গতিপ্রকৃতি সবটাই এমন দুর্বিনীত যে, সে এই একটি বিকেলের জন্যে বাবাকে চাইলে না আমল দিতে। যদি সুমিতা ওর ওই ব্যাকুল বাতাসের

উল্টোদিকে মুখ করে কেঁদেও উঠত, তবু রেহাই ছিল না। যেতে হবে, যেতে হবে। ওই একটি কথা ভাসিয়ে নিয়ে গেছে সব।

আয়নার সামনে দাঁড়াবার আগে, বাগানের রোদটুকু চোখে পড়েছিল সুমিতার। বেণী দু'টো নিয়ে কী যে করবে ও। খোঁপা বাঁধল আজ সুমিতা। বাংলা খোঁপা। কাঁটার অভাব ছিল না, যদিও ওর নিজের একটিও নেই। তারপর কাপড় পরতে ঢুকল ছোট কুঠরিতে। মনে পড়ে গেল অনেকদিন আগের একটি কথা। এমনি এক বৈশাখের বিকালে, গিরীনদা বলেছিলেন বড়দিকে, কী পরবে? বাইরে বৈশাখের দাবদাহ, তার মাঝে হয় তুমি অগ্নিরূপিণী কৃষ্ণচূড়া হয়ে আমাদের আরো দগ্ধ করতে পার। অন্যথায় তাপদগ্ধ ব্যাকগ্রাউণ্ডে কাঁচা সবুজের মায়া ছড়িয়ে আমাদের প্রাণ একটু জুড়াতে পার। দু'টোই আমি প্রেফার করছি।

বড়দি বলেছিল, কাব্যি করার লোভে মিছে কথা বললে। যে জুড়োতে চায়, সে জ্বলতে চায় না। যে কোনো একটা। জুড়িয়ে দেওয়াটাই অধর্ম। আমি আগুনের বেশটাই নিলুম।

ছি! কেন যে এসব কথা মনে পড়ছে সুমিতার। কিন্তু অলক্ষিতের সমস্ত ছাত্রসমাবেশটি যেন ওর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে, অবাক মুগ্ধ চোখে দেখছে। এ ওর অভিসার নয়, তবু ব্যাকুলতার মধ্যে চাপা একটি লজ্জা থেকে থেকে কেমন অবশ করে দিচ্ছে। মনে করিয়ে দিচ্ছে নানান কথা।

বেছে নিয়ে পরল সুমিতা সবুজ রংএর শাড়ি। গাঢ় সবুজ ওর দীপ্তাঙ্গে লকলকে অরণ্যের মত যেন বন্য হয়ে উঠল। কোনো শান্তভাবের ছায়া তো পড়েনি ওকে ঘিরে। কী বিপদ! কেমন করে নিজকে ও আরো নিষ্প্রভ করে দেবে।

এদিকে সময় যায়। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল ছোট কুঠরি থেকে। ততক্ষণে বায়ু কোণ থেকে স্বয়ং বায়ু তার রথ দিয়েছে চালিয়ে। যেন সুমিতার কাপড় ছাড়তে যাওয়ারই অপেক্ষায় কোথায় আত্মগোপন করেছিল সে। সুযোগ পেয়ে ছুটে এসেছে দিগন্ত অন্ধকার করে।

সংশয়ে দুরু দুরু করে উঠল সুমিতার বুকের মধ্যে। বায়ুকোণের রুদ্র কিম্ভুত রথও দুরু দুরু করে এল ধেয়ে গগনে গগনে হেঁকে। তার চাবুক-কষা ঝিলিক হানল বিদ্যুতে বিদ্যুতে। সহসা সারা বাড়ির উন্মুক্ত দরজা-জানালা-গুলি দারুণ শব্দে আঘাত করল গরাদে চৌকাটে।

ছুটে এল বিলাস। ঝড় এসেছে।

সোনার আঁচল গেল কোথায় উড়ে। জঞ্জালে আর ধুলোয় দিল শহরের আকাশ ভরে। দিনের আলো হারিয়ে গেল অন্ধকারে। বাগানের গাছগুলি বুক মুখ চেপে পড়ল মাটিতে।

পথে পথে দৌড়োদৌড়ি, হল্লা হাঁক, সবকিছুতেই যেন ঝড়-উল্লাসের মাতন।

সঘন বজ্রপাত চোখ ধাঁধালো পলে পলে। স্বর্ণচাঁপার শিরে বিদ্যুৎ-কষার শিহরণ। পর্দাগুলি ফুলে উঠেছে পালের মত। বৃষ্টি এল বড় বড় ফোঁটায়।

এই ঘনঘোর অন্ধকারের সমারোহে মিশে গেল সুমিতার ঘন সবুজের সাজ। তুফান লাগল ওর ঘন অরণ্যের সাজে, বিদ্যুতের কষা বুকের খোলা কপাটে। সে কপাট ও দু' হাত দিয়ে বন্ধ করতে পারল না। আশাহত বিমূঢ় বিস্মিত ব্যথায় দেখতে লাগল এই প্রলয়ের খেলা। আর ভিতর দুয়ারের খোলা পাল্লা আছড়াতে লাগল আপন-মনে।

ফিরে দেখল, বড়দি স্থির অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে জানালার কাছে। মুখ দেখা যায় না। কিন্তু বাতাসে যেন কাঁপছে ওর সর্বাঙ্গ। এলোখোপার চুল উড়ছে, লুটিয়ে পড়ছে কাঁধে।

কিন্তু সুমিতার নিজের বুকে ঝড়। বাইরের প্রলয়টা যেন শুধু ওর জন্যেই। কী মেয়ে! ভাবছে, ছাত্রসমাবেশের সবকিছুই গেল ঘটে, আটকা পড়ে গেল নিজে। প্রলয়টা যে বাইরেও এসেছে, ছাত্রসমাবেশ থেকে এ রবিবারের ছুটির প্রাঙ্গণে, সেটুকু ভাবতেই পারছে না।

সহসা মনে হল, কে যেন আসছে বাইরের গেট ঠেলে। লোহার গেটের ঝনাৎকার শুনতে পেল যেন সুমিতা। ছুটে গেল বাইরের ঘরে।

কেউ আসেনি। মুখোমুখি বসে আছেন দুই বৃদ্ধ। বাইরের ঘরের দরজাটা অনেকখানি বারান্দার টালিশেডের মধ্যে। সেখানে বৃষ্টি আসার কোন সম্ভাবনা নেই, তাই খোলা রয়েছে। ছেঁড়া পালের মত আছড়ে উড়ে অস্থির হয়ে উঠেছে নীল পর্দাটি।

আবার তাকাল সুমিতা বাইরের দিকে। এ কী অবোধ ঝড় ওর বুকের মধ্যে। ও যেন শুনল, কে আসছে লোহার দরজা ঠেলে, বাইরের ঘরের দরজা খুলে। কাকে আসতে দেখল সুমিতা। কই, কোনো মুখ তো মনে

পড়ছে না। কোন চেনা মুখ, চোখ, চেনা পোশাক, কিছুই দেখেনি, কেবল একটি মূর্তি ছাড়া।

বৃষ্টির ছাট পশ্চিমে। পুবের বারান্দায় জল নেই। সেইখানে উঁকি দিয়ে দেখল সুমিতা, প্রচণ্ড বৃষ্টিধারা ঝরছে অসংখ্য ছুঁচের মত, ছুটে চলেছে রাস্তার উপর দিয়ে। বাতাসের ঝাপটায়, বিদ্যুতের ঝিলিকে, বজ্রের হুঙ্কারে, কে যেন ভয় দেখাচ্ছে সবাইকে, শাসাচ্ছে ক্রুদ্ধস্বরে। দেখল, রাস্তার ওধারে, দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে সেই কালো গরুটি। যাকে প্রতিদিন দেখতে পায় সুমিতা, ওদের বাগানের দরজার কাছে, জিভ বাড়িয়ে দিয়ে তাকিয়ে থাকে বিষণ্ণ চোখে। কতদিন মনে হয়েছে, টুক্ করে দরজাটি খুলে দিয়ে আসে। কিন্তু ভয়ে পারেনি। সভয় উদ্দীপ্ত চোখে জলের ঝাপটায় ভিজছে এখন জানোয়ারটা।

লোহার গেট বন্ধ। কেন তবে এমন মনে হল সুমিতার। তবে হয় তো কেউ আসবে আজ।

ঝড়ের নিশিতে পেল মেয়েটাকে। কে যেন আসবে এখুনি এ রুদ্র-তাণ্ডবকে মাথায় করে। ওর আছাড় খাওয়া কপাটে জমাট বেঁধে উঠতে লাগল অশ্রু। রুদ্ধকান্না ফুলতে লাগল ভিতরে ভিতরে। কে যেন আসবে।

বোধহয় ওধারের রাস্তার বেলগাছের একটি ডাল ভেঙ্গে পড়ল মড়মড় করে। বুকের ঝাড়ে লাগল সুমিতার প্রলয়ঙ্কর দাপাদাপি। চোখ ফেরাতে পারল না ঝড়ক্ষুব্ধ বৃষ্টিপ্লাবিত রাস্তা থেকে।

দরজার কাছে বারান্দায় রইল দাঁড়িয়ে। মাঝে মাঝে কোটি কোটি বৃষ্টিকণা নিয়ে এসে, হাওয়া উড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে সবুজ শাড়ি। বৈশাখের দাবদাহে শান্ত সবুজের মায়া ধরেছিল। এখন ঝড়ে উড়ছে। ওর আলুথালু-বেশিনী সবুজ দেহলতা বিকশিত হয়ে উঠছে আরো।

বাইরে এত ঝড়, সুমিতার বুকে ঝড়, আর ঘরের মধ্যে মুখোমুখি বসে দু'টি মানুষের মনে যে কিসের ঝড় লেগেছে, বুঝতে পারছে না সুমিতা। এ ঘরের সঙ্গে বাইরের কোন মিল খুঁজে পাচ্ছে না ও। দু'জনেই যেন বিস্মিত, বিমর্ষ। কেমন বিক্ষুব্ধ দেখাচ্ছে মাঝে মাঝে মিত্রসাহেবকে আর দু'জনেই বিড়বিড় করে কী সব বলছেন।

বাবাকে ছেলেমানুষ মনে হচ্ছে। যেন, কড়া মাস্টার-মশাইয়ের পাল্লায় পড়ে বিব্রত হয়ে পড়েছেন, ভয় পেয়েছেন। ভীরু চোখে তাকিয়ে আছেন

মিত্রসাহেবের দিকে। আর মিত্রসাহেবের সেই এক-ই কথা, এ দেশের লোক চাষাভুষো থেকে শুরু করে কেউ ভাল নয়। এদের কিছুই নেই, এদেশে নিজের ছেলেপিলে পর্যন্ত মানুষ করা যায় না। মিত্রসাহেব জানেন, মিত্রসাহেব অভিজ্ঞ, তাই মিত্রসাহেব ঘৃণা করেন সবকিছুকে, কেবল জপ, আহ্নিক আর তেত্রিশ কোটি দেবতা ছাড়া।

হঠাৎ চোখে পড়ল সামনের বাড়িটার আলসেয় এক ঝলক আলো। রোদ নয়, পশ্চিমের মেঘলা আকাশের ঝিলিক ওটা। তখনো সামান্য বৃষ্টি ঝরছে কিন্তু শুরু হয়েছে লোক চলাচল।

সুমিতার সমস্ত মন ভরে বাজতে লাগল একটি বিষণ্ণ রাগিণী। ঝড় ওর সবটুকু উচ্ছ্বাসকে নিয়ে গেছে উড়িয়ে। সন্ধ্যা নামছে। এবার বাতি জ্বলবে।

একবার সুমিতা ভাবতে চেষ্টা করল সেই সমাবেশের উৎসবের কথা। তারপর, যেন কার ওপরে ওর সমস্ত অভিমানে চোখ দু'টি দিল ভিজিয়ে। কী দুর্দৈব! কী বিচিত্র বিপর্যয়। কিন্তু যদি বা এল ঝড়, গেলও, তবু কেউ এল না। সবুজ শাড়ি নিয়ে ওকে হারিয়ে যেতে হবে এবার অন্ধকারে।

বাড়ির মধ্যে গেল ও বড়দির কাছে। এখানেও একটু বিস্মিত ব্যথার চমক ছিল। দেখল, বড়দি দাঁড়িয়ে রয়েছে পশ্চিমের জানালার কাছে। শুধু বাঁ দিকের গাল দেখা যাচ্ছে। চোখের কোণ থেকে গাল ভেসে টলমল করছে চোখের জল। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে পড়ল সুমিতা। ভাবল, ফিরে যাবে। কিন্তু সেখান থেকে ফিরেছে বিমুখ হয়ে। এখন ঘরে থাকতেও পারবে না আর।

এই ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় মুখ ফেরালে বড়দি। বলল, কে, রুমনি?

সুমিতা বলল, হ্যাঁ বড়দি। ঘরে আসছিলুম।

বড়দি মুখখানি ফিরিয়ে নিয়ে বলল, আয়।

সুমিতা পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়াল বড়দির কাছে। জানালা দিয়ে দেখল, সত্যি বেল গাছের একটি ডাল পড়েছে ভেঙে। সামনের একটি বাড়ির পুরো বারান্দাটির ডালপাতার পর্দা গেছে খসে।

সুমিতার ঠোঁট কাঁপছে। বড়দিকে জিজ্ঞেস করতে চাইছে কিছু। তার আগেই বড়দি জিজ্ঞেস করল, বেরুতে পারিসনি বুঝি।

—না বড়দি! তুমি বেরুলে না।

—পারলুম না।

সহসা বড়দির বুকের কাছে ঘেঁষে বলল সুমিতা, বড়দি তুমি কাঁদছিলে। বড় ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করেছে। কিন্তু বড়দি বললে যেন ভেজা গলায়, সুমিতার ঘাড়ে হাত রেখে; এক একসময় কিছুই ঠিক করতে পারিনে, তাই বড় কষ্ট হয়।

সুমিতার ঠোঁটের প্রান্তে ছুটে এল অনেক কথা। কিন্তু বলতে পারল না। একটু একটু করে নামছে অন্ধকার। মনে হল, সারা কলকাতাও যেন নির্বাক হয়ে গেছে এখন।

এমন সময় বাইরের ঘরে শোনা গেল অনেকগুলি গলার স্বর, পায়ের শব্দ।

মেজদির গলা শোনা গেল, বোস তোমরা, আমি আসছি। বলতে বলতেই উপস্থিত মেজদি। দেখেই বোঝা গেল, পুরো ঝড়টি গেছে মাথার উপর দিয়ে। এলো-কেশ ছড়ানো গালে কপালে। আঁচল টেনে জড়িয়েছে কোমরে। ওদিকে কাঁধের ব্যাগ, কাঁধ থেকে গড়াচ্ছে বেসামাল হয়ে। চোখে মুখে ধুলোর মাঝেও চমকাচ্ছে ভারি খুশির দীপ্তি। সচকিত খুশি গলায় বলল দম টেনে টেনে, তোরা এখানে? ও, বড়দি ভাই, একরাশ এসেছে আজ। রাজেন, মৃণাল, হিরণ্ময়—অনেক। সমাবেশ উড়িয়ে নিল ঝড়ে, এখন খিচুড়ি রেঁধে নাকি খাওয়াতে হবে আমাকে।

বড়দি খুশি হল কি না বোঝা গেল না। এগিয়ে এসে বলল, বেশতো।

সুমিতা ভাবছিল, ঝড় গেছে শান্ত হয়ে, সব গেছে ডুবে কোন বিষণ্ণতার পাথারে। লোহার গেট কাঁপছে ঝনঝনিয়ে। আশ্চর্য! মনের চাওয়ার সঙ্গে কোন মিল নেই এ সংসারের।

শুনতে পাচ্ছে সুমিতা, কাদের পদভারে কাঁপছে সারা বাড়িটি। গম্ গম্ করছে কাদের কলকণ্ঠে।

সুমিতা যেন সবকিছুই দেখছে এক বেদনাহত বিস্ময়ে। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে জমাট হচ্ছে রাতের কালিমা। বাতাস গেছে, উচ্ছ্বাস গেছে, ঝরে গেছে যা ঝরবার। শুনতে পাচ্ছিল ও, বাগানে তান ধরেছে ঝিঁঝিঁ। মন ভরে উঠেছিল এক আশ্চর্য স্নেহে ও ভালবাসায়—ছোট্ট রুমনির মন। বড়দিকে চাইছিল আদর করতে ছোট মেয়েটির মত।

সেই সময়ে কেঁপে উঠল সারা বাড়ি।

কাঁধ থেকে ব্যাগ নামিয়ে উঁচু স্বরে ডাকলে মেজদি, বিলাস!

জবাব এল, যাই মেজদি।

এও যেন জীবনের আর একটি দরজা খুলে গেল ওর সামনে। ঝড়ের সময় কাটে একলা কাল। যতক্ষণ সেই ঘোর-ঘন-ঘটা না যায়, ততক্ষণ আবির্ভাব ঘটে না আসলের। হতাশার ব্যথা তাতে লাগুক যতখানি, সত্য যখন আসে, তখন সে বোধ হয় আসে এমনি নির্বাক বিষণ্নতার ঘোরে। তবে কি ওর মন ভরে ছিল কৃত্রিম ঝড়ের দোলায়।

এদিকে সুগতা পড়েছে যেন মহা ভাবনায়। আজকের দিনটা বিলাসের হাতে রান্নার ভার ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু রাঁধতে গেলেও, সে-খাবার মুখে তোলা যাবে কি না, সে-বিষয়ে ওর ঘোর সংশয়।

শুধু কি তাই? সুমিতার মেজদি সে। কিন্তু ওর মাপ জোক করা গম্ভীর তাল যে কী পরিমাণ বে-তাল হয়ে গেছে, নিজেই কি জানে? দেখছে কি একবারো নিজের চোখ মুখ, ভাব ভঙ্গি? বে-তাল হয়েই সে বড়দির পরামর্শ চাইছে। এমন কি রুমনির পরামর্শও। কী করা যায় রাঁধবার। সেই 'সরল বাংলা রান্না প্রকরণ' বইটা দেখে দেখে তিন বোনে রান্নাটা সারলে কেমন হয়।

বাঁচিয়ে দিলেন এমন সময় বাবা এসে। সেই টাকা আসার ঘটনার পর থেকে বড়দির সঙ্গে প্রায় কোন কথাই বাবার হয়নি। বাবার চোখে-মুখে খুশির আভাস। কিন্তু সেই হেঁকে-ডেকে চলাফেরাটুকু নেই আর তেমন। বরং বাড়ির আজ এই হঠাৎ খুশির মেলায় ওঁকে একটু শান্তই মনে হচ্ছে। তবু মুখ দেখে বুঝতে পারছে সুমিতা, বাবার মনের সব দুশ্চিন্তা, আবিলতা ডুবে গেছে এখন। আজ পড়ে পাওয়া ষোল আনা পেয়ে গেছেন ঘরে বসে।

বাবা আগে দেখলেন বড়দিকে। বড়দির দিকেই তাকিয়ে বললেন কী বিপদ হল? সব শুনে, বেগতিক দেখলেন বাবাও। একটু চুপ করে থেকে বললেন, ঝুমনো, আমি বলছিলাম, আজকে বিলাসের উপরেই রান্নার দায়িত্বটা ছেড়ে দেওয়া যাক। তোমাদের অতিথিরা বসে থাকবেন একলা একলা, তোমরা থাকবে এদিকে, সেটা ঠিক হবে না। কি বল?

ঠিক সুমিতার মনের মত কথাটি যেন বলেছেন বাবা। বোধ হয়

সকলেরই। তবু একবার মেজদি বলল, বিলাসের উপর। কিন্তু যদি গণ্ডগোল হয়—

যদিও গণ্ডগোল কখনোই হয়নি এবং শেষ পর্যন্ত আরো দু'একবার এমনটিই হয়েছে। তবু বললেন বাবা, তা হতে দেবে কেন? বিলাসের উপর খবরদারির ভার তোমাদের তিনজনের। তা'ছাড়া খালি তো খিচুড়ি নয়, আনুষঙ্গিক আরো কিছু আছে নিশ্চয়। সেটা তো তোমাদেরই করতে হবে।

মেজদি আজ ওর পুরনো দিনের পিছনে গেছে ফিরে। কূল ভাসানো নির্ঝরিণী। কোন্‌দিকে গতি, অনুমান করা যাচ্ছে না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ভিতরের নির্ঝর এখন উপ্‌চে পড়েছে। কোমরে আঁচল বেঁধে বলল বাবাকে, ঠিক বলেছ।

বাবা একটু অসহায়ের মত করে বললেন, হ্যাঁ, দেরি করে ফেলো না। আর ওদিকটাও একটু সামলাও। মিত্র সাহেবের সঙ্গে তো রাজেনের এর মধ্যেই হয়ে গেল এক প্রস্থ।

রাজেনের সঙ্গে! তিন বোনই চমকে উঠল! মেজদি বলল, কেন কি হয়েছে?

—কিছুই নয় এমন। জানিস তো মিত্তিরসাহেব একটু অন্যরকম লোক। একটু তর্কবিতর্ক হয়েছে রাজনীতি নিয়ে।

মেজদি বলে উঠল, সেই ভাল। শুনে আমার বুকের মধ্যে ধুক ধুক করছে। ভাবলুম, রাজেন বুঝি রেগে মেগে চলেই গেল।

বলে ফেলেও মেজদির কী সঙ্কোচ। চট্‌ করে একবার বড়দিকে আড়চোখে দেখে, বিলাসকে ডেকে নিয়ে গেল শোবার ঘরে।

কিছুটা চঞ্চল্য এসেছে বড়দির স্থিরমগ্নতায়। সারাদিনের দলিত শিথিল কাপড়-চোপড় সামলাতে হচ্ছে ওঁকে।

মেজদি পাশের ঘর থেকেই বলল, রুমনি, তুই একটু বাইরের ঘরে যা।

বুকের মধ্যে ধক্‌ করে উঠল সুমিতার। ভয়ার্ত স্বরে বলল, কেন?

বোধ হয় চকিতে একবার মেজদির ঠোঁটের কোণে বিদ্যুতের ঝিলিক উঠল ঝলকে। সুমিতার নিজের মনেও হানল চকিত বিজলী। মুহূর্তে ও ভীরু চিৎকার করে উঠল, মেজদি, তুমি কিছু বলেছ বুঝি?

কিন্তু মেজদি তখন প্রায় ঘরের বাইরে। দরজার কাছ থেকে বলল, আশ্চর্য! বলব আবার কী। যেতে নেই বুঝি তোকে। দেরি করিসনে, যা।

অসহায় সুমিতা। এর ওপরে 'না' বলার ক্ষমতা নেই ওর। যদিও বা যেত সহজে, এখন পা' দু'টি অসাড় হয়ে গেছে। কী করবে ও। সংসারে কত মেয়ে প্রেম করে, তাদের একজন করে প্রেমিক থাকে। সেই মেয়েরা যায় অভিসারে।

সুমিতার প্রেম করা হয়ে ওঠেনি। গোটা কলকাতার যুবকদের আজকে সে তার প্রেমিকের জায়গায় বসিয়ে, অভিসারে যেতে চেয়েছিল সভার মাঝখানে। কিন্তু ঝড় এসে গেল। কী ভয়ংকর ঝড়। তারপর একেবারে স্তব্ধ।

বাইরের ঝড়েই ও থরথর করে কেঁপেছিল, প্রকৃতির স্তব্ধতার সঙ্গে স্তব্ধ হয়েছিল।

কিন্তু সেটা ভুল। ঝড়ের পরেও ঝড় আসে। বাইরের ঝড় যায়, ঘরের ঝড় আসে। এ-ও যেন সুমিতার সেই অভিসারে যাওয়ার মতই। তবে সে যাওয়া যে এত কঠিন, কে জানতো।

প্রথমে দৌড়ুল আবার বড়দির ঘরে, কাপড় বদলাতে। মরে গেলেও তো এই কাপড় পরে ওই ঘরে যেতে পারবে না আর কিছুতেই। অথচ আশ্চর্য! এই পরে যাচ্ছিল তখন সমাবেশের মাঝে।

বড়দি বলল, ও কী হচ্ছে? কোথায় যাচ্ছিস?

বলল, কাপড় বদলাব।

ভ্রু কুঁচকে বলল বড়দি, কেন? লোকজন এসেছে, কাপড় ছাড়ছিস কেন? ওই পরেই যা।

নিরুপায় সুমিতা। এ নির্দেশও অমান্য করার রাস্তা নেই ওর। এটা যে আবার সামাজিক রীতিনীতির মধ্যে পড়ে। এক চুল সরবার উপায় নেই।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল খাবার ঘরের দিকে। খাবার ঘরের আলো গিয়ে পড়েছে বাগানে বারান্দায়। বাতাসে ভেসে গেল যেন সুমিতা ওই দিকে। একটু দম নেবে। কেন এরকম হল, ও জানে না।

দাঁড়িয়ে পড়েছিল সুমিতা বারান্দার সিঁড়ির ওপরে। ঘরের আলো পড়েছে ওর গায়ে।

হঠাৎ কানে এল, এই, সুমিতা।

চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখল তাপসী ঝুঁকে পড়েছে ওদের দোতলার রান্নাঘরের ছোট্ট বারান্দাটিতে। ফিরতেই বলল, কী করছিসরে ওখানে দাঁড়িয়ে।

সহসা যেন কী ধরা পড়ে গেছে সুমিতার। ঢোক গিলে বলল, কিছু না তো।

সামান্য আলোতেও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, তাপসীর চোখ দু'টি যেন কিসের লোভে চক্ চক্ করছে। একটি বিচিত্র ইশারা ওর ঠোঁটে চোখে হাসিতে। বলল চাপা গলায়, না, কিছু নয়। আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারিসনি। তোদের বাড়িতে অনেক ছেলে এসেছে, না?

অবাক হয়ে বলল, হ্যাঁ।

তাপসী বলল, হিরণ্ময় বিনয়, ওরা সবাই এসেছে না?

প্রায় রুদ্ধশ্বাস হয়ে বলল সুমিতা, হ্যাঁ, তা' কি হয়েছে।

তাপসী তেমনি হেসে হেসে বলল, বুঝেছি, বুঝেছি।

তাপসীর 'বুঝেছি বুঝেছি' শুনে সুমিতার নিজের বুকের ভিতরেও দু'বার বিদ্যুৎ চমকিত হল। বলল, কী বুঝেছিস্?

চাপা গলায় প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে বলল তাপসী, বুঝেছি, যা তুই বুঝেছিস। তোর সাজ দেখেই বুঝেছি।

সুমিতা বলল, সাজ কোথায়। এতো আমি আগেই পরেছি।

চোখ ঘুরিয়ে বলল তাপসী, থাক্, আর মিছে কথা বলতে হবে না কিন্তু কার জন্যে পরেছিস বল্‌তো। বিনয় না হিরণ্ময়।

সুমিতার মনে হল, তাপসী যেন ওর ভিতরের কোন্ সুদূরের দরজাটা সত্যি খোলা পেয়েছে। এই সাজের মাঝে কোথায় যেন বিনয় হিরণ্ময়ও আত্মগোপন করেছিল। কিন্তু থতিয়ে গেল তাপসীর এমন সোজাসুজি জিজ্ঞাসায়। সহসা জবাব দিতে পারলে না।

তাপসী আবার বলল, বুঝেছি বুঝেছি। ওয়ান অব্ দেম্। তুই ভাই বেশ লাকী।

—লাকী?

—নয়? আমাদের বাড়ীতে ওসব নট্ অ্যালাউড।

—কী সব?

—ছেলেদের আড্ডা

তাপসীর কথার মধ্যে একটি লুব্ধ হতাশার সুর। একটু বেদনার আভাসও যেন অনুরণিত হল তার গলায়। সুমিতা বলল, তুই আসবি আমাদের বাড়িতে।

তাপসী বলল, নট্ অ্যালাউড।

বলে আবার হেসে উঠল চাপা গলায়। নট অ্যালাউড। তাপসীর জীবনের সঙ্গে কোথায় যেন শিবানীর একটু মিল রয়েছে। অথচ আশ্চর্য! দুই পরিবারে কত তফাত। শিবানীর একলা বাইরেও বেরুতে নেই। ও বাড়ির সবাই বলেন, মেয়ে বড় হয়ে গেছে। তাপসীর আছে একলা বাইরে বেরুবার নির্দেশ। নইলে কলেজ যাবে কেমন করে। কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই প্রতি পদক্ষেপে জোড়া জোড়া অদৃশ্য চোখ নিয়ন্ত্রণ করছে ওর গতিবিধি! সে চোখ ওর বাবা মায়ের। ওটা নাকি শাসনের পদ্ধতি। নবেন্দুর বন্ধুরা এলে সে ঘরে যাওয়া নিষেধ তাপসীর। ওটা ওদের বাড়িতে অভাবিত। অথচ ডেপুটি সাহেবের বাড়ি, পুরোপুরি মডার্ন। কলেজে যাওয়া ছাড়া সামাজিক রীতি হিসাবেই তাপসীকে বেরুতে হয় ঠোঁটে মুখে রং মেখে। বাড়িতে বসে আলাপ সম্ভব সেই ছেলের সঙ্গে, যাকে আলাপের জন্য ডেকে আনবেন ওর বাবা মা।

তাপসী বলল, কিন্তু, তুই এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছিস যে?

সুমিতা বলল, বড় লজ্জা করছে।

—আহা, একদিন তো সব লজ্জাই ভেঙ্গে যাবে।

—কার কাছে?

—যাকে ভাবছিস মনে মনে।

ছি ছি! সব কথাগুলির মানে উল্টে ফেলছে তাপসী। যে ব্যাপারে সুমিতা কাঁটা হয়ে গেছে লজ্জায়, তার সঙ্গে কোন মিল নেই তাপসীর কথার।

হঠাৎ চমকে উঠল সুমিতা। কার ছায়া পড়ছে ওর পাশে। পিছু ফিরে দেখবার আগেই ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল মেজদির গলা, একি রুমনি, তুই এখানে।

এবার বুঝি ধমক আছে অদৃষ্টে। বলল, এই যে যাচ্ছি। তাপসীর সঙ্গে একটু কথা বলছিলুম।

তাপসী বলে উঠল চাপা গলায়, এই মিথ্যুক! তুই তো পালিয়ে এসেছিস্।

ছায়া সরে গেল। সুমিতাও পিছন ফিরে ঘরে ঢুকতে গিয়ে শুনতে পেল তাপসীর কথা, বেশ আছিস তোরা।

বেশ। হয় তো বেশ। তাপসীর মত বন্দিদশা সুমিতা ভাবতে পারে না। কিন্তু এখন—

এখন আর কিছু ভাববার নেই। নিজেকে ঠেলে নিয়ে দাঁড়াল গিয়ে বাইরের ঘরের দরজায়।

সেখানে তখন ঘোরতর তর্ক উঠেছে জমে। সুমিতাকে দেখে সবাই থামল। প্রথমে ওর দিকে কারুর যেন নজরই পড়ল না। তাতে খানিকটা স্বস্তি পেল বটে, মনটা গেল খারাপ হয়ে। সুমিতাকে নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার সময় নেই কারুরই।

তর্ক জমেছে আশীষ আর রাজেনের মধ্যে। বিষয় বোঝা না গেলেও আন্দাজ করা যায়। রোজার গারোদি আর লুই আরাগঁ'এর সাম্প্রতিক 'উর্দি' 'না-উর্দি' নিয়ে আসর গরম হয়েছে। নিশ্চয় সাহিত্য আর রাজনীতির ফাটাফাটি চলছে।

আসলে, সবাইকে দেখে মনে হচ্ছিল, পৃথিবীতে ওরা একদল ছন্নছাড়া। কোথায় যেন যাত্রা করেছিল এই মানুষগুলি, কোন দুর্গমের পথে। কিন্তু ঝড়ের মারে সবাই ফিরে এসেছে কোটরে।

সুমিতা কি করবে না করবে, ঠিক করার আগেই রবিদা বলে উঠলেন, এ-যে ঘন ঘোর বনানী। এস রুমনো সাহেবা। আরক্ত হয়ে উঠল সুমিতার মুখ। জানত, রবিদা কিছু একটু বলবেনই।

মৃণাল তার প্যাণ্ট ছেড়ে আজ এসেছে ধুতি পাঞ্জাবি পরে। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, সুমিতা তো এখন পুরোপুরি লেডী। দাঁড়িয়ে উঠে অনার জানাতে হয় ওঁকে।

মুখের রক্তাভা আর একটু গাঢ় হল সুমিতার। সবাই তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। বিনয়, আশীষ, হিরণ্ময়। বিনয়ের সেই লজ্জামুগ্ধ ব্রীড়াবনত ভাব। হিরণ্ময়ের সেই হাতা গোটানো, উস্কোখুস্কো চুলে ত্রস্ততা। অপলক ছোট চোখের ঢুলঢুলুনিতে কী এক দুর্বোধ্য তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসা আশীষের।

(১২)

এর মধ্যে যাকে সুমিতার সবচেয়ে বেশী চোখে লাগছিল, সে রাজেন। রবিদার চেয়েও চওড়া কপাল রাজেনের। সারা কপালটিতে যেন পিছলে

পড়ছে আলো। ঝড়ের বেলায় কালো চুলে পড়েছে ধুলো, পড়েছে অবিন্যস্ত হয়ে বিশাল কপালে। তীক্ষ্ণ ভ্রূর তলায় টানা টানা চোখ ছু'টিতে সর্বক্ষণই কী এক বিস্ময় ও কৌতূহলের ঝিকিমিকি। মনে হয়, চোখের ওই বিস্ময়ের বিদ্যুৎ আভাসটুকুই সারা মুখে ধরে রেখেছে যত রুক্ষতা। ওটুকু না থাকলে মনে হত ভাবের বশে মুগ্ধ হয়ে বসে আছে একজন। এ ঘরের সোফা আলমারি শেলফ, রঙ্গীন পর্দা আর ফুলদানির মধ্যে যদি বা মানিয়েছিল রবিদা থেকে বিনয়কে পর্যন্ত, মানায়নি রাজেনকে। মোটা আলখাল্লার মত পাঞ্জাবি, তার ভাঁজ গেছে অনেকদিন। কিংবা ছিল না কোন কালেই। মালকোঁচা দিয়ে পরা ধুতি, পায়ের কনুয়ের অনেক ওপরে। সে যে আর কিছুতেই নামবে না, সেটা বোঝা যাচ্ছে শক্ত দৃঢ় গোড়ালি দেখে।

রবিদা বললেন, বোস রুমনো সাহেবা।

রাজেন বলল, দাঁড়াও রবিদা, ওর সঙ্গে আগে আমার বোঝাপড়া হবে।

রবিদা বললেন হেসে, সর্বনাশ। আজ তা হলে ডালপালা সব ভাঙল সবুজ বনানীর। কেটে পড় ভাই শীগ্‌গির।

সবাই হেসে উঠল। ঝড় উঠল সুমিতার বুকে। ফুলদানির বারোমেসে ক্রুসান্‌থিমামের পাপড়ি ছিঁড়তে ছিঁড়তে, আরক্ত মুখ রাখল নীচু করে।

রাজেন যেন সাক্ষী মেনে বলছে সবাইকে। বলল, আমি ওর সঙ্গে আজ অবধি কটা কথা বলেছি জানিনে, কিন্তু ও আমাকে কী কী বলেছে শোন। এক নম্বর, বদরাগী—

সুমিতা বলে উঠল ভয়চকিত গলায়, না না—

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বলল রাজেন, ছু' নম্বর, গোঁয়ার।

—ওমা! না, কখ্‌খনো না।

ভয়ে আর উত্তেজনায় সুমিতার গলা রুদ্ধ প্রায়। ডালপালা সত্যি বুঝি ভাঙল।

রাজেন বলল, দাঁড়াও। আরো মনে করতে হবে। হ্যাঁ, কাটখোট্টা, গোমড়ামুখো···

বুঝতে পারছিল সুমিতা, কথাগুলির সবখানিই আসলের চেয়ে বেনো জলের ঢেউ, কিন্তু ধাক্কাটা লাগল ওর। মেজদির পাশে যাকে কল্পনা করেছে, তাকে কখনো বলেনি এসব। কল্পনাতেও নয়। বলে উঠল, কখনো নয়। সব মিছে কথা।

এমন সময়ে ঘরে ঢুকল মেজদি। বলল, কী হয়েছে?

সুমিতা দৃপ্ত ভঙ্গিতে ফিরে দাঁড়াল মেজদির দিকে। যা কোনদিনই করেনি। বলল, কি বলেছ তুমি ওঁকে?

—কী বলেছি?

ততক্ষণে হাসিটা ভেঙ্গে পড়েছে সুমিতার রুদ্ধ অভিমানের তটে।

কিন্তু হাসির মাঝে বেসুর ছিল একটু। রবিদার হাসির মাঝে ছিল একটু আড়ষ্টতা। তাকিয়েছিলেন ভিতর দরজার দিকে। মনে হল, পুরো মনটি নেই এখানে।

রাজেনের মেঘমন্দ্রিত অট্টহাসির মধ্যে উল্লাসের ধ্বনি একটু বেশী। তখন মৃণাল তাকিয়েছিল সুগতার দিকে। আর সুগতা বিস্মিত চোখে চকিতে একবার দেখল রাজেনকে।

আশীষ হাসছিল, কিন্তু নিঃশব্দে। লক্ষ্য করছিল সবাইকে। শুধু বিনয় আর হিরণ্ময় সুমিতার দিকে চেয়ে হাসতে গিয়ে চোখাচোখি করল পরস্পরে।

সুগতা বলল, কিন্তু যা-ই বল, তুমি একটু গোঁয়ার আছ রাজেন।

রাজেন বলল, আছি-ই তো। নইলে ছাত্র আন্দোলন করব কেমন করে?

—কেন?

—নইলে কবে তোমরা ভাসিয়ে দিতে আমাকে। এমনিতেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মরতে হয়। ভাগ্যিস্ একটু গোঁয়ার হয়েছিলুম, তবু কথা শোনে সবাই।

সবাই হেসে উঠল আবার।

মৃণাল বলল, কিন্তু রাজেন, পালিয়েও যায় অনেকে।

বিদ্যুৎ কষার মত তীক্ষ্ণ হাসি নিঃশব্দে ঝলকে উঠল রাজেনের ঠোঁটে। বলল, জানি। যারা পালাবার, তারা পালাবেই। তাদের ধরে রাখবার মন্ত্র আমার জানা নেই, চাইনেও।

সুগতার ঠোঁটের হাসিটুকু বারে বারে ছড়্ খেয়ে যেতে লাগল। কে যেন অদৃশ্যে টিপুনি দিচ্ছে ওর হৃৎপিণ্ডে। চমকে চমকে উঠছে ব্যথায়। বাতাসে শিউরে উঠছে কূল ভাসানো নির্ঝরিণী। বলল, ও, গোঁয়াতুর্মি দেখেই কথা শোনে সবাই। ভালবেসে বুঝি শোনে না?

কথাটার মধ্যে কিসের একটি সুর ছিল। সুগতার ঝড়-এলোমেলো মুখে চাপা অভিমানের বিদ্যুৎ-চকিত আভাস।

রাজেন বলল, তা' হলে সে গোঁয়ারকে দেখে কেউ পালায় না বল।

সুমিতা ঠিক ধরতে পারছিল না, অন্তস্রোতের গতিটা ছুটছে কোন্‌দিকে। কিন্তু মেজদির চোখে মুখে ক্রমেই যেন রক্ত ফুটছিল অদৃশ্য চাবুক-কষায়। বলল, গোঁয়ারকে দেখে পালায় কিনা জানিনে, কিন্তু—

সহসা থেমে গেল সুগতা। ওর দুই চোখে নেমে এল অতল গভীরতা। নির্ঝরিণীই হারিয়ে গেছে যেন কোন নিস্তরঙ্গ অতল সমুদ্রে।

এতক্ষণে প্রথম মুখ খুলল আশীষ ওর সেই ঢুলুঢুলু চোখে। কেমন একটু বিদ্রূপের আভাস নিয়ে বলল, শেষ পর্যন্ত যে পালাবার সে পালায়।

রাজেনের যেন হঠাৎ খেয়াল হল, আবহাওয়াটা মোড় নিচ্ছে অন্যদিকে। তাড়াতাড়ি বলল একটু সঙ্কুচিত হয়ে, যে যতো খুশি বকো আর রাগো ভাই, খিচুড়ির আসরটা যেন নষ্ট না হয়।

মৃণাল কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করছিল। সিগারেট টেনে টেনে আর কূল পাচ্ছিল না। বললে, আমিও সেইটেই চাইছিলুম।

রাজেন বলল, সবাই মিলে যেন আমাকে দোষ দিও না। আমাকে গোঁয়ার বলেছ, তাই আমি বলেছি। সে আমার মা'ও আমাকে রোজ গোঁয়ার বলেন, আমিও মাকে অনেক কিছু বলি।

আবার একটু হাসির শব্দ শোনা গেল সকলের গলায়।

রাজেন বলল আবার, মাঝখান থেকে যে আমাকে এসব বলেছে সেই বেচারী পড়ে গেছে মহা ফাঁপরে। তুমি বোস সুমিতা।

সুমিতা বসল বিনয়ের পাশের সোফাটায়। সুমিতার চেয়েও আরক্ত মুখে, কেমন যেন কুঁচকে উঠল বিনয়।

সুগতা উঠল চেয়ার ছেড়ে। কোমরে বাঁধা আঁচলটি গেছে খুলে। সেটি তুলতে গিয়ে চকিতে একবার চোখোচোখি হল মৃণালের সঙ্গে। বলল, আমাকেও যেন দোষ দিও না তোমরা। শেষ কথা, আমার খিচুড়ির আসরটা আমি কিছুতেই মাটি হতে দিতে চাইনে। সমাবেশ না জমবার অভিশাপ থাকলেও চাইনে। বলে চলে যেতে গিয়ে আবার ফিরে বলল, রুমনি, তুই কিন্তু আসিস পরে রান্নাঘরে

চলে গেল সুগতা। সুমিতা দেখল, রবিদাও মেজদির সঙ্গে গেল ভিতরের ঘরে।

রবিদা আর মেজদি চলে যাওয়ার পরেও, কয়েক মুহূর্ত বাইরের ঘরের আবহাওয়া যেন থম্‌কে রইল। একরাশ কৌতূহল ব্যাকুল করে তুলল সুমিতাকে ভিতরে ভিতরে। কেবলি মনে হতে লাগল, মেজদির সঙ্গে রাজেনদার কোথায় একটু কী ঘটে গেছে। যার অতল আবর্তের সামান্য নির্বাক কম্পনটুকু দেখতে পেয়েছে সুমিতা। ও একলা নয়, এ ঘরের সবাই। বিশেষ করে আশীষ। ওর ঠোঁটের কোণের কেয়োর মত কুঞ্চনটুকু যেন অন্তঃসলিলের সব আবর্তটাকে ঘূর্ণিপাকে আরো ফাঁপিয়ে তুলছে দুর্বোধ্যভাবে। আর আশ্চর্য! আশীষের সঙ্গে সুমিতার বারেবারেই চোখোচোখি হচ্ছিল। আশীষ যেন একটু কেমন করে তাকাচ্ছিল ওর দিকে।

নিয়ত বিস্ময় কুঞ্চিত চোখে রাজেনেরও যেন একটি চকিত ছায়ার আভাস দেখা দিল। বলল, মৃণাল, একটা সিগারেট দাও, খাই।

মৃণালও পকেটে হাত দিয়ে একটু শক্ত হয়েই ছিল। সহসা শিথিল হওয়ার অবকাশ পেল যেন। তাড়াতাড়ি সিগারেটের প্যাকেট বার করে বলল, অব্‌ কোর্স—

আশীষ বলল, এদিকেও দিও মৃণাল।

মৃণাল আবার বলল, অব্‌ কোর্স—

ধুতি-পাঞ্জাবি পরা 'অব্‌ কোর্সের ভঙ্গিতে বেমানান লাগছিল ওকে। আশীষের ব্যাপারটা একটু আলাদা হয়ে গেছে এখানে। একসময়ে কলেজে পড়েছে রাজেন—মৃণালের সঙ্গেই। সাহিত্য করে অনেকদিন থেকে। সব চেয়ে বড় গুণ যেটা ওর, সেটা হল ওর পড়াশোনার বিস্তৃতি। বিশেষ করে বিদেশী সাহিত্য। সে নিজেও সাহিত্য করে। হঠাৎ একবার ওর খেয়াল হয়েছিল, নতুন কিছু স্থষ্টি করতে হবে সাহিত্যে। পালিয়ে গিয়েছিল কয়লাখনি অঞ্চলে। সেখানে কিছু হয়নি বলে, চা-বাগানে। তাও খুব একটা মনোমত হয়নি বলে, ট্রেড ইউনিয়ন করতে নেমে পড়েছিল শহরতলীর চটকল এলাকায়। এই করে, তিন বছর কাটিয়ে, আবার ওকে ঢুকতে হয়েছে সেই ঘোলা জলে। অর্থাৎ কলেজে। এখন অবশ্য সাহিত্য সম্পর্কে আশীষ অন্যকথা বলে। কিন্তু রাজেন-মৃণালের সঙ্গে রয়ে গেছে সেই পুরনো বন্ধুত্বের জের।

আশীষ সিগারেট নিয়ে রাজেনের দিকে ফিরে বলল, হঠাৎ সিগারেট খাচ্ছ যে?

রাজেন বলল, খাওয়া যাক আজ একটা। সুমিতার দিকে ফিরে বলল, সুমিতার অনারে।

রাজেনের সঙ্গে চেখোচোখি হল সুমিতার। পরমুহূর্তেই রাজেনের বিস্ময়-বিদ্যুৎ-চকিত চোখে হাসি ফুটে উঠল। বলল, ভাবছ, লোকটা সত্যি গোঁয়ার, না ?

সুমিতা লজ্জিত হেসে বলল, মোটেই না।

রাজেন বলল, যাক্, বাঁচা গেল। তোমার রেজাল্ট আউট হচ্ছে কবে ?

সুমিতা—জুনের গোড়ার দিকেই।

মৃণাল বলে উঠল, তখনো, খিচুড়ি না হোক, অন্য একটা আসর আমাদের বসবে নিশ্চয়ই।

আশীষ বলল, তা' হলে এবার আমাদের সেই পুরনো আলোচনাটাই ফিরে আসুক।

(১৩)

আশ্চর্য সুন্দর কথা বলে আশীষ। জ্ঞানের পরিধিটা ওর বহুদূর ব্যাপ্ত। সেটা জ্ঞান কিনা কে জানে। পড়াশোনা আছে নিশ্চয়ই। অতীতকালের মিশর ব্যাবিলনের ইতিহাস পেরিয়ে, রোম পার হয়ে, ফ্রান্স আর ইংল্যাণ্ড ঘুরে ওর বক্তব্য যখন ভারতের কূলে এসে দাঁড়ায়, তখনই দেখে সবটা শূন্য। বর্তমান ভারতের সবকিছুর উপরেই তার উদ্যত অঙ্গুলির বিদ্রূপ আর ভ্রূকুটি।

রাজেনের সঙ্গে বিতর্ক তার অষ্টপ্রহর।

কিন্তু সুমিতার মনটা চমকে চমকে উঠছে বার বার। আশীষ যেন কী এক বিচিত্র অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে তার দিকে। যেন কী বলছে। সেই নিঃশব্দ বার্তায় লজ্জা করছে সুমিতার। লজ্জা করছে, কিন্তু একটি 'পুরোপুরি ছেলের' *এমন চাউনিতে কী একটি গৌরবও যেন আছে। আবার খারাপও লাগে। শরীরের মধ্যে কেঁপে ওঠে কেন চাউনি দেখে ? কিন্তু রাজেনের দিকে চোখ পড়লেই থম্‌কে যায় আবার সুমিতা। আর ভাবে, এই ব্যাক্তিত্বসম্পন্ন মূর্তির সারা মুখে দৃঢ় অভিব্যক্তির মধ্যে কোথায় একটু বৈরাগ্যের বিচিত্র স্পর্শ রয়েছে লেগে। চোখে তার কী যে আশ্চর্য বিস্ময় ! যেন এই বিশ্বের ধূলিকণা থেকে সবকিছুকেই নতুন করে দেখছে বারে বারে। ওই চোখে, অমনি বিস্ময়ে বারে বারে মেজদিকে

দেখবে ফিরে,মেজদিকে ফিরে তাকাতে হবে বারে বারে। তার মনের কূলে কূলে নিশ্চয় আচমকা শিহরিত হবে নিস্তরঙ্গ জল। যদি প্রাণ থাকত ধূলিকণার, সেও ভাবত, আমি সামান্য পথের ধুলো। কী দেখছে আমার মধ্যে সে অমন করে। মেজদি নিশ্চয় ধরা পড়েছে ওই চোখে ওর কঠিন দৃপ্ত হৃদয় নিয়ে।

রবি রাজেনকে থামিয়ে বলল, যাক্, ডেপুটি সাহেবের কথা শোনা যাক্।

শুনলেই তো. উনি বলে গেলেন, অনেক রাজনীতিকের দেখা উনি পেয়েছেন ওঁর এজলাসে। যে দেশকে উনি ওঁর কাঠগড়ায় শুধু দেখেছেন, সে দেশের মানুষকে উনি করুণা করতে পারেন, ভালবাসেন কী করে। শত হলেও উনি হচ্ছেন রাজ-প্রতিনিধি, রাজার অংশ।

মৃণাল বলল, কিন্তু এদেশে তো ডেপুটির স্বদেশ-কীর্তিও কিছু কম নেই।

রাজেন বলল হেসে, এ দেশে মেরী কার্পেণ্টার আর লং সাহেবের মত ইংরেজও এসেছিলেন। তাতে ভারতবর্ষে ইংরেজের জাত-বদল হয়ে যায়নি। যে ডেপুটিদের স্বদেশ-কীর্তির কথা বলছ তুমি, তাঁদের পরিচয়টা ডেপুটি বলে অন্য কিছু। তবে, আমি যে হিরণ্ময়কে রাগ করতে বারণ করেছি, তার কারণ, রাগ করে কোন লাভ নেই। মিত্রসাহেবরা যে এত বাড়াবাড়ি করেন, সেটা হল ত্রিশঙ্কুর ক্রোধ। ইজ্জতের দিক থেকে ওঁদের নতুন কিছু পাবার নেই। সেই বিক্ষোভ তো আছেই, তার উপরে বাস করেন যে দেশে, সে দেশের জীবন থেকে রয়েছেন অনেক দূরে। জীবনের এ শূন্যতার জ্বালাও তো কম নয়। যদিও এ জ্বালাটাকে ওঁরা ওঁদের সমাজের তৃপ্তি বলেই জানেন।

সব কথার মানে স্পষ্ট নয় সুমিতার কাছে। ওর চোখের সামনে শুধু মিত্র সাহেবের সেই একঘেয়ে কথাগুলি যেন অস্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে।

দেখছে, শুনছে। আর শুনছে সুমিতা, ওর কানের কাছে বিনয় বলছে ফিস্‌ফিস্ করে, পার্কে গিয়ে খুঁজেছিলুম শুধু তোমাকে। না দেখে মনটা এত খারাপ হয়ে যাচ্ছিল! নতুন একটা গান বেঁধে নিয়ে এসেছিলুম আজকে, সভায় গাইব বলে, জানো। ভাবছিলুম তুমি না এলে—

বিরক্ত নয়, ভীষণ লজ্জা করছে সুমিতার। রাজেনের জন্যে নয়। সে মেতে গেছে তার বিষয়ে। লজ্জা করছিল আশীষের দিকে তাকিয়ে। সে তাকাচ্ছে এদিকে বারে বারে সেই দৃষ্টিতে, ঢুলুঢুলু চোখে। আড়চোখে ঠোঁট কুঁচকে। ভাবটা যেন, আমার নজর আছে ওদিকেও।

সুমিতা ভুলে যায়নি, ওকে ডাক দিয়ে গেছে মেজদি। কিন্তু যেতে

পারছে না এ ছেড়ে। যেতে পারছে না, অথচ উৎসুক মন বারবার উঁকি দিয়ে আসতে চাইছে ভিতরে। কোথায় গেলেন রবিদা, কার কাছে গেলেন আজ এতদিন পরে।

রবি এসে দাঁড়াল সুজাতার ঘরের দরজায়।

দরজা রয়েছে খোলা কিন্তু আড়াল রয়েছে পর্দার। ওর পাশ দিয়ে সুগতা চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। ভেবে এসেছিল অনেককিছু, অনেক দিনের অনেক সঙ্কল্প নিয়ে। মহীতোষের অনুরোধ এড়িয়ে যেতে পারেনি রবি। অনেক দিনের বন্ধু। যে বন্ধুত্ব সম্পর্কে বন্ধু ও আত্মীয়মহলে আলোচনার শেষ ছিল না। তাদের বন্ধুত্বের মধ্যে যারা অনেক কিছু দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু আজ কাছে এসে, গাঢ় নীল পর্দাটা যেন কী এক দুর্বোধ্য বাধার দুলতে লাগল চোখের সামনে। হাত দিয়ে পর্দা সরাতে, চোখে পড়ল, সুজাতা দাঁড়িয়ে রয়েছে জানালায়, বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে।

রবি ডাকল, ব্যস্ত আছ ?

চমকে উঠল সুজাতা। ফিরে দাঁড়িয়েই অসম্বৃত আঁচল ঠিক করে এক মুহূর্ত থমকে গেল বিস্ময়ে। বলল, কে ? ও, রবি, এস।

শেষ মুহূর্তের ডাকে অনেকখানি নির্বিকার শোনাল সুজাতার গলা। সহসা ওর রক্তাভ ঠোঁটের কোণে একটু বিদ্রূপের আভাস উঠল ফুটে। তরল টল্‌টল্‌ চোখে বিস্ময়ের একটি অস্পষ্ট কাঠিন্য এল ঘিরে। দেখে এখন বোঝবার উপায় নেই, এ মেয়ে সন্ধ্যাবেলা শুধু জীবনের রুদ্ধ দরজাগুলির গায়ে মাথা ঠুকে ঠুকে ফেলছিল চোখের জল। তবু বহুদূরে জলোচ্ছ্বাসের কলকলানি শোনা যাচ্ছে কোথায়। যেন মরণের বান ডাকছে সেখানে। এতক্ষণে কাপড় বদলানো হয়েছিল বটে, কিন্তু অবিন্যস্ত খোলা চুলে কিংবা মুখে হাত পড়েনি এখনো সুজাতার। বলল, বোস।

রবি বসল একটি চেয়ারে। অনেকদিন পরে, হঠাৎ বড় অচেনা লাগছে এই ঘর। ব্যবধান যেন কত সুদূর। যেন সহসা এক নিষিদ্ধ ঘরে ঢুকে, অসহায় অস্বস্তি বোধ করছে। এ রবিকে দেখলে বোঝা যায় না, তাঁর ব্যক্তিত্বকে সবাই সম্ভ্রম করে বাইরে। ছাত্রমহল থেকে উচ্চ রাজনীতির আসরে যাঁর সসম্মান গতিবিধি রয়েছে।

সুজাতা দাঁড়িয়েছে খাটে হেলান দিয়ে উর্ধ্বাঙ্গে বাঁক নিয়ে। যেন সত্যি আসছে কোন জলোচ্ছ্বাসের তীব্র ঢেউ। তাকে ও প্রতিরোধ করবে।

রবি তাকাল সুজাতার দিকে। সেই বুদ্ধিদীপ্ত বিষণ্ণ চোখে। কিন্তু পরমুহূর্তেই চোখ সরিয়ে নিল অন্য দিকে। ধিক্কার না থাক, কেমন একটি ঔদ্ধত্য রয়েছে সুজাতার সর্বাঙ্গে।

বিক্ষুব্ধ জনারণ্যে যার ভয় নেই, সে কি না ভীরু এই ঘরের কোণে। রবি বলল, তোমাকে কয়েকটা কথা বলব সুজাতা।

সুজাতা! এ নামে ডাকবার তো কথা ছিল না। যার সঙ্গে পরিচয় ছিল, সে তো উমনো।

সুজাতা বলল, কী কথা বল।

এমনি করে কথা বলেনি কোনদিন দু'জনে। বহু খুনসুটি করেছে দু'জনে এককালে। জীবনের অনেক মোড় ঘুরে, অনেক স্মৃতির গ্রন্থি পার হয়ে আজ এসে আবার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে এই রূপে। যে ভয়ংকর ফাঁকিটা এতদিন নির্লিপ্ত বেশে দাঁড়িয়েছিল দু'জনের মাঝখানে, আজ সে ঠোঁট টিপে হাসছে নিষ্ঠুরভাবে।

রবি বলল, কথাটা ঠিক আমার নয়।'

সুজাতার ঠোঁটের কোণে বিদ্যুৎ হানল দূর আকাশের। যেন আগের মতই বলল ঠাট্টার ভঙ্গিতে হেসে, পরের জন্যে তো তুমি লাইফ স্যাক্রিফাইস করেই আছ। পরের কথা-ই তো তোমরা বল।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে এক সর্বগ্রাসী আক্রমণের সমস্ত আয়োজন ঝক-মকিয়ে উঠল সুজাতার কথার স্বরে ও ভঙ্গিতে। সেইজন্য ও প্রথম থেকেই অগ্রগামিনী। যেন তার দুর্ভাগ্যের জন্যে দায়ী সবার বড় আসামীকে পেয়েছে আজ সামনে।

এক মুহূর্তে রবির মুখও শক্ত গম্ভীর হয়ে উঠল। কিন্তু শান্ত গলায় বলল, কথাটা ঠিক তা নয়। ওঁর ধারণা, আমি তোমাকে বললে বোধহয় কাজ হবে।

ওঁর অর্থাৎ মহীতোষ। কাকাবাবু বলাটাও ছেড়ে দিয়েছে নাকি রবি। কিন্তু সুজাতার সমস্ত মুখ অকস্মাৎ জ্বলে উঠল দপ্ করে! রক্তাভ ঠোঁটে ফুটল সুস্পষ্ট ধারালো বিদ্রূপ। তবুও বুকের গভীরে যেন এক সুতীব্র কনকনানি। সেটা যত বাড়ল, রবির এই নির্লিপ্ত শান্ত মুখ ততই কেন যেন অস্থির করে তুলল চাপা ক্ষোভে।

বলল, তুমিও নিশ্চয় কাজ হবার আশা নিয়েই এসেছ আজ বলতে।

রবির বিশাল শরীরে একটি অসহায়তা দেখা দিল। ব্যাকুল গলায় বলল, না, না—

সুজাতা বলল, তবে ?

কিসের জন্যে এমন কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করছে সুজাতা। চকিতে একবার মনে হল রবির, যদি অধিকারের প্রশ্ন হয়, তবে এ মুহূর্তে এ ঘর থেকে চলে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

বাঁক ছেড়ে সোজাসুজি দাঁড়িয়েছে সুজাতা। ঝুটা মসলিনের শাদা জামার অস্পষ্ট সীমানায় কিলবিল করছে সোনার হার।

রবি বলল, থাক্ ওসব কথা। হয় তো তোমার মন ভাল নেই আজ।

রবি উঠতে গেল। ভ্রূ কুঁচকে উঠল সুজাতার। বলল, থাকবে কেন ? এরচেয়ে ভাল মনের আশা না-ই বা করলে।

রবির শ্যামল চিকন মুখে রক্ত উঠেছে ফুটে। ঘাম দেখা দিয়েছে কপালে বিন্দু বিন্দু। উঠে দাঁড়াল সুজাতার সারা গায়ে ছায়া ফেলে। বলল না, আজ থাক্ সুজাতা।

আবার 'সুজাতা'। বলল, আজ থাক। কিন্তু আমার ওপরে তোমার এত রাগের কারণ আমি সত্যি জানিনে।

দৃপ্তভঙ্গিতে ঘাড় ফিরিয়ে বললে সুজাতা, রাগ আমি কারোর 'পরেই করিনি। কিন্তু সারা ঘরটি যেন থম্‌থম্ করছে। আসবাবপত্র থেকে সবকিছু, দেওয়ালের ন্যুড্‌টিও রয়েছে যেন উৎকর্ণ হয়ে।

বলতে চায় না সুজাতা, বলতে চায় না আর। কিন্তু কী চতুর আর মিথ্যুক রবি। মনে করেছে, 'উমনোকে' 'সুজাতা' বলে ডাকলেই বুঝি, শুধু বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে বুঝি, এমনি নির্লিপ্তভাবে ফিরে যাওয়া যায়। সুজাতা যে আসলকে ছেড়ে নকলের গলায় মালা দিয়ে এখন পাপের ফল ভোগ করছে, তাতে যেন রবির একটুও আনন্দ হয়নি, এমনি ভাব দেখাতে চাইছে। খুশিতে আর ঘৃণায় এতখানি নির্বিকার হবার ক্ষমতা পেয়েছে রবি, সেকথা জানে সুজাতা। তবে কেন না বলে ছাড়বে। ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আমার দুর্ভাগ্যে যে খুশি হয়, তাকেও কি আমার ভাল লাগাতে হবে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠে বলল রবি, তোমার দুর্ভাগ্যে খুশি ?

—নয় ? একটুও নয় ?

হৃৎপিণ্ডে ধক্‌ধক্‌, ছ' পায়ে কাঁপুনি লেগেছে সুজাতার।

রবি হাত দিয়ে নিজের ঠোঁট চেপে ধরেছিল। হাত সরিয়ে স্খলিত চাপা গলায় বলল, কিসে বুঝলে ?

নিজেকে সম্বরণ করতে চাইছিল সুজাতা। হৃৎপিণ্ডের দ্রুত ওঠানামায় কে যেন কণ্ঠনালীতে হাত চেপে বলছিল ভিতরে ভিতরে, থাক্‌ থাক্‌। কিন্তু সামলাতে পারলে না রবির প্রশ্নের মুখে। বললে, যেমন করে অনেককিছু বোঝা যায়, তেমন করেই।

কয়েক মুহূর্ত আরণ্য স্তব্ধতা গেল। রবি দাঁড়িয়ে চেয়ারের হাতলটি মোচড়াচ্ছিল। তারপর যেন হঠাৎ অনেকখানি শান্ত গম্ভীর গলায় বলল, সুজাতা তোমার মন নিয়ে তুমি যা খুশি তাই ভাবতে পার, বলতে পার। কিন্তু তোমার দুঃখে আমি সুখী, একথা তুমি ছাড়া কেউ বিশ্বাস করবেনা।

সুজাতা তেমনি মুখ রেখেছে ফিরিয়ে। বললে, করবে না, বাইরের অনেকেই বিশ্বাস করছে।

চকিতে একবার রবির মনে পড়ল ওর বাড়ির কথা। সে নিজে ছাড়া সে বাড়িতে সবাই সাহেব। সেই প্রাণান্তকর বাঙ্গালী-সাহেব বাড়িতে তাকে মনে হয়, যেন ছেলেপুলেদের গৃহশিক্ষক ছাড়া আর কিছু নয়। সেখানে কথার আড়ালে, সবাই সুজাতার নামটি করে ওঁর কাছে। ভাবে ভাষায় ইঙ্গিত দিতে চায় দু'জনের অন্তরঙ্গতার। এড়িয়ে যাবার ইচ্ছে থাকলেও মনে মনে ক্ষুব্ধ না হয়ে পারে না।

বলল, তোমাদের সেই অনেকে কি বিশ্বাস করে না করে আমি জানিনে। জানতেও চাইনে। তবে একজনের কথার সঙ্গে তোমার মিল খুঁজে পেলুম, সেটুকু অস্বীকার করতে পারিনে। সে গিরীন।

সুজাতা মুখ ফিরিয়ে সরে গেল এক পা, খাটের কোণে। পিছন থেকে এলিয়ে পড়েছে সর্পিল চুল। বলল, সে তোমার বন্ধু। তোমাকে চেনে বেশী।

প্রতিটি কথার মধ্যে সুজাতার নিষ্ঠুর আয়ুধ। কিন্তু, যত শান্ত হয়ে পড়ছে রবি, ততই যেন আক্রমণ ব্যাহত হচ্ছে। যত ব্যাহত হচ্ছে, ততই দাবানল জ্বলছে হু হু করে। ততই হৃৎপিণ্ডে কিসের নিষ্ঠুর টিপুনি লাগছে।

রবির কণ্ঠস্বর গাঢ় হচ্ছে ক্রমে। কিন্তু আঘাতের চমকটুকু উঠেছে সামলে। বলল, তোমরা দু'জনেই আমার বন্ধু। তোমাদের এই চেনাচিনির

ওপরে আর আমার কথা চলেনা। আমি তো জানতুমনা, আমাকে তোমার এত চেনা আর এত ঘৃণা।

সুজাতা রুদ্ধশ্বাস, নিষ্কম্প ছায়া নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল শক্ত হয়ে। আক্রমণের সমস্ত অস্ত্রগুলি এবার যেন ঘুরে দাঁড়িয়েছে ওর দিকেই।

রবি আবার বলল, আমি ভেবেছিলাম নিজের দুর্ভাগ্যে পথ খুঁজে পাচ্ছনা তুমি, তাই আসতে পারনা কাছে।

সুজাতার বুকের ভিতরে কে নিঃশব্দে উঠল ফুঁপিয়ে—সত্যি, সত্যি, পথ আমি পাচ্ছিনে খুঁজে। কিন্তু আমার সে দুর্ভাগ্যের দায় কি আমার একলার? রবির কি কোনো জবাবদিহি নেই?

রবি বলল, হয় তো তোমার বন্ধু অমলাদের নাইট ক্লাবেও এ নিয়ে দারুণ ঘৃণায় তোমরা হাসহাসি করেছ।

বুকের নিগূঢ় তলে নিঃশব্দ চীৎকারে ফেটে পড়ল সুজাতা, না না। কিন্তু মুখে বলল, নাইট ক্লাব?

রবি—হ্যাঁ, তোমাদের পার্ক স্ট্রীটের নাইট ক্লাবের কথা বলছি।

কিন্তু সেখানে তো কেউ হাসেনি রবিকে নিয়ে। অমলা তার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কখনো তা বাড়তে দেয়নি সুজাতা। কিন্তু রবির মুখে নাইট ক্লাবের কথা শুনে আরো তীব্র হয়ে উঠল ওর গলা, কেউ যদি হেসে থাকে, তাকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নেই আমার।

রবির মুখে ক্রোধের আভাস নেই। কিন্তু দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও মুখ থম্‌থমিয়ে উঠেছে। বলল, রাগ করো না, তেমন অনুরোধ আর করতে পারিনে। তবু, তোমার বাবা আমাকে বলতে বলেছিলেন গিরীনের দেওয়া মাসোহারাটা তোমাকে এ্যাক্‌সেপ্ট করতে।

আবার ফিরল সুজাতা উদ্যত ফণা নিয়ে। এইবার ও চীৎকার করে উঠতে চায়। কোনরকমে নিজকে ধরে রেখে বলল, তুমি কী বল?

—কাকাবাবু আমাকে যা ভেবে বলতে বলেছিলেন, সেটা আসলে আমাদের দু'জনেরই ভুল। নইলে কেন এসেছিলুম বলতে। তবু, একটি কথা না বলে পারছিনে সুজাতা। গোড়ায় তোমার গলদ হয়েছে কোথাও।

—যথা?

রবি দৃঢ় গম্ভীর স্বরে বলল, দেখ সুজাতা, নিজের অনেক সমস্যা থাকে, তা দিয়ে আর দশজনকে ভোগাবার অধিকার তোমার নেই। তোমার সুখে

কেউ বাধা দেয়নি, দুঃখের দায় যদি কেউ নিতে আসে, তাকে অপমান করার অধিকারও তাই তোমার চিরদিন থাকবে। কিন্তু কথা সেখানে নয়। কথা হল, তুমি হয় তো মনে করেছ, মস্ত বড় একটা 'অসত্যকে' আঘাত করে, 'সত্যকে' রক্ষা করেছ। তা' কিন্তু আদপেই নয়, তোমার এই অদ্ভুত ব্যবহার তার প্রমাণ। আসলে গিরীনের বিত্তের মূল্যটা তোমার কাছে কম নয়। আমাকে যত খুশি ঘৃণা করতে পার, ভেবে দেখ, সেটা হারিয়ে তোমার দুঃখ বেড়েছে কি না।

তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করে বলল সুজাতা, কোনো বিত্তহীনকে বিয়ে করলেই বোধ হয় সুখী হতুম ?

রবি তৎক্ষণাৎ বলল, না। বিত্তহীনদেরও হৃদয় আছে, আর তাই আছে তাদের স্বস্তিতে বাঁচবার অধিকার। তোমার পক্ষে সেটা স্থান নয়, তুমি নিজেই সেটা ভাল বোঝ। সেইজন্যই আর একটি কথাও বলব। গিরীনকে যদি ভালবেসে থাক, তবে সবকিছু মিটিয়ে ফেল এখুনি।

রবি দেখতে পেল না, সুজাতা কাঁপছে সত্যি সত্যি। এলো চুলে, রক্তকুঞ্চিত ঠোঁটে আর দীপ্ত চোখে, ভয়ংকরী দেখাচ্ছিল ওকে। বলল, তোমার কি কোন সন্দেহ আছে সে ভালবাসায় ?

—আমি জানিনে। রবি ফিরে গেল দরজার দিকে। সারা মুখ ভেসে গেছে ঘামে। হঠাৎ একটি অস্ফুট শব্দ শুনে ফিরে তাকাল। শুনতে পেল, সুজাতা বলছে, যাও তুমি।

বেরিয়ে গেল রবি। সুজাতা দাঁড়িয়ে রইল তেমনি। বুকের ওপরে দু' হাত চাপতে চাপতে তুলে নিয়ে এল গলার কাছে। খাটে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। মনে হল, সেটা যেন সরে যাচ্ছে একটু একটু করে।

ফিরে দাঁড়িয়ে সুজাতা শক্ত করে ধরল খাটের রেলিং। তারপর, শূন্য ধমনীতে একটু একটু করে ফিরে এল রক্ত। যত আসতে লাগল, ততই মনে হল, একটি ভয়ংকর সত্য ওর ধমনীতে আসছে ছুটে। ভালবাসেনি ও গিরীনকে। ভালবাসেনি, তবু প্রাণ ভরে চেয়েছিল গিরীনের বিষয়বৈভব। চেয়েছিল শৈশব থেকে, নিজেকে ভেবেছে চিরদিন বিপুল বিত্তবানের ঘরণী। ওই স্বপ্নটুকুকে ভালবেসেছে সুজাতা, ওই সত্যটাকে লালন করছে সোহাগ দিয়ে। কিন্তু মানুষটির কথা ভেবে দেখেনি। বিত্তকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে জীবনের একটি প্রতিপত্তিকে ও হারিয়েছে। সে ওর ভালবাসার

প্রতিপত্তি। ওর ভালবাসা, সেখানে আজ শুধু ব্যর্থতা, বিদ্রূপ আর ঘৃণা। সেইজন্যেই সারা প্রাণ-ভরে শুধু ছলনা আর একদিকে। পরকে নয়, ছলনার বেড়িটা আজ ওকেও ঘিরেছে পিল্‌পিল্‌ করে। কিন্তু এ কি আশৈশব বিপুল বিত্তসাধন ওর যে, তার আড়ালেও সুজাতা পারলে না ছলনা করতে। ছলনা করতে হচ্ছে আজ নিজেকে নিয়ে।

পর মুহূর্তেই ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল আবার রবির মুখ। আর দারুণ অভিমানে চোখের তট ছাপিয়ে এল জল। যে ওকে কখনো কিছুই বলেনি, তার প্রতিই বারে বারে ফুঁসে উঠল, দর্পী, অহঙ্কারী মিথ্যুক আর চতুর বলে। অসত্যকে-ই যদি আঘাত না করে থাকে সুজাতা, তবে বিপুল বৈভবের বাসনাকে দলিত করে এসেছে কেমন করে? 'মন' নয়, 'মতি'র ফাঁদে পড়েছিল সেদিন সুজাতা। কিন্তু রবি কী মিথ্যুক, কী মিথ্যুক! জীবনে অসত্যকে আঘাত করার প্রথম পাঠ কার কাছ থেকে পেয়েছিল সুজাতা? রবি নয়?

তবু, সুজাতা যে 'সত্য'কে ফাঁকি দিয়ে অসত্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছিল, সেই ক্ষোভে রবি ওর সমস্যাটাকেও স্বীকার করতে চায় না। আসলে ওর জীবনের সেই অস্তিত্বের জটিলতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে সুজাতা। যে ওকে নিয়ত ভেংচি কাটছে। বলছে, ভালবাসাকে ফাঁকি দিয়ে, গণ্ডূষ ভরে পান করতে চেয়েছিলে জীবনখানি। প্রকৃতি তার শোধ নিচ্ছে তোমার উপর। রবি সেই প্রকৃতির বাহন হিসেবেই কথা বলছে।

রবি শুধু প্রকৃতিরই বাহন? আর কিছু নয়? গিরীনকে বিয়ে করতে গিয়ে সে যে রবির সঙ্গে মিথ্যাচার করেছে, সুজাতার সেই জ্বালাটুকুও রবি বোঝে না? সহসা ভয় ফুটে উঠল সুজাতার চোখে। এ পৃথিবীতে ওর ফাঁকির জ্বালাটা বুঝি কেউ কোনদিন বুঝবে না। বড় একাকী মনে হচ্ছে নিজেকে। এই ভরা বাড়ির নিঃসঙ্গতা থেকে পালাতে ইচ্ছে করছে।

কিন্তু উপায় নেই। সারা বাড়িতে তখন কলরব উঠছে ভোজনের।

(১৪)

সুজাতার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মনে হল রবির—এতদিনে বোধ হয় সাঙ্গ হল এ বাড়িতে যাওয়া আসার পালা। শুধু সুজাতার জন্যেই আসেনি এতদিন, লোক ছিল এ বাড়িতে আরো। কিন্তু নিজের মনের কাছে তো

কোন ফাঁকি নেই, যত দূরে থাক্‌, আর একজনের অস্তিত্বকে অনুভব করেছে সর্বক্ষণ। মনে হল, সেই আর একজনই আজ যেন পিছনে পিছনে এসে দেখিয়ে দিয়েছে বেরিয়ে যাবার দরজাটা।

কিন্তু যাওয়ার উপায় ছিল না। যাদের সঙ্গে এসেছে, তাদের ছেড়ে গেলে অকারণ কিছু কৌতূহল রেখে যেতে হবে। নিজেকে অনেকখানি সামলাবার চেষ্টা করে ঢুকল খাবার ঘরে। সেখানে তখন আসর ভাঙবার সময় হয়েছে।

সুমিতার সঙ্গে প্রথম চোখোচোখি হল রবিদার। ও নিজেও তখন মেতে গেছে গাছকোমর বেঁধে।

এদিকে সেই তর্কটা তলে তলে অনেকখানি বেড়ে উঠেছে রাজেনের সঙ্গে মৃণাল-আশীষের। যতবারই ওই কথাটা উঠতে যাচ্ছে, বাধা দিচ্ছে সুগতা, আবার তোমাদের ওই কথা ?

খাবার টেবিলেরই এক পাশে বসেছিলেন মহীতোষ। তিনিও ফিরে তাকালেন রবির দিকে। বললেন, এস রবি।

খাবার টেবিলের সঙ্গে আর একটি টেবিল জুড়ে দেওয়া হয়েছে। জায়গা রয়েছে অনেকখানি। সুমিতা নিজে একখানি চেয়ার এগিয়ে দিল রবিকে।

সুমিতার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ একটি কথা মনে পড়ে গেল রবির। কোর্টে দাঁড়িয়ে বলেছিল সুমিতা, গিরীনদা যদি হাত ধরে নিয়ে যান বড়দিকে, তবে বেশ হয়। রবি বলেছিল, 'ঠিক বলেছ রুমনো, এর চেয়ে ভাল আর কিছু হয় না।' মনে তো হয় না, কথাটি নিতান্তই ছলনা করে বলেছিল সুমিতাকে।

ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক শূন্য চোখ ফেরাতে ভুলে গেল সুমিতার উপর থেকে।

নীচু গলায় জিজ্ঞেস করল সুমিতা, আমাকে কিছু বলছেন রবিদা ?

রবি চমকে উঠে বলল, অ্যাঁ ? পরমুহূর্তে ওর সেই স্নিগ্ধ হাসি হেসে বলল, হ্যাঁ বলছি, আমাকেও খেতে দাও।

এইটুকুই আন্দাজ করেছিল সুমিতা। এমনি একটু সব-ভোলানো হাসি হেসে উঠবেন উনি। এছাড়া ওঁর উপায় নেই।

অনেক কথা, অনেক হাসির কলরোলে শেষ হল খাওয়া। বিনয় আর হিরণ্ময় একবারও চোখ ফেরাতে পারেনি সুমিতার উপর থেকে। মাঝে মাঝে

আশীষ। আশীষের চাউনিতে সেই কী এক অর্থপূর্ণ অথচ অস্পষ্ট কথা।। কী যেন বলছে ওকে আশীষ। যদিও শোনা যায় না, তবু সর্বাঙ্গ কেন যেন শিউরে ওঠে সুমিতার। আর কখনো সখনো বিদ্যুৎ-বিস্মিত চোখ পড়েছে রাজেনের। কিন্তু মৃণাল বারে বারেই দেখছে কেবলি সুগতাকে। লক্ষ্য করে দেখেছে সুমিতা, মেজদি মৃণালের দিকে তাকিয়েই চকিত গম্ভীর মুখ ফিরিয়ে একবার দেখে নিচ্ছে রাজেনকে।

সবাই যখন বেরিয়ে পড়েছে, তখন মহীতোষ ডাকলেন রবিদাকে। মেজদি চলে গেল বাথরুমে হাত মুখ ধুতে। বাইরের ঘর থেকে চলে আসতে গিয়ে সুমিতা দাঁড়িয়ে পড়ল দরজার পাশে।

ঘরের ভিতরে মহীতোষ বললেন, কিছু বলেছিলে নাকি?

রবিদার গলা শুনতে পেল, বলেছিলুম।

মহীতোষ—রাজী হয়েছে টাকাটা নিতে?

চকিতে ভেসে উঠল সুমিতার চোখে গিরীনদার চেকটা। রবিদা বললেন, ঠিক বুঝতে পারিনি।

পায়ের শব্দে বুঝতে পারল সুমিতা, রবিদা চলে যাচ্ছেন। বললেন, আচ্ছা আমি এখন চলি।

মহীতোষ অসহায় বিস্ময়ে বললেন, তুমি কি রাগ করেছ রবি?

রবিদা বললেন, না না। তবে আমি বলাতে বোধ হয় উমনো অপমান বোধ করেছে। আমার বলাটা ঠিক হয়নি।

মহীতোষ—আমিই তোমাকে বলতে বলেছিলুম রবি।

রবিদা—তাতে আপনার দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই কাকাবাবু। আমার নিজের দিক থেকেও একেবারে অনিচ্ছা ছিল না। কিন্তু আমরা দু'জনেই বোধ হয় ভুল বুঝেছিলুম, তবে—

তবে?

কাকাবাবু, আমার মনে হয় সবটাই ঘটেছে বোধ হয় একটা রেষারেষির বশে। তারই একটা পাল্টা রিঅ্যাকশন হয়েছে উমনোর। ওর নিজের মনেই হয়তো অনেক সংশয় রয়েছে। জানেনা, কী চায়।

মহীতোষ বললেন, এইটাই সবচেয়ে সাংঘাতিক রবি। এই চাওয়া না চাওয়ার ধাঁধা মানুষকে তার অজান্তে বড় বিপদের পথে টেনে নিয়ে যায়।

খানিকক্ষণ চুপচাপ। রবিদা আবার বললেন, চলি আমি।

সরে গেল সুমিতা। রাগ না হোক, কিছু একটা হয়েছে রবিদার। এমন নির্বিকার শুকনো গলায় কোনদিন বিদায় নেননি।

বড়দির ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল, ঘর অন্ধকার। শুধু পাখার বাতাসে একটানা যান্ত্রিক শব্দ আবর্তিত হচ্ছে। সুমিতা ডাকল, বড়দি।

—কী!

—খাবে এস।

জবাব এল, তোরা খা। আমার খিদে নেই।

ঘরের পর্দা ধরে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল সুমিতা। কাছে গিয়ে আর কিছু বলতে ভরসা হল না।

বড়দি খাবে না শুনে, এক মুহূর্ত ভ্রূ কুঁচকে নির্বাক হয়ে রইল সুগতা। তারপর খেতে চলে গেল। কিন্তু ঠোঁটের কোণে কেমন একটি কঠিন বিরক্তির দাগ রইল লেগে।

রাত্রে শুয়ে সুমিতার কেবলি মনে হতে লাগল, সন্ধ্যাবেলার সেই ঝড়টা যেন এখনো দাপাদাপি করছে ঘরের বাইরে। এখনো যেন বাড়িময় অনেক, অনেক কোলাহল। তার মধ্যে ও উৎকর্ণ হয়ে রইল। যদি মেজদি কিছু বলে। কিন্তু সুগতার দিক থেকে কোন সাড়া শব্দ এল না।

সকালবেলা সুমিতা পায়ে পায়ে নেমে এল বাগানে। অধিকাংশ ফুল-গাছগুলি মুখ থুবড়ে পড়েছে মাটিতে। পাতা ঝরেছে, ডালপালা ভেঙেছে। মহীতোষ বাগানে এসে লেগেছেন গাছের পরিচর্যায়।

সুমিতার সদ্য বিছানা-ছাড়া মূর্তি দেখে মহীতোষ একটু অবাক হলেন। বললেন, কী খবর রুমনো সাহেবা। সকালবেলাই এদিকে যে?

সুমিতা বলল, এমনি।

বলে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল গাছগুলির দুরবস্থা। মহীতোষ কঞ্চি বেঁধে দোমড়ানো গাছ খাড়া করছিলেন। তারপর, সুমিতা যে এমনি আসেনি, সেটা বোঝা গেল, ও যখন ঝপ করে এসে বসে পড়ল মহীতোষের কাছে।

—কী হয়েছে রুমনো।

শুধু লজ্জা নয়, একটু বোধ হয় শঙ্কাও ছিল সুমিতার মনে। তবু বলল, বাবা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

অবাক হয়ে বললেন মহীতোষ, নিশ্চয়ই করবে! কী কথা বল তো? সুমিতা বলল, কাল তুমি মিত্রসাহেবকে কিসের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটরের কথা বলছিলে?

মহীতোষ হঠাৎ অন্যমনস্কের মত কঞ্চি বাঁধতে বাঁধতে বললেন, ও সেকথাটি তোমার কানে গেছে ঠিক।

হ্যাঁ। তোমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন উনি মিউনিসিপ্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের কাজের কথা।

মহীতোষ তখন একটি গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। কোন জবাব দিলেন না।

সুমিতা ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। আবার ডাকল কিছুটা ভয়ে ভয়ে, বাবা।

মহীতোষ বললেন, হুঁ।

আবার কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ। তারপর বললেন মহীতোষ, রুমনো সাহেবা, এখন তুমি বড় হয়েছ, তোমাকে সব কথাই বলা যায়। আমি একটা চাকরি পেয়েছি।

চাকরি! বাবার দিকে ভাল করে তাকাল সুমিতা। সহসা মনে হল, বাবার মাথার চুলগুলি অনেক বেশী সাদা হয়ে উঠেছে এর মধ্যে। সারা মুখে বার্ধক্যের রেখা পড়েছে আরো ঘিঞ্জি হয়ে। প্রসন্ন ক্লান্তির বদলে অসহায় ত্রস্ততা উঠেছে ফুটে চোখের গভীর পরিখার ওপারে।

সুমিতার বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল বাবার কথা শুনে। বলল, তোমার আবার কিসের চাকরি বাবা? তুমি রিটায়ার্ড ম্যান।

মহীতোষ তখনো চোখ না তুলেই বললেন, রিটায়ার্ড মানুষও চাকরি করতে পারে রুমনো সাহেবা। আমি চেয়েছিলুম এই কাজটা! মিত্রসাহেবও চেষ্টা করেছিলেন আমার জন্যে।

সুমিতা নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল বাবার দিকে। অনেক কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করছে ওর। কিন্তু বাবাকে নিরুৎসুক দেখে, মুখ খুলতে পারছে না। ও জানত, মহীতোষ তাঁর কর্মজীবন শেষ করেছেন। যতদিন বাঁচবেন, ততদিন ভোগ করে যাবেন পেন্‌সন।

হঠাৎ মহীতোষ নিজেই ফিরলেন সুমিতার দিকে। ঘরের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন, রুমনো, তোমার যখন এতই শুনতে ইচ্ছে হয়েছে তখন বলি। এ বাড়িটা ছাড়া আমি আর কিছুই করতে পারিনি। পেন্‌সনের টাকাটা সবই খরচ হয়ে যায় মাসে মাসে। ভেবেছিলুম, তোমাদের বিয়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যাব। এভাবেই চলে যাবে আমার জীবন। কিন্তু য

ভাবা যায়, তা হয় না কখনো সাহেবা। আমাকে আরো কিছু করতে হবে।

সুমিতা বলল, কেন, তুমি যা ভেবেছিলে, তাইতো হচ্ছে।

—কোথায়? কোথায় তা হল? তোমার বড়দির দিকে তাকিয়ে দেখ। তোমার আর ঝুমনোর কি হবে এখনো জানিনে। কিন্তু আমি যদি এই অবস্থায় মরি, তোমার বড়দির কী হবে? তখন তো পেন্‌সনের টাকা থাকবে না।

কথাগুলি শুনতে শুনতে টন্‌টন্ করে উঠল সুমিতার বুকের মধ্যে। মহীতোষের দিকে সোজাসুজি চোখ তুলে তাকাতে পারল না। বুঝতে পারল, কী নিদারুণ দুশ্চিন্তায় ভুগছেন বাবা। শুধু দুশ্চিন্তা নয়, কণ্ঠস্বরে মনে হল, কোথায় একটি গভীর ক্ষত রয়েছে অভিমানের।

কিছু বলতে পারল না সুমিতা। নরম মাটিতে আঙুল দিয়ে আঁক কাটতে লাগল।

ইতিমধ্যে রোদ উঠেছে কিছুটা। উঠতে না উঠতেই তাত ফুটেছে রোদে।

সুমিতা বলল, কিন্তু, তুমি আমাদের লেখাপড়া শেখাচ্ছ, আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারব।

মহীতোষ বললেন, তা হয়তো পারবে। তবু তোমরা আমার মেয়ে। আমি এত সহজে নিশ্চিন্ত হব কেমন করে? ছেলে হলেও নিশ্চিন্ত হতে পারতুম না। আমি চেয়েছিলুম, সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তোমরা সসম্মানে থাকবে।

সুমিতার ঠোঁটের আগে ছুটে এল কথা। কিন্তু দ্বিধা হল বলতে। তবু না বলে পারল না, চাকরি করলে কি সমাজে প্রতিষ্ঠা হয় না বাবা?

মহীতোষ চোখ তুলে তাকালেন সুমিতার দিকে। কেমন একটু বিস্মিত অনুসন্ধিৎসা ছিল সেই দৃষ্টিতে। সুমিতা আরক্ত হয়ে উঠল।

মহীতোষ বললেন, হয় বৈ কি! কিন্তু তাতে আমার তো কোনো সান্ত্বনা নেই। সেইজন্যে আমার সান্ত্বনা আমাকে খুঁজতে হচ্ছে।

অস্পষ্ট হলেও, অনেক কথা মনে হতে লাগল সুমিতার। বলতে ইচ্ছে করল অনেক কথা। কিন্তু এখন সেসব কথা বাবার সামনে বলতে সঙ্কোচ হল ওর। এই সামাজিক পরিপেক্ষিতে তিন মেয়ের কারুরই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

করেননি মহীতোষ। করবেন না কোনদিন। কিন্তু যা বিশ্বাস করেন, তা বলতে দ্বিধা নেই। তা করতেও পেছপা হবেন না। যত বড় বেদনার হোক এটা সুমিতার কাছে, নিজের বিশ্বাস ও সম্মানের জন্যে সে বেদনাই স্বীকার করে নিয়েছেন বাবা নিজে।

তবুও শত দুর্বলতার মধ্যে, সায়াহ্নের সেই একাকী মানুষটির জন্যে সুমিতার বুকে নিঃশব্দে গুম্‌রে উঠল কান্না। বলল, কিন্তু বাবা, আমার বড় ভয় করছে। কী করে তুমি পারবে?

মহীতোষ আবার মনোযোগ দিয়েছেন গাছের দিকে। হেসে বললেন, পারব রে কমনো সাহেবা, পারব। তুই দেখছি তোর মায়ের স্বভাব পেয়েছিস। সব বিষয়ে তুই ছেঁকে ধরবি।

সুমিতা বলল, তবে, তুমি বড়দি মেজদির সঙ্গে আগে এ বিষয়ে একটু আলোচনা করে নাও।

মহীতোষ সন্ত্রস্ত হয়ে ফিরে বললেন, না না, এখন ওসব কথা তোমার দিদিদের বলতে যেও না। যখন বলবার, তখন আমিই বলব। আজ আমার জয়েনিং ডেট্‌। বিলাসকে বলে রেখেছিলুম রান্নার কথা। তুমি বরং ওদিকে একবার দেখ। চা একটু তাড়াতাড়ি দিতে বল।

সুমিতা দিদিদের বলাটাই সবচেয়ে সমীচীন বোধ করছিল। কেননা, যদি বিশেষভাবে বাবাকে বাধা দিতে হয়, তবে তারাই তা পারবে। যদিও, সেবিষয়েও অনেক সংশয় আছে সুমিতার। বলল, আজকেই যেতে হবে?

—হ্যাঁ।

···কোথায় সেটা?

—কলকাতার বাইরে, মাইল দশেক। আমাকে ট্রেনে যেতে হবে।

যেতে গিয়ে শঙ্কিত মুখে ফিরে দাঁড়াল সুমিতা। বলল, কলকাতার বাইরে? বালীগঞ্জ স্টেশন দিয়ে যাবে?

—না। শিয়ালদহ দিয়ে।

সুমিতা সভয়ে বলে উঠল, কী বলছ তুমি বাবা? কী করে তুমি পারবে রোজ রোজ যেতে?

গম্ভীরভাবে হাসলেন তেমনি মহীতোষ। ভাঙ্গা ডাল খাড়া করতে করতে বললেন, যেমন করে সব মানুষ পারে। অত ভয় পেয়ো না।

বলে মুখ ফেরালেন। কিন্তু সুমিতার সারা মন জুড়ে এক সভয় কান্না

রইল থমকে। বাবার এই স্থির অবিচলতার মধ্যেও যেন এক গূঢ় অশান্তিকে দেখল পিল্ পিল্ করে এগিয়ে আসতে। বাবা যখন শান্ত হয়ে কথা বলেন, তখন আর কথা চলে না তার উপরে। মনে হল, বাবার এই অবিচল কাঠিন্য-টাই আর এক রূপে দেখেছে বড়দির মধ্যে।

(১৫)

অকূলে ভাসল সুমিতার মন। তবু কোন কূলকিনারা পেলনা ও ভেবে। মেজদির ভাষায় যাকে বলে ঐক্যবদ্ধ ফ্রণ্ট, এ বাড়ির সেই দুর্জয় ফ্রণ্টে ভাঙন ধরেছে বড় রকমের।

তিন দিন ধরে প্রত্যহ একই সময়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন মহীতোষ। একই সময়ে প্যাণ্ট কোট পরে, টাই বেঁধে, টুপী মাথায় দিয়ে। বহুদিনের পুরনো একটি অস্পষ্ট ছায়া ভেসে উঠেছিল সুমিতার চোখে। সে ওর শৈশবে-দেখা, জুজু-মূর্তি মহীতোষ। টাই-টুপী-পোশাক ছিল ওর চোখে জুজুর বেশ। বাবার সেই চাকুরে জীবনের পুরনো মূর্তিটা, স্পষ্ট করে দেখা হল সুমিতার। বহুদিন এত ফিটফাট হয়ে কেউ বেরুতে দেখেনি ওঁকে। স্পষ্ট করে দেখা হল বটে, কিন্তু শৈশবে দেখা তেমনটি আর নেই। তার একটি ছায়ামাত্র। প্রথমদিন মেজদি বলেছিল অবাক হয়ে, এ কী! কোথায় চলেছ এভাবে?

বাবা বোধহয় সেই পুরনোদিনের মত মেয়েকে খুশি করার জন্যে একটু হেসেছিলেন ভ্রূ তুলে। যেন বলতে চেয়েছিলেন, কোথায় বল তো ঝুমনো? কিন্তু হেসে উঠে মুখ ঘুরিয়ে বলেছিলেন বাবা, আবার ডাক পড়েছে পুরনো জায়গায়। সরকারী নথিপত্রের ব্যাপার তো। হয়তো কোন গণ্ডগোল হয়েছে, তাই ডেকেছে।

মেজদি একটু অবাক হলেও বোধহয় বিশ্বাস করেছিল। অবাক হওয়ার কারণটা আর কিছু নয়। কথাটি আগে থাকতে না বলার ব্যতিক্রমটাই বিস্ময়ের। বলেছিল, কই, তুমি তো কিছুই বলোনি।

মহীতোষ মুখ না ফিরিয়েই বলেছিলেন, সময় পেলুম কোথায়? কালকেই তো সংবাদ এল। তবু মেজদির বিস্ময়ের সর্পিল ভ্রূ-লতা সরল হল না। কাল না হোক, আজ সকালেও সময় ছিল। এমনিভাবে জিজ্ঞেস না করলে, হয়তো শোনাই হত না ব্যাপারটা।

সুগতা ফিরে তাকিয়েছিল সুমিতার দিকে। এই ভয় করেছিল সুমিতা। হয়তো ওর মুখ থেকেই স্পষ্টাক্ষরে সবটুকু পড়ে নেবে মেজদি। সামান্য অছিলা করে সরে গিয়েছিল ও সামনে থেকে।

কিন্তু আসল লোক মহীতোষ নিজে এত নির্বিকার। সুগতা বিশ্বাস করেছিল মহীতোষকে, কিন্তু ওঁর এই অনাসক্ত ব্যবহারের জন্য মনে মনে দায়ী করেছিল সুজাতাকে।

মহীতোষ বোধহয় আরো একজনকে আশা করেছিলেন। আর একজন কাছে এসে জিজ্ঞেস করবে, কোথায় চলেছ এভাবে। কিন্তু সুজাতা আসেনি।

ওরা তিন জন না থাকলে মহীতোষের কাছে যেমন সারা বাড়িটা ছুবিবহ হয়ে ওঠে, ওদের তিন বোনেরও তেমনি, মহীতোষ না থাকলে মনে হয়, বাড়িটার কোথায কী ঘটে গেছে।

মহীতোষ বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তিন বোন দাঁড়িয়েছিল তিন জায়গায়। কেউ কাউকে দেখতে পায়নি। কিন্তু মনের তলায় পাক খাচ্ছিল বোধহয় এক জায়গাতেই। তিনদিন হল, আরো অনেক তিনদিন গেল। সুমিতা দেখল, একটি ছলনার জাল চারদিক থেকে গ্রাস করছে সারাটি বাড়ি। মহীতোষের এ নিয়মিত যাওয়া আসা নিয়ে, কেউ কথা বলতে পারল না মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

শুধু দু'জন জিজ্ঞেস করেছে। তাও সুমিতাকে। ঝি অচলা আর বিলাস। বলেছে, ছোট দিদিমণি, সাহেব কি আবার চাকরি করতে যাচ্ছেন?

ঝি-চাকরের এ কৌতূহলটা এ বাড়িতে শোভন নয়। তবু এরা পুরনো মানুষ। ওদের টনক নড়েছে। না জিজ্ঞেস করে পারেনি। সুমিতার কাছেও কোন অশোভন মনে হয়নি। বলেছে, হ্যাঁ।

চোখোচোখি করেছে অচলা আর বিলাস। ভাবখানা, কী জানি, বড় লোকের কথাই আলাদা। তবু ঝি অচলা একবার টেনে বলেছে, এই বয়সে আবার···।

সেই যে গেছেন রবিদা আর আসেননি এ বাড়িতে। মহীতোষ এসে রোজই জিজ্ঞেস করেন, রবি এসেছিল। জবাব দিতে হয় সুমিতাকেই। একই জবাব। ও যেখানেই বেরুক, মহীতোষ আসবার আগে ঠিক উপস্থিত হবে বাড়িতে। কেননা, ঠিক ওই সময়েই বাড়িটা থাকে একেবারে ফাঁকা। বড়দি মেজদি থাকে না। সেই একঘেয়ে মিত্রসাহেবের ঘ্যানঘ্যানানি। ভারতবর্ষের

স্বাধীনতা প্রাপ্তি নিয়ে ভীরু বিক্ষোভে প্যানপ্যান করেন ; আমি আপনাকে বলে রাখছি মিঃ ব্যানার্জি, এই সালটা একটা ভয়ংকর দুর্ভাগ্যের বৎসর।

রবিদা আসেন না। বড়দির সম্পর্কে মেজদি এত নিরুৎসুক অনাসক্ত ভাব দেখায়, যেন দু'জনে বিদেশ থেকে এসে কোন হোটেলের ঘরে বাস করছে পাশাপাশি। দু'টি কথা, একটু হাসি, খেতে বসে সামান্য বাইরের আলোচনা। কিন্তু এত প্রাণহীন, নিরাসক্ত যে, তার চেয়ে দু'জনে চুপ করে থাকলে মানায় অনেক বেশী।

ছলনা, ছলনা, শুধু ছলনা। কাকে যে দায়ী করবে, দোষ দেবে, ভেবে পায় না সুমিতা। কারুর ওপরেই রাগ করতে পারছে না। বড়দি, মেজদি, বাবা, কারুর প্রতি রুষ্ট হতে পারছে না। নিজেকে আর সেই ভীরু অশিক্ষিত লতাটির মত লুকিয়ে রাখতে মন চায় না। ইচ্ছে হয় সোজাসুজি কথা বলে এদের এই অসহজের সহজ গতিটা ভেঙে চুরমার করে। কিন্তু তাতেও ভয়। যদি নতুন কোন সঙ্কট এসে পড়ে এর ওপরে।

ওর পরীক্ষার ফল বেরুবার দিন আসছে ঘনিয়ে। বাড়ির এ আড়ষ্ট আবহাওয়ার মধ্যে সেই দিনটির প্রতীক্ষা করছে সুমিতা। আর যা-ই হোক, তবু একটা কিছু নিয়ে থাকা যাবে।

এর মধ্যে, মনের এই অকূলে, কখনো কখনো আচমকা ঝড় বইয়ে দিয়ে যায় তাপসী। বিপথগামী করে দিয়ে যায় সব ভাবনাকে। এত স্পষ্ট ইঙ্গিত ছড়ানো তাপসীর কথা! সারা শরীরে, রক্তে রক্তে এক আশ্চর্য দোলা দিয়ে যায়। কখনো কখনো ভয়ঙ্কর অশ্লীল মনে হয়। যখন তাপসী ওর দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলে, তোকে দেখলে মনে হয়, তুই ভাই ডুবে ডুবে জল খাস্।

সুমিতা ভীরু বিস্ময়ে চমকে উঠে বলে, কেন?

কোন তীক্ষ্ণতা নেই তাপসীর। বরং বড় স্থূলভাবে হেসে বলে, তোর ঠোঁট দু'টো দেখে মনে হয়, এর মধ্যেই···

পায়ের তলা থেকে একটা তুহিন-ঠাণ্ডা সাপ যেন সুমিতার মাথায় বেয়ে উঠে কিল্‌বিল্ করে। বুকের মধ্যে বাজে ড্রাম। বলে, মানে?

তাপসী বলে চোখ ঘুরিয়ে, আহা, যেন কিছু বুঝিস্‌নে। তোকে কেউ কখনো—

কথা শেষের আগেই সুমিতা চাপা গলায় ওঠে চীৎকার করে, যাঃ।

—কেউ নয়? বিনয়, হিরণ্ময়, আশীষ···

—ছি ছি, কী যা তা বলছিস্?

আরক্ত মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে সুমিতার। তাপসী বলে, রাগ করলি?

—তুই বড় বাজে বকিস্, ভাই।

তাপসী বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, হবে।

কেমন একটু ঠোঁট কুঁচকে, চোখ পিট্ পিট্ করে হেসে ওঠে তাপসী। হাসি পায় সুমিতার। হাসে দু'জনেই। তারপর সুমিতার ভিতর থেকে শামুকের শুঁড়ের মত পিল্ পিল্ করে বেরিয়ে আসে বিস্মিত কৌতূহল। বলে, আচ্ছা, তোর···?

তাপসী যেন হাসবার জন্যেই বুকের কাপড় এলো করে হাত তুলে বলে, হাণ্ড্রেড টাইমস্।

সুমিতা বলে বিস্মিত লজ্জায়, যাঃ। কী করে?

তাপসী বলে ঠোঁট উল্টে, এর মধ্যে তিনবার প্রেমে পড়েছি জানিস্?

—এর মধ্যে তিনবার?

—হ্যাঁ। বারো বছরে আমার এক মাসতুতো ভাইয়ের সঙ্গে···

নিদারুণ লজ্জার মধ্যেও হেসে লুটিয়ে পড়ে সুমিতা। বারো বছরে?

—হ্যাঁ। তারপর ষোল বছর বয়সে দাদার এক বন্ধুর সঙ্গে। আঠারো বছরে এক দূর-সম্পর্কের মামার সঙ্গে। অবশ্য তারা সকলেই খুব কেউকেটা সাহেব মানুষ। এক বছর আর ওসব নেই।

হাসতে গিয়েও কন্‌কনে বরফের মত বুক জমে ওঠে সুমিতার। কোনো ছেলেকে দেখে হঠাৎ কয়েক মুহূর্ত ভাল লাগার অনুভূতি ছাড়া, এ বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা নেই ওর জীবনে। ভীত বিস্ময়ে অপলক চেয়ে থাকে তাপসীর দিকে।

তারপর বলে, তোদের বাড়ির লোকে জানে না?

—জানলে তো লক্ আপ।

এমন বলার ভঙ্গি তাপসীর, বুকের হাজারো ধুকপুকনির মধ্যে পারা যায় না, না হেসে। বলে, আর বিয়ে?

—সে তো বাবা মা দেবে। এই তো আজ দেখাদেখি আছে।

—কী রকম? তোকে দেখতে আসবে?

—ধুস্! আজকাল আবার দেখতে আসাআসি আছে নাকি? তা'হলে সমাজে কান পাতা দায় হবে না?

—তবে?

—ওসব অনেক ব্যাপার। আমি যাচ্ছি দাদার এক বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে। যেন আমি কিছুই জানিনে। মা বলে দিয়েছে, 'এইভাবে যাবে সেজেগুজে, মোটেই বাচালতা করবে না। তোমার দাদার বন্ধু নরেশ জানে তুমি কেন যাচ্ছ। নরেশের এক বন্ধু আসবে আজ সেখানে বেড়াতে। ছেলেটি বড় চাকুরে। এখনো অবিশ্যি কিছুই জানে না ছেলেটি। নরেশ তোমাকে আলাপ করিয়ে দেবে। দেখো যেন যা তা কিছু বলে বসো না। ঠিক ঠিক বুঝে আলাপ করবে। তারপর ওখান থেকে সোজা বাড়ি আসবে।'

প্রায় ডেপুটি-গিন্নীর মত ভ্রূ কুঁচকে, এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল তাপসী স্মিতার দিকে। তারপর চোখের একটি বিচিত্র ভঙ্গি করে বলল, বুঝলে ম্যাডাম, একে বলে দেখাদেখি।

স্মিতা বলল, তারপর?

—তারপর? যদি ও পক্ষের মন মজে, তবে আমার অনুপস্থিতিতে নরেশদাকে নিশ্চয় জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তারপর মাছি মাকড়সার জালে আসবে ধীরে ধীরে।

—কিন্তু যদি তোর ভাল না লাগে?

—বয়ে গেল। আমাকে ঠিক তার সঙ্গে কথা বলতে হবে, চা এগিয়ে দিতে হবে, বাড়ি থেকে পারমিশন দিলে সিনেমা থিয়েটারেও যেতে হবে। আর তখন সে ঠোঁট কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে জিজ্ঞেস করবে, 'আমাকে বিয়ে করতে তোমার কোন আপত্তি নেই তো তাপসী?'

শুনতে শুনতে রুদ্ধশ্বাস হয়ে উঠেছিল স্মিতা। সমাজের এ সত্যটা জানাজানি সত্ত্বেও এমন করে কোনদিন যেন ওকে টুঁটি চেপে ধরেনি। শিবানীর কথা মনে পড়ে স্মিতার। একই গোত্রের যেন, তবু কত তফাত। প্রায় চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করে, তখন তুই কী বলবি?

—আমি? তাপসী বলে, ওর বাসি রং মাখা ঠোঁট দু'টি বাঁকিয়ে, বলার আগে আমি ভাবব, মা বাবা কী বলেছেন। তাঁরা বলেছেন, 'ছেলেটি ভাল, বড় চাকুরে। শুনেছি, ওদের কোম্পানী ওকে বিলেত পাঠাবে। সকলের নজর রয়েছে ওই ছেলের দিকে। ওকে কোনরকমে হাতছাড়া করা যাবে না।

দেখো, দু'টো চারটে বাজে কথা বলে ছেলেটিকে তাগিও না যেন। তা'হলে তোমারই দুর্গতি হবে।' ব্যস্, আর তো আমার ভাবাভাবির কিছু নেই। আমি খালি কোনরকমে একবার ঘাড় কাত করে দেব। আর সে অমনি হাতটি ধরবে চেপে। এমনি করে।

বলে খপ্ করে চেপে ধরে সুমিতার হাত। আচমকা ভয়ের বিদ্যুৎ-চমক লাগে সুমিতার বুকে। তাপসী হাসে খিল্‌খিল্ করে। এমনভাবে বলে সবটুকু, যেন এ ঘটনা আগেও ঘটে গেছে ওর জীবনে।

সুমিতা ভীরু বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে তাপসীকে। শ্যামাঙ্গিনীও বলা যাবে না তাপসীকে। কালো মেয়ে, চোখমুখও এমন কিছু বলার মত নয়। কিন্তু ওর খোঁপায়, চোখে মুখে নিয়ত কিসের এক চাপা হাসি ও অনুসন্ধিৎসা, চলা-ফেরার ভঙ্গিতে, কাপড় পরার ধরনে, সব মিলিয়ে এমন কিছু একটা বয়ে বেড়ায়, সবাই একবার ভুলেও তাকাবে ওর দিকে। কিন্তু সেটুকু সবই বাইরে থেকে ধরে রেখেছে তাপসী। নিজের বলতে অতি সাধারণ কালো মেয়ে ছাড়া ও আর কিছু নয়।

আর যেটুকু আছে, সেটুকু মনে হয়, একটি বিচিত্র জ্বালা। ওর ওই বহিরঙ্গনের ভঙ্গিটার মধ্যে সেই জ্বালাটুকুই যেন বয়ে বেড়াচ্ছে অভিশাপের মত। যত ভয় থাক্, বিস্ময় থাক্ সুমিতার মনে, ও রাগ করতে পারে না তাপসীর ওপর। বরং ওর এই দুর্বিনীত হাসি ও কথার ভিতর দিয়ে কেমন করে যেন মন কাড়ে। মনের কোথায় একটু বাষ্প জমিয়ে দেয় ওর হাসির উত্তাপের মাঝে।

সুমিতা বলে, আর যদি ছেলেটার পছন্দ না হয়?

—তা হলে সে কিছুই জিজ্ঞেস করবে না। বরং নরেশদাকেই ভাবে ভঙ্গিতে তখন আমাদের হয়ে অ্যাপ্রোচ্ করতে হবে। আর সেই ছেলেটা কাঁড়ি কাঁড়ি মিছে কথা বলে পালিয়ে বাঁচবে! ভাববে বাবা! খুব কড়া ট্র্যাপ্ থেকে বেঁচে গেছি, একটা কালিন্দী মেয়ে আর একটু হলেই ঘাড়ে চাপছিল আর কি!

বলে চোখ পাকায় তাপসী, তোর অত দুর্ভাবনা কিসের? তুই তো ডজন ডজন ছেলের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিস। পুরো ফ্রিডম।

কিন্তু সুমিতা তখনো ছাড়ে না। বলে, কিন্তু তোর লেখাপড়া?

—কম্পার্টমেণ্টাল দিয়ে তো ম্যাট্রিক পাশ করেছিলুম, তাও একবার

ফেল করে। এবারো গাব্বুস নির্ঘাৎ। ওসব আমার দ্বারা হবেও না কোনকালে। যা হবে, তাই করে বেড়াচ্ছি।

বলে আবার হাসে চোখ টিপে। তারপর আরম্ভ করে ওর প্রেম-কাহিনী বলতে। ওর সেই দূর সম্পর্কের মামা, দাদার বন্ধু, আর মাসতুতো ভাই। তারপর সুমিতার গাল টিপে দিয়ে বলে, শুধু তুই ভাজার মাছটি উল্টে খেতে জানিস্‌নে। সত্যি, কত ন্যাকামোই যে জানিস্।

আরো কত কথা যে বলে তাপসী। যে কথাগুলি, কখনো ভয়ে কখনো ঘৃণায় শিহরণ তোলে গায়ের মধ্যে। কিন্তু কখনো কখনো সেই কথা তোলপাড় করে সুমিতার রক্তে। ওর অকূলে হারানো মনের মাঝে কী এক বিচিত্র অর্থহীন ঝড় তুলে দিয়ে যায়।

তখন এই আড়ষ্ট বাড়িটার পরিবেশ ছেড়ে সুমিতা বাসে চেপে ছোটে কলেজ স্ট্রীটের দিকে। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে আসতে আসতেই ঝড় অনেকখানি প্রশমিত হয় আপনা আপনি। বৌবাজারের মোড়ে এসে ওকে নামতে হয় সভয়ে। কোথায় চলেছে ও, কার কাছে চলেছে। মিথ্যে নয়, ওই তল্লাটে, অনেকগুলি আড্‌ডা আছে, অনেকে আছে আশেপাশে ছড়িয়ে নানান জায়গায়। যাদের কথা তাপসী বলে বারে বারে। কিন্তু ও এসেছে ছুটে কার কাছে? কোন্ আসরে! এখানে রেডিও ঘ্যান্‌ঘ্যান্, ওখানে ট্রামের ঠং ঠং। চৌরাস্তার ভিড়ে, আরক্ত মুখে লুকিয়ে বাঁচে না নিজেকে। তাড়াতাড়ি অন্য ফুটে গিয়ে ধরে উল্টোপথের গাড়ি।

বাড়ি এসে হঠাৎ অর্থহীন বোধ হতে থাকে সমস্তটা। ও যে বাড়ির ছোট মেয়ে রুমনি, তারো সহসা বড়দির মত মনে হয়, জীবনটার চারদিকে কি এক কষ্টকর বেড়া রয়েছে ঘিরে। যেখানে বারবার প্রশ্ন করেও কোন জবাব পাওয়া যায় না। এখন বড় ভয় হয় সুমিতার। ভয় হয়, জীবনের কোন্ এক অনির্দিষ্ট অন্ধকারে নিজেও যাবে হারিয়ে।

ও এখন মেজদির কলেজের পুরনো বইগুলি নিয়ে পড়ে। ওকে অনার্স নিতে হবে, বি-এ-তে। লেখাপড়া করতে হবে অনেকখানি।

তারপর বাবা আসেন। ওঁর সান্নিধ্যে এসে, শত বিষণ্ণ আড়ষ্টতার মধ্যেও আবার নিজেকে ফিরে পায়। ভয় করে, আবার না আসে তাপসী। ও এসেই যেন কি একটা কলকাটি দিয়ে যায় নেড়ে। আর অভিমান হয় রবিদার ওপর। ভাবে, যাবে একবার রবিদার বাড়িতে। কিন্তু বাড়ির লোকগুলির

কথা মনে হলেই সভয়ে পেছিয়ে আসে মনে মনে। রবিদার সঙ্গে বাড়িটার কী অসম্ভব তফাত!

তবু এল তাপসী, বেলা তিনটের ঝোঁকে। কী যে হুড়ে মেয়ে। এসে গায়ে পড়বে, ধামসাবে।

আজ এসে বলল, পরীক্ষা দিয়ে এসেছি। ফেল না পাশ, বুঝতে পারিনি। নেহাত গোবেচারী। প্রেমের কিছুই বোঝে না।

তারপর একথা সেকথার পর হঠাৎ বলল, আর প্রেমের দাম কী বা আছে। চারদিকে দেখতে পাচ্ছি সব একই ব্যাপার।

--কি রকম?

—কি রকম আবার। ছেলেটির বাপের টাকা আছে, ছেলেটিও সাতশো টাকা মাইনেয় নাকি চাকরি করে, সোসাইটিতে ওদের প্রেস্টিজ আছে। আর কী চাই। প্রেম করতে পার যার সঙ্গে খুশি, বিয়ে এখানেই করতে হবে।

—কিন্তু, তারপর?

—তারপর যত খুশি প্রেম। ইচ্ছে না করলেও প্রেম, প্রেম আর প্রেম। তারপরে বুড়ি হয়ে যাব, সব জুড়িয়ে যাবে।

এ প্রেমের কোন রূপ খুঁজে পেল না স্থমিতা। সেটা কার সঙ্গে, কিসের জন্যে। ওটা তো আসলে ক্রীতদাসীর মত আত্মসমর্পণ।

তাপসী বলল, একেবারে যে অবাক হয়ে গেলি? তোদের বাড়িতেই ছাখ না। স্থজাতাদির ব্যাপারটা কি?

হঠাৎ মনে হল, স্থমিতা জমে পাথর হয়ে গেছে।

ভয়-স্খলিত গলায় জিজ্ঞেস করল, কী?

তাপসী বলল, আহা, জেনেশুনে তুই বড় ন্যাকা সাজিস্। তোর বড়দি তো বাপু আসলে ভালবাসেনি স্বামীকে। নেহাত বড়লোক দেখেই গিরীনবাবুকে পাকড়ালে। শেষটায়—

স্থমিতার মনে হল, মাটি সরে যাচ্ছে ওর পায়ের তলা থেকে। তবু সর্বাঙ্গে একটি অসম্ভব ঝাঁকুনি দিয়ে, শক্তি সঞ্চয় করে চাপা গলায় চীৎকার করে উঠল, তাপসী।

তাপসী চমকে বলল, কি রে?

কয়েক মুহূর্ত নির্বাক দু'জনেই। তাপসী বলল, রাগ করলি?

সুমিতার বুকের ভিতর থেকে কী একটি বস্তু গলার কাছে ছুটে আসছে ভলকে ভলকে। কোনরকমে বলল, হ্যাঁ।

তাপসী আরো কয়েক পলক ওর কাজল মাখা চোখে তাকিয়ে রইল তীক্ষ্ণ চোখে। তারপর বলল, কিন্তু তোকে রাগাবার জন্য বলি নি ভাই। যা দেখেছি, তাই বলেছি। তবু সুজাতাদির কত সাহস, ভাল লাগেনি বলে ছেড়ে আসতে পেরেছেন। আমরা? আমরা কি করব? তোকে তো কিছু ভাবতে হয় না, তাই তুই রাগ করতে পারিস। বলতে বলতে তাপসীর গলা যেন ধরে এল। বলল, আচ্ছা, আজ যাচ্ছি।

তাপসী বেরিয়ে গেল। সুমিতার বুক থেকে ভলকে ভলকে ছুটে আসা বস্তুটি অকস্মাৎ নেমে এল চোখের কোল প্লাবিত করে। একটা ভয়ঙ্কর অশ্লীল সত্য, যেটাকে ছলনা করে চলেছে একদিক থেকে আজ সারাটি বাড়ি, সেই কথাটিই যেন চাবুকের মত ছুঁড়ে দিয়েছে তাপসী। রাগ করুক তাপসী, কাঁদুক, সত্য বলুক, তবু বড়দির এতবড় অপমান ও কেমন করে নেবে গায়ে পেতে।

মন যখন একটু শান্ত হল, তখন ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল রবিদার মুখখানি। যে কথাটিকে নিজের মনেও স্বীকার করতে পারেনি কোনদিন, আজ হঠাৎ মনে হল, বড়দির এ অপমানের অনেকখানি গ্লানি বয়ে বেড়াচ্ছেন রবিদা।

কার ওপরে যে রাগ করবে সুমিতা। সংসারের এই অসহজ বিচিত্র নিয়মগুলির প্রতিই ওর দুর্জয় অভিমান হতে লাগল।

(১৬)

বড়দির জন্যে রবিদার গ্লানির কথাটি যে হঠাৎ এসেছে সুমিতার মনের অন্ধকার ছাপিয়ে, তা'তে ও নিজে অবাক হয়নি একটুও।

স্পষ্ট মনে পড়ছে রবিদার প্রতিটি কথা, প্রতিটি চাহনি, নিয়ত হাসি, যাওয়া আসা আর বড় বিচিত্র করুণভাবে বাবার মুখোমুখি নীরবে বসে থাকা।

জীবনের কূলে কূলে যখন চোরা বান আসে, তখন জীবন নিজেও জানতে পারে না, কতদূর উঠেছে সে ছাপিয়ে। সুমিতাও জানে না, বড়দিকে নিয়ে ওর চিন্তা ছাপিয়ে উঠেছে কতখানি।

ছায়া আসতে লাগল ঘনিয়ে। বেলা পড়ো পড়ো হয়েছে। সুমিতা উপুড় হয়ে পড়ে রইল খাটে। ঘর থেকে ছুটে যাওয়ার নিজের পাগলামিটা আজ পেয়ে বসেনি। তাপসী আজ মনের আর একটা দরজা খুলে দিয়ে গেছে মুখের ওপর। শুধু সেই কথাগুলিই চারদিক থেকে ঘিরে রাখল ওকে। সোসাইটি, প্রেস্টিজ, পজিশন, সিকিউরিটি আর ভয়ঙ্কর রকমের হ্যাপিনেস্।

যত বড় অপমানই হোক, তবু সবটা যেন আজ ধরা পড়ে গেল সুমিতার চোখে। কোন্ পথে যে রেহাই আছে, সেই বোবা ভাবনায় কান্না পেতে লাগল ওর।

বিলাস বলল দরজার বাইরে থেকে, ছোট দিদিমণি, সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

চমকে উঠল সুমিতা। তাড়াতাড়ি উঠে আলো জ্বালিয়ে বড়দির ঘরে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আলুথালু বেশ, চুল বাঁধাও হয়নি। মহীতোষ এসে দেখলে ভীষণ অবাক হবেন। জানে সুমিতা, শুধু অবাক নন, যে রকম ভীরু মানুষ, হঠাৎ চিন্তিত হয়ে পড়বেন।

ফিরতে গিয়ে দাঁড়াল আবার সুমিতা। যেন তীক্ষ্ণ চোখে, আয়নাতে তাকাল আর একজনের দিকে। তাপসীর ধামসানিতে জামাটি বিস্রস্ত হয়ে গেছে একেবারে। এই আলুথালু বেশে নিজেকে দেখে যত ওর লজ্জা করতে লাগল, ততই মনে হতে লাগল, ওর গা হাত পা, সমস্ত শরীরটি আশ্চর্য সুন্দর। বিচিত্র রূপ ওর চোখে মুখে। নিজেকে অনেকখানি বড় মনে হতে লাগল। তারপর মনে হল, সত্যি, ও যেন অবিকল বড়দির মতই দেখতে।

ভ্রূ কাঁপিয়ে, কেমন একটু যেন ভীত হেসে, নিজেকেই নিজে জিজ্ঞেস করল, আমার জীবনও কি বড়দির মতই হবে?

কিন্তু সমস্ত আয়নাটা জুড়ে নিজের অবয়বটাই একটা নিষ্ঠুর বোবা মূর্তির মত তাকিয়ে রইল সুমিতার দিকে। পরমুহূর্তে নিজের প্রতিই যেন বিরক্ত হয়ে, তরতর করে চলে গেল বাথরুমে।

মহীতোষ যখন এলেন, তখন সুমিতা পুরো ফিটফাট। কিছুই বলাবলি হল না। শুধু মহীতোষ সপ্রশংস দৃষ্টিতে সুমিতার সাজটুকু বোধ হয় দেখলেন। তারপর তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে, খাবার টেবিলে এসে বসলেন। সুমিতা চা ঢেলে নিল কাপে।

মহীতোষ আজ এতক্ষণ পরে বললেন, রবি আসেনি আজো?

সহসা সুমিতার দৃষ্টি নত হল। বলল, না। আর বোধ হয় আসবেন না।

অবাক হয়ে বললেন মহীতোষ, কেমন করে জানলে ?

মুখ নামিয়ে রেখেই জবাব দিল সুমিতা, আসেন না দেখে বলছি।

কিন্তু আশ্চর্য! বাবার প্রতি হঠাৎ অভিমানে কান্না পেতে লাগল সুমিতার। মনে হল, রবিদাকে বিমুখ শুধু বড়দি করেননি। বাবাও করেছেন। উনি কি কিছুই জানতেন না ?

কিন্তু মহীতোষের মোটা ভ্রূ দু'টি কুঁচকে উঠল বিস্ময়ে। বললেন কী হয়েছে রুমনো সাহেবা ?

সেটা ঠিক সুমিতা নিজেও বোধ হয় জানত না। মনের তলে তলে, কথাগুলি যে শেষ পর্যন্ত এত সেজেগুজে, হেসে, চা খেতে বসে, হু হু করে ছুটে আসবে, ভাবতে পারেনি একেবারে। বলল, বড়দি নিশ্চয় রবিদাকে কিছু বলেছে, তাই আর আসেন না।

সেকথা জানতেন মহীতোষ। তা'তে তিনি বিস্মিত হননি। কিন্তু বিস্ময় কাটল না ওর সুমিতাকে দেখে। তখনো তাকিয়ে রইলেন একইভাবে।

সুমিতা একটুখানি-সময় সাহস সঞ্চয় করে আবার বলল, তুমি তো জানো বাবা, বড়দি কিছু বললে, সবচেয়ে বেশী রবিদার বাজবে।

মুহূর্তে কী ঘটে গেল। মহীতোষ চায়ের কাপ নামিয়ে, খানিকক্ষণ অপলক অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকিয়ে রইলেন সুমিতার দিকে। আজকাল রুমনো সাহেবার অনেক কথা শুনেই এমনি করে তাকাতে হয়। বললেন, তোমাকে কি কেউ কিছু বলেছে নাকি এ সম্পর্কে ?

—কোন সম্পর্কে ?

—রবি আর উমনোর ?

—না।

—তবে ?

—আমি বুঝি বাবা।

বলে বাবার দিকে এক মুহূর্ত চোখ তুলে আবার নামিয়ে নিল সুমিতা।

মহীতোষের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। বললেন, কী বোঝ রুমনো সাহেবা ?

বাবার গম্ভীর স্বরে একটু যে ভয় না হল তা' নয়। কিন্তু তার চেয়ে বেশী মুখ আরক্ত হল লজ্জায়। একটু চুপ করে থেকে বলল, রবিদার নিশ্চয় অনেক কষ্ট হয় বাবা।

কিসের কষ্ট, কেন কষ্ট, না বললেও মহীতোষের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল সব। কয়েক মুহূর্ত কিছুতেই কথা বলতে পারলেন না। কেবলি মনে হতে লাগল, ছোট মেয়ে রুমনিও যেন ওঁরই পিতৃত্বের প্রতি রুষ্ট কটাক্ষ করছে। নইলে রবির কষ্টের কথা কেন স্নমিতাকে বলতে হবে। বললেন, চল রুমনো, আমরা বারান্দায় যাই।

দু'জনে বারান্দায় এলেন। রাস্তায় আলো জলছে। লোক চলাচল করছে। তবু সবই কেমন শান্ত, স্তব্ধ মনে হচ্ছে। মাঝে মাঝে, ভিতরের রাস্তার দিকে, সন্ধ্যাবেলায় কলকাতাকে অদ্ভুত নীরব বিষণ্ণ মনে হয়।

স্নমিতা মহীতোষের কাছ ঘেঁষে বলল, বাবা তুমি রাগ করলে ?

মহীতোষ – না, রাগ করিনি। তুমি ঠিকই বলেছ।

মহীতোষ আবার বললেন, কিন্তু আমার কোন দোষ নেই তা'তে রুমনো সাহেবা। রবি অনেক বড়, মহৎ ছেলে। কিন্তু তোমার বেলাও যদি আজ এরকম কিছু ঘটে, তবু আমি কিছু বলতে পারব না। বলা যায় না।

মহীতোষের বুকে হাত দিয়ে বলল স্নমিতা, থাক্, এসব কথা কেন বলছ বাবা ?

চোখে ওর জল এসে পড়ল। মহীতোষ স্নমিতার মাথায় হাত রেখে বললেন, বলছি, পাছে তুমি আমাকে ভুল বোঝ।

তারপর অনেকক্ষণ পর বললেন, রুমনো, তোমার বড়দির ব্যাপার আমি আজো ঠিক বুঝিনে। তবে আমাদের চোখ দিয়ে দেখা সবকিছুই খুব তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে যেন। হয়তো আরো বদলাবে, তখন তোমাদের আমি চিনতে পারব না একেবারেই। আমি ত্রিশ বছর আগে ভাবতুম একটা নতুন জীবনকে গ্রহণ করেছি। এর চেয়ে আগে বাড়ার ক্ষমতা যদি আমার না থাকে, তবে যেন আমাকে ভুল বুঝো না বাবা।

পাখার বাতাসও গরম লাগছিল স্নমিতার। মেজদি আর বাবা বেরিয়ে গেছেন। পাশের ঘরে কী যেন লিখছে বড়দি।

কাল স্নমিতার রেজাল্ট আউট হবে। থেকে থেকে সেই কথাটি মনে পড়ছে আর পাখার তলায় হাঁসফাঁস করছে গরমে। বসেছিল মেজদির চেয়ারে, টেবিলের সামনে। হঠাৎ ধাক্কা লেগে একটি ড্রয়ার একটু ভেতরে

ঢুকে গেল। টানতে গিয়ে খুলে এল ড্রয়ারটি। অবাক হয়ে ভাবল স্নিতা, এটা তো কোনদিন খোলা থাকে না। নিশ্চয় মেজদি ভুলে গেছে।

বন্ধ করতে গিয়ে কী ভেবে টেনে খুলল। কাগজ, খাম, পেন্সিল, পাস। একটি রূপোর বাটিতে কানের দুল, গলার হার। যেগুলি মেজদি কিছুতেই পরবে না। একটি ছোট্ট ভ্যানিটি ব্যাগ। আর একটু খুলল। একটি ইংরেজী কবিতার বই। তার পাশে একটি খাম। ওপরে ইংরেজীতে লেখা, সুগতা বন্দ্যোপাধ্যায়—কলিকাতা। কিন্তু পোস্টাল খাম নয়।

হাত দিয়ে খামটা খুলতেই কেমন ধক করে উঠল বুকের মধ্যে। রেখে দিয়ে দরজার দিকে ফিরে তাকাল ভীত চোখে। দরজা জানালা নিজেই দিয়েছিল বন্ধ করে বাইরের হলকার ভয়ে, তবু হাত দু'টি যেন কেঁপে উঠল, আর মনে পড়ল মেজদির সেই দৃপ্ত কঠিন মুখখানি। পরমুহূর্তেই নিজেকে ধিক্কার হেনে, বন্ধ করে দিল ড্রয়ার। ছি! হয়তো মেজদির পরীক্ষার নোট কিংবা ছাত্র সমিতির কিছু। নয়তো, যা খুশি তা-ই। ওর মনে এত কৌতূহল, বুকে দ্রুত তাল কেন।

উঠতে গিয়ে আবার বসল। ঘামে ভিজে উঠল জামা। মুখেও ঘাম দেখা যাচ্ছে। আশ্চর্য। অবিশ্বাসী সাপের মত হাতটা আবার পিল্‌পিল্ করে এগিয়ে যাচ্ছে ড্রয়ারের দিকে। মন যত বলছে, না, না, ছি ছি! ততই ওর নিজের হাত বশে থাকছে না। আবার হাত ফিরিয়ে নিয়ে এসে, সারা শরীর শক্ত করে রইল দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে। তবুও যেন কী এক দারুণ শক্তিতে হাত উঠতে চাইছে। শেষ মুহূর্তে চোখ ফেটে জল এসে পড়ল। না না, কখ্‌খনো না। যা-ই থাক, যা-কিছু, কিছুতেই হাত দেবে না।

কিন্তু ততক্ষণে, ড্রয়ার খুলে খামটি খুলে তুলে নিয়েছে হাতে। তুলে নিয়ে খুলে ফেলেছে। একটি নীল আর একটি শাদা কাগজ। দু'টিই লেখা কাগজ। দু'টিই পত্র, দু'জনের হাতের লেখা। একটি ছোট ছোট প্যাঁচানো লেখা, আর একটি বড় বড়, ধরে ধরে সুন্দর করে লেখা। যে ভয়ে স্নিতা খুলতে চায়নি, দেখতে চায়নি, সেই জিনিসই দু'টি। দু'টি পত্র, একসঙ্গে। আশ্চর্য! কেন?

কিন্তু একী অবোধ কৌতূহল ওর। কী ভয়ঙ্কর দুঃসাহস! কেমন করে নিজের সঙ্গে এমন করে বিশ্বাসঘাতকতা করছে স্নিতা। অসহ্য গরমে কাপড়

ফেলে দিল গা' থেকে। ততক্ষণে অবিশ্বস্ত দৃষ্টি দ্রুতগামী পিঁপড়ের মত পিল্‌পিল্ করে বেয়ে চলেছে লেখার ওপর দিয়ে। বড় বড়, ধরে ধরে লেখা নীল-পত্রখানির লাইন ধরে ধরে।

স্বগতা,

মুখে বলার সাহস নেই বলেই বোধহয় পত্রের আশ্রয় নিতে হচ্ছে। সেজন্যে দোষ নিওনা। যদিও প্রতিমুহূর্তেই ভয় পাচ্ছি, এরকম পত্র লিখে মনের কথা বলতে চাওয়াটাই তোমার নিজের চরিত্রানুযায়ী একেবারে বিপরীত ঠেকবে। যদি ঠেকে, তবে জানবে, আমার সমস্ত দিক থেকেই যে-কথা বলা প্রয়োজন বোধ করছি কিছুদিন থেকে, যে-কথা আমার দিক থেকে না বললে আর চলে না, সে-কথা বলতেই পত্র লিখতে হচ্ছে। একথাও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, পারলে মুখে বলতাম নিশ্চয়ই। বলবার আশা নিয়ে অনেকদিন গিয়েছি তোমার সামনে। বিরক্ত হয়েছ, কিংবা রাগ করেছ, নয়তো অবাক হয়েছ মনে মনে আমাকে দেখে। হয়তো বা হেসেছ মনে মনে আমার অবস্থা দেখে। কিন্তু তোমার সতেজ মূর্তি নিয়ে, সহজ দৃপ্ত চোখে যেই তাকিয়েছ, আমার সবই এলোমেলো হয়ে গেছে মনের মধ্যে। তোমার হাসির ধারে এমন একটা গাম্ভীর্যের রেশ লেগে থাকে যে, সামনাসামনি গিয়ে আর আমার কিছু বলবার সাহস থাকে না। ভয়, পাছে হাসি ভেদ করে তোমার ওই গাম্ভীর্যটাই থমথমিয়ে ওঠে।

তবুও তোমাকে যে হাতে হাতে পত্র দিতে সাহস করছি, সে ভরসাটুকু দিয়েছ তুমিই। আমি জানি, তুমি অবাক হবে প্রথমে, কিন্তু যে ভাবান্তরটুকু ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছ আমার, তা'তে নিশ্চয়ই ঐটুকু বুঝেছ, মুখে না বলি, যেমন করে হোক, এবার কিছু একটা বলতেই হবে আমাকে।

সেদিন ব্যুফেতে, জলের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে তুমি, 'কি ব্যাপার? আজকাল যে তুমি আস্তে আস্তে বোবা হয়ে যাচ্ছ একেবারে?'

আমি বললাম, 'কিছু বলতে পারছিনে।'

তুমি তাকিয়ে রইলে দূর গঙ্গার দিকে। তোমার মুখে কিছুক্ষণ জলের ঝিকিমিকি দেখা গেল। তারপর গম্ভীর হয়ে উঠলে আস্তে আস্তে। বুঝলাম, আর কিছু বোধ হয় শুনতে চাওনা তুমি আমার কাছ থেকে।

আরো এরকম অনেকদিন, অনেক সময় গেছে। কতদিন তোমার অজান্তে তোমার দিকে তাকিয়ে থাকতে গিয়ে হঠাৎ চোখোচোখি হয়ে গেছে। পরশুদিন তুমি কমিটি মিটিং-এর পর বাইরে এসে পরিষ্কার বলেই ফেললে আমাকে, 'তোমাকে এত অন্যমনস্ক দেখছিলুম যে।'

আমি বললাম, নিশ্চয় কারণ আছে।

কিন্তু সে কারণ তুমি শুনতে চাইলে না। তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের বাড়ি পর্যন্ত গেলাম। তুমি যেন ভয়ে ভয়ে শুধু পড়া আর ছাত্র-সঙ্ঘের কথা-ই বললে। তার চেয়ে, তুমি নীরব থাকলেও ক্ষতি ছিল না। পড়া কিংবা সঙ্ঘকে আমি খাটো করছিনে, কিন্তু তখন বড় অবান্তর বোধ হচ্ছিল। সত্যি, ফ্যাশানের খুবই ভক্ত ছিলাম। তুমি যেদিন প্রথম হেসে বিদ্রূপ করলে, আর ফ্যাশানের দিকে এগুতে পারলুম না। যদিও পোশাকটাই মানুষের সব নয়, পরে তুমিই বলেছ। বাড়ির গাড়িতে করে উনিভার্সিটিতে আসতাম, কলেজেও আসতাম। যে কোন কারণেই হোক, তোমার এবং অনেক বন্ধুর চোখে ওটা খারাপ ঠেকেছিল। সেদিন থেকে গাড়ি চড়াটা ছেড়ে দিয়েছি। যদিও আমাদের বাড়িতে আর গাড়ি চড়ার লোক কেউ নেই। গাড়িটা আমি আমার মায়ের সম্পত্তি হিসেবে পেয়েছি। আমার দিদিমার আর কেউ নেই (হেসোনা যেন, তোমাকে সব লেখা দরকার), একমাত্র দৌহিত্র হিসেবে তাঁর দু' লক্ষ টাকা, বাড়ি, গাড়ি সবই বর্তেছে আমাতে।

আর আমার সম্পর্কে যা শুনেছ, তোমার চোখের স্পষ্ট ঘৃণায় যা দেখেছি আমি, তার অনেকখানিই সত্যি। ছাত্র আন্দোলনে আসাটা আমার অনভিপ্রেত ছিল না। আমার উপর সবাই বিরূপ বলে আমি ঘেঁষতাম না। কিন্তু এখন ঘেঁষছি। মিশছি এবং মোটেই তো অসহজ বোধ করছি না। অবশ্য, তুমি এবং আরো কয়েকজন বন্ধুর কাছে জীবনের নতুন শিক্ষা পাঠ করেছি আমি। এখন তুমিও বল মাঝে মাঝে, 'গাড়িটাকে সত্যি জং ধরিয়ে দিও না।' যথেষ্ট, ওইটুকুই আমার ভরসা। টাকা, গাড়ি, এসব মানুষের জীবনে অনেকখানি প্রয়োজনীয়, বিশ্বাস কর নিশ্চয়ই। তবু বলব, পূর্বে যা শুনেছিলে তার অনেকখানিই সত্যি।

আমি মদ খেতাম। মদ খেয়ে শেষ পর্যন্ত আমার মা দিদিমার সামনেও গিয়েছি মাতাল হয়ে। পঙ্কের শেষ সীমা পর্যন্ত নেমেছি, অস্বীকার করিনে। (বড় ভয় হচ্ছে, এই মুহূর্তেই হয়তো চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলবে কুটিকুটি

করে। তবুও) বহুদূর নেমেছিলাম, উঠতে পারতাম কিনা জানি না। যদি না, দেখা হত তোমার সঙ্গে।

এই মুহূর্তে আমার সত্যি কথা বলার সময় এসেছে। আমি ভাবতে পারিনে তোমার পাশে নিজেকে নিয়ে ফিরব কেমন করে। তোমার জীবনের উচ্চতার সঙ্গে, দৃঢ়তার সঙ্গে গা' মিলিয়ে চলতে পারব কিনা জানিনে। সেই চেষ্টা করব। শুধু যদি এসো পাশে—আমি আমার জীবনের ঐশ্বর্যের দুর্দশা থেকে অনেকখানি রেহাই পাব তবে।

আর একটু লিখি। সেদিন আমার চুলের ঝুঁটি ধরে নাড়িয়ে যখন বললে, 'মশাই, ছেলেমানুষের মত অতক্ষণ ধরে কী দেখছিলে আমার দিকে', তোমার সেই মুহূর্তের মূর্তি স্মরণ করে পত্র না লিখে আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতে পারলাম না। পত্র পেয়ে যদি রাগ না কর, অপমান বোধ না কর, তবে নিশ্চয়ই আবার তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে। ইতি—

মৃণাল।

সুমিতার ভয়ার্ত অস্থিরতাটা কেটে এসেছে অনেকখানি। কিন্তু যেন জামা গায়ে জলে ডুব দিয়ে উঠেছে। ভয়েলের জামা লেপ্‌টে গেছে সারা গায়ে। চিঠির তারিখ দেখে বুঝল, ছ' মাস আগের চিঠি।

তারপরে আর একটি চিঠি। আশ্চর্য। মেজদি এই দু'টি চিঠি-ই রেখেছে পাশাপাশি। কেন? তখন ওর মনের ধিক্কার গেছে, বিশ্বাসের মর্যাদা গেছে। বৃশ্চিকের মত কিল্‌বিল্‌ করে চোখের নজর চলল খুদে অক্ষরের প্যাঁচানো লেখার চিঠিটার গা বেয়ে।

সুগতা,

অবাক হয়েছি তোমার চিঠি পেয়ে। হঠাৎ চিঠি দিতে গেলে কেন? সারাদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে, বাড়ি এসে দেখছি, তোমার পত্র। আবার দেখছি, জবাব চেয়েছ পত্রে। ভীষণ হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু তোমার পত্র পড়ে পুরোপুরি হাসতে পারিনি।

ছাত্র-আন্দোলনটাকে আমি তোমাদের কয়েকজনকে দেখে সঙ্কীর্ণ বলি নি। কিন্তু জীবনের গভীরতর প্রদেশে যতই এগুব, আমার মনে হয়, ততই আমি ওদিক থেকে সরে আসব। সেটা হয়তো আমার মনের গঠন প্রকৃতি। আমি যে পরিবেশে, যে ঘরে মানুষ হয়েছি, সেই মন নিয়ে আমাদের জাতীয় জীবনে ব্যাপকতাকে কেন যেন খুঁজে পাইনে এখানে। ছাত্রের শিক্ষা, মাইনে,

স্বাস্থ্য ইত্যাদি খুবই গুরুতর বিষয়, তার জন্যে এখনো প্রচণ্ড আন্দোলনের প্রয়োজন আছে, থাকবেও অনেকদিন। তা' ছাড়া মধ্যবিত্ত যুবশক্তির বিরাট অংশ এখানেই।

তবু জীবনের গভীরতম, ব্যাপকতম প্রদেশটাকে আমি যতই অনুসন্ধান করতে গেছি, ততই দেখছি, আমার মন চলে যায় সম্পূর্ণ ভিন্নতর মানুষ ও জনপদের দিকে। সেখানে প্রতিমুহূর্তেই নিজের মনটাকে, অর্থাৎ চিন্তার পরিধিকে বড় সঙ্কীর্ণ ছোট্ট একটুখানি মনে হয়। মনে হয়, আমি একটুখানি। জিজ্ঞেস করলে এদেশের কোন কথাই আমি বলতে পারব না।

সে সব যাক, আমি তো এখুনি যাচ্ছিনে। তোমার চিঠি পেয়ে অবশ্য আমার লোভ হচ্ছে—চিরকাল কলকাতার ছাত্র আন্দোলন নিয়েই না হয় কাটিয়ে দিই। কিন্তু, তারপর যে তোমরাই একদিন আমাকে ছেড়ে যাবে না, তা' বুঝব কেমন করে। এখন তো আমাকে প্রায় গুরুদেব করে ফেলেছ, (যদিও গুরুবাদে আমি একেবারেই বিশ্বাসী নই) তারপর ?

একে তো চটকলের কেরানীর ছেলে। এম এ পাশ করেও একটা বড় চাকরি নয়, রাজনীতি। সেটা রাজনীতি কি না তাও বলতে পারিনে। বরং বলা যায়, মানুষ আমি যত ছোটই হইনা কেন, আমার কিছু বলার আছে। আমি বলতে চাই, এবং তারই সন্ধানে আছি। ভাগ্যি ভাল, আমার মায়ের কোন বাধা নেই, যদিও তাঁর সঙ্গে আমার ঘোরতর বিরোধ। তিনি আমাকে বলেন, প্রাণহীন নিষ্ঠুর। কেন জানিনে। তবু আমরা একসঙ্গে বাস তো করি। তোমরা নিষ্ঠুর বলেও তো এক সঙ্গে থাকতে পারবে না।

যাক্, ঠাট্টাটাকে কিছু মনে করো না। তুমি আমার চিরদিনের সাহচর্য চেয়েছ, এমন কী দেশান্তরে, পথে পথে ফিরবে শত দুঃখেও। আমি আছি, তুমি এলে তোমাকে কেউ আটকাতে পারবে না। মানুষের নিজের মনের কাছে স্বীকৃতিটাই অনেকখানি। পত্র পড়ে মনে হল যেন, কিসের একটি অদৃশ্য ভয় তোমাকে তাড়না করছে। সেটাও মনের মধ্যে ছায়া ফেলেছে বাইরের কোথাও থেকে এসে। তাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, কেননা, ওটাও নিজের মনের। তুমি না চাইলে সে আপনি উবে যাবে।

কিন্তু আর যা-ই কর, আমাকে খুব বড় করো না। তা'তে তুমি, পরে বন্ধুরাও অনেক দুঃখ পেতে পার। আমিও পারি। আমাকে বিশাল ও

কঠিন ভেবে এড়িয়ে যাবার কিছু নেই তোমার, ভয় পাবারও কিছু নেই। আমার বন্ধুত্ব রইল তোমার জন্য চিরকাল, যে কোনো অবস্থাতে।

শেষবার, আবার একটু ঠাট্টা করছি—বড়ো সেন্টিমেণ্টাল মেয়ে বাপু তুমি।

ভালবাসা ও শুভেচ্ছাসহ,

রাজেন।

সমস্তটাই, স্টীম-চালিত যন্ত্রের মত করল সুমিতা। পত্র দু'টি শেষ করেই, ঠিক যেমনটি ছিল, রাখল তেমনি করে। তারপর যেন অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল শূন্য চোখে। স্খলিত জামার বুকের গহনে কল্‌কল্‌ নির্ঝরিণী বইছে ঘামের। উঠে গিয়ে খুলে দিল একটি জানালা। তারপরেও যেন দূর বাড়িগুলি পেরিয়ে, তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে। যা পড়েছে, সবটুকু আর একবার পড়ে নিচ্ছে মনে মনে।

কিন্তু ভয়? কোন্‌ অদৃশ্য ভয় তাড়না করছে মেজদিকে? সেই ভয়ের নাম কী? বড়দিকেও কি ওই ভয় তাড়না করেছিল বিয়ের আগে? না, সুমিতার মেজদি কেন ভয় পাবে? মেজদি দুর্জয় সাহসিনী। সে ভয় পাবে না, কখনো না।

(১৭)

ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই প্রায় লাফ দিয়ে বিছানা ছাড়লে সুমিতা। কাল সারারাত প্রায় ঘুমোতে পারেনি। উঠেই মনে হল, বাড়ির সবাই জেগে গেছে। বেলা হয়ে গেছে ওর। আসলে মহীতোষ ছাড়া তখনো বিছানা ছাড়েনি কেউ। পাশের বিছানায় এলোখোঁপায় মুখ গুঁজে মেজদি তখনো অচৈতন্য। সুমিতা ছুটে গেল বাইরের ঘরে। কিন্তু টেবিলটা ফাঁকা। সেখানে খবরের কাগজটি নেই। ছুটে গেল বাগানে। মহীতোষ ছিলেন সেখানে তাঁর নিত্যকর্মে। সুমিতা গিয়ে বলল, কাগজ আসেনি বাবা?

মহীতোষ বললেন, এখনো তো সময় হয়নি। দাঁড়াও, অত ব্যস্ত হলে কি চলে। তোমাদের রেজাল্ট নিয়ে বেরুবে। আজ একটু বা দেরিও হতে পারে।

মহীতোষের ঠোঁটের কোণে লুকনো স্নেহের হাসিটুকু ওর চোখে পড়ল না। বলল, কেন?

মহীতোষ হেসে উঠলেন। বললেন, অতগুলো ছেলেমেয়ের পাশের খবর ছাপতে হবে তো কাগজওয়ালাদের।

কী দুশ্চিন্তা সুমিতার। আবার কী একটা বলে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু বাবার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই হেসে উঠল দু'জনে।

হাসির মধ্যেও উৎকণ্ঠার স্বরে বলল সুমিতা, বিলাসকে দিয়ে রাস্তা থেকে একটা কাগজ কিনতে পাঠিয়ে দেব বাবা?

মহীতোষ হেসে বললেন, কেন, আধ ঘণ্টার মধ্যেই কাগজ এসে পড়বে। এত উতলা হচ্ছ কেন তুমি? এদিকে এসো।

কাছে গেল সুমিতা। মহীতোষ কয়েক মুহূর্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার কি মনে হচ্ছে? পাশ করবে তো?

দু'হাতে বাসি চুল সরাতে গিয়ে সলজ্জ হেসে মুখ ঢাকল সুমিতা। বলল, কেমন করে জানব।

পরীক্ষা তো তুমিই দিয়েছ।

সুমিতা নীরব। মহীতোষ বললেন, মনে হচ্ছে কাল সারারাত ঘুমোওনি।

চমকে বলল সুমিতা, ঘুমিয়েছি তো।

মহীতোষ আর একবার সুমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে সূর্যমুখীর গোড়ায় প্যাকেটের মশলা মেশাতে লাগলেন।

সুমিতার হঠাৎ কেমন লজ্জা করতে লাগল। সত্যি, ও তো সারারাত কাল ঘুমোতে পারেনি। কিন্তু সে তো পরীক্ষার জন্যে নয়। অন্য ভয়, অন্য চিন্তায়।

আবার ছুটে গেল ও বাইরের ঘরের বারান্দায়। গেল গেটে, রাস্তার ধারে। কেউ কেউ যাচ্ছে কাগজ হাতে। ইচ্ছে করছে, টেনে নিয়ে নিজের রেজাল্টটা দেখে নেয়। ইতিমধ্যে সুগতাও এসেছে বাইরে। তারো সেই একই কথা, কাগজ এসেছে, রুমনি?

—না।

কাগজ, কাগজ। কোন খবরের দরকার নেই। শুধু সেই সাপ্লিমেণ্টটা পেলেই হয়। অন্যদিনের চেয়ে একটু দেরি করেই আজ কাগজ এল। খুলেই, ধকধকে বুকে আগে সেণ্টারের নাম। তারপর রোল রেজেষ্ট্রি···পাশ।

পাশ করেছে সুমিতা। ফার্স্ট ডিভিশনেই পাশ করেছে। কী করবে এবার সুমিতা। কী করবে!

মহীতোষ ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করলেন, পাশ?

সুমিতা আরক্ত মুখে হেসে চট করে একেবারে নুয়ে পড়ল বাবার পায়ে।

মহীতোষ অবাক হয়ে বললেন, আরে, করিস কী?

সবচেয়ে অবাক সুগতা। এরকমভাবে প্রণামের ব্যাপারটা তো ছিল না কোনদিন এ বাড়িতে। কোত্থেকে আমদানী করলে এসব রুমনি।

তাতে কী লজ্জা সুমিতার। সত্যি, এ ও কী করে ফেললে। ইচ্ছে করে নয়, এছাড়া যে এ মুহূর্তে ও আর কিছু ভেবেই পেলে না। শুধু তাই নয়, মেজদিকেও একটা প্রণাম করে ফেললে।

সুগতা তো প্রায় সুড়সুড়ি লাগার মত হেসে ধম্‌কে উঠল, এই রুমনি।

মহীতোষ বললেন, পাগল।

সুমিতা ছুটে গেল বড়দির কাছে। তাকেও প্রণাম করলে।

সুজাতা বলল, আরে? কি হয়েছে?

—পাশ করেছি, বড়দি।

অবাক হয়ে বললে সুজাতা, সেজন্যে নমস্কার করতে হয় বুঝি।

নিঃশব্দে হাসল সুমিতা। ভাবল, বড়দি নিশ্চয়ই ওকে শিবানীর পর্যায়ে ফেলে একেবারে আন্‌কাল্‌চার্ড ভাবছে।

মহীতোষ এগিয়ে এসে দু'টি দশ টাকার নোট বাড়িয়ে দিলেন সুমিতার দিকে। বললেন, এটা তোমার পুরস্কারের ফাউ। আসলটা পরে পাবে। সেটা অবিশ্যি টাকা নয়।

সুমিতা নোট দু'টো নিয়ে বলল, কী করব বাবা টাকা দিয়ে?

যা তোমার খুশি। বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে একটু বেড়াবে, খাবে আজ।

সেই মুহূর্তে বাকী দুই বোনেরও মনে পড়ে গেল পুরনো দিনের কথা। তখন আরো জমজমাট ছিল। রিটায়ারের আগে মহীতোষের গাড়ি ছিল। খাওয়া বেড়ানো ছাড়াও বই, শাড়ি, সোনার গহনা পুরস্কার দিয়েছেন প্রত্যেকটি পাশের সময়ে। মেজদি তার কিছুটা পেয়েছে। সুমিতা সামান্য।

গুল্‌তোনিটা একটু থামতেই সকলের নজরে পড়ল, সুজাতা আজ স্নান করতে চলেছে সকলের আগে। এতক্ষণে সকলের খেয়াল হল। সকলের পরে বিছানা ছাড়ে সুজাতা, প্রায় মহীতোষের বেরিয়ে যাবার সময়ে। আজ

সাতসকালে স্নান। শুধু তাই নয়। জানা গেল, তাড়াতাড়ি খাবার কথাও বিলাসকে বলে রেখেছে সুজাতা।

মহীতোষ জিজ্ঞেস করলেন, তোমার আজ এত সকাল সকাল যে উমনো।

সুজাতা সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, একটু কাজ আছে।

এইটুকুই শুনলে সবাই। দেখলে, মহীতোষের মুখে একটু ছায়ার আভাস। বোঝা গেল, এর বেশী শোনা যাবে না আর কোন পক্ষ থেকেই।

সুমিতার মনে হল, ওর পাশ করার আনন্দে যে আলোটুকু ছড়িয়েছিল বাড়িতে, কয়েক পোঁচ অন্ধকার নামল তা'তে।

মহীতোষ আর বিশেষ কোন কথা না বলে মন দিলেন নিজের কাজে। মেজদি কোন কিছুই জিজ্ঞেস করবে না বড়দিকে। শুধু সুমিতাই এক ফাঁকে না জিজ্ঞেস করে পারলে না—কোথাও বেড়াতে যাবে নাকি বড়দি ?

এখানে জবাব আরো সংক্ষিপ্ত, না।

মহীতোষের একটু পরেই বেরিয়ে গেল সুজাতা।

আস্তে আস্তে নানান কথার অলিগলি দিয়ে গতকাল রাত্রের কথা মনে পড়ল সুমিতার। বড়দির পাশ দিয়ে উঁকি দিল মেজদির প্রসঙ্গ।

সুমিতা কাল প্রায় সারাটি রাত্রি ঘুমোতে পারেনি। মেজদি বাড়ি আসার পর থেকে কী ওর অস্বস্তি। প্রতি মুহূর্তে ভয়, ড্রয়ার খুলেই মেজদি চমকে তাকাবে তীক্ষ্ণ চোখে। জিজ্ঞেস করবে, এ কি! আমার ড্রয়ারে হাত দিয়েছিল কে ?

তখন যে সুমিতার কিছুই বলার থাকবে না। কেঁদে ক্ষমা চেয়েও মনের গ্লানি তো যাবে না। একটি অবিশ্বাসের অদৃশ্য চিহ্ন নিয়ত ঘুরবে ওর পিছনে পিছনে!

মেজদি যতক্ষণ ড্রয়ারে হাত দেয়নি, ততক্ষণ ঘুমের ভান করে পড়ে থাকতে হয়েছে কাল। অনেকক্ষণ পর, অনেক পড়ার পর, শুতে যাবার আগে মেজদি ড্রয়ার খুলেছে। নাড়াচাড়া করেছে এটা সেটা। সুমিতার মনে হয়েছে, সুগতা নাড়াচাড়া করছে ওর হৃৎপিণ্ডটা নিয়েই। তারপর দেখেছে, খামটাও হাতে করতে। সেই সময়ে কালঘামে প্লাবিত হচ্ছিল সুমিতা।

মেজদি রেখে দিয়েছে খামখানি। আবার বই পড়েছে। কিংবা পড়ার বই পড়ছে না, রাজনীতির বিষয় খুঁটছে অক্ষরে অক্ষরে।

সেই মুহূর্তে সুমিতার ভয় ও অপমানের গ্লানিটি গেছে ছেড়ে। এমনি

মানুষের মন। অথচ কিছুক্ষণ আগেই ভাবছিল, এ গ্লানি ওর কোনদিন কাটবে না। তবুও ঘুমোতে পারেনি সারারাত ধরে। তখন ওর অবসর এসেছে, চিঠি দু'টির কথা ভাববার। রাজেনের চিঠিটা মৃণালের পরে। প্রায় তিনমাস বাদে। দু'টি চিঠির দুই সুর। সেই ভিন্ন সুরের রূপ বিশ্লেষণ সম্ভব নয় সুমিতার পক্ষে। কিন্তু মানুষ দু'টি পরিষ্কার ধরা পড়ে যায়। হয়তো, চিঠির নীচে নাম না দেখলেও, লেখককে চিনতে পারে সুমিতা।

কিন্তু অনেক গরমিলের মধ্যেও, একটি মিল আছে দু'জনের। একজন চেয়েছে, আর একজন সাড়া দিয়েছে ডাকের। দু'টি মিলিয়ে একটিই হয়, তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে ভালবাসি। কিন্তু, ভয়? ভয় কেন পাবে মেজদি?

তারপর মনে হল, রাজেনের তিনমাস আগের চিঠির সঙ্গে সেদিন ঝড়ের রাতের কোথায় একটি মস্ত অমিল দেখা দিয়েছে। যার কাছে মেজদি লিখে পাঠায় মনের ভয়, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে চায় জীবনের দুর্গম পথে পথে, ঝড়ের রাতে মেজদির ঠিক সেই রাজেনকে তো চোখে পড়েনি একবারো।

বেলা তিনটে নাগাদ এল বিনয়। পাশ করার আনন্দটা আর একবার ঝলকে উঠল সুমিতার। কিন্তু পরমুহূর্তে লজ্জিত হয়ে জিজ্ঞেস করল বিনয়কে, পাশ করেছ

বিনয় ভয়ঙ্কর সেজে এসেছে আজ। কোঁচা পড়েছে লুটিয়ে। মাথার মাঝখানের সিঁথিটা অস্পষ্ট হয়ে সমস্ত চুলেই একটু ব্যাকব্রাশের লক্ষণ। ভারী নিরুৎসুক গলায় বলল, করেছি, কিন্তু তোমার মত নয়।

—আমার মত নয় মানে?

—তুমি ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছ। আমি থার্ড।

সুমিতা অবাক হয়ে বলল, কী করে জানলে। তুমি আমার রোল নাম্বার জানতে?

বিনয় ওর অভ্যস্ত সকরুণ লজ্জায় বলল, মনে করে রেখেছিলুম।

সুমিতা ঠোঁট টিপে হেসে একবার দেখলে বিনয়ের আপাদমস্তক। তখুনি কী একটা বলবে বলবে করেও সামলে নিলে নিজেকে। বলল, তবে যে বলেছিলে, পাশ করতে পারবে না।

বিনয় বলল, তখন তা-ই মনে হয়েছিল। কিন্তু আর আমি কিছুতেই পড়ব না।

অনেকখানি গাম্ভীর্য দিয়ে বলার চেষ্টা করেও কথার মধ্যে ওর ছেলেমানুষের আব্দারের সুরটিই পরিস্ফুট। সুমিতা বলল, কেন? সেই গান?

বিনয় চকিতে একবার দেখে নিল সুমিতার মুখের দিকে। তারপর বলল, হ্যাঁ। হোল্‌টাইমার না হলে কোন বিষয়ে সিদ্ধিলাভ হয় না। অল্‌রেডি একজন ওস্তাদের কাছে ভর্তি হয়েছি। কিন্তু হলে কি হবে। বাড়িতে ভীষণ আপত্তি।

বিনয়ের এ করুণ অবস্থার মধ্যেও হয়তো হেসে ফেলত সুমিতা। সামলে নিয়ে বলল, চল বেরুই।

বিনয় চকিত উচ্ছ্বাসে ঝলকে উঠল। বলল, আমি বলতে যাচ্ছিলুম। যাবে?

লাল টকটকে শাড়ি পরে, সারা ঘর আরক্ত করে এসে দাঁড়াল সুমিতা। ভয়েলের লাল শাড়ি যেন সারা গায়ে তরল আগুনের মত গলে পড়ছে তার সর্বাঙ্গে। লাল লিনেনের জামাটা ওর এতদিনে কাঁধ থেকে নেমেছে একটা দুঃসাহসিক পর্বত-চূড়ার সঙ্কীর্ণ কিনার ঘেঁষে। কিন্তু জামার সাহসের চেয়ে মনের সাহসটা কম বলে, হেলায় বাঁধা একটি বিনুনি ওকে লতিয়ে দিতে হয়েছে বুকের খোলা সীমানায়। বোঝেনি, আড়াল করতে গিয়ে আরো একটি চোখ-টানা-চিহ্ন ওতে আঁকা হয়ে গেছে।

শাড়ির এ তরল আগুন ঝল্‌কে উঠল বিনয়ের চোখে। ওর যৌবনের নতুন খোলা দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে রক্তে রক্তে অনুভব করল একটি বিচিত্র বোবা বিস্ময়-মুগ্ধ উত্তেজনা।

সুমিতা কিছুতেই লজ্জা চাপতে পারছিল না। তখনো মুখের স্নো ঘষার অছিলায় সারা মুখে হাত বুলিয়ে ঢেকে রাখতে চাইছিল। শেষ পর্যন্ত ওকেই বলতে হল, চল।

প্রায় চমকে উঠে বললে বিনয়, হ্যাঁ, চল। কাউকে বলে এলে না?

—বলে এসেছি মেজদিকে।

মেজদি। ধক করে উঠল বিনয়ের বুকের মধ্যে। সুগতাদি। সুমিতা হেসে বলল, তোমার খুব ভয়, না?

বিনয় টেনে বলল, না—তবে···

সুমিতার দিকে চেয়ে সে প্রসঙ্গ আবার ভুলে গেল। বলল, কোথায় যাব?

কোথায়! সেটা একটা সমস্যা। কেননা, যেখানে খুশি সেখানেই যাওয়া যায়।

বিনয় আবার বলল, কিন্তু আজ একদম হাঁটব না। ট্রামে বাসেও নয়। স্রেফ ট্যাক্সি চেপে বেড়াব।

সুমিতা বলল, বেশ। সারা কলকাতাটা ঘুরব।

ওরা দু'জনেই অনুভব করছিল, সকলেই তাকিয়ে দেখছে ওদের দু'জনাকে।

বড় রাস্তায় এসে ট্যাক্সি ডেকে উঠতে গিয়ে হঠাৎ সুমিতা যেন চমকে ডাক দিল, আচ্ছা, বিনয়—

—বল।

চোখ বড় করে বলল, এক জায়গায় যাবে?

—কোথায়?

—ছাত্রসঙ্ঘের অফিসে।

—কেন

—রাজেনদার সঙ্গে দেখা করতে।

বিনয়কে একটু বিমর্ষ দেখাল। কিন্তু সাহস পেল না আপত্তি করতে। বলল, কিন্তু সেখানে বেশী দেরি হয়ে যাবে।

—দেরি আবার কি? বেড়াতে বেরিয়েছি। দেখা করে চলে আসব। তোমাকেও তো রাজেনদা খুব ভালবাসেন। পাশ করে দেখা করবে না?

এবার বিনয়ই একটু লজ্জিত। বলল, না তা নয়, যাবনা কেন? চল।

গাড়িতে বসে বিনয় যতবার দেখল সুমিতাকে, ততবারই চোখে পড়ল, হাসি ও অভিমানে এক বিচিত্র আলোছায়ার খেলা ওর মুখে। একেবারে গায়ে গায়ে বসেনি। তবু বিনয়ের রক্তধারা এক নতুন প্লাবনে ঘোলা হয়ে উঠছে। যেন এক পাগলা ঘূর্ণির আবর্তে দিশেহারার মত্ততা পেয়েছে প্রাণ।

বলল, কি ভাবছ সুমিতা?

সুমিতা বলল, রবিদার কথা। একবারো এলেন না। আচ্ছা বিনয়, আজ একবার রবিদাদের বাড়ি যাব, কেমন। তারপরে, দু'জনে বেরিয়ে পড়ব।

বিনয়ের উপায় ছিল না ঘাড় কাত করা ছাড়া। সুমিতার মুখের আলো-ছায়াটা ওইখানেই।

গাড়ি ছেড়ে দিয়ে দাঁড়াল এসে দু'জনে ছাত্রসঙ্ঘের অফিসে।

সারা ঘরটি ধুলোর আর পুরনো পোস্টার লিফলেটের জঞ্জালে ভরা। টেবিল চেয়ারও নড়বড়ে, ধুলোমাখা। দেয়ালে পোস্টার। ছেচল্লিশের ছাত্র শহীদদের ফটো। দোমড়ানো দলা পাকানো ফেস্টুন। সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে গান্ধীজীর দন্তহীন স্নিগ্ধ হাসি মাখানো ফটোখানি। তবু সব মিলিয়ে কেমন একটা রুদ্ধশ্বাস কারখানার মত মনে হল সুমিতার।

রাজেন ছাড়া আর একজন বসেছিল পাশে। চেনা চেনা, কিন্তু অচেনা। শান্ত শিষ্ট, মোটা লেন্সের চশমা-চোখে একটি যুবক। ভাবের ঘরে ডুব দেওয়া চোখ। আশ্চর্য একটি তন্ময়তা দৃষ্টিতে। বসে আছে কাঁধে নিয়ে মস্ত একটি ঝুলি।

ওদের দু'জনকে দেখেই রাজেন অবাক, হেসে ডাক দিল, আরে, এসো এসো। কি ব্যাপার, একেবারে এখানে?

কাছে এল দু'জনেই। সুমিতা বলল, দেখা করতে এলুম আপনার সঙ্গে।

রাজেন বলল, বটে। ভয় করেনি তো?

সুমিতা ঘাড় নাড়ল নিঃশব্দে। রাজেন আবার বসতে বলেই সহসা জিজ্ঞেস করল, আসল কথা বল, তোমাদের পরীক্ষার খবর কি?

সুমিতা বলল, পাশ করেছি। তাই বলতে এলুম।

---বিনয়?

—পাশ করেছি।

—টেনে বুনে বুঝি?

তারপর পাশের যুবকটির দিকে ফিরে বলল রাজেন, বিনয়কে তো চেনই। এ হচ্ছে সুগতার ছোট বোন। সুমিতা হাত তুলে নমস্কার করবার আগেই রাজেন আবার বলল, আর এ আমাদের চিত্রশিল্পী বিভূতি।

সুমিতার মনে পড়ল। বিভূতির অনেক ছবি পত্র পত্রিকায় দেখেছে ও। আরো মনে পড়ে, একবার বোধহয় মেজদির সঙ্গে গিয়েছিল বাড়িতে, অনেকদিন আগে। তখন বিভূতি ফোর্থ ইয়ারে পড়ত মেজদির সঙ্গে।

সে উঠবে উঠবে করছিল। এবার বিদায় নিল।

সুমিতা দেখছিল রাজেনকে। আর বারবার মনে পড়ছিল সেই চিঠিখানির কথা। এই আপাত বিদ্যুৎ-চকিত চোখের আড়ালে সুদূর গম্ভীর

আকাশের মত যেন রাজেন বিশাল। এই পোস্টার ফেস্টুন অফিসের চেয়ে যেন আরো বহুদূরের এক অজানিত লোকে বিস্তৃত।

পরীক্ষার সম্বন্ধে আরো দু' একটি কথার পর, বিনয়কে বলল রাজেন, তারপর? পড়বে তো?

বিনয় সলজ্জ নীরব। স্মিতা হাসল বিনয়ের দিকে চেয়ে। বলল, আমি জানি ও কি করবে।

ধুতি পাঞ্জাবিতে গুটিয়ে গেল প্রায় বিনয়। রাজেন বলল, জানি। গান তো? আর তুমি? স্মিতার দিকে ফিরে তাকাল।

স্মিতা বলল, পড়ব।

—বি এ?

—হ্যাঁ।

—তারপর? এম এ?

—হ্যাঁ।

তারপর?

তারপর। স্মিতা যেন চমকে উঠল। ছটফটিয়ে উঠল কথা খুঁজে না পেয়ে। এমন করে তারপরের কথা তো কোনদিন ভাবেনি।

রাজেন হেসে উঠে বলল, আমি জানি।

কৌতুক উৎসুক চোখে তাকাল স্মিতা, কী বলুন তো?

—বিয়ে!

—অ্যাঁ?

রাজেন হেসে উঠল হো হো করে, সারা ঘর কাঁপিয়ে। বলল, খুব বড়লোক বরের সঙ্গে।

লাল হয়ে উঠল স্মিতা। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই নতুন করে রাজেনের চোখে পড়ে গেল বিনয়। বিনয়েরও আরক্ত নত মুখ।

কি বলতে গিয়ে মুখ নামাল স্মিতা। রাজেন বলল, কি বলছিলে, বল?

স্মিতা বলল, বড়লোকের সঙ্গে বললেন কেন?

রাজেনের মুখে চকিতে দেখা দিল একবার গাঢ় মেঘের ছায়া। ঠোঁটের কোণে একটু বা শ্লেষের বিদ্যুৎ। হেসে বলল, তবে? তোমাদের বিয়ে বুঝি গরীবের সঙ্গে হবে।

কথাটি বাজল স্থমিতার কষাঘাতের মত। সংশয়ান্বিত চোখে তাকাল রাজেনের দিকে। কি বলতে চায় রাজেন।

রাজেনও যেন চকিত লজ্জায় বিব্রত হয়ে উঠল। হেসে বলল, রাগ করলে নাকি?

স্থমিতা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না, না।

রাজেন বলল, তোমাকে ঠাট্টা করে বললুম। তা বলে কি ইন্‌সেন্‌সিবল্ ছেলের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে। আমি যদি এখন মস্তবড় মিলওয়ালার মেয়েকে বিয়ে করি, সে বেচারী কেঁদে পালাতে পথ পাবে না। খালি তো টাকা নয়, মনটা দেখতে হবে। মানুষ যেখানে মানিয়ে চলতে পারে, সেখানে বিয়ে করে।

থেমে একটু অদ্ভুত হেসে আবার বলল, তা তুমি অত সীরিয়স হয়ে উঠছ কেন? এর মধ্যেই সে সমস্যা এসে পড়েছে নাকি?

বিনুনি দিয়ে মুখ চেপে হাসল স্থমিতা। ঘাড় নাড়ল নিঃশব্দে। তবু, রাজেনের এই সত্যি কথাগুলির আড়ালে কোথায় যেন কী একটা বাজছে। যেটা ওর মনের সংশয়ের তারে দিয়েছে একটি নিশ্চিন্ত ঝঙ্কার। সবচেয়ে নীচু কিন্তু তীক্ষ্ণ পর্দাটা বাজছে গুরু গুরু করে।

রাজেন আবার জিজ্ঞেস করল, তোমার মেজদির খবর কি?

স্থমিতা বলল, কেন, ও আসেনি এখানে?

—কই, সাতদিন তো তার দেখা পাইনি, খুব পড়ছে বুঝি?

—না, রোজই বেরোয় তো।

আবার একবার চোখোচোখি হল রাজেন স্থমিতার। দু'জনেই অনুভব করল, দু'জনেই একটি সায়রে চলেছে ভেসে। স্থমিতার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, মৃণালদা আসেননি?

রাজেন সহসা ড্রয়ার খুলে, সেই দিকেই মুখ রেখে বলল, খেয়াল করিনি। বোধহয় আসতে পারেনি কয়েকদিন।

তারপর হেসে বলল, তা হলে স্থমিতা, অভিনন্দন দিয়ে শুধু কি হবে? অনেকে এসে পড়বে। চল, তোমাদের দু'জনকে একটু খাওয়াই।

স্থমিতা দৃঢ়ভাবে ঘাড় নেড়ে বলল, না, এখন নয়। অপনার বাড়ি যাব।

—আরে বাপ্‌রে, সে ভাই অনেক দূর।

—তবে আপনি আমাদের বাড়ি আস্থন।

—তাই যাব।

ইতিমধ্যে দু'টি ছেলে এল। বিদায় নিল এরা দু'জনে।

রবিদার বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে বিনয়কে পাঠালে সুমিতা খোঁজ করতে।

রবিদার বাড়ির ভাই-বোনদের কেমন যেন নকল মৌনীবাবা মনে হয়। অথচ মেয়েরা রং মেখে, ছেলেরা প্যাণ্ট পরে পাশে পাশে ঘুর ঘুর করবে ঠিক, তাকাবে আড়ে আড়ে।

রবিদাকে পাওয়া গেলনা বাড়িতে।

বেলা শেষের দগ্ধ আকাশে, শেষ অঙ্গারের দীপ্তি লেগেছে। তপ্ত বাতাস হয়েছে একটু ঠাণ্ডা। সারা কলকাতা নিশ্বাস নিতে বেরিয়েছে পথে, পার্কে, ময়দানে।

রক্তাম্বরী সুমিতার খর আগুনের শিখাও যেন কেমন ছাইচাপা হয়ে এসেছে এই ঝোঁকে। রাজেনের ওখান থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকেই কেমন একটু ছায়া ঘিরে এসেছে ওকে।

বিনয় বলল, চল ব্যুফেতে যাই।

তাই গেল দু'জনে। মেজদির চিঠির কথা মনে পড়ল। মৃণালের সঙ্গে ব্যুফের সেই কথা।

পঞ্চম জর্জের কালো মূর্তিটার বাঁ-পাশ দিয়ে গিয়ে নামিয়ে দিল ট্যাক্সি। ব্যুফের গাধাবোটের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে হঠাৎ সুমিতার মনটা আবার দীপ্ত হয়ে উঠল। জলে তখন আকাশের ধূসর লালিমা। আশেপাশে জাহাজ স্টীমার অনেক নৌকার ভিড়। আরো দূরে ভাসছে বয়া, অতিকায় কচ্ছপের মত। পাখিরা ফিরে চলেছে দল বেঁধে জলের ঢেউ ঘেঁষে ঘেঁষে।

প্রায় ওর কানের কাছে মুখ এনে জিজ্ঞেস করল বিনয়, কী খাবে সুমিতা।

সুমিতা বলল, যা খুশি।

বিনয় অর্ডার দিল যা খুশি। যা খুশি ওরা খেল আর রেখে দিল। বাতাসে বার বার আঁচল পড়েছে উড়ে বিনয়ের গায়ে। লাল লিনেনের সর্বনাশা বাঁকটা বাতাসে কাঁপছে থরথরিয়ে শাণিত অস্ত্রের মত। নীচে তার রক্ত-শৃঙ্গ সুমিতাকে আজ যেন অনেকখানি করেছে বলিষ্ঠ উদ্ধত। কিন্তু সুডোল বাঁকের ছায়ায় যেন কেমন একটু নম্র। বিনয়ের অপলক

চোখের সামনে লজ্জার আগলটুকু বোধহয় গোপন থাকছে না কিছুতেই। তাই হাসির আভাস লেগে রয়েছে ঠোঁটের কোণে।

হঠাৎ সুমিতা ভ্রূ কাঁপিয়ে জিজ্ঞেস করল, কী দেখছ?

বিনয় যেন ইচ্ছে করেই ধরা দিয়ে বলল, তোমাকে। সত্যি, কী সুন্দর!

সুমিতা মুখ ফিরিয়ে তাকাল দূর গঙ্গায়। বলল, সবই ভারী সুন্দর।

তারপর আর একটা কি বলতে গিয়ে ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেলল সুমিতা।

বিনয়ের চোখে নিয়ন-আলোর ঘষা-চকচকে ধাঁধা। রক্তে ওর তোলপাড় লেগেছে। এখানে আশেপাশে প্রত্যেকটি টেবিলে অনেকের ভিড়।

বিনয় বলল, চল, বাইরে যাই।

সুমিতা বলল, তাই চল। গঙ্গার ধারে গিয়ে বসি।

দু'জনে এসে বসল একটি গাছের ছায়ার কোল আঁধারে। সামনে সারি সারি নৌকা! লম্প আর হ্যারিকেন জ্বলছে সেখানে। রাস্তায় জ্বলছে আলো।

নৌকাগুলির দিকে তাকিয়ে মনে হল, কিছুই জানে না সুমিতা। কত লোক আছে এদেশে, কতরকম, কত দূর দূরান্ত থেকে আসছে তারা। তাদের যে সংসার আছে, ছেলে-মেয়ে আছে, ভাবতে পারে না। আবহমান কাল থেকে এরা যেন গঙ্গার বুকেই ঘুরছে নৌকা নিয়ে।

বিনয় বসেছে প্রায় ওর গা ঘেঁষে। ওর বুকের মধ্যে দূর মেঘের গুরু গুরু ডাক পড়েছে যেন। কিছুই যেন ঠিক বুঝতে পারছে না। মনে পড়তে লাগল বারবার, তাপসীর প্রেমের কথা।

বিনয় গান ধরল গুন গুন করে। কিন্তু রক্তধারার তীব্রতা ভাল করে গান গাইতে দিল না ওকে। আঠারোর রক্তকণা গলিত তপ্ত লাভার মত পোড়াচ্ছে ভিতরে ভিতরে। বলল, সুমিতা, কলেজে না পড়লেও তোমার দেখা পাব তো?

সুমিতার বুকের মধ্যেও তখন ধকধক করছে। মনে হচ্ছে, অবশ বিহ্বল হয়ে পড়ছে আস্তে আস্তে। বার বার তাপসীর কথাগুলিই মনে পড়ছে। প্রেম, প্রেম, তবে এই কি প্রেম! যা যা সন্দেহ করেছিল তাপসী, ডুবে ডুবে জল খাওয়ার মত।

বিনয় একটি হাত তুলে নিল সুমিতার। বিনয়ের হাত ঠাণ্ডা, ঘামে ভেজা, একটু-বা কাঁপা কাঁপা।

নিঃশ্বাস লাগছে ঘাড়ের কাছে। ডাকল, সুমিতা।

সুমিতা কোন রকমে বলল, উঁ!

বিনয় ঠোঁট ছোঁয়ালে সুমিতার সুদীর্ঘ গ্রীবায়। একবার কেঁপে উঠে, সুমিতা যেন অবাক বিস্ময়ে পাথর হয়ে যেতে লাগল। রক্তধারাটা জোয়ার ঠেলে যেন নামতে লাগল ভাঁটার টানে।

বিনয় বলল, সুমিতা, আমি তোমার কাছ থেকে যেতে চাইনে।

বলতে বলতে সুমিতাকে টেনে আনল কাছে। আনতে গিয়ে বুঝল, সুমিতা পাষাণের মত শক্ত হয়ে গেছে! আবার ব্যাকুলভাবে আকর্ষণ করতে যেতেই হাত দিয়ে বাধা দিল সুমিতা। আশ্চর্য! এ কি হচ্ছে। কেন ওর তাপসীর মত মনে হচ্ছে না। কেন সমস্ত ব্যাপারটা ওকে শুধু দুঃখিত করছে, কাঁদাতে চাইছে। বিনয়কে তো ওর একটুও খারাপ মনে হচ্ছে না। তবু ব্যাপারটাকে এত ছেলেমানুষের পাগলামি মনে হচ্ছে কেন। কতটুকুই-বা ওর বয়স। তবু কেন এক আশ্চর্য বিষণ্ণ গাম্ভীর্যে ভরে উঠছে মন।

সুমিতা হাত ছাড়িয়ে নিল বিনয়ের হাত থেকে। কিন্তু সরে বসল না। বিনয় কাঁপছে। কাঁপছে ভয়ে ও লজ্জায়। এই নিঃশব্দ আচমকা বাধায় জ্বরতপ্ত করে তুলল ওকে। কি করবে। পালাবে, না নেমে যাবে গঙ্গায়।

কিন্তু কিছুই করতে পারল না। ঠিক সুমিতার মতই বসে রইল আড়ষ্ট হয়ে।

সুমিতার মনে হল, কী একটি কঠিন বস্তু ঠেলে উঠছে বুক থেকে। তাকে ও ধরে রাখছে ঢোক গিলে গিলে।

কাছে দূরে মেয়ে পুরুষের নীচু গলার কথা ও হাসি শোনা যাচ্ছে। মোটরের হেডলাইট মাঝে মাঝে লেহন করে যাচ্ছে পলকে।

অনেকক্ষণ পর, বিনয় অনেক শক্তি সঞ্চয় করে জিজ্ঞেস করল, রাগ করছ সুমিতা।

সুমিতা উঠে দাঁড়াল। রাস্তার আলোর একটি রেশ নিঃশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর মুখে। সেই মুখে একটি বিচিত্র বিষণ্ণ স্নিগ্ধ হাসি। বিনয়ের দিকে ফিরে তাকাল। হঠাৎ যেন ওর চোখে স্নেহের ধারা পড়ল গড়িয়ে। বলল, রাগ করব কেন? রাগ করিনি, কিন্তু আমি তা পারিনে বিনয়।

আশ্চর্য! বিনয়ের মনে হল, ওর চেয়ে অনেক বড়, অনেক গম্ভীর,

স্নেহশীলা একটি একেবারে অন্য মেয়ে সামনে দাঁড়িয়ে। এর সঙ্গে তো সে বেরোয়নি বাড়ি থেকে। এই হাসি, এই কথা, এই মূর্তির সঙ্গে তো কোন পরিচয় নেই ওর কোনকালে।

সুমিতা বলল, তুমিই হয়তো রাগ করলে?

বিনয়ের চোখ হঠাৎ ছলছল করে উঠল। ঢোঁক গিলে বলল, না।

তারপর দু'জনে হেঁটে এল চৌরঙ্গীতে। সুমিতাই জিজ্ঞেস করল, আর কোথাও ঢুকবে?

বিনয় বলল, না। আজকে এবার বাড়ি যাই।

ট্যাক্সি ডেকে ওঠবার আগে সুমিতা বলল, বাড়িতে আসবে তো বিনয়?

বিনয় যেন একটি দিশেহারা করুণ শিশু। নীরবে শুধু ঘাড় কাত করল। ওকে পিছনে ফেলে গাড়ি ছুটল দক্ষিণে।

গাড়ির মধ্যে ঢুকে বসতেই চোখের জলে ঝাপসা হয়ে গেল সুমিতার দৃষ্টি। কেন এমন হল। কোনটাই যে ওর ইচ্ছাধীন ছিল না। বড় বিচিত্রভাবে শুধু মনে হল, না-না, মনের সেখানে বিনয়ের কোন ছায়া তো নেই। সেখানে বিনয় শুধু সঙ্গী, খেলার সঙ্গী।

বাড়ি ঢুকে দেখল বাইরের ঘরে বাবা, মেজদি আর মৃণাল বসে আছে। মৃণালের মুখ লজ্জিত, কিন্তু দীপ্ত। কি যেন আলোচনা চলছিল। ওকে দেখে মৃণাল বলে উঠল, কংগ্রেচুলেশন!

(১৮)

—কোনোরকমে মুখে হাসি টেনে, একটু দাঁড়িয়ে, সোজা ভিতরে চলে গেল সুমিতা। কাপড় ছাড়ার কুঠরিতে গিয়ে সুদীর্ঘ আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ বিস্মিত বিহ্বল হয়ে। তারপর আস্তে আস্তে হাত দিয়ে স্পর্শ করল ঘাড়ে, যেখানে বিনয়ের ঠোঁট স্পর্শ করেছিল। না, কোন জ্বালা নেই সেখানে, অপমান নেই, শুধু এক দুর্বোধ্য বেদনা। সমস্তটাই একটি নিরানন্দ শৈথিল্যের মধ্যে যেন বার বার নিজের কানেই ফিস্‌ফিস্‌ করছে, না, না, এ সে নয়, এ সে নয়।

কুঠরির বাইরে এসে দেখল, মহীতোষ চলে গেছেন নিজের ঘরে। বড়দি ফেরেনি এখনো।

বাইরের ঘরে ঢুকে দেখল, সেখানে কেউ নেই। দাঁড়াল থমকে সুমিতা।

বাইরের বারান্দায় শোনা যাচ্ছে গলার স্বর। মৃণাল আর মেজদির। কথার গুঞ্জনের ফাঁকে স্থগতার চাপা হাসির নিক্কণ উঠল বেজে।

পায়ে পায়ে ফিরে গেল স্থমিতা শোবার ঘরে। সমস্ত ব্যাপারটাই শব্দহীন অথচ দৃঢ়স্বরে যেন ঘোষণা করছে একটি কথা। এক অনিবার্য, অপরিহার্য পরিণতি। স্থগতা-মৃণাল, স্থগতা-মৃণাল।

অনেকক্ষণ বসে রইল ও টেবিলে মাথা গুঁজে। তারপর গেল বাবার ঘরে। অনেকগুলি ফাইলপত্র নিয়ে বসেছেন মহীতোষ।

এক মুহূর্ত স্থমিতার মুখের দিকে অনুসন্ধিৎস্থ চোখে তাকিয়ে হঠাৎ একটু হাসলেন মহীতোষ। বললেন, তুমি যাওনি বাইরের ঘরে?

স্থমিতা বলল, ওরা বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

মহীতোষ একটু অর্থপূর্ণ হেসে বললেন, ও।

তারপর ফাইলের দিকে চোখ রেখে বললেন, মৃণালকে তোমার কেমন লাগে ঝুমনো সাহেবা।

চকিতের জন্য মন বিস্ময়ে একটু মোচড় দিয়ে সহজ হয়ে গেল স্থমিতার। এক মুহূর্তেই সমস্ত অস্পষ্টতাটুকু গেল উড়ে। বলল, ভাল।

মহীতোষ বললেন, ঝুমনো আর মৃণাল এন্‌গেজড্‌, তুমি জানতে?

জানত না। জানাজানির মাঝামাঝি ছিল। চোখে মুখে ওর কোন বিস্ময় কিংবা আনন্দের চিহ্ন দেখা গেল না। বলল, জানতুম না। এক একবার মনে হত।

মহীতোষ একটু অবাক হলেন স্থমিতার মুখের ছায়া ছায়া নির্বিকার ভাব দেখে।

মহীতোষ বললেন, ওরা দু'টিতে স্থখী হবে, নয় ঝুমনো সাহেবা?

মনের কোথায় যেন একটি আঘাত লেগেছে স্থমিতার। মহীতোষের সামনে সেটুকু চাপবার আপ্রাণ চেষ্টা করেও পারল না। বলল, নয় কেন?

মহীতোষ আর একবার স্থমিতার দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলেন। ঝুমনির ব্যবহারে অবাক-অস্বস্তিতে ভরে রইল মন। এই তাঁর প্রথম মনে হল, ঝুমনি অনেকখানি বড় হয়ে উঠেছে মনে মনে। সহসা ইচ্ছে করলেই আর ওর মনের কথা টের পাওয়া যায় না।

মৃণাল চলে গেছে। মেজদিকে দেখে বিস্ময়ের আর সীমা নেই স্থমিতার। দু'বার গুন্‌গুন্‌ করে উঠেছে বোধ হয় নিজেরই অজান্তে। কানের পাশ দিয়ে

কয়েক গুচ্ছ চুল এলিয়ে পড়েছে গালে-কপালে। কেমন যেন একটু ভাব-বিভোর, বেসামাল। থেকে থেকে, আপনা আপনি চিক্‌চিক্ করে উঠছে ঠোঁটের বাঁকে।

খাওয়ার পর, শুতে এসে মেজদি জিজ্ঞেস করল, কোথায় গেছলি রুমনি।

সুমিতা কি একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। তারপরে বলল, অনেক জায়গায়। রবিদাকে খুঁজেছিলুম আজ, দেখা পাইনি।

কিন্তু সুগতার আর সেদিকে খেয়াল নেই। গালে হাত দিয়ে ঝুঁকে পড়েছে টেবিলের ওপর। ঠোঁটের ওপর কলম চেপে যেন কিছু ভাবছে।

সুমিতা আবার বলল, রাজেনদার সঙ্গেও দেখা করেছিলুম।

সুগতা চমকে ফিরল একেবারে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত। যেন সভয়ে জিজ্ঞেস করল, কে?

সুমিতা কেমন ঘাবড়ে গেল। হঠাৎ যেন অপরাধ করে ফেলেছে কথাটি বলে। পুনরাবৃত্তি করল কথাটি। দেখল, মেজদির দীপ্ত মুখখানি পাংশু হয়ে গেছে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে বসে রইল আড়ষ্ট হয়ে। একটি অস্পষ্ট অপরাধবোধ বাড়তে লাগল সুমিতার মধ্যে। বলার পূর্বমুহূর্তে কেন যেন ওর একবার মনে হয়েছিল, রাজেনদার নামটি একটি অসঙ্গতির সৃষ্টি করবে হঠাৎ।

তারপর, একটি নিশ্বাস ফেলে সুগতা নিজেকে শান্ত করল অনেকখানি। বলল, ও!

কোথায় দেখা করলি?

—সঙ্ঘের অফিসে।

সুগতার মুখে শুধু গাঢ় ছায়া। বলল, হঠাৎ, কেন রে?

—পরীক্ষার সংবাদ দিতে।

—ও। কী বললে রাজেন?

—তোমার কথা বললেন, সাতদিন যাওনি।

সুগতার মুখ ক্রমেই একেবারে আড়াল হয়ে যাচ্ছে সুমিতার দিক থেকে। বলল, আর কী বললে?

সুমিতা বলল, বললে, তুমি বুঝি খুব পড়ছ, তাই আর যাবার সময় পাওনা।

তারপর অনেকক্ষণ আর কোন কথা নেই। কেবল পাখার ব্লেডগুলি শূন্যতাকে ফর্‌ফর্ করে কাটছে নিঃশব্দে।

সুমিতা আবার বলল, মেজদি, বাবা বললেন, তুমি আর মৃণালদা এন্‌গেজড্‌ ?

যেন অনেকদূর থেকে সুগতার স্বর ভেসে এল, হুঁ।

সুমিতার ঠোঁটের তটে ভীরু-সঙ্কোচের হাসি। কী একটা কথা বলতে চাইছে, পারছে না। কিন্তু অপ্রতিরোধ্য বেগে কল্‌কল্‌ করে আসছে সেই কথা। দাঁত দিয়ে দংশাচ্ছে সুমিতা ঠোঁটের প্রান্ত। যেন দংশে দংশে ধরে রাখবে কথাগুলি।

শেষ পর্যন্ত বলতে হল ওকে, জানো মেজদি—

—অ্যাঁ ?

—আমি, আমি ভাবতুম, তোমার বিয়ে হবে রাজেনদার সঙ্গে।

চকিত ভীরু বিস্ময়ে কুঁচকে উঠল সুগতার ভ্রূ। বলল, কেন ?

ঢোঁক গিলল সুমিতা! ভাবল, মেজদি নিশ্চয় রেগেছে। বলল, এমনি।

এমনি! এমনি যে নয়, সেটুকু বুঝল ওরা দু'জনেই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে। সুমিতা আবার বলল, জানো মেজদি, আগে আমি সত্যি মনে করতাম, রাজেনদা রাগী আর গম্ভীর মানুষ। কিন্তু এখন মনে হয়, রাজেন-দাকে আমরা বুঝতে পারি না। মনে হয়, রাজেনদা এক আশ্চর্য মানুষ। আমাদের কাছ থেকে অনেক, অ-নে-ক দূরে, কিসের এক ঘোরে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছেন, না? গম্ভীর ঝুমনো, রুমনির মেজদি আজ যেন ছোট বোনের কাছে কেবলি বিব্রত হয়ে পরছে। সুমিতার একবারো খেয়াল হল না এন্‌গেজ-মেণ্টের সংবাদের পর এমনি করে আর রাজেনের বিষয় বারে বারে উত্থাপন করা উচিত নয়। তবু না বলে পারল না, হ্যাঁ, রাজেন অনেক বড়, অনেক দূরের মানুষ। কাছাকাছি থেকেও ওরা চিরকাল দূরে। গরীব বড়লোক, ওগুলো কোন প্রশ্ন নয় ওদের কাছে। সংসারের কোনকিছুর কাছেই ওরা ধরা দিতে চায় না। আমরা ওদের কেউ নই।

বলতে বলতে সভয়ে থামল সুগতা। ধিক্কার দিয়ে উঠল নিজেকে। ছি ছি, এসব কি বলছে ও রুমনিকে। এ যে সবই নিজের তৈরী কথা, সবই মিথ্যে, ভয়ঙ্কর মিথ্যে। সুমিতাও বিস্ময়ে যেন কুঁচকে উঠেছে ভিতরে ভিতরে। অনেক দূরের, অনেক বড় রাজেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মেজদি যে তার কেউ নয়, একথা তো কোনদিন টের পায়নি সুমিতা। মেজদিকে বিমুখ করে ফিরিয়েছে রাজেন, এ যে অভাবিত। আজো রাজেনের কথার

মধ্যে, এ সংসারের কোন সৃষ্টিছাড়া উক্তি শুনতে পায়নি ও। নির্বাক বিস্ময়ে সুমিতা তাকিয়ে রইল মেজদির দিকে।

সুগতার মনে হচ্ছে, একদিকে যেন ওর সব কথাগুলিই মিথ্যে। আর একদিকে সুমিতার সামনে মুখ খুলতে গিয়ে চেপে ধরেছে অস্বস্তিকর লজ্জা। দু'দিকের চাপে রুদ্ধশ্বাস হয়ে উঠছে সুগতার। ঘামতে শুরু করেছে বিন্দু বিন্দু। কিন্তু আশ্চর্য! ওর যে দীপ্ত গম্ভীর ব্যক্তিত্বের কাছে আর সবকিছুই ম্লান হয়ে যায়, সেটা হারিয়ে গেছে রুদ্ধশ্বাস অসহায়তার মধ্যে। নিজের কাছেই আটকা পড়েছে হঠাৎ। নিজেকেই যেন জবাব দিতে হচ্ছে নীচু গলায়, সংসারে একদল লোক আছে, যারা নিজের লক্ষ্য ছাড়া কিছু দেখে না, কাউকে না। সঙ্গী চায় না, পেছনও ফেরে না। রাজেন হল সেই দলের লোক। আমাকে বিয়ে করে ও নিজেই হয়তো দুঃখ পেত।

আবার! আবার মনে হল, এও মিথ্যে। যতই বলতে গেল, ততই পুড়তে লাগল সুগতার বুকের মধ্যে।

বিস্ময় থাকলেও ভীরু অস্বস্তিতে ভরে উঠেছে সুমিতার মন। কেবলি মনে হল, কী একটা কষ্ট হচ্ছে মেজদির। কী একটি কথা বলতে পারছে না কিছুতেই। কেন ও এমন করে কথা বলছে সুমিতার সঙ্গে। ওর সেই দীপ্তি কোথায়। যা দেখে, সব সংশয় পেরিয়ে শুধু মেজদিকেই মনে হয়, ধ্রুব সত্য।

সুগতা নিজের সঙ্গে যুঝতে গিয়ে ক্ষত-বিক্ষত হতে লাগল। নিজের এই অস্থিরতা আরো বেশী প্রকাশ হয়ে পড়ার আগেই সুমিতাকে অবাক করে দিয়ে বলল, নে, রাত হয়েছে, এবার শুয়ে পড়, রুমনি।

বলে, বাতি অফ্ করে দিয়ে শুয়ে পড়ল সুগতা। অন্ধকারে, দু'চোখের কোল ভরে উঠল জলে। মনে মনে বলল, কই, কোন মিথ্যে তো ও বলেনি। রাজেন যে সত্যি অনেক দূরে, বহু দূরে। আসলে যে ভয়টাকে ও চাপছে ভিতরে ভিতরে সে ভয় হল রাজেনের সঙ্গিনী হওয়ার। দূরে যেতে আপত্তি নেই, কিন্তু কতদূরে। জীবনের কোন্ গহনে! সেই সুদূরপথের কোন সীমা-রেখা তো সুগতা দেখতে পায়নি।

আবার মনে হল, মিথ্যে বলছে। আসলে নিরাপত্তার ভয়ে পালিয়ে এসেছে ও। নিরাপত্তা, সুখ, আনন্দ, সমাজের মান-সম্মানের কাছে পালিয়ে এসেছে ভয়ে। রুমনির সন্দেহটাই বুঝি সত্যি।

কিন্তু কই, রাজেনকে দেখে তো ওর অবস্থার কথা মনে হয়নি কোনদিন।

শুধু মনে হয়েছে, সতেজ ডানাওয়ালা দুর্গম আকাশের পাখী রাজেন। শাণিত চঞ্চু সাহসী তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি বহুদূরে। অনেক বড়, সুদূর ব্যাপ্ত আর ভয়ংকর।

বুকে যত অস্থিরতা, ততই চোখ ভেসে গেল জলে। এ অশ্রু ওর দুঃখের নয়, ব্যাথারও নয়। নিজের সঙ্গে বিবাদের এই চোখের জল।

একেবারে নিস্তব্ধ হয়েছে নগর। পাশের খাটে শোনা যাচ্ছে সুমিতার ঘুমন্ত নিঃশ্বাস। সুগতার চোখের সামনে ভেসে উঠল মৃণালের মুখ। সেই মুহূর্তে মনের সমস্ত বিবাদের তোড়টা ছড়্ খেয়ে, একটি অবোধ ব্যাকুলতা দেখা দিল। মৃণালের প্রত্যাশা-ব্যাকুল চোখ। সেই ছায়ার মত ঘোরাফেরা সুগতার আশেপাশে।

সবকিছু ছাপিয়ে বুকের মধ্যে হু হু করে উঠল মৃণালের জন্যে। অনেকক্ষণ চলে গেছে মৃণাল। অনেক রাত হয়েছে। কিন্তু মনের যোঝাযুঝির মধ্যে শুধু মৃণালের কথাই মনে হতে লাগল। কিসের এত দুশ্চিন্তা, বিচার বিশ্লেষণ। সুগতা তো মৃণালকে ভালবেসেছে। এর মধ্যে কোথায় যুক্তি নিরাপত্তার, ভয় কোথায় রাজেনের সঙ্গিনী না হতে পারার। ও ভালবেসেছে মৃণালকে। মৃণালকে, আর কিছুকে নয়। আর কাউকে নয়।

ভেজা চোখ বন্ধ করল সুগতা। ভোর হতেই বিছানা ছেড়ে উঠল। বেশবাস গুছিয়ে নিল যেমন তেমন করে। তারপর কাউকে কিছুটা না বলে, রাস্তায় গিয়ে চেপে বসল একটি উত্তরগামী বাসে। নামল এসে একটি বড় বাড়ির সামনে।

মৃণালের দিদিমার বাড়ি। এখানেই থাকে সে। তখনো নিঝুম বাড়ি। ভাড়াটে নেই, শুধু দিদিমা-নাতি আর ঠাকুর চাকরের বাসস্থান। মৃণালের বাবা মা থাকেন অন্যখানে। চেনা বাড়ি, চেনা সিঁড়ি। দোতলায় উঠে, চাকরের সঙ্গে দেখা। সে বেচারী চোখ ঘষে দেখে বলল, আপনি? দাদাবাবু তো ঘুমোচ্ছেন।

সুগতা ফিস্‌ফিস্ করে বলল, দিদিমা কোথায়?

চাকর বলল, উনিও ঘুমোচ্ছেন।

সুগতা বলল, ঠিক আছে। তুমি যাও, আমি মৃণালের ঘরে যাচ্ছি। দরজা বন্ধ নেই তো?

আজ্ঞে না।

করুক লজ্জা, হোক মুখ লাল। কিছুতেই নিজেকে চাপতে পারছে না স্বগতা। মনের সমস্ত দ্বন্দ্ব যেন তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে ওকে! রাত্রের সমস্ত কথাগুলি মিথ্যে। অকারণ ভয়ে ওকে খুঁজেছে, মেরেছে, চটকেছে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে। জীবনের পথ থেকে স্বগতা বিচ্যুত হয়নি। ভালবেসেছে ও মৃণালকে, অসহায় পঙ্কিলাবর্তের জীবনকে তুলে এনেছে নিজের পাশে। এ-ই তো সত্য। রাজেন সাহসী শক্ত দৃঢ়। সে চলবে নির্ভয়ে একলা। স্বগতাকে তার কোন প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন ভীরু ভঙ্গুর মৃণালের।

ঢুকে দেখল, উপুড় হয়ে ঘুমোচ্ছে মৃণাল। স্প্রিং-এর গদীতে ঢুকে গেছে বুক চেপে। দামী আসবাবে ভরা ঘর, কিন্তু অগোছালো। অ্যাস্‌ট্রেটা ছাপিয়ে উঠেছে পোড়া সিগরেটের চাপে।

স্বগতা কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল অপলক চোখে। ভারী অসহায় মনে হচ্ছে মৃণালকে। পিছন দিকে একবার তাকিয়ে, দু'হাতে মৃণালের মাথাটা দিল ঝাঁকিয়ে।

মৃণাল ঘুমন্ত চোখ খুলে এক মুহূর্ত বিমূঢ় বিস্ময়ে রইল চেয়ে। তারপর চকিতে উঠে বসে বলল, তুমি? কি হয়েছে?

স্বগতা হেসে বলল, কিছু না। শুয়ে পড়, আমি চলে যাচ্ছি। বলে সত্যি সত্যি পিছন ফিরল।

তখনো যেন অবাক ভয়ে দিশেহারা মৃণাল একেবারে পাথর হয়ে রয়েছে। চলে যায় দেখে লাফ দিয়ে উঠে পথরোধ করে দাঁড়াল। উৎকণ্ঠিত গলায় বলল, কি হয়েছে, বলে যাও স্বগতা।

যেন ভয়ংকর একটা কিছু শোনবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে মৃণাল। স্বগতা হেসে ফেলল। বলল, কিছু নয় সত্যি।

কিন্তু মৃণালের কপাল সর্পিল হয়ে উঠল এক অজানা দুশ্চিন্তায়। বলল, তবে? হঠাৎ এসে কিছু না বলেই চলে যাচ্ছ যে?

মৃণালের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে বলল স্বগতা, তোমাকে দেখতে ইচ্ছা করছিল। একটু চুপ করে আবার বলল, এমন সব বাজে ভাবনায় পেয়ে বসেছিল রাত্রে, কিছুতেই না এসে পারলাম না। মাঝখান থেকে তোমার ঘুমটি গেল।

একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল মৃণাল, তাই ভাল। এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে।

—কেন, ভয় কিসের?

—কী জানি। ভাবলুম, কিছু একটা অপরাধ করে ফেলেছি হয়তো।

মৃণালের মুখের দিকে কয়েক নিমেষ তাকিয়ে রইল সুগতা। বলল, তোমার দেখছি সব সময়েই কী এক অপরাধের ভয়। মনের মধ্যে এত অপরাধ বোধ কেন?

—ও কিছু নয়। এটাও বোধ হয় তোমার কাল রাত্রের ওই সব বাজে ভাবনার মত। সে যাক্, চলে যাবে কেন? বস।

—না বাড়িতে বলে আসিনি। তোমার দিদিমাও এখুনি দেখে আবার মুখ ভার করবেন।

সে কথা মিথ্যে নয়। মৃণালরা উত্তর কলকাতার সেকেলে পরিবার। দিদিমার বাড়িতে বরং সেকেলে আভিজাত্যেরই বাড়াবাড়ি। দিদিমাও তাই। মৃণালের বউ হিসেবে সুগতাকে ভাবতেই পারেন না। কাঁধে ব্যাগ, ছাত্র-নেত্রীকে নাত্-বউ বলে ভাবতে গিয়ে মন বেঁকে আছে প্রথম থেকেই। সুতরাং কথা পারতপক্ষে বলেন না। শুধু লোমহীন ভ্রূ দু'টি বৃদ্ধার কুঁচকে ওঠে। কিন্তু মৃণাল বড় আদরের নাতি। যত আপত্তিই থাক্, সেখানে কোন কথা চলে না।

দিদিমা একদিন বিদ্রূপ করে বলেছিলেন সুগতাকে, ও! তোমারই ভয়ে খোকা গাড়ি চড়া ছেড়েছে?

লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেছল সুগতা। বলেছিল, না তো! গাড়ি থাকলে চাপবে না কেন? পরে শুনেছিল, আসলে মৃণাল নাকি বলেছিল, বিয়ে না করে আর গাড়ি চাপব না। কিন্তু দিদিমার আপত্তি না থাকার আর একটি গূঢ় কারণ ছিল। সেটাও উনি নিজেই বলেছিলেন, তোমার ভয়েই খোকা মদ খাওয়া ছেড়েছে, শুনলুম। খুব ভাল।

কথাগুলি যেন কেমন মাপা মাপা, স্নেহহীন। তারপরে বলেছিলেন, তবে, মেয়েছেলেকে এত বেশী ভয় করে চলাটাও বাপু বড় ভয়ের কথা।

তবু বসতে হল সুগতাকে। মৃণাল বলল, আমি বরং তোমাদের পাশের ডেপুটি বাড়িতে একটা ফোন করে দিই।

সুগতা বলল, না না, ততক্ষণ বসব না। আর বাড়িতেই বা কী ভাববে।

নিরস্ত হতে হল মৃণালকে। বলল, কিন্তু রাত্রের বাজে ভাবনাগুলো কী, তা'তো বললে না।

সুগতা অন্যদিকে মুখ ফিরে বলল, সেসব কিছু, নয়।

মৃণালের অপরাধ বোধ, সেটা 'ও কিছু নয়।' সুগতার বাক্সে ভাবনাগুলিও 'সে কিছু নয়।' কিন্তু দু'টো 'কিছু নয়' মিলে এমন একটি অদৃশ্য 'কিছুর' মত খচ্‌খচ্‌ করতে লাগল দু'জনের মাঝখানে।

মৃণাল একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল সুগতার দিকে। ওর পুষ্ট বলিষ্ঠ শরীরের প্রতি অঙ্গে এক আশ্চর্য দৃঢ়তা। এক একসময়ে, বাইরে থেকে দেখলে আকস্মিক ধাক্কা লাগে চোখে। যেন প্রতিটি রেখা ওই তীব্র রং-এর মাঝে বড় তীক্ষ্ণ হয়ে আছে। কিন্তু, এই এলোমেলো বেশবাশে, রুক্ষ চুলে, বুকের আঁচল ছাপিয়ে ওঠা জামার ফিতের মধ্যেও একটি অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব রয়েছে ফুটে।

চোখোচোখি হতেই সুগতা বলল, কি হল ? কথা বলছ না যে ?

মৃণাল উঠে দরজাটা বন্ধ করতে গেল। সুগতা একেবারে লাল হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি বলল, না, না, ওকি ? বাড়ির লোকেরা কি ভাববে। খুলে রাখ।

মৃণালও তাড়াতাড়ি বলে উঠল, তা' বটে। তবে বস, আমি চা দিতে বলি।

মৃণাল চলে গেল। সেইদিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধ হাসিতে ভরে উঠল সুগতার মুখ। দেয়ালের দিকে ফিরে তাকাল ও বিভূতির আঁকা একটি ছবির দিকে। ক্রোকুইল নীবে, চায়নিজ কালির ছবি, একটি মেয়ে গালে হাত দিয়ে, রেলিংএ ভর দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে পথের এলোমেলো ভিড়ের দিকে।

(১৯)

এ বাড়িতে এখন প্রতিদিন রাত পোহায় নতুন ঘটনা, নতুন বিস্ময় নিয়ে। বড় ধীরে, কিন্তু সুনিশ্চিত আর স্পষ্ট ফাটল-রেখাটি দিনে দিনে বাড়ছে সর্পিল হয়ে। অন্তরালে বসে কে যেন ভয়ঙ্কর শক্তিতে, অন্ধ আক্রোশে চাড়্‌ দিচ্ছে দিবানিশি।

যত বিস্ময়, তত বেদনা এ সংসারে। সুমিতা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল, সুখ নেই এ সংসারের কারুর। কোথাও নেই। আজ এই মুহূর্তে যা সুখ, পরের দিনে ফিরে আসে সে দুঃখের বেশে। শুধু অপরকে দিয়ে নয়, নিজেকে দিয়েও এখন বারংবার মনে হয় সেকথা। সেই যে স্বপ্ন দেখেছিল, নিজে যেন একটি চিত্রবিচিত্র পাতাবাহারের ঝাড়, নানান পাখির জটলা

তার ডালে ডালে, সেটা হঠাৎ দাঁড়িয়েছে এখন রং ফিরিয়ে। একদিকে স্মরণ ধরেছে পাতাবাহারের স্বপ্নে, আর একদিকে পুরোপুরি অচেনা লাগছে জীবনের এই বিচিত্র ঝাড়টিকে।

সুগতা কাটিয়ে উঠেছে ওর সেই রাত্রের সংশয়াবস্থা। ফিরে এসেছে আবার দীপ্ত প্রাখর্য, তার সঙ্গে এক সুগভীর ঘোর। শুধু ঠোঁটের কোণে কঠিন রেখাটি চিকচিক করে যেন অন্তরের কোন গূঢ় রহস্যের মত। সুগতার রক্তধারায় যে একটি নেশার আমেজ লেগেছে, সেটুকু পাঠ করা যায় ওর মুখে, শরীরের প্রতিটি রেখায় রেখায়, চলাফেরায়-কথায়।

তবু সংশয় সুমিতার। সংশয়, মেজদিকে হয়তো বুঝতেই পারছে না। যা দেখছে, সবই মিথ্যে।

সংশয় শুধু সংশয়। জীবনের এই শুরুতেই নিরন্তর সংশয় পায়ে পায়ে ফিরছে। ভয়, কখন হোঁচট খেয়ে পড়বে মুখ থুবড়ে।

কিন্তু এত কথা ভাববার অবকাশ ছিল না সুমিতার। সকালবেলা লুকিয়ে লুকিয়ে বড়দিকে দেখে ভয়ে মরছে ও এখন। ভয় হচ্ছে, যদি চোখোচোখি হয়ে যায় বড়দির সঙ্গে। দেখা হয়ে যায় সকলের সামনে। বাইরের ঘরেই রয়েছে মেজদি। জামাকাপড় পরছেন বাবা নিজের ঘরে। সকলের সামনে যখন দেখাদেখি হবে, তখন কী হবে।

এতদিন, সুজাতাকে সাদা শাড়ি পরতে দেখেছে সবাই। সবাই দুঃখ পেয়েছে। কিন্তু কার্যকারণে অনুমানে অবাক হয়নি কেউ।

আজ বড়দির সর্বাঙ্গে রং। ঘরে ঢুকতে গিয়ে তাই ফিরে এসেছে সুমিতা। আজ আলমারি উজাড় করে, বেছে পরেছে শাড়ি। ড্রেসিং টেবিল উজাড় করে মেখেছে রং। এতদিন তাকানো গেছে, আজ তাকাতে গিয়ে ভয়ে ধুকধুক করছে বুকের মধ্যে। আজ আর তাকানো যায় না। আনন্দে হেসে উঠতে গিয়েও মনে হল, কী এক সর্বনাশের আয়োজন করেছে বড়দি সর্বাঙ্গের সাজে।

ঈষৎ উন্মুক্ত দরজা দিয়ে আর একবার ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে পালিয়ে গেল সুমিতা বাইরের ঘরে।

শেষ মুহূর্তে চোখে কাজল টানল সুজাতা। তারপর ফিরে তাকাল আয়নার দিকে। হাসল একটু। রং মাখা ঠোঁটের কোণ টিপে আছে যেন লুক্রোজিয়ার দীপ্তি নিয়ে। কেউ নেই, দেখেনি কেউ। তবু দ্রুত নিশ্বাসে

কম্পিত নাসারন্ধ্র। লীপ্‌স্টিকের চাপা তীব্র গন্ধটাও কেমন যেন শ্বাসরোধ করতে চাইছে।

আবার তাকাল ঈষৎ ঘাড় ফিরিয়ে, ভ্রূ তুলে। যেন সামনে রয়েছে আততায়ী, ধরাশায়ী করছে মর্মভেদী বাণে। ঘাড়ের উপরেই নিপুণ করে বাঁধা সুবিস্তৃত খোঁপা। তারপর এক ঝলক রোদের মত নেমেছে উন্মুক্ত সুছাঁদ গ্রীবা ও পিঠ। অনেক নীচে গিয়ে ঠেকেছে জামরং জামার বোতামপটীতে। সামনেও নেমেছে তেমনি অসঙ্কোচে, যেন সহসা উল্লাসে মত্ত নিরুদ্দিষ্ট গতিতে। ভয়-ধরানো এক সীমারেখায় এসে থেমেছে, যেখানে এসে সুগভীর অন্ধকার রয়েছে থমকে এক বিচিত্র ইশারা নিয়ে। কী এক তীব্র বিদ্বেষ আর শ্লেষে অসঙ্কোচ করছে সারা দেহ। পিঙ্ক্‌ সিল্কের অবাধ্য সজ্জা রেখায় রেখায় কিল্‌বিল্‌ করছে সাপের মত।

ড্রয়ার খুলে একটি ঝুটো মুক্তার হার পরল গলায়। চোখে গগল্‌স পরতে গিয়ে আবার তাকাল থম্‌কে। আপন মনেই বলল শ্লেষ চাপা সুরে, দেখবে! দেখুক। দেখুক দেখুক, তা-ই তো আমি চাই। দেখে ভাববে, অনেকদূর নেমেছি। ভাবুক। নেমেছিই তো। বলে হাসতে গিয়ে থেমে গেল। গম্ভীর হল মুখ। তারপর এক মুহূর্ত অবশ হয়ে রইল সারা শরীর। কণ্টকিত হল তীব্র ঘৃণায়।

আবার হাসল। মনে পড়ল অমলার কথা, এটুকু দরকার। সাজতে গিয়ে যদি কলঙ্ক হয়, হোক। মিথ্যে বৈরাগিনী হয়ে ফিরে লাভ কী!

তবু দরজার পর্দাটা সরাতে গিয়ে হাত দু'টি উঠছে না কিছুতেই। যেন কত ভার, কত ভারি এই সামান্য পর্দা। তাড়াতাড়ি গগল্‌স পরে, দু' চোখ আড়াল করে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই মহীতোষ বেরিয়ে এলেন নিজের ঘর থেকে। দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন কয়েক লহমা। চিনতেই পারেননি যেন। সুজাতা ততক্ষণে হেঁটে এগিয়ে গেছে বাইরের ঘরে।

মহীতোষ যেন পাংশু হয়ে উঠলেন ভয়ে। দ্রুত পায়ে বাইরের ঘরে এসে ডাকলেন, উমনো, উমনো শোন।

এই আশঙ্কাই করেছিল সুমিতা। তাকানো যায় না, তাকানো যায় না সত্যি বড়দির দিকে। কী ভয়ঙ্কর, সুন্দর দুর্বিনীত সাজ। যেন পথে পথে সমস্ত মানুষের বিবেককে পুড়িয়ে দিয়ে যাবে।

স্নগতাও চমকে উঠেছিল। বিস্ময়-দীপ্ত চোখে দেখতে লাগল স্নজাতাকে। 'গগল্‌সটা খুলল না। ফিরে দাঁড়াল স্নজাতা। বুকের মধ্যে কেমন যেন ধকধক করছে। ওর নিজের মনেও ছিল এই আশঙ্কা। এ বাড়ির ঘোর উৎসবের দিনেও যে এমন করে সাজেনি কোনদিন স্নজাতা। মহীতোষের ডাক শুনে ফিরতে গিয়ে সহসা ওর মুখের রংএর পর রং উঠল ফুটে। তবু নিজেকে শক্ত করে বলল, কি বলছ?

এই কয়েক মুহূর্তেই মহীতোষের মুখে কে অনেকখানি হিজিবিজি দাগ কেটে দিয়েছে। ঘাম দেখা দিয়েছে বিন্দু বিন্দু। হাত দিয়ে টেবিলটা ধরে একবার দেখলেন স্নজাতাকে। উৎকণ্ঠা চেপে, অকম্পিত গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাচ্ছ তুমি উমনো, তিনদিন ধরে একই সময়ে?

স্নজাতা কয়েক নিমেষ ঠোঁট টিপে নির্বাক রইল। ওর মুখের ভাব অনেকখানি চাপা পড়েছে চোখের আবরণে। সেটা নিজেও জানে স্নজাতা। একবার স্নমিতা আর স্নগতা, দু'জনাকেই দেখল আড়চোখে। বলল, কাজে।

—কাজে?

নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারেননি মহীতোষ। দু' পা এগিয়ে এসে, ঘাড় কাত করে আবার জিজ্ঞেস করলেন, কোথায়?

স্নজাতা দেখল, মহীতোষের লং প্যাণ্টটা যেন কাঁপছে। ফ্যান ঘুরছে, বাতাসে কাঁপছে। কিন্তু টাই-এর বন্ধনীর মুখে কলারটা ভিজে উঠছে ঘামে। চোখ থেকে গগল্‌স খুলে নত চোখে জবাব দিল স্নজাতা, কাজে যাই।

আবার একটুক্ষণ নীরবতা। মহীতোষের মুখের রেখায় একটি অদ্ভুত কাঠিন্য দেখা দিল। গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কোথায়?

স্নজাতা চকিতে দেখল একবার মহীতোষের মুখের দিকে। বলল, 'কারদেজো'য়।

মহীতোষের মুখের রেখা গভীরতর হল। বললেন, 'কারদেজো'য়? এ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী?

—হ্যাঁ।

—কিসের কাজ?

—ম্যানেজারের পার্সন্যাল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট।

ম্যানেজার। বোধ হয় একবার স্মরণ করবার চেষ্টা করলেন মহীতোষ কারদেজোর ম্যানেজারকে। কোথায় যেন শুনেছেন কিংবা দেখেছেন

ভদ্রলোককে। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। গিরীনের অন্তরঙ্গ বন্ধু, ইওরোপ-ফেরত্তা ডুভেন Cardezoর ম্যানেজার। সুজাতার বিয়ের সময় ভদ্রলোক এসেছিলেন তাঁর এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পার্সন্যাল অ্যাসিস্ট্যাণ্টকে নিয়ে। সে মেয়েটিও নিমন্ত্রিতা ছিল।

হঠাৎ সমস্ত ব্যাপারটা কেমন ঘুলিয়ে গেল মহীতোষের কাছে। কেবল একরাশ সংশয়, ভয় ও বেদনা তাঁকে গ্রাস করতে লাগল। সমস্ত ব্যাপারটিকে সর্বাঙ্গীণ চিন্তা করতে পারলেন না। দিশেহারা উৎকণ্ঠায় জিজ্ঞেস করলেন, কেন উমনো?

সুজাতা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। বলল, কাজ করার আবার কেন, কী আছে? এভাবে বসে থেকে লাভ? তা' ছাড়া—

মহীতোষের হাত বোধ হয় সত্যি কাঁপছিল। বললেন, কী, বল?

সুজাতা বলল, তোমাকে তো বলেছি, আমি কারুর গলগ্রহ হয়ে থাকতে চাইনে।

মহীতোষের স্বর স্তিমিত চাপা হয়ে এসেছে, কার গলগ্রহ তুমি? আমার?

সুজাতা এক লহমা নির্বাক থেকে বলল, নয়? নইলে তুমি কেন মফস্বলের মিউনিসিপ্যালিটিতে গিয়ে চাকরি নিয়েছ, বল?

সভয়ে কণ্টকিত হয়ে সুমিতা ফিরে তাকাল মহীতোষের দিকে। ভাবল, ওকেই সন্দেহ করবেন বাবা, বড়দিকে বলেছে ভেবে। কিন্তু মহীতোষ ফিরে তাকালেন না ওর দিকে। কেবল সুগতা অবাক হয়ে ফিরে তাকাল। মহীতোষের চাকরির কথাটা শুধু ওর কাছেই একেবারে আকস্মিক।

মহীতোষের দু' চোখে যেন অশ্রুহীন কান্নার আভাস। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে, ঢোঁক গিলে বললেন, উমনো, চাকরি নিয়েছি, সে কী তুমি আমার গলগ্রহ বলে। আর কিছু নয়?

—আর আমার জন্যে দুশ্চিন্তা। সেজন্যে তুমি রবিকেও পাঠিয়েছিলে আমার কাছে। অকারণ তুমি আমার জন্যে দুর্ভাবনা করছ। শুধু দুর্ভাবনা নয়, হয়তো আমার ওপর রাগ করেই আবার এ বয়সে এরকম একটা চাকরি অ্যাকসেপ্ট করেছ। কিন্তু তার তো কোন দরকার ছিল না।

মহীতোষ বললেন, রাগের কথাটা ঠিক নয় উমনো। আর দুশ্চিন্তার কথা বলছ। তোমার জন্যে আমার দুশ্চিন্তা, সেটা তো কেউ ঠেকাতে পারবে না। তুমি চাকরি নিলেও আমি নিশ্চিন্ত হতে পারব কি?

সুজাতা বলল, না হওয়ার তো কারণ দেখিনে।

বলতে বলতে হঠাৎ কঠিন হল সুজাতার মুখ। বলল আমার জন্যে কাউকে আমি দায়ী করতে চাইনে। কোনকিছুর জন্যেই নয়। নিজের দায়িত্বটা আমার নিজেরই। তুমি শুধু নিজের মনের সান্ত্বনা খুঁজলে কী করে হবে। আমার নিজের সান্ত্বনারও দরকার আছে।

মহীতোষ শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, আশ্চর্য! চাকরি করতে চাও কর, তাতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু এ যেন কেমন হয়ে গেল। যে জীবন আমি শুরু করেছিলাম, যেভাবে তোমাদের তিনজনকে নিয়ে আমার ভবিষ্যৎটা ভাবতুম, সে সমস্তই কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

সুজাতার গলার স্বরও নেমে এল এবার। বলল, সকলেরই যাচ্ছে বাবা। তোমার, আমার, সকলেরই। সেজন্য তুমি আমাকে দায়ী করতে পার না, আমিও তোমাকে দায়ী করতে পারিনে।

—উমনো, কেউ আমরা কাউকে দায়ী করছিনে। হয়তো, ছোটকাল থেকে তোমাদের যেভাবে মানুষ করেছি, তার মধ্যেই কোন গলদ থেকে গেছে। থেকে থাকলে সে গলদ আমার।

সমস্ত ঘরটি কেমন ব্যথিত বিহ্বল হয়ে উঠেছে। টন্‌টন্ করছে সুজাতারও বুকের মধ্যে। এত নিপুণ সাজের মধ্যেও নিজেকে লাগছে যেন শ্রীহীনা অপরাধিনী। একবছর আগে হলে হয়তো এখুনি গুটি গুটি পায়ে ফিরে যেত নিজের ঘরে। কিন্তু জীবনের, শুধু জীবনের নয়, মনের কোথায় একটি ভাঙ্গন ধরে, তার টানা পথ বাঁক নিয়ে গেছে ঘুরে। সেখান থেকে আর উজানে ফেরা চলে না ওর। নিজের দেহ, মন ও ভবিষ্যৎ নিয়ে এক অনিশ্চিত সংশয়ের হাহাকার অনেকগুলি বাঁধা বিশ্বাসকে চুরমার করেছে। এখন, চাওয়া-পাওয়া সম্পর্কেও বড় কষ্টদায়ক অস্পষ্টতা ঘিরে ধরেছে চারিদিক থেকে। যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, সেখানে শুধু রুদ্ধশ্বাস অসহায়তা গ্লানি, আত্মগোপন আর বিদ্রূপ নিজের প্রতি। বলল, আজ আর পুরোন কথা ভেবে লাভ কী?

বলে হাতের ঘড়ি দেখল সুজাতা।

মহীতোষ উৎকণ্ঠিত চাপা গলায় বললেন, কিন্তু আমার বড় ভয় করছে উমনো।

সুগতা উঠে মহীতোষের হাত ধরে বলল, তুমি বসো বাবা, ওরকম করো না। ভয় পাচ্ছ কেন তুমি। চাকরি করুক না বড়দি। তুমি যেভাবে

জীবন চেয়েছিলে, সেভাবে যখন হয়নি, তখন আমরা যে কেউ-ই চাকরি করি, সেটা তোমার মেনেই নিতে হবে। কিন্তু বড়দি—

শক্ত মুখে ফিরে দাঁড়াল সুগতা, সুজাতার দিকে। তীব্র চোখে সুজাতার আপাদমস্তকে চোখ বুলিয়ে কঠিন গলায় বলল, তোমার নিজের দায়িত্ব তুমি নিজে নেবে, তাতে কারুরই কিছু বলার নেই। কিন্তু নিজের সম্পর্কে স্ক্যাণ্ডালগুলো একটু কমাবার চেষ্টা করো।

সুজাতা মনের কাছে হার না মেনেও শেষ পর্যন্ত কেমন যেন অপরাধ বোধ করছিল মহীতোষের সামনে। তার ওপরে নিজেকে খুঁটিয়ে সাজানোটা কোথায় একটু পরাজয় বোধ জাগিয়েছে মনে। এক মুহূর্তে জীবনের সবটা মিলিয়ে ভিতরে ভিতরে একটি দূরাগত কান্নার নির্ঝর আসছিল ছুটে। সহসা সুগতার কথায় দপ্ করে জ্বলে উঠল মনের মধ্যে। রক্ত-ঠোঁট কুঁকড়ে বলল, কিসের স্ক্যাণ্ডাল?

সুগতারও সারা চোখে মুখে উত্তেজনার দপ্‌দপানি। রাগলে মনে হয়, ও-ই সকলের বড়, গম্ভীর, কর্ত্রী। চাপা গলায় অদ্ভুত ব্যঙ্গ করে বলল, আমার চেয়ে তুমি সেটা ভাল জানো।

কিন্তু রাগ সুজাতারও কম নেই। ওর রাগ আজ আরো বেশী। কেননা ওর যে কোন যুক্তি নেই ওই স্ক্যাণ্ডালের পিছনে, শুধু বিচ্যুত জীবনের দুঃখটাই আছে। রাগে রাগে আর কিছু নয়, বাঁধলো শুধু বিপর্যয়। চাপা ছিল অনেকদিন, আজ ফেটে পড়ল চৌচির হয়ে। সুজাতা বলল, ভাল জানি কী মন্দ জানি, সেটা আমিই বুঝব। তোর কাছে কোন কৈফিয়ত দিতে পারব না।

মহীতোষের ঠোঁট কাঁপল, কিন্তু কিছু বলতে পারলেন না। এ বাড়িতে এমন অভাবনীয় ব্যাপারে, ভয়ে দুঃখে চীৎকার করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করছিল সুমিতার। কিন্তু, মন এমনি বিচিত্র—কান্নাটা যতই থাক্, কেমন একটি কৌতূহল ও উত্তেজনায় আড়ষ্ট নিশ্চল হয়ে বসেছিল ও। কান্নাটা আটকা পড়ে গেছে এক ভীরু বিস্ময়ের বাঁধে।

কথা বলে বেরিয়ে যাচ্ছিল সুজাতা। কিন্তু এমনিভাবে চুপ করে যাওয়া সুগতার চরিত্র নয়। উদ্দীপ্ত গলায় বলে উঠল, ওসবের কৈফিয়ত শোনা-ও লজ্জার বিষয়। কিন্তু পারিবারিক সম্মানটা ভুলে যেও না। তোমার মিসেস্ শ্যামসনের আড্ডায় আর নাইট ক্লাবে যাওয়ার কৈফিয়ত তোমার বোনেরা

লোকের কাছে দিতে পারবে না। ওগুলো ভদ্রমহিলাদের আস্তানা নয়।

বিন্দু বিন্দু ঘামে ধুয়ে যাচ্ছিল সুজাতার মুখের রং। ভয়ঙ্কর ক্রোধে ওর বুকের অসঙ্কোচ জামাটা দুলে দুলে উঠছে। একরাশ মকর-চোখের মত ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে ঝুটো পাথরের হার। চোখ রক্তবর্ণ। তীক্ষ্ণ গলায় যেন চাবুকের শিস্ দিয়ে উঠল, কাদের আস্তানা সেটা আমিই বুঝব, ভদ্র-মহিলারা নিজেদের নিয়ে থাকুন।

চকিতে একবার মহীতোষের ঘর্মাক্ত ভয়ার্ত ব্যথিত মুখের দিকে দেখে আবার বলল, পারিবারিক সম্মানে যদি আটকায়, পরিবার থাকুক। আমি কারুর সম্মানে আঘাত করতে চাইনে।

কী কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল সুগতা। নিমেষের জন্যে সুজাতার দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল।

নিজেও জানে না সুমিতা, কান্না চাপবার জন্যে কখন আঁচল চাপা দিয়েছে মুখে। চোখের কুল ছাপিয়ে এসেছে জল।

যেতে গিয়েও দাঁড়াল সুজাতা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে। চোখে ওরও জল এসে পড়ছে। ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে মুছে নিতে লাগল।

মহীতোষ উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু দাঁড়িয়েই আছেন।

কোন শব্দ নেই। শুধু চারটি বুক বোঁধহয় নিঃশব্দে ভাসছে অকূল পাথারে।

অনেকক্ষণ পর, সুজাতারই নিশ্বাসের শব্দে চমকে উঠলেন মহীতোষ। মুখে ফিরে এসেছে বিষণ্ণ শান্ত ভাব। সুজাতার কাছে গিয়ে বললেন, তোমার অ্যাটেনডেন্স ক'টায় উমনো ?

সুজাতা ভেজা গলায় জবাব দিল, এগারোটায়।

শান্ত গম্ভীর গলায় বললেন মহীতোষ, তাহলে তুমি বেরিয়ে পড়, লেট্ হয়ে গেছে। শুধু একটু তাড়াতাড়ি ফিরে এসো মা।

সুজাতা নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল আরো একটু সময়। তারপর বলল, বাবা, তোমরা কতদূর ভেবেছ আমার বিষয়ে জানিনে। কত কথা শুনেছ, তাও জানিনে। তোমাদের সবাইকেই বলছি, সমাজের আত্মীয়-বন্ধুরা আমার দুরবস্থা দেখে শুধু করুণা করবে, সে আমি চাইনে। এ-সমাজের কাছে কতটুকু আমার সম্মানের মূল্য বুঝিনে, সকলের করুণার চাইতে আমি যা করছি, তা-ই আমার ভাল।

মহীতোষ বললেন, উমনো জীবনটা স্রোতের মত। একদিকে বাধা পেলে সে আর একদিকে যাবেই। তুমি ঠিকই বলেছ, তোমার নিজের সান্ত্বনা তোমার কাছেই। বড় হলে, ছেলেমেয়েদের গোটা জীবনই চারদিকে বড় হয়ে পড়ে, তখন ছোটকালের কথা ভেবে আর তাকে আমার সান্ত্বনায় শান্তি দেওয়া কঠিন। তোমার কিছু হয়তো বুঝি, সব বুঝিনে। সেই সবটুকু নিয়ে তুমি নিজেকে যেন আঘাত করো না কখনো। তুমি বাড়ি ফিরে এস কিন্তু তাড়াতাড়ি।

সুগতা সবচেয়ে অভিমানী মেয়ে। ওর সতেজ দীপ্তিতে সেইটাই থাকে ঢাকা পড়ে। মুখ ফিরিয়ে সুজাতাকে কিছু বলতে গিয়েও পারল না। ছুটে চলে গেল ভিতরে।

সুমিতা বলল কান্না চেপে, তুমি বাড়ি ফিরে এস কিন্তু বড়দি।

সুজাতা বেরিয়ে গেল। ওর বুকের মধ্যে এক অসহায় মেয়ে ব্যাকুল কান্নায় বারবার বলতে লাগল, ওরা আমার কিছু বোঝে না, কিছু না। নিজেরা ভয় পেয়ে আমাকে ভয় পাইয়ে আরো দুর্বল করে তুলছে।

ট্রামে কালিঘাটের মোড়ে এসে নামল সুজাতা। কথামত, কাছেই অপেক্ষা করছিল অমলা গাড়ি নিয়ে। ভ্রূ কুঁচকে, রাঙানো ঠোঁটের ভঙ্গি করে বলল, খুব মেয়ে বাবা। তুই চাকরি করবি বটে।

সুজাতা ম্লানভাবে হাসতে চেষ্টা করল।

(২০)

মরিস্ মাইনরের দরজা খুলে দিতে গিয়ে ভ্রূ কুঁচকে অপাঙ্গে তাকাল অমলা সুজাতার দিকে। পুঁইমেটুলি রংএ রাঙানো ঠোঁট টিপে হাসল। মেয়ে বলেই বোধহয় ওর প্রাণ একবার বিস্মিতমাৎসর্যে উঠল কনকনিয়ে। কালিঘাটের ওই পথের মোড়ে অমলা, ওর নীল মরিস্ মাইনর, সব চাপা পড়ে গেছে যেন সুজাতার রূপ আর রংয়ের ভারে। কিন্তু সে ক্ষণিক মাত্র। ভ্রূ তুলে প্রায় রুদ্ধ গলায় বলল অমলা, টেরিবল্! করেছিস্ কী?

সুজাতা বোধহয় নিজেকেই ব্যঙ্গ করে হাসল ঠোঁট উল্টে। বলল, যেমন বলেছিলি। নে, এখন উঠতে দিবি।

অমলা সরে গেল হুইলের পাশে। সুজাতা এসে পাশে বসতে অমলা বলল, সে যে এমন মারাত্মক হবে, তা ভেবে তো বলিনি। আজ তো কারদেজোর

ম্যানেজার থেকে আর্টিস্ট, কেরানী, মায় লিফ্‌টম্যানটার পর্যন্ত অবস্থা কাহিল হয়ে পড়বে। বেচারীরা কাজ করবে কী করে!

সুজাতা ম্লান হেসে তাকাল সামনের দিকে। অমলার হাত উঠে গেল সুজাতার কাঁধে, রাঙানো নখ বিছের মত পিল পিল করে কণ্ঠা বেয়ে, গাল টিপে ধরে ফেরালো নিজের দিকে। বলল ফিস্‌ফিস্ করে, আমারই প্রাণটা কেমন করছে।

বলে অসঙ্কোচে একমুহূর্ত ঠায় সুজাতার মুখ ও বুকের দিকে তাকিয়ে বলল, আয়নায় দেখিছিলি তো একবার নিজেকে?

সুজাতা তেমনি ম্লান গম্ভীর স্বরে বলল, নইলে সাজব কেমন করে? এবার স্টার্ট দে। অনেক লেট্ হয়ে গেছে। নতুন চাকরি—!

—অবকোর্স! নতুন চাকরি!

ট্যাক্স-কী ঘুরিয়ে স্টার্ট দিয়ে হেসে উঠল অমলা খিলখিল করে। বলল, পার্সন্যাল অ্যাসিস্ট্যাণ্টের জন্যে এতক্ষণ কারদেজোর ম্যানেজারও বোধহয় হাঁপিয়ে উঠেছে। কিন্তু—

গাড়ি চলেছে। অমলা আড়চোখে একবার তাকাল সুজাতার দিকে। একটু পরে আবার বলল, কিন্তু সত্যি গিরীনটা একেবারে রাস্কেল। মাইরি!

অমলা আবার তাকাল আড়চোখে। সুজাতা ফিরল না। দৃষ্টি ওর সামনের দিকে, সুদূরে। কেবল মুখটি কঠিন হল। আরো একবার বোধহয় কেঁপে উঠল ভ্রূর মাঝখানে। গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল, হঠাৎ? কেন?

সুজাতার ভাবে ভঙ্গিতে অমলা ঘাবড়ে গেল। কিন্তু অস্বস্তিটুকু এত গভীরে, ওর রং-করা মুখে তার কোন আবর্ত নেই। সামনে পুলিসের হাত। নখ রাঙানো হাত বের করে, পেছনের গাড়িকে ইঙ্গিত করে থামাল গাড়ি। প্রায় সুজাতার মতই একটু করুণ হাসি টেনে বলল, মনে হল, তাই বললুম। দেখা হয় কিনা মাঝে মাঝে।

সুজাতার রক্তাভ ঠোঁটের কোণ সাপের জিহ্বার মত চিকচিকিয়ে উঠল। কিন্তু সহসা কিছু বলল না। কেবল বুকের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ও বিস্ময় নিয়ে নীরব হয়ে রইল।

অমলা গাড়ি বাঁয়ে ঘুরিয়ে ফাঁকা পথ ধরল। এখানে পথ অনেকখানি নিঃশব্দ। আকাশের নীল পুড়ে পুড়ে ধূসর হয়েছে এর মধ্যেই। মেঘের

কোন চিহ্ন নেই। বড় বড় বাড়ি আর গাছগুলি যেন কেমন প্রাণহীন নীরব। যত বড়, ঠিক ততখানি অসহায় বোবা যেন, দগ্ধ হচ্ছে রোদে। প্রতি অলিন্দ ফাঁকহীন বন্ধ অর্গলে সর্বত্র চাপা। আরপর সামনে মাঠ, মাঝে তার কালো সর্পিল পথ কাঁপছে মরীচিকার মত।

সুজাতা জানে, গিরীনের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হচ্ছে আজকাল অমলার। হঠাৎ দেখা হয়ে যাচ্ছে প্রায়ই। কথাও হচ্ছে নানা রকমের। এতক্ষণে ওর ভ্রূ কুঁচকে উঠল। বলল, আরো দু'দিন একথা বলেছিস্।

অমলা চোখের কোণ দিয়ে তাকিয়ে, একটু হেসে বলল, আজকে নিয়ে তিন দিন বলছি। গিরীন নিজেও বলে। বলে, ব্যাপারটা এখনো পর্যন্ত তার বোধগম্যই হয়নি, অর্থাৎ এরকম একটা ব্যাপার যে ঘটেছে, তার বিস্ময়ের ঘোরটাই নাকি কাটেনি আজো। বলে, আমি বোকা হয়ে ফিরছি সর্বত্র। বেচারীর অবস্থাটা দেখলেও দুঃখ হয়।

এক কথা, প্রায় একই কথা আজ তিনদিন বলল অমলা। ওপরে ওপরে যথেষ্ট নির্বিকার অন্যমনস্ক থেকেও, সুজাতার বুকের মধ্যে কতগুলি অদৃশ্য মতলব নখ আঁচড়াতে খামচাতে লাগল। ঠোঁটের কূলে কূলে আবর্তিত হতে লাগল ভয়ংকর বিদ্রূপ, বিষের মত তীব্র অনেকগুলি কথা। কিন্তু নিজেকে ধরে রাখল অনেক কষ্টে। অমলাকে চটাতে পারবে না ও কিছুতেই, দূরে সরিয়ে দিতে পারবে না। মনের মাঝে কোথায় এক ঘোরতর অমিল থাকা সত্ত্বেও নোঙর ছেঁড়া জীবন খুঁটি আঁকড়ে ধরেছে অমলাকেই। এ খুঁটি ওকে কোন নিশানা ঠিক করে ধরতে হয়নি। পথের মাঝে আপনি এসে পড়েছে, নিয়তির মত।

কিন্তু বড় ভয়ংকর অমলার ভাবান্তর। কেবলি গিরীনের কথা বলে। সব জেনেশুনেও কেন বার বার। গিরীনের রক্ষিতাদের কথাও বলে অমলা। ছি ছি ছি! যেটা আসলে লেগেছে, সেই নিজের মনের অহংকার, অভিমান আর অপমানবোধের পুরোপুরিটা নিজের কাছেও বোধহয় ধরা পড়েনি। কিন্তু হিংসা করবে সে গিরীনের মেয়ে সঙ্গিনীদের? সুজাতা তো জানে, গিরীন প্রতিদিন কোথায় ঘোরে, রাত্রিবাস করে কোথায়। যে জীবন কাটাচ্ছে গিরীন, সেটা তো নতুন নয়। আগে পরে একই। তাইতেই গিরীন সতেজ সুস্থ স্বাভাবিক। এই সামাজিক পরিবেশ—তাতে ওর সম্মানের চুন একফোঁটাও খসেনি কোনদিন পান থেকে, কোন অস্বাভাবিকতা ছিল না

ঘরে-বাইরে। মাঝখানে সুজাতা গিয়ে নিস্তরঙ্গ জলে কিছু আলোড়ন জাগিয়ে ফেলেছে। ফিরেছেও ভয়ংকর আলোড়ন নিয়ে। শুধুই আলোড়ন, কিন্তু দুর্বোধ্য। কোন পথে তার গতি নেই, পায়নি।

সেখানে আর যাই হোক, অমলার আঁকা গিরীন নেই। অসহায় ব্যথিত অমলার 'বেচারী' শব্দটার মধ্যে চাপা চাপা উমেদারীর গন্ধ। সেইটাই ওকে ক্রোধে আত্মহারা করছে, ভয় দেখাচ্ছে ভীষণ।

অমলা আর একবার আড়চোখে তাকিয়ে, হেসে হঠাৎ একটু ঢুলু ঢুলু চোখে দৃষ্টি হানল। বলল, আর তুইও ভাই বড্ড ক্রুয়েল···আমারই ভয় করে এক এক সময়। গিরীনের সম্পর্কে এক সময় আমারো—

হঠাৎ অসহ্য ঘৃণায় নাক সিঁটকে, ঠোঁট কুঁকড়ে চাপা গলায় বলে উঠল সুজাতা, এসব কথা একদম ভাল লাগছে না ভাই, একেবারে না।

অমলা চমকে থতিয়ে গেল। ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগল ওর বুকের মধ্যে। স্টিয়ারিং হুইলটা চেপে ধরল শক্ত করে। কয়েক মুহূর্ত পরে হেসে বলল, খুব রেগে গেছিস না?

সুজাতার ভয়ও করছিল। হয়তো গম্ভীর হয়ে যাবে অমলা। তাড়াতাড়ি বলল, না। কিন্তু ভাল লাগছে না, সত্যি।

অমলা এবার সোজাসুজি একবার তাকিয়ে বলল, তোর আজ কী হয়েছে বল্ তো?

—কিছু হয়নি তো।

—বাজে কথা বলছিস্। চোখের কাজলে তেল থাকে, জানিস্ তো।

—তাতে কী।

—তেলে জলে যতই অমিল থাক, তেলের গায়ে জল যেটুকু শেষ পর্যন্ত লেগে থাকে, তা সহজে মোছে না। এখনো তোর চোখে জল লেগে রয়েছে দেখছি।

সুজাতা ব্যস্ত হয়ে ব্যাগ খুলতে গেল। অমলা হেসে উঠে বলল, না না, আয়না দেখতে হবে না। বাব্বা! কী মেয়ে। জল থাকলে তো আগেই বলতুম। কিন্তু কেঁদেছিস্, সেটা বোঝা যাচ্ছে।

সুজাতা বলল, ও কিছু নয়।

পথের দিকে তাকিয়ে চিন্তিতভাবে অমলা ওর পুঁইমেটুলি-রং ঠোঁট কামড়ে ধরল সাদা দাঁতে। বলল, রবি এসেছিল বুঝি?

সুজাতা চমকে উঠে গাড়ি থেকেই চারপাশে তাকিয়ে বলল, কোথায় ?

অমলা মনে মনে হেসে বলল, এখানে নয়, বাড়িতে ?

অবাক হয়ে বলল সুজাতা, না তো।

পরমুহূর্তেই একটু অপ্রতিভ হয়ে বলল, কেন ?

—নইলে, কাঁদালে কে তোকে বাড়িতে ?

—কেন, রবি আমাকে কাঁদায় নাকি ?

—বলেছিলি তো সেই রকম একদিন। কবে একদিন রবির কথা শুনে সারারাত্রি কেঁদেছিলি। শুনেছি, অনেক পুরুষ নাকি শুধু কাঁদাতেই ভালবাসে। আর সেই মেয়েরা নাকি কেঁদেই সুখ পায়।

সুজাতা গম্ভীর হল আবার। কিন্তু একটু রংয়ের ছিটা লেগে গেল মুখে। বলল, কেঁদে, কাঁদিয়ে কেমন সুখ, ওসব আমি জানিনে। তোকে যেটা বলেছিলুম, সেটা অপমানের কথা। রবির অপমানের কথাগুলি ভেবে কান্না পেয়েছিল।

—সে অপমানই হোক্, আর যাই হোক্, যারা কাঁদায়, তারা দুঃখ দিয়েই কাঁদায়। কেঁদে যখন সুখ, তখন দুঃখ পেয়েও সুখ নিশ্চয়ই।

ঠিক কথা নয়, একটু যেন বিরক্ত হয়ে বলল সুজাতা, কী যা তা বাজে বক্‌ছিস্। অকারণে রবিকে টেনে এনে এসব কেন। জানিস তো সবই, আমি একদম ওকে টলারেট করতে পারিনে।

স্ট্র্যাণ্ড রোডে পড়ে অমলা হেসে বলল, কথা শুনে অবিশ্যি সেরকমই মনে হয়। কিন্তু তারপর ? আমার বাপু ঘোর সন্দেহ, ওই কুটকচালে কথার মানুষ প্রফেসারটিকে তুই সব সময় মনে রেখে চলিস্।

তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে সুজাতার ভারমিলিয়ান ঠোঁট বেঁকে উঠল। বলল, কেন, সেরকম কিছু টের পেয়েছিস্ নাকি ?

বিদ্রূপ না হলেও, একটা সুদূর কুহকী হাসির আভাস অমলার ঠোঁটে। বলল, না, টের পাইনি। ভয় নেই।

—কেন ?

—আর যাই হোক্, সবকিছুর চেয়ে তোদের ওই রবিদের মত ওঁচা নির্জীব আর কিছু নেই।

সুজাতা নিশ্চুপে একটু সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, সেই থেকে রবি তো আর আসেনি।

কারদেজোর সামনে ব্রেক কষে অমলা ঘাড় কাত করে একেবারে সুজাতার মুখের কাছে মুখ নিয়ে এল। অর্থপূর্ণ হেসে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, তুই ডাকলে হয়তো আসবে।

সুজাতা দরজা খুলে নামতে নামতে হেসে বলল, সেইটা বাকী আছে। তোকে দিয়েই খবরটা পাঠাব রাক্ষুসী। এখন বল্, বিকেলে আসছিস্ তো আমাকে তুলে নিতে।

অমলা হেসে বলল, হ্যাঁগো হ্যাঁ।

ততক্ষণে পিছন ফিরে লিফ্‌টের দিকে এগিয়ে গেছে সুজাতা। পিছন ফিরতেই ওর মুখের সমস্ত হাসিটুকু উবে গেল ভোজবাজীর মত। অনেকক্ষণ ধরে বুকের মধ্যে একটি তীক্ষ্ণ কাঁটা খুঁচিয়ে মারছিল, তবু হেসেছে। যেন অবশ করে রেখেছিল। এখন অকস্মাৎ সুযোগ পেয়ে কাঁটাটি উঠল মাথা উঁচিয়ে। অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির করে তুলতে লাগল।

আর সুজাতার প্রাণের এই অবোধ অস্থিরতার মূলেই ঘা দিতে চায় সবাই। সবাই, অমলা, বাবা, বোন, বন্ধু, সবাই। যে অস্থির ওর মন গোটা জীবনটাকেই তছনছ করছে। ও যত বেসামাল, সবাই তত পণ করেছে যেন আরো বেসামাল করতে। এই কারদেজো, বাড়ি, মিসেস স্যামসনের ক্লাব, অমলা, যাদের কাছে যেতে ওর মন প্রতিনিয়ত বিদ্রোহী, আজ ঠিক সেই সব জায়গায়ই ওকে যেতে হবে সারাদিনের বাঁধা রুটিন মত। তার ওপরে অমলার আজকাল গিরীন-প্রসঙ্গ। সেটা ছাড়িয়ে, তারো ওপরে রবির প্রসঙ্গ, যে তাকে সবচেয়ে হীন আর দুর্বল বলে জেনেছে, উপদেশ দিয়েছে গিরীনের কাছে ফিরে যাবার। মনে করেছে ওর ওই কপট বিষণ্ণ-গাম্ভীর্য ও সততার ভিতরটা সুজাতা মোটেই দেখতে পায় না। জানে না, বোঝে না কিছু।

আবার সেই বোবা অস্থিরতাই আসছে ঘিরে চারদিক থেকে।

লিফ্‌ট নেমে এসে তুলে নিল ওকে। তাড়াতাড়ি চোখে গগল্‌সটা এঁটে দিলে সুজাতা। মিথ্যে নয়, একবারের জায়গায় দু'বার তাকাল লিফ্‌টম্যান। অফিসের গেস্টরুমের এক কোণ থেকে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান টেলিফোনিস্ট মেয়েটি এক লহমা অবাক হয়ে হেসে বলল হ্যালো হাউ ডু ইউ ডু!

ভিন্ন সুরে একই কথার পুনরাবৃত্তি করে ঘাড় হেলিয়ে হেসে সুজাতা মেইন অফিসের সীমানায় গেল। কিন্তু মেয়েটি তাকিয়ে রইল তেমনি ঠোঁট কুঁচকে।

মেইন অফিসেও চাক-ভাঙা মৌমাছির মত গুঞ্জন উঠল একটা। একরাশ দৃষ্টি ছুটে এল চারদিক থেকে। আসে রোজই, একটু অন্যরকমভাবে। তারপর ম্যানেজারের পার্টিশনের দরজা।

শুভেন্দু, শুভেন চেয়ার থেকে প্রায় লাফ দিয়ে দাঁড়াল উঠে। কারদেজোর ম্যানেজার। বেঁটে মানুষ, ওল্টানো কোঁকড়ানো চুল। ভীষণ ফর্সা, অদেশীয়সুলভ। টাই-প্যান্টের নিটুট কেতা। অদ্ভুত তীক্ষ্ণ ছোট ছোট দু'টি চোখ।

কথা বলতে গিয়ে থতিয়ে গেল একমুহূর্ত। সুজাতাকে দেখতে দেখতে আবার থতিয়ে গিয়ে বলে উঠল, এসেছেন? আমি ভীষণ দুশ্চিন্তা করছিলুম, কেন আপনি আসছেন না। হঠাৎ কোন অসুখ-বিসুখ—

কথাগুলি মোটেই ম্যানেজারের মত নয়। রক্তাভা দেখা দিল সুজাতার মুখে। ওর বিয়ের দিনই প্রথম দেখেছে শুভেনকে। গিরীনের বন্ধু লোকটি। পরিচয়টা ভাল করে হয়েছে আসলে মিসেস স্যামসনের ক্লাবে। অমলার অন্তরঙ্গদের মধ্যে শুভেন একজন। চাকরিটা হয়েছে সেইদিক থেকেই। শুভেনও খুশি হয়ে সম্মতি দিয়েছিল। মাঝখান থেকে, যে মেয়েটি চাকরি করছিল এখানে, শুভেনের অফিস ও বাইরের সঙ্গিনী, সে বেচারীকে চলে যেতে হয়েছে কারদেজোর মাদ্রাজের ব্রাঞ্চে। সেসব নিয়েও কম গুলতোনি হয়নি। অফিসের আলোচনার বিষয় সবই শুনেছে ও অমলার কাছ থেকে। অমলার কাছে বলেছে শুভেন। বলেছে, অনেকের আপত্তি ছিল সুজাতার জন্যে। কিন্তু টেঁকেনি। বলে অমলা মুচকে হেসে বলেছে অপাঙ্গকটাক্ষপাত করে, 'কেননা খোদ ম্যানেজারেরই ভাল লেগে গেছে তোকে।'

সে-ই তো সুজাতার সবচেয়ে বড় ভয় ও বিঘ্ন। মিসেস স্যামসনের ক্লাবে, এতদিন আলাপের পরেও হাল ছাড়েনি শুভেন। ঠিক গিরীন-প্রসঙ্গের মত তখন অমলা বলত শুভেনের কথা। শুভেনের জীবনের ব্যর্থতা, দুঃখ, অনেক কিছু। চাকরি দিয়ে, নতুন করে কোমর বাঁধছে শুভেন। যেন চাকরি নিয়ে ওকেই কৃতার্থ করেছে সুজাতা। ভাগ্য ভাল, লোকটা গিরীনের কথা তুলে কখনো সুজাতাকে সমবেদনা দেখায় না। শুধু নিজের কথা। সেও এত কথা যে, প্রতিমুহূর্তেই শুনতে বড় ভয় সুজাতার।

নিজের মনের কাছে অস্বীকার করতে পারে না সুজাতা, ঠোঁটের কোণে গর্বের একটু সূক্ষ্ম হাসি চমকাচ্ছে নিয়ত। কারদেজোর ম্যানেজার যদি

কৃতার্থ মনে করে ওকে দেখে, তবে কেমন করে সুজাতা এই সমাজের মেয়েলী মন থেকে দূর করবে অহঙ্কার। তা ছাড়া, শুভেন বন্ধু গিরীনের।

কিন্তু, এ অহঙ্কার সুজাতার বাইরের। ওর ভিতরের অস্থিরতার আবর্তে এ যে শুধু ভয়। সেখানে কোন অহঙ্কার নেই। কিন্তু জীবনের একদিকের ধাক্কায়, আর একদিকের এই অর্থের আশ্রয়কে ও কোনরকমেই ভাঙ্গতে চায় না। খুশী রাখতে চায় শুভেনকে।

সুজাতা বলল অপ্রতিভ লজ্জায়, অনেক দেরি হয়ে গেল মিঃ—

—নো নো, একদিন আধদিন ওরকমে কিছু যায় আসে না। বসুন বসুন বসুন। রবার সিল্‌ক লং প্যান্টের রেখায় রেখায় যেন নেচে উঠল শুভেনের সুগঠিত উরু পেশী। আবার বলল, আমি ভাবলুম, আপনি আবার ডিসিশন করলেন নাকি কিছু।

হেসে মাথা নাড়ল সুজাতা। অসম্ভব শুভেনের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকা। ক্লাবে ও যখন পানমত্ত হয়ে ওঠে, তখনো চোখ দু'টিকে এমন ভয়াবহ মনে হয় না। বরং তখন দেখায় ভীরু আর বোকা। ওই তীক্ষ্ণ চোখ দু'টিই ভেসে ওঠে মরা মাছের চোখের মত।

জায়গায় বসে সুজাতা ফাইলে হাত দিতে যাবে। মানুষের গলার একটি বিচিত্র শব্দ শুনে, চোখ তুলল। শব্দটা শুভেনের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর। বলল, যদি কিছু মনে না করেন সুজাতাদেবী, অতুলনীয় মনে হচ্ছে আপনাকে। একটা ম্যানেজারের অফিসে, আপনাকে মানায় না। আর…জানত সুজাতা, শুভেন বলবে এই কথা। অমলা বলেছিল, আজকে নয়, আরো আগে, পোশাকে প্রসাধনেও একটু সোশ্যাল হওয়া দরকার। আর কিছু নয়, সবই ভিরমি যাবে, তুই ঘুরবি রাণীর মত।

রাণীর মত! ঠিকই, একটা খুশি জ্বলছে মনের মধ্যে, কিন্তু একটি তীক্ষ্ণ গ্লানি বসছে কেটে কেটে। খুশিটুকু একরকমের জলুনি।

সপ্রশ্ন সঙ্কুচিত চোখে তাকাল সুজাতা।

শুভেন বলল, আর, কারদেজোর আর্টিস্টরা বলে, আমার বিউটি সেন্‌স নেই। হয় তো তাই। যদি কিছু মনে না করেন, সাজ-সজ্জার বাইরে আপনাকে চোখ সয়, তাই সেইটেই যেন ভাল, মানে, এখন, এখন কী রকম জানেন, চোখ যেন ঝলসে যাচ্ছে, এ ক্লইনিং স্পার্ক।

অবাক হল সুজাতা। যেন, করুণভাবে অনুরোধ করছে শুভেন তাকে

না-সাজতে। যেন সত্যি ওকে কেউ শ্বাসরুদ্ধ করছে ভিতরে ভিতরে। ছ'টো ফ্যানের হাওয়াতেও ঘামছে ওর থ্যাবড়া শক্ত কপালটা।

একথার কোন জবাব নেই। জবাবের প্রত্যাশাও ছিল না শুভেনের। কথা শেষ করে ওর জায়গায় গিয়ে বসল ও।

সুজাতা ভাবল, এই ওর ম্যানেজার, ও পার্সন্যাল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট, এই ওর চাকরি। সময় চলে গেল টিক্‌টিক্ করে। কাজ কতখানি হয়েছে, সুজাতা নিজেও জানে না। একই পার্টিশনের মধ্যে, শুভেনের নিয়ত দৃষ্টির সামনে ও যেন এক বিচিত্র শিকারের মত ছট্‌ফট্ করতে লাগল। আর চারপাশ থেকে সেই ভয়ঙ্কর থাবাটাই আসতে লাগল ঘিরে। অপরের করুণা, ঘৃণা, সংশয় আর লোভের পাত্রী। এই রূপ, আর এই শরীর দেখে শুধু রক্তধারা নাচে পুরুষের। নিজের বিবাহিত স্বামীও শুধু এইজন্যেই আজ ওকালতী করে বান্ধবীর মারফত। শুধু একজন মজা লোটে দূর থেকে বিদ্বেষের আনন্দে। উপভোগ করে তারিয়ে তারিয়ে। সে রবি। ভীরু আর কাপুরুষ, বীরত্ব শুধু জেল খাটতে, আছে কিছু নির্বিষ মাস্টারিয়ানা। নীতিসর্বস্ব বাক্‌চতুর। এছাড়া আর কি ভাববে সুজাতা।

নিজেই জানেনা, শুধু জীবনের ভয় আর অবিশ্বাসগুলিকে কাটিয়ে উঠতে পারছে না বলেই যত ওর দুর্দশা। মেয়ে এবং মানুষ হয়ে গোটা সংসারের এ দুর্দশাকে সুজাতা কাটাবেই বা কেমন করে।

বেলা যায় পড়ে। আকাশটা পুড়ে পুড়ে এবার রং ধরে তামাটে। কারদেজো বিল্ডিং-এর পশ্চিম দিগন্ত রক্তাভ হয়ে উঠছে। রক্তাভ হয়েছে শুভেনের ঘর। রক্তাভ হয়েছে সুজাতার সমস্ত অন্তর। শুভেনের রক্তে রক্তে জমাটি নেশা।

এই সময়ে সুজাতার বার বার মনে হতে লাগল, কোথায় যাবে, কার কাছে যাবে ও। যতই রাত আসবে, ততই ভীত বিহঙ্গের মত সঁপে দেবে নিজেকে অমলার অতল অন্ধকারে। ঝুমনো, সুমিতার কথা মনে পড়ে, আর যেন কিছুতেই যেতে ইচ্ছে করছে না ওদিকে। আর, বাবার উমনোটির মত জীবনের এত বছর কাটিয়ে আজ চূড়ান্ত বিমুখ হয়ে উঠেছে মন।

শুভেন পৌঁছে দিতে চাইল গাড়িতে করে, যেখানে যেতে চায় সুজাতা। অমলার কথা বলে বিদায় নিল।

তারপর গাড়ি চলল অমলার। পথ ঘুরে, মাঠ ঘুরে, বেড়িয়ে বেড়িয়ে, আড়চোখে দেখে দেখে, শেষপর্যন্ত অমলা সার্কুলার রোড ধরল।

গাড়ি এসে ঢুকল মিসেস শ্যামসনের ক্লাব প্রাঙ্গণে। সন্ধ্যা তখন উত্তরে গেছে। বারান্দার টালি-শেডে ঢাকা পরে গেছে লেখাটি, 'ক্লাব এ্যাণ্ড বার।' অনেকগুলি গাড়ি এসে জুটেছে প্রাঙ্গণে। এ এক বিচিত্র মেয়েপুরুষের আড্ডা। রীতিমত মেম্বারশিপ, আছে নিয়ন্ত্রিত। স্টেজ এবং হলঘর ছাড়াও তিনতলা বাড়িটির নানান্ খোপে খাপে ফাঁদ আছে ছড়িয়ে। লোকে বলে, সোসাইটির যত অবৈধ কিংবা বৈধ প্রণয়ের জায়গা এইটি। মেম্বার বেশী মেয়েরাই। পুরুষেরা অধিকাংশ সভ্য হয় মেয়েদেরই সুপারিশে। সেদিক থেকে বুড়ি শ্যামসন সচেতন নারীর অধিকারে।

চারদিকে ফিস্‌ফিস্ গুঞ্জন। সুজাতাকে নিয়ে প্রাইভেট চেম্বারে ঢোকবার আগেই পুরুষেরা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে গুঞ্জন শুরু করে দিল। সারা হলঘরেই আজ পুরুষের প্রশংসা আর মেয়েদের বিদ্বেষের গুঞ্জন উঠল যেন। অনেকদিন দেখা সত্ত্বেও, অনেকে আজ চিনতেই পারল না সুজাতাকে।

—কে?

—ও! তাই নাকি!

—হোরিবল্!

—স্‌প্লেণ্ডিড।

চেম্বারে ঢুকে, অমলা গাল টিপে দিল সুজাতার। বলল, মরে গেল আজ সবাই। কিছু খাবি আজ?

সুজাতা ঘামছিল দরদর ধারে। বলল, খাব।

অমলার বিস্মিত হওয়ার পালা এবার। কিছু খাওয়া, মানে পান করা। এতদিনে বার তিনেক প্রায় স্পর্শ করার মত খেয়েছে সুজাতা।

অমলা বলল, সত্যি?

হাসবার চেষ্টা করে বলল সুজাতা, তবে কি মিথ্যে! অমলার দু' চোখে চকিত আলোর ঝলকানি। ছুটে গিয়ে অর্ডার দিয়ে এল অমলা। ফিরতে গিয়ে দেখল গিরীন তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে হলঘরে দাঁড়িয়ে।

অমলা বলল চোখ কুঁচকে, আমি ডাকলে আসবেন আমাদের চেম্বারে?

গিরীন স্থির নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে ছিল অমলার দিকে। বলল, যদি বলেন। অবশ্য, কোনরকম মিস্‌আণ্ডারস্ট্যাণ্ড না হয়।

সুজাতা আজ খেল খানিকটা।

প্রায় দেড়ঘণ্টা পরে, ওর সমস্ত মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। নতুন আরশোলার

পাথ্‌নার মত চক্‌চক্‌ করছে আরক্ত চোখ। কিন্তু নীরব হয়ে গেছে একেবারে। কী যেন বলতে চেয়েছে বারবার, বলতে পারেনি মুখ ফুটে। যেন কী এক ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা কিল্‌বিল্‌ করে উঠছে সারা মুখে।

অমলা কয়েকবার উঠে যেতে চেয়েছে, যেতে দেয়নি সুজাতা। অমলা ক্রমে বিস্মিত ভীত হয়ে উঠছিল সুজাতাকে দেখে। কেন যেন, কষ্টও হচ্ছিল। আশ্চর্য নিষ্পাপ দুঃখিনী মেয়ে বলে মনে হচ্ছিল সুজাতাকে।

বলল কোনরকম অসুস্থ বোধ করছিস্‌ না তো সুজাতা।

সুজাতা খুব পরিষ্কার গলায় জবাব দিল, না তো।

—তবে? কিছু বলবি?

সুজাতা হাসল একটু। বলল, কী বলব অমল! বলছি না, ভাবছি, আমার মুখে খুব গন্ধ হবে তো!

—না, ততখানি খাস্‌নি।

—আর ভাবছি অমল, এ সংসারকে আমার কী দেওয়ার আছে, তা জানিনে, কী চায় এ সংসার, তাও জানিনে বলে আমার বড় কষ্ট হয়। বলে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

অমলা বলল, ছাখ্‌, শত হলেও তুই মেয়ে, মেয়েমানুষ, এ সময়ে কী চাই, সে কথা কি তুই বুঝিস্‌নে?

সুজাতা—বুঝি। সে-ই তো বড় যন্ত্রণা, নিজেকে নিয়ে। আমার তো কেউ নেই।

—অনেকেই আছে, চায়ও।

—জানি। সেইটে আরো কষ্টকর।

পরমুহূর্তেই চমকে উঠে ভীতস্বরে বলে উঠল, পালাব এবার। কী জানি ভাই এসব আমি কি করছি, কিছু বুঝতে পারছিনে। বড় ঘেন্না করছে, আর ভয় করছে। বলতে বলতে শটান উঠে দাঁড়াল সুজাতা। চোখে জল এসে পড়ছে ওর।

—কোথায় যাচ্ছিস্‌।

—বাড়ি।

সামান্য কাত হয়ে দ্রুত পায়ে, না টলে টলে বেরিয়ে গেল সুজাতা।

অমলা বলল, দাঁড়া, গাড়ি বার করি।

—না ভাই, আজ হাঁটব বড় রাস্তা পর্যন্ত।

হল পার হয়ে, প্রাঙ্গণ পেরিয়ে বেরিয়ে গেল সুজাতা। গিরীন তখন প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। অমলা তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিলে।

বাতাস বইছে। গিরীনের সিগারেটের স্ফুলিঙ্গ উড়ছে। ওর সারা মুখে একটা বোবা বিস্ময় ছাড়া আর কিছু নেই। কিছু জিজ্ঞেস করলে না অমলাকে, নড়ল না এক পা। এমন কি, অমলার বিদায়ের হাতের সঙ্কেতও দেখতে পেল না।

সুজাতা পায়ে পায়ে, মোড় নিয়ে সার্কুলার রোডে এসে উঠল। রাস্তার আলোগুলি এখানে বড় বড় দেবদারু বট আর বাদামের ছায়া ও বিস্তারকে ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি। রাস্তা এসেছে ফাঁকা হয়ে। সামনে অনেকখানি জমি নিয়ে খৃষ্টানদের পুরনো কবরস্থান। গাঢ় অন্ধকার ও নৈঃশব্দ এখানে বিচিত্র অশরীরী মায়া ছড়িয়েছে। সাদা পাথরের স্তম্ভ আর মূর্তিগুলি দূর অন্ধকারে গাছের আড়াল আবডাল থেকে যেন অদ্ভুত মূর্তিতে বেড়াচ্ছে নড়েচড়ে। কথা বলছে কোরাস গলায় ঝিঁঝি ডাকের আড়ালে। বাতাস বইছে শন্‌শন্‌ করে। জোনাকির ঝিকিমিকি দেখা যায় কবরস্থানের অন্ধকারে।

অমলার গাড়ির লাইট এসে পড়ল সুজাতার গায়ে। ব্রেক কষে নেমে বলল অমলা, এ কি হচ্ছে সুজাতা, ঐ রাস্তায় এত রাত্রে হেঁটে যাওয়া যায়?

—বড় ভাল লাগছে ভাই হাঁটতে। একটু ভয় ভয়ও করছিল।

যেন সত্যি, ছোট একটি মেয়ে। অমলা হাত ধরে টানল ওকে। সুজাতা হঠাৎ বলল, দ্যাখ্‌ অমল আমি তো চেয়েছিলুম স্বাস্থ্যবান শিক্ষিত একনিষ্ঠ স্বামী আর স্বচ্ছন্দ জীবন। সংসারে কি এটা মেয়েদের খুব বেশী দাবী।

অমলা দেখল, চোখের জলে সুজাতার সারা মুখ ভেসে গেছে। বলল, হ্যাঁ। সব মেয়েই বোধহয় এই চায়। ওই দু'টির একটি সুখ, আর একটি স্বস্তি। কিন্তু সংসারেরই বোধহয় এই নিয়ম, মেয়েরা কোনদিন ও দু'টি জিনিস একসঙ্গে পাবে না। ও দু'টি জিনিস কেউ একত্র পায় না ভাই, কেউ না।

সুজাতা ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল তাই, তাই বোধহয়।

দু'জনে উঠল গাড়িতে। মরিস্‌ মাইনরটাও যেন একটি অসহায় মেয়ে। দু'জনকে নিয়ে চলল চাপা গুরুগুরু শব্দে।

বাইরের ঘর থেকে মহীতোষ দেখলেন নামতে সুজাতাকে। তাড়াতাড়ি চলে গেলেন নিজের ঘরে। শব্দ পেয়ে, বাতি নিভিয়ে পড়া সাঙ্গ করল সুগতা।

সুমিতা অন্ধকারে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল বালিশে মুখ গুঁজে।

(২১)

দিন কেটে গেল।

সুমিতা দেখলে। ঘরে-বাইরে, ভয়ে-বিস্ময়ে, দিনগুলির চেহারা দেখলে। নিজেকে সরিয়ে রাখতে চেয়েছে, ফিরিয়ে রাখতে চেয়েছে মুখ। বাংলায় অনার্স নিয়েছে সুমিতা। দিবানিশি ঘাটছে বাংলা সাহিত্যের প্রবন্ধ-নিবন্ধের স্তূপ। যেগুলিতে ওর হাত দেবার কথা নয়, সেগুলির ওপর দিয়েও চালিয়ে দিয়েছে পড়ার ঘোড়া। ঘোড়া-ই। এই ছোটার মধ্যে, পদাবলী-বাউল-আখড়াই-পাঁচালী, কোন্‌টা কোন্‌খান দিয়ে কীভাবে এল গেল নিজেই ঠিক করতে পারল না। শুধু বাংলা দেশের একটি দিশেহারা বিস্তৃতি ওর সামনে। অচেনা, অজানা তার রূপ। তার মাঝে মিশে যায়নি সুমিতা। মিশে যাওয়ার উপায় ছিল না। শুধু ছুটছিল।

একদিন ও ডি বি এল-খানি হাতে দেখে সুগতা বললে, এর মধ্যেই ওটা ধরেছিস কেন রুমনি? ওটা তো পরে পড়লেও চলবে।

সুমিতা একটু সলজ্জ-গম্ভীর স্বরে বলেছে, দেখছি একটু।

সব সময়েই লেখা আর পড়া, কলেজে যাওয়া-আসা নিয়ে সময় কাটিয়ে দিতে চায়। এই যে দিন কেটে যায়, এর সবটুকুই যেন ও ভরে রাখতে চায় পড়া দিয়ে। কিন্তু জীবনের সবচেয়ে বড় পড়াটা যে ওখানে নয়, সেইটি মর্মে মর্মে অনুভব করছিল সুমিতা। তাই আসলে ফাঁকি পড়ছিল পড়াটা। সব পড়েছিল অন্যদিকে।

যে দিনগুলি কেটে গেল, মন পড়েছিল সেইদিকে।

শীতের স্পর্শ লাগছে দিকে দিকে। শীত যেন কালো রাত্রি। হেমন্ত, তার রক্তাভ বিষণ্ণ সন্ধ্যা। সেই প্রাক্‌-শীত বিষণ্ণতায় ধূসর হেমন্ত বিরাজ

করছে কলকাতায়। গাছগুলি নিথর হয়েছে, শুকোচ্ছে পাতাগুলি। পথে জমেছে ধুলো, আবীরের মত লাগছে দেয়ালে দেয়ালে, গাড়ি-তারে-পোস্টে।

আর চারিদিকে শুধু একটি কথা, 'ঐতিহাসিক'। কাগজে, দেয়ালে, লোকের মুখে মুখে ওই একটি শব্দ, আর একটি দিন, 'পনরই আগস্ট'। গত পনরই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা পেয়েছে। নিশানে নিশানে গিয়েছিল দেশ ছেয়ে। গানে বক্তৃতায় হয়ে উঠেছিল মুখর। এখনো তার জের কাটেনি পুরো। রদবদলের ব্যাখ্যা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে থাকে প্রতিদিনের কাগজে। ঘোষিত হয় বেতারে। দেশ বিভাগ, গণপরিষদ, ডোমিনিয়ন পার্লামেণ্ট, আর একটি নতুন বাহিনী, রেফিউজী।

ঐতিহাসিক দিন-মাস-বছর। ঐতিহাসিক কথা, ঐতিহাসিক পরিবর্তন। ঐতিহাসিক, ঐতিহাসিক।

সবই ঐতিহাসিক। এই বাড়ি, বাড়ির মানুষ, সুমিতার চোখে সবকিছুই ঐতিহাসিক। শুধু এর কোন লেখা নেই, ঘোষণা নেই। লেখা যেটুকু, সেটুকু কখনো-সখনো সহসা দেখা যায় চোখে চোখে। ঘোষণা যেটুকু, সেটুকু পরস্পরের জীবনধারার ভঙ্গিতে।

সেই চারমাস আগে যেদিন রাত্রে সুজাতা ফিরল অনেক দেরিতে, মহীতোষ অপেক্ষা করেছিলেন, অন্ধকারে বাইরের ঘরে। সুগতা ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তায় পড়ার ভান করে কান পেতেছিল গেটের দিকে। শুধু যার কিছুই জানার কথা নয়, সেই সুমিতাই সমস্ত বিষয়টা দেখছিল। সুজাতা ফিরে আসার পর সবাই নিশ্চিন্ত হয়েছিল, কেঁদে বাঁচেনি সুমিতা। সারারাত্রি কেটেছিল ভয়ে ভয়ে, রাত পোহালে না জানি কী ঘটবে।

কিন্তু আশ্চর্য। ঘটেনি কিছুই। শুধু তাই নয়। অন্তরে অন্তরে যত অসন্তোষ, যত অমিল বেড়েছে দিনে দিনে, ততই সবাই আরো শান্ত, আরো ভদ্র হয়ে উঠেছে। বড় বিচিত্র রীতিনীতি এই সমাজের, এই জীবনের। ভিতরে চাপা পড়ে রইল আগুন। সবাই কথা বলছে মিহিসুরে, হাসছে পরস্পর। বসে এক টেবিলে, কথা বলে নানারকম। যেন একই সূত্রে গাঁথা সবার প্রাণ। খাবার টেবিলে বসে নুনের পাত্রটি সুজাতার দিকে এগিয়ে দিতে পারলে যেন কৃতার্থ বোধ করে সুগতা। মহীতোষকে দু'টি বেশী খাওয়ার জন্যে নিজের হাতে ভাত তুলে দিয়ে সুজাতা অনুরোধ করে।

বাইরের লোক এলেও বোধ হয় এত ভদ্রতা পোষায় না। সবাই নিখুঁত-ভাবে সকলের ভূমিকা পাঠ করে চলেছে। ভাল আছি, বেশ আছি, তুমি ভাল থাকো, সবাই ভাল থাকুক। কোথাও কোন দ্বিধা নেই, দ্বন্দ্ব নেই। সবাই যেন কত কাছাকাছি। কত কাছাকাছি, কত মিষ্টি সুন্দর। পান থেকে চুনটুকুও খসবার জো নেই।

কে বলবে, এদের মধ্যে আছে কোন বিরোধ।

সামনে থেকে সরে গিয়ে যে যার নিজের জীবনে যায় ফিরে। সুজাতা চলে যায়, আসে রাত্রে। সম্প্রতি তার উগ্র প্রসাধন ছাপিয়েও একটি অদ্ভুত রুক্ষতা ফুটে বেরিয়েছে। চোখের কোলে পড়েছে কালি। কোন কোনদিন রাত্রে তাকে পৌঁছে দিয়ে যায় অমলার গাড়ি। দু'দিন ফিরতে দেখা গেছে শুভেনের সঙ্গে।

মহীতোষ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ব্লাডপ্রেসার বেড়েছে। ডাক্তার এসেছেন দু'দিন। কিন্তু সেটা যেন কিছুই নয়। বিশ্রাম নেওয়ার কথা বলেছেন ডাক্তার। সেদিকে কান দেন না একেবারে।

সুজাতা সুগতার সঙ্গে অসুখের কথাবার্তা হয়। কিন্তু মহীতোষ উড়িয়ে দেন। যার কাছে বিশেষ করে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল, সেই ছোট রুমনির কাছেই কেমন যেন বেকায়দায় পড়ে যান।

রুমনি স্থির চোখে মহীতোষের দিকে তাকিয়ে থাকে। সেই চোখে বাবার প্রতি অনেক অভিমান ও অভিযোগ। একটু অপ্রতিভভাবে, স্নেহ-স্নিগ্ধ হেসে বলেন, কি বলছ রুমনো সাহেবা।

সুমিতা বলে, তোমার শরীর কিন্তু রোজ একটু একটু করে খারাপ হচ্ছে বাবা।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর সুজাতা ঠিক এমনি করেই মহীতোষের কাছে কাছে থাকত, বলত এমনি করে। সুমিতার কথা শুনে বুকের মধ্যে টনটন করে উঠে মহীতোষের। তখন সুজাতার নিজের জগৎ উন্মোচিত হয়নি। আজ হয়েছে। সে নিজেকে নিয়েই আজ বেসামাল। সুগতারও নিজের জীবন তার প্রবেশপথের দরজা খুলে দিয়েছে। সুমিতারও দেবে. সেদিন সে আর মহীতোষের কথা ভাববার অবসর পাবে না। বিশ্বসংসারের এইটিই বোধ হয় নিয়ম।

তাতে কোন দুঃখ ছিল না মহীতোষের। মেয়েরা সবাই তাদের নিজের নিজের জীবনে ছড়িয়ে পড়বে ওঁকে ছেড়ে, তার মধ্যে বেদনা আছে। কিন্তু সুখ আছে অনেকখানি। সেই সুখটুকু থেকে বঞ্চিত শুধু হননি, ভয় হচ্ছে। প্রত্যেকের জীবন যখন স্বতন্ত্রভাবে তৈরী হচ্ছে, তখন আর তার মধ্যে নিজের কিছু করার খুঁজে পান না, সবটুকু বুঝতেও পারেন না, সেইটিই ভয়।

পাশের বাড়ির ডেপুটি মিত্রসাহেবের মত একদিকে পালক, আর একদিকে শাসকপিতা তিনি হতে পারেননি। হলে বোধ হয় সকলের জীবনের প্রতি নিজের অনেকখানি হাত থাকত। সে আফসোসও আজ হয় মহীতোষের। অথচ যে স্বাতন্ত্র্যবোধকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, সেই জীবনে যে জটিলতার জট আছে, তার সূত্র খুঁজে পাওয়াও সাধ্যাতীত। আগে পিছে, সে সবই এখন যেন নিরর্থক মনে হয়। মনে মনে সন্দেহ হয়, ও-সব কিছুই নয়, আসলে হয়তো মেয়েদের উনি সুখের সন্ধান করতেই শিখিয়েছেন চিরদিন। সমাজের আরো উঁচু তল্লাটে ওঠার একটি ভয়ঙ্কর বেগ দিয়েছেন পুরে রক্তের মধ্যে।

ভাবতে নিজেরই কেমন লাগে, ভয় পান। কিন্তু সেইটিই তো ওঁর স্বধর্ম। মনের, চরিত্রের এবং যে সমাজে বাস করেন, সেখানকার। তার মধ্যে তো কোন দুরভিসন্ধি ছিল না। আর যদি বাপ হিসেবে শুধুমাত্র এইটুকুই দিয়ে-ছিলেন, তাতে এত যে তীব্র বিস্ময়কর যন্ত্রণা ছিল, তা কী জানতেন?

আজ শাসনের অধিকার গেছে ফুরিয়ে। পালনের সীমানায় ধরে রাখার উপায় নেই। সকলের আলাদা জীবনের মত ওঁর নিজের জীবনও আলাদা-ই। তাই নিজেকে বড় একলা মনে হয়। অনেক কিছু মনে হয়। কয়েকদিন বাড়ি ফেরার পথে নেমে পড়েছেন পথে। চৌরঙ্গীতে দাঁড়িয়ে নানারকম ভেবেছেন। বড় একলা মনে হয়েছে। একটি মানুষ চাই। একটি মানুষ। 'বার'-এর দিকে তাকিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেছেন। ফিরে এসেছেন আবার। লিণ্ডসে স্ট্রীট ধরে এগিয়ে গেছেন নিশি-পাওয়া মানুষের মত। অনেকদূর গেছেন। পথে পথে, মোড়ে মোড়ে মেয়েদের জটলা দেখেছেন। দলা দলা রুজ লিপস্টিক ঘষা ফ্যাকাশে মেয়েগুলি। পুরনো গাউনগুলি ধুয়ে ভাঁজ করে কোনরকমে রেখেছে টিকিয়ে। ঈগলের মত তীক্ষ্ণ চোখে এই দশাসই বয়স্ক মানুষটির দিকে তাকিয়েছে ফিরে। আড়কাঠি এসেছে টিকটিকির মত, কানের কাছে বিড় বিড় করেছে, ছোটিবালা মেমসাব হোজুর, কালিজ গার্ল।

ক্রমেই জীবনের এই সন্ধ্যা-রক্তে লেগেছে তীব্র কম্পন। স্রোত তার নীচ

থেকে ওঠেনি ওপরে, বরং তরতর করে নেমেছে। মনে হয়েছে রক্ত পড়ছে গড়িয়ে পথে পথে। শরীরটা ভারী হয়েছে, প্রতি মুহূর্তে মনে হয়েছে, অসাড় অচৈতন্য হয়ে মুখ থুবড়ে পড়বেন পথে।

এই শেষ জীবনে, নিজের মেয়ের সঙ্গে অমিল হল বলে পণ্যাঙ্গনার কাছে যেতে চেয়েছেন অবোধ একাকীত্ব ঘোচাবার আশায়। সারাজীবনে এ মোহ ছিল না কোনকালেই। কিন্তু একি বিচিত্র মানুষ মহীতোষ। কোথায় এর যুক্তি, কোথায় এর কার্যকারণ। যতই ওই সর্বনাশা পথে গেছেন এগিয়ে, ততই ভাববার চেষ্টা করেছেন। আজ এই বুড়ো বয়সে একটি মনের মানুষের প্রয়োজন হয়েছে। মনের মানুষ, হাসি, আনন্দ প্রাণখোলা কথা। সেই আশায় শেষ পর্যন্ত ওই পথে।

লোক শুনলে কি ভাববে। যত মন্দই ভাবুক, এর মধ্যে নিজেকে ধ্বংস করা ছাড়া আর কোন তত্ত্ব নেই। লোকে কত কি ভাবে। সংসারে দুঃখ থাকলে মানুষ কত কী করে। যেটুকু মহীতোষের সংসার, যা নিয়ে সুখ দুঃখ, তাঙ্গন ধরেছে সেইখানে। তাই পাগলের মত দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছেন।

কিন্তু মদও খেতে পারেন নি, মনের মানুষের হাসির অছিলায় পারেননি কোন মেয়ের কাছে যেতে। বোধ হয় ঠিক ওইটি চান নি। কী চেয়েছেন, ঠিক জানেন না বলেই গেছেন।

তারপর নিজের প্রকাণ্ড শরীরখানি কুঁজোর মত নুইয়ে, দু'হাতে মুখ ঢেকে পালিয়ে এসেছেন। ভিতরের পাশবিক চীৎকারটা কেউ শুনতে পায়নি। শুধু সারা মুখের ভাঁজে ভাঁজে লোনা জল পড়েছে গড়িয়ে।

মাঝখান থেকে লাভ হয়েছে ব্লাডপ্রেসারের আধিক্য। ছিলই, সেটুকু বাড়িয়েছেন রীতিমত। আর বিস্ময়ে ভয়ে লজ্জায় ধিক্কারে গেছেন অসাড় হয়ে। হয়তো আর দশজন বাপের চেয়ে বিপত্নীক মহীতোষ একটু বেশি অনুরক্ত মেয়েদের প্রতি। সংসারে যেন দেখতেই পান না আর কাউকে। তা বলে কী ভয়াবহ পাগলামিই না গ্রাস করতে বসেছিল ওঁকে।

সুজাতা মেয়ে হয়েও যেন ওর মায়ের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি। ওর দুঃখে, নিজেকে ধ্বংস করার বিচিত্র তাণ্ডবে, মহীতোষ বড় বেশি দিশেহারা হয়েছেন। কিন্তু সুজাতা! ভাবেন, উমনো আমার প্রাণে ব্যাথার কাঁটা হয়ে রইল ফুটে। কিন্তু আমার ঝুমনো আছে, আছে রুমনো সাহেবা। সামনেই বড় আনন্দের

দিন, ঝুমনোর বিয়ে। বুড়ো বয়সে একটি জীবন তো সবে শুরু হয়েছে। উমনো রইল, ঝুমনো-রুমনোর জীবনে প্রতিষ্ঠাটুকু দেখে যাবেন! করেও যাবেন, নিজের যতটুকু করার।

কিন্তু ব্যথা এমন জিনিস, যেখানে সে আছে, সেখানে সব আনন্দ ছাপিয়ে তার মেদুর বিষণ্ণতার আভাস ওঠে ফুটে। কাঁটা যদি থাকে বিঁধে, খচখচ তো সে করবেই।

এখন সুমিতার চোখের সামনে ওকে বেশি পড়তে হয়। একটু সঙ্কুচিতও হন। ছোট মেয়েটার চোখে অনুসন্ধিৎসা বড় তীব্র। কখনো কখনো বিরক্ত হয়ে ওঠেন নিজেরই দুর্বলতায়। মন তিক্ত হয়ে ওঠে। উমনো ঝুমনোকে যা বলতে পারেন না, রুমনোকে সেকথা বলে ফেলেন। যখন ও অমনি করে বলে, তোমার শরীর বড় খারাপ হয়ে পড়ছে, তখন ঠোঁটের কোণে একটু বক্র হেসে বলেন, তোমার জগৎটা এখনো অনেক ছোট রুমনো সাহেবা। তাই এসব সামান্য জিনিস তোমার চোখে পড়ে। এটা এমন কিছু নয়, সেরে যাবে।

সুমিতা বোঝে, বাবা কী বলতে চান। এক মুহূর্তের জন্যে বুকের মধ্যে টনটন করে। পরমুহূর্তেই বড় রাগ হয়। তীব্র গলায় কিছু বলে উঠতে ইচ্ছে করে। জানুক সবাই, এই বাড়িটার ছলনা সহ্য হচ্ছে না কিছুতেই। তারপরে শান্ত হয়ে যায়। শান্ত হয়ে তাকিয়ে থাকে।

সংসারে সুমিতা দু'টি লোককে বোধ হয় সবচেয়ে বেশি স্নেহ করে। একজন বিমল, আর একজন মহীতোষ। শিশু নয় দু'জনের কেউই। কিন্তু ওর নারীত্ব এই দু'জন সম্পর্কে এই অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় করেছে।

তারপর আসে সুগতা আর মৃণালের কথা। কোন-কোনদিন মহীতোষের সঙ্গে মৃণালের দেখা হয়ে যায়। যেদিন না হয়, সেদিন জিজ্ঞেস করেন, মৃণাল এসেছিল?

এসেছিল।

সুগতার পরীক্ষার আগেও এসেছে নিয়মিত। পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, এখন আসে আরো নিয়মিত। সারাদিন, রোজ আসে মৃণাল।

সারা বাড়িটাতে থাকে ওরা দু'জনেই।

সংসারে কতই না অদলবদল হয়। পরীক্ষার সময় সুগতার চোখে-মুখে যে ক্লিষ্টতা দেখা গিয়েছিল, তা মুছে গেছে। ওর সারা দেহে যেন ঝাঁপ দিয়েছে

এক নতুন প্লাবন। বলিষ্ঠ শরীরখানি যেন কত হাল্কা। মুখ ভরে একটু রং-এর ছোপ ধরে আছে সর্বক্ষণ। ওর মত গম্ভীর মেয়ের চোখের তারা দু'টিতে এখন নিয়ত চকিত দীপ্তি। বেলা বারোটার ঘণ্টা বেজে যাওয়ার পর, নিরালা বনের হরিণীর মত থাকে উৎকর্ণ হয়ে, চঞ্চল হয়ে বার বার ফিরে ফিরে চায় দরজার দিকে। কখন মৃণাল আসবে।

মৃণালের আগের সেই অপ্রতিভতা গেছে। কেমন একটি হারাবার ভয় ছিল কয়েক মাস আগেও। এখন অনেকখানি দৃঢ়তা পেয়েছে। চোখে-মুখে সতেজ দীপ্তি। কথা বলে রাশি রাশি, আসে সশব্দে, যায় সশব্দে। সুগতাকে উঠতে হাত বাড়ায়, বসতে হাত বাড়ায়। তবু মনের খুব গভীরে সে অনুভব করে, জীবনের এক অদৃশ্য ক্ষেত্রে সুগতা কোথায় যেন এক ধাপ বেশি উঠে আছে। সেটা যে কোথায়, সঠিক জানে না মৃণাল। বোধ হয় জীবনেরই সর্বাংশে। কোথায় যেন একটু খাটো, একটু বেশি কৃষ্ণ। তাই সুগতার প্রতি মনের সমীহটাও বেশি। এটা চরিত্রের মধ্যে এসে আপনি ভিড়েছে। মৃণালকে তৈরি করতে হয়নি।

এসব কোনদিন মন দিয়ে চেয়ে দেখেনি সুগতা। ওর গম্ভীর বলিষ্ঠ মূর্তিটির আড়ালে যে মেয়েটি আছে, সে দেখেছে পুরুষের ব্যাকুল প্রার্থনা। করুণভাবে ভালবেসেছে ও মৃণালকে। মৃণালকে সুগতা গ্রহণ করেছে, সঁপে দেয়নি নিজেকে। সেটাও ওর চরিত্রের গঠন।

তবু সুগতা মেয়ে। মৃণাল যতক্ষণ না আসে, চঞ্চল হয়ে ফেরে ঘরে ঘরে। এলেই আবার সেই মূর্তিতে ফিরে যায়, শান্ত হয়। ও ভালবেসেছে মৃণালকে।

কয়েকদিন গাড়ি নিয়ে এসেছে মৃণাল। সুমিতার বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করে উঠেছে। কেবলি মনে পড়ে গেছে বড়দি আর গিরীনদার কথা।

সারাদিনে দু'জনের কত কথা যে চলে। কত কথা, কত খুনসুটি। মেজদির মধ্যে যে এমনি একটি হাসিখুশি মেয়ে আছে, এতটা টেরও পাওয়া যেত না কোনকালে। দু'দিন সুমিতা মৃণালের বক্ষলগ্ন দেখেছে সুগতাকে।

একদিন বাগানের পিছনে, সন্ধ্যার পরে মৃণাল ওর সুদীর্ঘ হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল মেজদিকে। ওরা দু'জনেই দু'জনকে চুম্বন করছিল। কাঁটা দিয়ে উঠেছিল সুমিতার সর্বাঙ্গ। মনে হয়েছিল, ওর বুকের কাপড়ে গেছে আগুন লেগে।

আর একদিন বাইরের ঘরে। বাড়িতে বিলাসও ছিল না। অসময়ে কলেজ থেকে ফিরে দেখল, মেজদি কী যেন লিখছে চেয়ারে বসে। মৃণাল জড়িয়ে ধরে, গালে গাল ঠেকিয়ে কী যেন গুন গুন করছিল। চমকে উঠেছিল দু'জনেই সুস্মিতাকে দেখে। মাঝখান থেকে সারাদিন বেরুতে পারেনি ওর সামনে। আর সুস্মিতা প্রতিজ্ঞা করে বসল, জীবনে কোনদিন আর রবার সোলের অমন সর্বনেশে নিঃশব্দ জুতো পরবে না। কিন্তু মৃণাল একটুও লজ্জিত নয় সুস্মিতার সামনে। বরং কথার আড়ি, হেসে হেসে জানান দিয়েছে, দেখেছ তো। বেশ করেছ।

দু'জনে বসে বসে নানান আলোচনা করে। পরশুদিন সারা-ভারত ছাত্র-সম্মেলন শেষ হয়েছে। সুগতা কেন্দ্রীয় সংসদে হয়েছে নির্বাচিত। সংসদের সেক্রেটারী অমৃতলাল কারলেকার ওকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল বোম্বেতে। যেতে পারেনি সুগতা। সামনের সপ্তাহে ওদের বিয়ে। তারপরে যাবে। জীবনে, কাজের ক্ষেত্রকে ও বিশ্বাস করে। জীবনে এইটি ওর বড় অঙ্গীকার— ছাত্র-আন্দোলন থেকে সরে যাবে না কখনো। মৃণাল কী কখনো তার স্ত্রীকে এসব বিষয়ে নিরস্ত করতে চাইবে।

মৃণাল বলে, যেখানে দেখে তোমাকে চিনেছি, সঁপেছি নিজেকে, সেখান থেকে তোমাকে টেনে নামাবার সাধ্য আমার নেই, তেমন মতিও যেন না হয় কখনো। আমাকে তফাত করো না। আমার জীবনকে আমি উৎসর্গ করেছি তোমার জীবনের পথে। তুমি কাজ করবে দেশের, আমিও কাজে লাগব তোমার। এমনি করেই কাটুক আমার এই একটি জীবন।

সুখী সুগতা। টাবুটুবু ভরাট মনে হয় ওকে। প্রতিদিন দু'জনে যায় ছাত্রসঙ্ঘের অফিসে। সেখানে সবাই মুগ্ধ সুগতাকে দেখে। রুক্ষমূর্তি, রূঢ়ভাষিণী ছাত্রনেত্রী নয় সুগতা। জীবনের অন্যান্য দিক এমন নিশ্চিন্ত ও স্বচ্ছন্দ করেছে ওকে, দিবানিশি রাজনীতির কঠোরতার মধ্যেও উল্লাসের জোয়ার বহে ওর চারপাশে। দেখে মনে হয়, ও যেন ছাত্রসমাজের রাজেন্দ্রাণী। একটু ঠাট্টা করে বললে, মক্ষীরানী। এসব দেখে সুগতা আরো গভীরভাবে চিন্তা করবার চেষ্টা করে। ভাবে, নিজেকে সবটুকু দিতে হবে বিলিয়ে। রাজনীতির ক্লাসিক পড়ে আরো বেশি করে। দু'জনেই পড়ে। ও আর মৃণাল। সম্প্রতি প্রবন্ধও লিখতে আরম্ভ করেছে সুগতা।

যেদিন মৃণাল গাড়ি নিয়ে আসে, সেদিন অন্য কোথাও যায় দু'জনে।

পোশাকেরও পরিবর্তন হয় মৃণালের পীড়াপীড়িতে। মনে মনে আত্ম-সমালোচনা করে সুগতা। মৃণালকে শুনিয়েই করে। যেন অহংকারের বশে, স্বাচ্ছন্দ্যের স্রোতে এ জীবনে বিচ্যুতি না ঘটে।

জীবনের ধ্রুবতারাটা দেখা গেছে, জানা গেছে তার অবস্থিতি। সেইখানে পৌঁছুতে হবে। দেখে সুমিতা। ভাল লাগে। ভাল লাগে, কিন্তু মেজদি যখন ওর ওই আসর থেকে ফিরে বাড়ির আসরে বসে, তখন বদলে যায়। বোঝা যায়, এখানে ওর জীবনের আলোছায়াটা ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে। রং লেগেছে অন্যত্র।

এখন আর তেমন ভয় নেই। একদিন ড্রয়ার খুলে দেখে নিয়েছে, রাজেনের সেই চিঠিখানি আছে কি না। আছে। ঠিক যেমন, তেমনি আছে। যেন ভুলেই গেছে।

রাজেনের কথা মনে পড়ে হঠাৎ একটু অভিমান হয় সুমিতার। কথা দিয়েছিল, বাড়িতে আসবে। আসেনি। আজকাল সে ছাত্রসঙ্ঘের অফিসে আসাও দিয়েছে কমিয়ে। পনরই আগস্টের পর থেকে হাওড়ার শ্রমিক অঞ্চলেই কাটায় বেশি।

অনেকে বলেছে, সুগতা-মৃণালের সিদ্ধান্তের ওপরেই এই পরিবর্তনটি ঘটে গেছে রাজেনের। কিন্তু শুধু সুগতা-মৃণাল নয়, সুমিতাও জানে, ক্রমেই শহর আর ছাত্র ছেড়ে, শহরতলীর শ্রমিকাঞ্চলে যাবার ইচ্ছে ছিল রাজেনের অনেক-দিন। পনরই আগস্ট ছাত্রদের মধ্যে প্রায় সরকারীভাবেই ঘোষণা করেছে রাজেন। সুগতা জানে, সুমিতাও দেখেছে, রাজেনের মূর্তি ও চরিত্রের তীক্ষ্ণ-তার মধ্যে কোথাও সুগতার জন্যে দাগ পড়েনি। হয়তো বড় বেশি রূঢ় তীব্র বলেই দাগটি চোখে পড়ে না সহজে। কিন্তু এগুলি ওর জীবনের বাধাস্বরূপ নয় কখনো।

এখানে ওর তৃপ্তি ছিল না। সেকথা ও নিজেই বলেছে, এখানে আমার নিজেকে বড় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা মনে হয়। বড় সংক্ষিপ্ত, অল্পায়ু এই শহরের গতি। জীবনটাকে চোখেই পড়ে না যেন। আমি নিজে ওই অঞ্চলের মানুষ। সেখানকার জীবনের কোনকিছুর সঙ্গেই আমি কলকাতাকে পারিনে মেলাতে। ছোট-বড়োর বিচারের বিষয় এটা নয়। কিন্তু ওখানে গিয়ে কাজ করতে হলে মনে অনেক সাহস সঞ্চয়ের প্রয়োজন, অনেক ধৈর্য, অনেক গভীরতা দরকার। সেটা ওখানে না গেলে সম্ভব নয়। দূর থেকে বসে হবে না।

পনরই আগস্ট ছাত্রসভায় রাজেনের বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিল সুমিতা। রাজেন বলেছে, এতদিন পরে এক নতুনতর সংগ্রামের পথ খুলে গেল। আরো দায়িত্ব, আরো বিস্তৃতির সময় এসেছে আজ। আমরা যে মুক্তি পেয়েছি, সেটা প্রমাণ করতে হবে গোটাজীবনের সব ভয় ও দুঃখকে হরণ করে।

সম্মেলনেও গেছল সুমিতা। প্রায় একই কথা সেদিন বলেছে রাজেন। ওর কথাগুলির নানারকম অর্থ করেছে অনেকে। কেউ বলেছে, পালাতে চাইছে। কেউ বলেছে, পনরই আগস্টের সাফল্যটাই বোঝেনি রাজেন।

হিরণ্ময় রাজেনের শিষ্য। কিন্তু বড় রগচটা ছেলে। বলেছে, বিস্তৃতির মানে কী ?

রাজেন বলেছে, সর্বাঙ্গীণতা। দেশ ও দশ সম্পর্কে আরো বেশি জানা, আরো বেশি শ্রদ্ধা, আর দেশসেবার নামে বিন্দুমাত্র ফাঁকিকেও নিরঙ্কুশ উপড়ে ফেলা।

—সেটা কী এতদিন হয়নি ?

—হয়েছে, অত্যন্ত হেলাফেলা ভরে। রাজনীতির জন্যে রাজনীতি নয়। ইংরেজের ইণ্ডিয়া নয়, ভারতবর্ষ সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি চাই, নইলে কিন্তু সব ভণ্ডুল হবে।

হিরণ্ময় বোঝার চেয়ে অবুঝ রোষে উঠেছে ফুঁসে, এতদিন তাহলে আমরা সব ভণ্ডুল করছিলুম।

রাজেনকেও ভাল করে চেনে হিরণ্ময়। চোখ তুলে তাকাতেই হিরণ্ময়ের রুক্ষ দৃষ্টি থতিয়ে গেছে। বলেছে, ভণ্ডুল করোনি, ওপরে ভাসছিলে। এবার ডুব দিতে হবে।

এই কথাবার্তার সময় সামনেই দাঁড়িয়েছিল সুমিতা। রাজেন দেখতে পায়নি। চলে গেছে অন্যদিকে। ফিরে ডাকতে সাহস পায়নি সুমিতা। কী ভীষণ দপদপে মুখ রাজেনের। যেন একটি জলন্ত অঙ্গারখণ্ড।

কেবল সুমিতার সামনে ক্ষোভে ও লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠেছে হিরণ্ময়। দূর থেকে দেখেছে সুমিতা, মেজদি আর মৃণালের সঙ্গে রাজেন ঘুরছে, হাসছে, কথা বলছে। কোথাও কোন অসামঞ্জস্য পড়েনি চোখে। শুধু সুমিতাকেই চোখে পড়েনি রাজেনের।

আশীষ এল মৃণালের সঙ্গে বেলা চারটের।

জীবনের এই এক ঐতিহাসিক বিস্ময় সুমিতার। আশীষকে ওর বড় ভয়। প্রায়ই আসে আশীষ মৃণালের সঙ্গে। ঘনিষ্ঠ বন্ধু মৃণালের। কোথায় কোন এক অদৃশ্য স্থান থেকে যেন আশীষ পাকে পাকে জড়িয়ে ধরছে সুমিতাকে।

ওর নিজের মন ও নিজে বোঝে না। সেখানে দিবানিশি কে কার সঙ্গে তর্ক করছে। চলতে-ফিরতে, পড়তে-খেতে, সর্বক্ষণ। মন ওর সুস্থির নয়। ও যে কারুর সঙ্গে প্রেম করছে, সেটা একেবারেই অনুভব করতে পারে না। অথচ মনে হয়, যেন বুকের মধ্যে কিসের বাতাস আলুথালু হচ্ছে অহর্নিশ। দোর খুলে কান পাতলে তো সেখানে প্রচণ্ড তাণ্ডব ছাড়া আর কিছু শুনতে পায় না। মাঝখান থেকে আশীষের কাছে কেমন যেন ভেঙ্গে দুমড়ে পড়ছে।

আশীষের সঙ্গে চোখোচোখি হলে ওর বুকের রক্তধারা ছলাৎ করে উঠে। বিনয়ের ঠোঁটের ছোঁয়ালাগা জায়গাটুকু ঘাড়ের কাছে জ্বলে দপদপ করে। বিনয় ওর প্রেমিক নয়। কিন্তু ভুল করে বিনয় যেটুকু রেখে গেছে, তার একটা বিচিত্র প্রতিক্রিয়া ঘটেছে ওর রক্তশিরের সুগভীর রন্ধ্রে।

(২২)

সুজাতার ঘর থেকেই শুনতে পেল সুমিতা, মৃণাল টক্ টক্ করে শব্দ করছে সুগতার দরজায়। তারপর খুশি উপচে পড়া জিজ্ঞাসা, আসতে পারি?

এক মুহূর্ত একটু ঠোঁট-টেপা হাসির নীরবতা। তারপর সংক্ষিপ্ত এবং পরিষ্কার ছোট্ট একটি, না।

ততক্ষণে পর্দা সরিয়ে ঢুকে পড়েছে মৃণাল। চোখ পিটপিটিয়ে বলল একটি হাস্যকর ভঙ্গি করে, অপরাধ?

ভ্রূ কুঁচকে অপাঙ্গে তাকাল সুগতা। তাম্বুলরঞ্জিত ঠোঁটের কোণে চমকালো একবার চকিত বিদ্যুৎ। মাঝে মাঝে হঠাৎ ওর পান খাওয়ার শখ চাপে। মুখের বিস্বাদ কাটাতে গিয়ে পাত্‌লা রক্তাভ ঠোঁট দু'টি যে টকটকে হয়ে ওঠে, সেটা ও জানে কিনা কে জানে। নভেম্বরের শেষে এই শীতে কোঁকড়ানো ছোট দিন। ঘরের মাঝে ছায়া এসেছে ঘিরে। সুজাতার হাউসকোট এর মধ্যেই আলমারি থেকে বেরুলেও সুগতা এখনো ওর মাদ্রাজী তাঁতের লাল জামায় ফুটিয়ে রেখেছে সাদা ফুল। শুধু তাই নয়, অনভিজাত ঘটি-হাতা পুরনো জামাটি অতি আয়াসে নাগাল পেয়েছে বোতামপটিতে। সেখানেও সাদা শাড়ির আঁচলখানি চূড়ার সীমায় ছিল বোধ হয় অকুলান।

মৃণালকে দেখে, আঁচল টেনে কুল রাখতে গিয়ে মনে মনে কুল হারানোর আভাস দেখা গেল ওর চোখেমুখে। বলল অপরাধ গুরুতর।

পায়ে পায়ে এগিয়ে বলল মৃণাল, যথা ?

সুগতা বলল, প্রথম অপরাধ চাউনি।

এমনভাবে তাকাচ্ছ, আমার ভীষণ লজ্জা করছে।

মৃণালের ছু' চোখ নেশাগ্রস্ত হল আরো। নিশি-পাওয়া রাক্ষুসে চোখে দেখতে লাগল সুগতাকে। বলল, অপরাধ, কিন্তু নির্দোষ। তোমার প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে···

থাক্। আমার বই কোথা, যেগুলো নিয়ে আসার কথা ছিল আজ ?

মৃণাল ঝুপ করে সুগতার পাশে বসে পড়ে অপরাধীর মত মুখ করে বলল, সত্যি কিছুতেই মনে থাকে না। কাল আনবই, আনবই

—থাক্, তিন সত্যি করতে হবে না। এখন ক'টা বেজেছে শুনি ?

—চারটে।

সুগতা গম্ভীর গলায় বলল, কাল থেকে আমি ঠিক বেরিয়ে যাব তিনটের মধ্যে।

অপরাধটা মৃণালের। কথা দিয়ে কিছুতেই সময় রাখতে পারে না। হয় ঘুমিয়ে পড়বে দিনের বেলা, নয়তো দ্রুতগতি খরগোশের মত, তাড়াতাড়ি করে ও জমে যাবে কোথাও। এটা ওর স্বভাব, আসলে দোষ নয়। পথে পথে কোণে কোণে এত আড্ডা ছড়ানো, হাজার তাড়া থাকলেও কাটিয়ে আসতে পারে না। শ্যাম রাখতে গিয়ে ওই কুলটা থাকবে না, ও বুঝেছে। জীবনের একটা দিক ভাঙবে, গড়বে নিশ্চয় আর এক দিক।

বলল, খুব রাগ করেছ, না ?

মৃণালের দিকে একবার চকিতে দেখে, মুখ নামিয়ে বলল সুগতা। রাগ কেন। সেই কখন থেকে বসে আছি। আসা আর হয় না। সত্যি, আমি কারুর জন্যে এমন করে কোনদিন বসে থাকিনি।

এই সহজ কথায়, সহজ সুরে ও ভঙ্গিতে সুগতার বুদ্ধি ছাড়িয়ে মেয়ে-হৃদয়ের তাড়নাটাই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মৃণালের ছু'চোখের তরঙ্গে অস্পষ্ট হয়ে দেখা দিল খুশির ঝিলিক। ওর সমস্ত দৃঢ়তা যেন দাগ কাটে ইস্পাতে। বলল, ইচ্ছে করে নয়, বিশ্বাস কর। তোমার চেয়ে আমি অনেক বেশী অ-সবুর হয়ে উঠেছি।

সুগতা লজ্জিত হয়ে উঠল। বলল, অ-সবুর আবার কী। শুধু শুধু অপেক্ষা করতে বড় বিশ্রী লাগে। ঠিক সময়ে বলে গেলে এরকম হয় না। তাহলে একটু কাজ হয়, পড়াও হয়। চল বেরিয়ে পড়ি। সেই ব্রিটিশ সোস্থালিস্টের বক্তৃতা আছে আজ স্টুডেন্টস হলে।

ততক্ষণে মৃণালের মাথায় একটি বিচিত্র প্রসঙ্গ আপনি এসে বসেছে জুড়ে। ওর মনে পড়ে গেল, বছরখানেক আগের কথা। রাত্রি প্রায় দশটা পর্যন্ত সুগতা একদিন না খেয়ে অপেক্ষা করেছিল রাজেনের জন্যে। কারুর জন্যে কোনদিন অপেক্ষা করেছে সুগতা, এখন হয়তো ভুলে গেছে। ভাবতে ভাবতেই মৃণালের ঠোঁটের তটে উপছে এল একটি কথা। আশ্চর্য! কথাটা সত্যি নয় জেনেও না বলে পারল না।

বলল, জানো কাল একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি।

সুগতা উঠে পড়ে বলল, বেশ করেছ। আমি জামাকাপড় পরে আসি।

মৃণাল বলল, না না, শোনই না, অদ্ভুত স্বপ্ন।

ঘরের মাঝে গিয়ে ফিরে দাঁড়াল সুগতা। বলল, বল তোমার অদ্ভুত স্বপ্ন।

মৃণাল হাসল, স্বপ্ন দেখলুম, তোমার বিয়ে হচ্ছে।

সুগতা ভ্রূ কোঁচকাতে গিয়ে হেসে ফেলল। সেই দমকে আবার তট হারালো আঁচল। বলল, সত্যি, নাকি। নিশ্চয় পাঁচুই ডিসেম্বর।

—হ্যাঁ, তারিখটা সেইরকমেরই।

—নিশ্চয়ই এ বাড়িতে?

—হ্যাঁ।

সুগতা হেসে উঠল খিল্‌খিল্‌ করে। আঁচল উঁচিয়ে প্রায় মারতে উদ্যত হয়ে দু' পা এগিয়ে এসে বলল, কার সঙ্গে?

মৃণাল বলল, রাজেনের সঙ্গে।

সুগতার উদ্যত আঁচল বসল চেপে নিজেরই উদ্‌গত হাসির মুখে। মুখ ফিরিয়ে বলে উঠল

ছি ছি, এ খুব অন্যায়।

মৃণাল তাকিয়েছিল সুগতার মুখের দিকে। বলল, অন্যায় হলে কী করব, দোষ তো আমার নয়, স্বপ্ন যিনি দেখান, তিনি—

সুগতা গম্ভীর হয়েই বলল, কেন যে এরকম স্বপ্ন দেখতে হয় তোমাকে।

—যাঃ! দেখে ফেললুম, তার কী করব। চকিতে একবার চোখোচোখি হল দু'জনার। সুগতা আবার বলল, না, ছি! ও বেচারীকে নিয়ে টানাটানি করার কোন মানে হয় না।

আশ্চর্য! রাজেনকে যে সুগতা 'বেচারী' বলছে, সে কথাটি কানে ওর লাগছে না একটুও। ওই একটি কথায় কোথায় যেন ও রাজেনকেও করুণা করে ছেড়েছে। তা থেকেএকটি কথা স্পষ্ট হয়ে গেল। রাজেনের দিকে থেকে মনকে একেবারে উজানে বইয়ে দিয়েছে সুগতা।

বোঝা গেল, মৃণালের নিঃসংশয়ের মধ্যে এখনো যেন সংশয়ের উঁকি ঝুঁকি।

পাশের ঘরে গোপন কৌতূহলবশে ন যযৌ ন তস্থৌ সুমিতা। মৃণালের স্বপ্ন সংবাদে সবচেয়ে যেন বেশি বেজেছে ওরই। কিছু না ভেবে-চিন্তেও কুপিত হয়ে উঠল সুমিতার মন। যেন মৃণাল অকারণ খানিকটা গ্লানি চাপিয়ে দিতে চাইছে রাজেনের ওপর।

চলে যেতে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল সুমিতা।

মৃণাল বলল, আমি টানাটানি করিনি। আমার টান তো একদিকেই। হয়তো ওদিকে টানটা রয়েছে সুগতার।

—কোন্ দিকে?

আবার চোখোচোখি হল। সুগতা বলল, সারা দিন-রাত এই সবই চিন্তা বুঝি? ভীষণ রাগ হয় আমার।

—কে বললে তোমাকে, আমি ওসব ভাবি।

—তুমি ভাব, আমি জানি। তাতে আমার অহংকারে না হোক মনে বড় লাগে।

মৃণাল খানিকটা তটস্থ অসহায়ভাবে বলে উঠল, না, না, তোমাকে দুঃখ দেওয়ার জন্যে কিছু বলিনি, সত্যি। সামনে সাতটা দিন। এই সাতটা দিনের জন্যে যত আবোল-তাবোল বকে চলেছি আমি। এ প্রসঙ্গ ইতি ইতি ইতি!

বলে একটুও সময় না দিয়ে দু'হাতে টেনে আনল কাছে সুগতাকে।

সুগতা সন্ত্রস্ত হয়ে বলল, যাঃ, রুমনিটা কোথায় আছে, দেখে ফেলবে এখুনি।

মৃণাল সুগতার ঘাড়ের কাছে নুয়ে বলল, কোথাও নেই।

—না নেই। ছেলেরা এত কানা হয়ে যায়। যাও, তুমি বসোগে, আমি কাপড় পরে আসছি। আলিঙ্গনমুক্ত হতে গিয়ে বলল আবার, নিশ্চয় সঙ্গীটি এসেছে ?

সঙ্গী অর্থে আশীষ।

মৃণাল বলল সঙ্গী বলে শুধু শুধু আমায় খোঁটা দিও না। আমার সঙ্গ ধরে আশীষ আর একজনের সঙ্গলাভের জন্যে।

—রুমনির তো ?

—নিশ্চয়ই। ছাখোগে হয়তো এতক্ষণ দু'জনে জমে গেছে বাইরের ঘরে।

পাশের ঘরে দুরু দুরু করে উঠল সুমিতার বুকের মধ্যে। আরক্ত মুখে পালাতে গিয়ে মনে হল পা দু'টি কে চেপে ধরে আছে।

সুগতা বলল ওরা দু'জনে কী সিরিয়স ?

—ভাব-ভঙ্গি দেখে বুঝতে পারনা ?

এবার জোর করে পালাল সুমিতা। পালিয়ে গেল খাবার ঘরের কোল দিয়ে একেবারে বাগানে।

ভাব-ভঙ্গি! সিরিয়স। কত কথা উঠছে। কতদূর এগিয়ে গেছে ওর আর আশীষের আলোচনা। যাবেই তো। এর ওপরে সুমিতার নিজের কোন জবাব নেই, কৈফিয়ত নেই, যত সংশয় আর জিজ্ঞাসা থাকুক মনের মাঝে, নিজের দিশেহারা তীব্র স্রোতধারাটিকে না পারছে চিনতে, না দেখতে পারছে তার গতিপথ।

এই সংশয়টাই তো ভয়। কী বিচিত্র ভয় ওর আশীষকে। গত চার মাসে আশীষ যেন কোন্ অন্ধকার থেকে চুপিসারে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে এসেছে সুমিতার চারপাশ ঘিরে। এতদিন আন্দাজ করেছে, এইবার পড়েছে লক্ষ্য। সুস্পষ্ট করে উঁকি দিচ্ছে আশীষ।

কিন্তু আন্দাজ আর লক্ষ্য নিয়ে কেন এত কূট তর্ক সুমিতার। ওরই অনুভূতির রক্ত-শিরা-উপশিরা বেয়ে এসেছে আশীষ। আসেনি তো না-জানান দিয়ে।

তবে কেন ভয় সুমিতার। যা সে চায়নি তবু পড়েছে স্রোতে, চলেছে তীব্র টানে।

অনেকদিন মনে হয়েছে, ছোট ছোট ঢুলু ঢুলু অপলক চোখে কী দেখে

আশীষ চেয়ে চেয়ে। ওই চোখে তীক্ষ্ণতাও ছিল। ঠিক বাজপাখির তীক্ষ্ণতা নয়, নির্বাক বকের মত। তন্ময় শুধু নিবিষ্ট নয় অনুসন্ধিৎসু।

দেড়মাস আগে একদিন এমনি সময়ে প্রায় সুগতা মৃণাল গেল বেরিয়ে। সুমিতা জানতোই না বাইরের ঘরে বসে আছে আশীষ। উদ্দেশ্যহীনভাবে বেরুতে গিয়ে হঠাৎ থমকে গেল আশীষকে দেখে। মনের চমকানিটুকু চেপে অবাক হয়ে বলল সুমিতা, আপনি বেরোননি ?

বলে দেখল আশীষের ঢুলু ঢুলু চোখে একটু অপ্রতিভ বিষণ্ণতা। চাপতে চাইছে নিজেকে। বলল তুমি চলে গেলেই বেরিয়ে যাব।

চোখ নামায়নি আশীষ। সুমিতা ভীরু নম্র লতাটি যেন। মনে মনে অবাক হলেও আশীষের সোজা কথায় লজ্জায় নির্বাক রয়ে গেল কয়েক মুহূর্ত। চোখ নামিয়ে রাখতে হল ওকেই।

এর অনেক আগে থেকেই আশীষ যাতায়াত করছিল নিয়মিত। এই প্রথম একটা সরাসরি পদক্ষেপ করল। আশীষের সারা মুখে কেমন একটা করুণ ভাব বিরাজ করছিল, যেটা ঢেকে দিয়েছিল ওর মুখের নিয়ত-বিদ্রূপ বক্রতা। কেমন একটু ঝুঁকে পড়ল সুমিতার মন।

বলল বেশ তো, না হয় না-ই বেরুলুম। গেলেও বাবা আসবার আগেই আমি চলে আসতুম।

কিন্তু কেমন যেন গুটিয়ে যাচ্ছিল সুমিতা আশীষের চোখের সামনে। বসে পড়ল ঝুপ করে একটি সোফায়।

আশীষ হাসল। হাসলেই তার মুখের বিদ্রূপটা ওঠে এঁকেবেঁকে। বলল যেভাবে নুইয়ে রাখলে মাথা, মনে হচ্ছে অস্বস্তিবোধ করছ খুবই।

আবার একটু অবাক হওয়ার চেষ্টা করে সলজ্জ হেসে বলল সুমিতা, কই না তো।

কিন্তু তাই তো! আশীষ যে প্রত্যহের মাঝে নতুন করে দিলে ভাঙন এনে।

আশীষ বলল, নয়তো ? যাক, আমি সেই ভেবে অপরাধী ভাবছি নিজেকে। ভাবি, রোজই বলব তোমাকে, একটু বসে যাও। পারিনে, কী একটা ভেবে বসবে হয়তো।

নিজেকে চোখ টিপে বলল সুমিতা, ওমা! কেন ?

বলে হাসল। হাসিটিও যে একরকম ভয়ের, সেটাও বোধহয় সুমিতার অজানা।

আশীষ চোখ সরাতে বোধ হয় জানে না। বলল, তা হলে ভুল করেছি এতদিন না বলে।

আশীষ হাসল। সুমিতাও হাসল বুকের দুরু দুরু তালে। বারবার মনে পড়তে লাগল, স্ট্র্যাণ্ড রোডের ধারে সেই সন্ধ্যারাতে আঠারো বছরের একজন সেদিন যত ভুল করে ফেলেছিল।

আশীষ আবার বলল, মাঝে মাঝে নিজেকে এত বন্ধুহীন মনে হয়, অথচ বন্ধুর ছড়াছড়ি চারদিকে। এত থেকেও এত একা লাগে, কোথাও যেতেই পারিনে।

যত শুনছিল, ততই শরতের ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকারে একটি নির্বোধ কাঁপুনি শীত ধরিয়ে দিচ্ছিল সুমিতাকে। সেই সঙ্গেই আশীষের একাকীত্বের বিষণ্ণতা ওর মনটাকেও তুলল মন্থর করে। সবচেয়ে আশ্চর্য! তখন থেকেই বিনয়ের ঠোঁট ছোঁয়ানো ঘাড়ের সেই একঠোঁট জায়গাটুকু জ্বলতে লাগল দপ দপ করে। তখন থেকে, সেইদিন থেকে, আজ পর্যন্ত।

এই কী ভালবাসা! জানে না সুমিতা।

জীবন নিয়ে কাব্য করার অবকাশ আসেনি সুমিতার। যেটুকু এসেছিল, সেটুকু নিয়ে তাপসীর মত কাব্য করতে গিয়েও পারেনি। একজনকে কাঁদিয়ে, কেঁদে ফিরেছে নিজে। সেই দিন থেকেই বুঝেছিল, বয়স অল্প হলেও একজন বন্ধুকে হারাল সুমিতা! ওর দোষে নয়, বিনয়ের নিজের ধিক্কারই নিজের কাছে থাকবে অপ্রতিহত ব্যারিকেড হয়ে।

কিন্তু মর্মে মর্মে বুঝেছে সুমিতা, মানুষের আছে দু'টি মন। পুরুষ এবং মেয়েমানুষ, উভয়েরই। দু'টি ছাড়িয়ে আছে হয়তো আরো মন। ঘটনার ক্ষেত্রে এসে দল বেঁধে সব দাঁড়িয়ে যায় দু'পাশে।

সুমিতার মনের দু'পাশে চলেছে তেমনি দু'য়ের লড়াই। আর ঠিক লড়ায়ের নিয়ম অনুযায়ী হারছে একপক্ষ, অপরপক্ষ জিতেছে। এই জেতাটাই সুমিতা প্রতিরোধ করতে চাইছে নিয়ত।

শিশুর মত নির্বোধ সহাস রক্তের মধ্যে দুর্বোধ্য দুরন্ত যন্ত্রণা দিয়ে গেছে বিনয়। বিনয়ের অস্থির ব্যাকুল হাত দু'টি প্রীতি সত্ত্বেও অসংশয়ে সরিয়ে দিতে পেরেছিল সুমিতা। যেন পাথর ভেঙে অতল গর্ভে পড়তে গিয়ে বেঁচে ফিরেছে।

চলতে গিয়ে আবার খাদ। খাদ কী, কেমন তার বিভীষিকা, এবার সেটুকু দেখবার জন্যই যেন চাক্ষুস টান ধরেছে প্রাণে, রক্ত-কোষে কোষে।

আশীষের উদ্যত হাতটি কিছুতেই সরাতে পারছে না সুমিতা। যতক্ষণ থাকে দূরে দূরে ততক্ষণ ভাবে অনেক কিছু। ভাবতে ভাবতে একটা বোবা কান্না সশব্দে চীৎকার দিয়ে উঠতে চায় ভিতর থেকে। ও যে মেয়ে, বারবার নিজেকে একথাটি বুঝিয়েও পারছে না সামলাতে। যত সহজে সবকিছু পারে ছেলেরা, সুমিতা তা পারবে কেমন করে।

কিন্তু বিশ্বসংসারের সমগ্র রক্তধারার মধ্যেই বোধহয় এই একই খেলা। বুদ্ধি দিয়ে তাকে সব সময় ধরে রাখা যায় না।

যদি বা রাখা যায়, আশীষ কাছে এলে যায় না আর। তখন প্রতি বিন্দু রক্ত বলে, আশীষকে আমি ভালবাসি, ভালবাসি, ভালবাসি।

বাগান দিয়ে ঘুরে গিয়ে বাইরের ঘরে ঢুকল সুমিতা। দেখল, নিবিষ্ট চোখে গালে হাত দিয়ে আশীষ তাকিয়ে আছে ভিতর দরজার দিকে। কেমন যেন বিমর্ষ, ক্ষুব্ধ দেখাচ্ছিল তার সর্পিল কপাল। সুমিতার দিকে চোখ পড়তে, নিয়ত সপ্রতিভ মুখ আশীষের চকিত হাসির দীপ্তিতে ছেলেমানুষের মত মনে হল।

আশীষ বলল, কী ব্যাপার। ভাবছিলুম তুমি বাড়ি নেই।

সেই প্রথমদিনের মত, আশীষের কাছে এলেই আজো দুরু দুরু করে বুকের মধ্যে। হেসে বলল, কেন?

—কোন সাড়া শব্দই নেই তোমার। ওদিকে বুঝতে পারছি, মৃণালের কোন খেয়ালই নেই। উঠে পড়তুম এখুনি।

—বন্ধুকে খবর না দিয়েই?

—কী করব। যার জন্যে আসা, সে যদি না থাকে…। আর বন্ধু নিশ্চয়ই খবরের প্রত্যাশা করছে না। সেই ভেবেই আরো রাগ হচ্ছিল মনে মনে।

—কার ওপর?

—সবকিছুর ওপর, বন্ধুর ওপর, আর তোমাদের ওই ভয়ংকর দরজাটার ওপর।

বলে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল বাড়ির ভিতরে যাওয়ার দরজাটি।

সুমিতা অবাক হয়ে বলল, কেন? দরজা কী করল?

—কিছু করেনি বলেই তো! একেবারে বোবা আর শূন্য।

বলে, তাকাল সুমিতার দিকে। সর্বাঙ্গে সুমিতার ওর দুরু দুরু মনের ঢাকনা। কলেজে যায়নি আজ। আবাঁধা চুল শ্যাম্পুর ফাঁপানিতে আলুলায়িত ঘাড়ে পিঠে। বেগুনী রং শাড়ির আঁচল নেমেছে কাঁধ বেয়ে। মাঝখানে যেন দপ দপ করে জলছে সুমিতার আরক্ত মুখ। টানা চোখ ঈষৎ রক্তিম। ঘুমভাঙার মত।

এক মুহূর্ত তাকিয়ে আশীষ বলল, আমার মত, দরজাটা একা।

সুমিতার বুকের রক্ত উঠেছে কলকল করে সেই ঘাড়ের কাছে। বলল, তোমরা ছেলেরা সবাই সব সময় কিছু না-কিছু বলে একটু ফিলজফি করবে।

আশীষকে আজকাল 'তুমি' বলে সুমিতা। আজকাল বলতে, দিন পনের ধরে।

আশীষ বলেছিল, কোন উদ্দেশ্য-বিধেয় বাদ দিয়েই বলছি, খুব অসুবিধে না হলে আমাকে 'তুমি' করে বলো সুমিতা। কথা দিচ্ছি, তাতে আমার কোন দাবী বাড়বে না, একটু অন্তরঙ্গতার লোভে।

যেন যাদু করেছে আশীষ। ওর কোন কথাই ফেলতে পারে না সুমিতা। পারে না, পারবেও না কোনদিন বোধহয়। শুধু যেটা পারে না সুমিতা, সেটা কথা। আশীষের সামনে কথা ফুটতে চায় না সুমিতার মুখে। মাঝে মাঝে মুখর হয়ে ওঠে সহসা। সে মুখরতা তর্ক। আশীষের জীবনবোধ, সাহিত্য, রাজনীতি, বিশ্বাস নিয়ে তর্ক। তখন এই আশীষকে সুমিতা ভুলে যায়। প্রতিবাদের ঝড় ওঠে, চাপা পড়ে যায় ক্ষণিকের জন্যে ওর রক্তকোষের তীব্রতা। আশীষ নীরব হয়ে টেনে নিয়ে যায় অন্য পথে, কথার মোড় দেয় ঘুরিয়ে। আবার ফিরে আসে আশীষের ব্যক্তি-জীবনের একাকী বেদনার কথা। আশীষ বলে অনেক কথা, ও শুনে যায়।

মৃণাল এল ঘরে। বসেছিল এতক্ষণ। সুগতার অর্ধেক সাজটা হয়েছে বোধহয় ওর চোখের সামনেই।

দুই বোন সহসা চোখোচোখি করতে পারে না। সুগতাকে একটা কিছু না-জানা ছলনার ছায়া টানতে হয় মুখে। তবু চাপা যেন থাকে না কিছুই।

সুগতা বলল, রুমনি, তুই কি বেরুবি?

জবাব দিতে গিয়ে সুমিতার চোখোচোখি হল আশীষের সঙ্গে। আশীষের

মুখে ফিরে এসেছে সেই বিদ্রূপ-বক্রতা। তাকিয়েছিল স্বগতার দিকেই। স্মিতার আগেই বলে উঠল, ভাবছিলুম তোমার বোনকে নিয়ে আজ আমাদের বাড়ি যাব।

স্বগতা বলল, তা যাক, কিন্তু তুই একটু তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস রুমনি। আমার দেরি হলে সবাই খেয়ে নিস।

ওরা দু'জনে বেরিয়ে গেল। যাবার আগে মৃণাল বলে গেল, চলি আশীষ।

স্মিতা নিজেকে কেমন যেন অসহায় বোধ করছিল। মনে হচ্ছিল, অদ্ভুত নির্বোধের মত, বোবার মত, নিজের সমস্ত সত্তাটা হারিয়ে ফেলে দাঁড়িয়ে আছে সকলের সামনে।

আশীষ বলল, কি হল, কিছু মনে করলে নাকি ?

একটুও অবাক না হয়ে যন্ত্রের মত হেসে বলল স্মিতা, কেন ?

—বাড়ি যাওয়ার কথা বললুম বলে ?

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে চেষ্টা করে বলল স্মিতা, না তো। যেতে চাও তো, চল যাই।

আশীষ এক মুহূর্ত নিবিষ্ট ঢুলু ঢুলু চোখে তাকিয়ে বলল, চল তবে।

(২৩)

দেখতে দেখতে অগ্রহায়ণের বেলা গেল চলে। সুদূর পশ্চিমাকাশের কোথাও এখনো একটুখানি ঝুলে আছে সূর্য। প্রাসাদের ভিড়ে গেছে চাপা পড়ে। সংকেত তার রয়েছে ছড়িয়ে আরক্ত আকাশের মুখে। যেন কিছু লজ্জা কিছু ভয় রয়েছে ঘিরে এই গোধূলি রক্তে। শহরের যন্ত্রযান ও গানের শব্দ ছাপিয়েও কোথায় কোন্ বাড়িতে বাজছে ক্ষীণ শঙ্খধ্বনি, ঘণ্টা বাজছে টিং টিং করে।

বেরিয়ে এল স্মিতা আশীষের সঙ্গে। খুব কম সেজেও অসামান্য সাজ হয়েছে ওর। সামনে থেকে চুল টেনে নিয়ে, ঘাড়ের কাছে বেঁধেছে লাল ফিতায়। গায়ের ওপর নিয়েছে জড়িয়ে সুতোর মাধবী-রং চাদর। সাদা ফুলের পাড়খানি ঘাড় থেকে নেমে উঠেছে বুকে। আবার নেমে গেছে কোমরের পাশে, ওর চলার দোলনে দোলনে।

ঠোঁটের কোণে মিট্‌মিট্‌ করছে একটু অস্পষ্ট হাসির আভাস। দৃষ্টি ওর সামনের পথের দিকে, কিন্তু চোখের ইন্দ্রিয় রয়েছে সজাগ, পাশে আশীষের প্রতি।

আশীষেরও তাই। শুধু ওর ঢুলুঢুলু চোখ চক্‌চক্‌ করছে, যেন বহু শত্রু বিনাশী কৃপাণ। জয়ের চেয়েও বিদ্রূপের মাত্রাটাই তাতে ফুটেছে বেশী। সটান দোহারা শরীরটার প্রতি অঙ্গেও সেই বিদ্রূপের আভাস যেন হেলছে আর দুলছে। চলেছে সুমিতার গা ঘেঁষে। বলল, হেঁটে যাবে।

সুমিতা ওর সেই সত্তা-হারানো প্রেমিকার নির্বোধ ভঙ্গিতেই বলল, যেমন খুশি।

পথে পথে বাতি জ্বলেছে। ভিড় চলেছে পথের দু' পাশে। বিশ্বসংসারে মানুষের পথ চিরদিনই বড় তৃষ্ণার্ত। সবাই তৃষ্ণার্ত চোখে তাকাচ্ছে দু'জনের দিকে। আশীষের চোখে মাতাল আবেশ। আবেশের পিছনে চাপা পড়ে আছে একটি বিচিত্র তীক্ষ্ণতা।

বলল, যেমন খুশি, আর যেখানে খুশি তো?

সুমিতা ঘাড় কাত করে বলল, হ্যাঁ।

—তবে বাড়িতেই চল।

ততক্ষণে সুমিতার বুকের কুণ্ডলীপাকানো সাপটা কিল্‌বিল্‌ করে উঠে এসেছে গলার কাছে। ওর সবই ঠিক ছিল। ওর নির্বোধভাব, সত্তা-হারানো আবেশ হাসি। কিন্তু জড়বস্তুর ধীরগতি চৈতন্যের মত একটি প্রশ্ন কিল্‌বিল্‌ করে উঠে এল জিভে। বলল, আচ্ছা, সবকিছুতেই তোমার এত বিদ্রূপ কেন বলতো?

চোখ যত ঢুলুঢুলু, কপাল তত বিস্ময়ে সর্পিল আশীষের। বলল, কেন, বিদ্রূপ কোথায় দেখলে?

সুমিতা বলল, মেজদি আর মৃণালকে দেখলেই তুমি এমন করে তাকাও। বিশেষ মেজদির দিকে। কেন বলতো?

দু'জনেই হেঁটে গেল খানিকটা কোন কথা না বলে। আশীষ তাকিয়েছিল দূরের দিকে। পার্কটা পার হয়ে বলল আশীষ, তুমি তো জানো আমাকে সুমিতা। তবে কেন এ সব কথা বলছ?

ঠিক এই জবাবটাই শুনবে বলে ভাবছিল সুমিতা। 'তুমি তো আমাকে জানো।' হ্যাঁ, জানে সুমিতা, সমাজের সমস্ত নীচতা, দীনতা, ভাঁড়ামি

প্রতিনিম্বিত খোঁচাচ্ছে অশীষকে। তাই সে দূরে সরে থাকতে চায়, অসহ্য ঘৃণা নিয়ে রাখতে চায় মুখ ফিরিয়ে। আর বিদ্রূপে হেসে দেখছে এই অনলস মিথ্যে-বোঝাই সংসারটাকে।

কিন্তু মেজদি। মেজদি কী করেছে। যদিও জিজ্ঞেস করতে বড় ভয় সুমিতার। কেননা, অশীষ তার প্রতিটি কথা যেন বিষেরপাত্রে ডুবিয়ে ছোঁড়ে। তবু বলল, কিন্তু মেজদি! ওর মধ্যে তুমি কী দেখলে।

আশীষের সারা মুখে বিছের মত বিদ্রূপের হাসি কিলবিলিয়ে উঠল। বলল, যা দেখি সারা সমাজে, সকলের আর আমার বাড়িতে। আমার বোনদের, বউদিদের, সবখানে সবাইকে। কেউই ব্যক্তি হিসেবে নিজের মত করে সুখের সন্ধান করছে না, কেননা, তাতে অনেক শক্তির প্রয়োজন। এই সমাজের ছাঁচে ঢালা পুতুল সব। সবাই তাই এক ছাঁদে হাসছে, চাইছে, বলছে। চোখে যেটুকু পড়ে, সেটুকু ভড়ংএর কম বেশী। আসলে সব এক একটি মিথ্যেবাদিনী।

বড় রাস্তা থেকে একটি ছোট রাস্তায় ঢুকল দু'জনে। সেখানে গ্যাসের আলোয় সুমিতার অবাক জিজ্ঞাসু মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল অশীষ। আবার বলল, তোমার মেজদির কথায় না হয় পরেই আসছি। নিজের বোনদেরই তো দেখলুম, ওদের ভালোবাসার বড়াই, নারী প্রগতি, প্রেমের মুক্তি, যা কিছু, সবই শেষ পর্যন্ত সেই রাজবাড়ির খিলানগুলোর খোপের পায়রার বক্‌বকম্‌। উড়ে ওরা অন্য কোথাও যায় না। আকাশের একটি কোণে উঁকি মেরে আবার ফিরে আসে। সবাই মুগ্ধ হয়, হাততালিও দেয়। পায়রার মালিক থাকলে, সে বেচারী একটু ঘাবড়ে যায় হারাবার ভয়ে। কিন্তু ওতো হারাবার নয়। খোপ ছেড়ে যাবে কোথায়। বুলবুলির বরাদ্দ ধান ছড়ানো আছে সেখানে, আর আছে ভরা মদ্দা পায়রা। আকাশের ডাকে কখনো সে সাড়া দিতে পারে! আমার ভগ্নীপতিরা সব শাঁসালো ব্যক্তি, বোনেরা আছে বেশ সুখে। যত সাধ্য-সাধন এতদিনের, সে তো ওই শাঁসটুকুর জন্যেই। পেয়ে গেছে, গেছে সব ফুরিয়ে।

বলে চাপা গলায় হেসে উঠল আশীস। চাপা হলেও ভয়ংকর তীব্র সেই হাসি। অতৃপ্ত স্নেহের জ্বালা অশীষের সারা চোখে মুখে। বলল, কী, তোমার খুব রাগ হচ্ছে নিশ্চয়ই সুমিতা।

সুমিতা বলল, না, রাগ নয়, ভয় হচ্ছে।

আশীষের সভয় হাত একবার প্রায় বেষ্টন করে, সুমিতার হাত স্পর্শ করে আবার সরে গেল। বলল, ভয় কেন?

কেন ভয় কেমন করে বলবে সুমিতা। কত ভয়। আশীষের কথার মধ্যে কোথায় একটি তীব্র 'সত্য' রয়েছে। তবু সেই সত্যোপলব্ধির অনেকখানি যেন নির্দয় ঘৃণা শুধু। এই অর্ধেক বিশ্বাসের ভয় সুমিতার। ভয়, তবে কী চোখে ওকে দেখে আশীষ, কেমন মেয়ে ভাবে। ও যে এক গহীন জল-স্রোতে ভাসছে। না পারে দাঁড়াতে নিজের শক্তিতে। ভয় শুধু ঠেকবে গিয়ে কোথায়। সব মিলিয়ে, আশীষের সব কিছুকেই তাই বড় ভয় সুমিতার। কেমন চোখে ওকে দেখে আশীষ, সেকথাও তাই জিজ্ঞেস করতে আটকে যাচ্ছে গলায়। শুধু এক রুদ্ধ ভয় ও বেদনা মনের মধ্যে। বলল, মেজদিকেও তুমি ঐ দলেই ফেলছ?

আশীষ বলল, নিশ্চয়ই। তোমার মনে কোন সন্দেহ থাকুক, তা' আমি চাইনে। সেই জন্যেই বলছি, জিজ্ঞেস করো মৃণালকে, এক বছর আগে আমি ওকে বলেছি, সুগতা যদি কাউকে বিয়ে করে, সে তুই। তোমার মেজদিকেও বলেছিলুম একদিন, সে নিশ্চয়ই মালা রেখেছে মৃণালের জন্যে। তার জন্যে সুগতা একটু রুষ্টও হয়েছিল আমার ওপর। ভয়ে ও বিস্ময়ে কেমন যেন সিরসির করে উঠল সুমিতার বুকের মধ্যে। গ্যাসের অস্পষ্ট আলোয় আশীষের তীক্ষ্ণ হাসিটি জ্বলছে গুপ্তির মত।

আশীষ আবার বলল, আমি যে জানি, এ হতেই হবে। তা' ছাড়া কী উপায় ছিল সুগতার বল। ও তো অনেক দূর গিয়েছিল, অনেক সাহস দেখিয়েছিল, আর কত দেখাবে। তাই আমি শুধু দেখি আর হাসি। অবাক হইনে।

বলে হেসে উঠল। দাঁড়িয়ে বলল, আর যেও না, এসে গেছি।

এই তো সেই বাড়ি। হঠাৎ চমকে উঠে, মুখে স্মিত হাসি টেনে আনল সুমিতা! মুখের ভয় আর বিস্ময়ের সমস্ত দাগগুলি অদৃশ্য হাতে খুঁটে খুঁটে তুলতে লাগল সন্ত্রস্তভাবে। বারে বারেই হাসবার চেষ্টা করতে লাগল। আশীষের গা ঘেঁষে উঠতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে! না না কিসের ভয় সুমিতার। বড় নির্দয় আর ভয়ংকর সত্য কথা বলে আশীষ। সেটা যখন অসহ্য মনে হয়। তখনই ভয়। এই সত্যের জন্যে আশীষ একাকী, বন্ধুহীন আত্মীয়হীন। সুমিতা আরো ঘন হয়ে এল আশীষের কাছে। ভাবে শত

ভয়ের মধ্যেও নির্ভয় আমার আশীষ। আশীষের এই স্পর্শের মধ্যেই মনের সমস্ত কথা আপনি আবার কুণ্ডলী পাকিয়ে মুখ গুঁজে ফেলে শান্তভাবে। ওর সঙ্গে সঙ্গে দেহের রক্তধারাও উঠতে থাকে সিঁড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে। সেই তালে তালে বলতে থাকে সুমিতা, ভালবাসি, ভালবাসি ভালবাসি। আর কিছু নয়। শুধু ভালবাসা। ওর উনিশ বছরের এই সাজন্ত বাড়ন্ত সুন্দর দেহের রক্ত শুধু প্রেমলোলুপ, উন্মত্ত এক আসঙ্গ লিপ্সায়। কী হবে তর্কে ও কথায়। খালি দেখছে, উনিশ বছরটা আর সবদিকে বোবা ও বধির। এজীবন যে এখন শুধু একটানা স্রোতে ভাসমান।

মস্ত বড় বাড়ি। একই পরিবার, তবু যেন সব আলাদা ভিন্ন ভিন্ন ফ্ল্যাটে। কারুর সঙ্গে কারুরই এমনিতে দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার উপায় নেই। কে কখন আসে যায়, টের পাওয়া যায় না। আশীষের বাবা, দুই দাদা, সবাই বড় চাকুরে। সবচেয়ে ছোট আশীষ। লেখাপড়া সাঙ্গ হওয়ার কথা ছিল অনেক আগেই। মাঝখানে বন্ধ হয়েছিল ওর সেই সাহিত্য-অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য, নানান জায়গায় ঘুরে। আশীষের ঘরটা ওর মায়ের ঘরের পাশেই, যদিও দেখা-সাক্ষাতের সম্ভাবনা কমই। বোধ হয়, ছোট ছেলে বলে মায়ের পাশের ঘরটি সাব্যস্ত হয়েছে ওর জন্য।

ঘরে ঢুকে বাতি জ্বেলে, দরজাটা ভেজিয়ে দিল আশীষ। দোতলার নীচেই হেমন্তরাত্রির ফাঁকা গলি একদিকে। বারান্দায় ফুলের টব কয়েকটা। ঘরে বোঝাই বই আলমারিতে। পল দ্য কক্, ডুমাস, হুগো থেকে বালজ্যাক্-স্তাঁদাল-আরাগঁ। টমাসমান-টলস্টয়-রলাঁ, নামকরা অসংখ্য বই, ঝক্ঝকে চক্চকে আলমারিতে। সুমিতার মনে হয়, ঠিক আশীষের মতই যেন সব বিদ্রূপ ও ঘৃণাভরে রয়েছে তাকিয়ে আলমারির কাঁচের আড়াল থেকে। হাসছে শ্লেষে। বিদ্রূপের মধ্যেও যেন আবেশে ঢুলুঢুলু চোখ, আশীষের জীবনজোড়া এই কেতাব-সংসারের। সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপরে বই খাতা সাজানো। নেপালের তৈরী পিতলের মীনে করা নাগরা-ছাইদানিটা যেন সোহাগী কুকুরছানার মত পেয়েছে ঠাঁই এ ঘরে। তেমনি রকমেই ঠাঁই পেয়েছে দেয়ালে টাঙ্গানো উত্তরবঙ্গের কালী-নাচের মুখোশ, পোড়ামাটির ছাইদানি, ছেলেভুলানো পুতুল। মনিবের হঠাৎ উদারতার দুর্বল ফাঁকে কিংবা দেশীয় সংস্কৃতিপিপাসার স্বাদ মেটাতে দিশী জিনিসগুলি ঢুকে পড়েছে এই আসরে। বিদেশের এই মহাকীর্তিখানায়, 'দিশী' জিনিসগুলিও কেমন যেন

ল্যাজ নেড়ে চাপা ক্রোধে গর্জায় গর্‌গর্ করে। বাংলা দেশের কোন্ চার পয়সার মেলা থেকে এখানে এসে হঠাৎ যেন কেমন জাত বদলে বসেছে। দেশে ওরা এই মাটিতে গড়ে, এই মাটিতে মেশে। এখানে হালফ্যাশানের লাইটশেডের তলায়, বুক-শেলফের কিনারে, মসৃণ সেক্রেটারিয়েট টেবিলে ওরা বিদ্রূপে হাসে মিট্‌মিট্ করে।

একপাশে খাটে পাতা বিছানা। সবদিকেই সাজানো গোছানো।

দাঁড়িয়েছিল সুমিতা টেবিলের পাশে। আশীষ ওর পিঠে হাত দিয়ে বলল, বসো।

সুমিতার রক্তের মধ্যে দোলা লাগল। নির্বোধ হাসিটুকু ছটফটে চড়ুয়ের মত নেচে বেড়াচ্ছে ঠোঁটে, চোখে, মুখে। চিন্‌চিন্ করে জলছে সেই চুলে ঢাকা ঘাড়ের কাছে।

বসল সুমিতা।

আশীষ বলল, তোমার মেজদির কথায় মনে মনে হয় তো ক্ষেপে উঠেছ আমার ওপর।

আবার! আবার ওসব কেন। বলল, না তো!

আশীষ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাকাল সুমিতার চোখের দিকে। বলল, সেজন্যেই অবাক হই তোমাকে দেখে। অথচ জানি আমি, এমন মেয়ে পাওয়া ভার, যে আমার কথায় চটবে না। আমি জানি সুমিতা, মাঝে মাঝে আমাকে নিয়ে তোমার মনে নানান কথার তোলপাড় হয়। এবার বুঝলে তো, সুগতাকে দেখলে আমি কেন অমন করে হাসি। বিশ্বাস করো, আমি হাসিনে, হাসি আমার আপনি আসে। যেদিকে তাকাই, সবখানে এক, একই ব্যাপার।

বলতে বলতে চোখের ঢুলুঢুলু ভাবটা আসে স্তিমিত হয়ে। সেখানে চিক্‌চিকিয়ে ওঠে ক্ষুব্ধ হতাশা।

সুমিতার বুকের সুপ্ত সাপটা আবার কুণ্ডলমুক্ত হয় নানা প্রশ্নে। যত হয় তত আসে ভয় ঘিরে। কথা থাক্, থাক্ না। সুমিতা তো জানে, আশীষ কত একাকী। সেজন্যে ওর অবুঝ মনের অজস্র জটার পাশ কাটিয়ে রয়েছে কাছে কাছে, ছেড়ে দিয়েছে নিজেকে আশীষের টানা স্রোতে। কিন্তু এখন আর না জিজ্ঞেস করে পারে না, সবই একরকম কেমন করে হয়? সবকিছুরই ভাল-মন্দ তো আছে।

আশীষ বলে উঠল, কোথায়, আমি তো দেখিনে সুমিতা। ছেলেদেরও

দেখলুম কম নয়। অক্ষম অথচ অহঙ্কারীর দল ঘুরে বেড়াচ্ছে কাফে-রেস্তোরাঁয়, কলেজে-হোস্টেলে, বারে আর রাস্তায়। গরীব করছে বড়লোকের ভড়ং, বড়লোক দারিদ্র্যের ভাঁড়ামি। স্থূলবুদ্ধি ছেলে শুধু মুখের দু'টি কথাতেই আর পোশাকে-আশাকেই হতে চায় ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল। বাদবাকী যাদের তুমি বাঙ্গালী নওযোয়ান বলবে, তাকিয়ে ত্থাখো তাদের দিকে, রকবাজ, সস্তা সিনেমার কিউর পার্মানেণ্ট বাসিন্দা,অসচ্চরিত্র, নোংরা।

গম্ভীর হয়ে শোনবার ভান করে সুমিতা। কিন্তু বুকের মধ্যে নিশ্বাস হয়ে ওঠে দ্রুত। কী এক ভয়ংকর বিতৃষ্ণার মদ খেয়ে আশীষ তিক্ত ও প্রজ্জ্বলিত। কত কথা সুমিতার মনের মধ্যে চীৎকার করে ওঠে, কিন্তু বলতে পারে না কিছুই। মনোযোগের সঙ্গে সুমিতা তাকিয়ে থাকে টেবিলের বই দু'টির দিকে। আশীষের ছাপানো উপন্যাস। যে বই দু'টি এ দেশের পাঠকেরা একেবারেই গ্রহণ করেনি। নিজের পয়সায় ছাপিয়েছে আশীষ, নিজের বুকেই রেখেছে জমিয়ে যন্ত্রণার পাহাড়ের মত।

বলতে আরম্ভ করলে কিছুতেই থামতে পারে না আশীষ। একটা পেনসিল নিয়ে টেবিল ঠুকতে ঠুকতে বলল, কী দিয়ে, কত দিয়ে উদাহরণ দেব তোমাকে বল। প্রেমের ব্যাপারে যে কোন ছেলের দিকে ত্থাখো, প্রেমিক নয়, সব যেন চাকরের মত বিদ্যেবুদ্ধি জাহির করছে প্রেমিকার কাছে, নয় তো টাকার জোরে চোখ রাঙাচ্ছে। শুধু প্রেমে পড়বার জন্যে যে কত ছলাকলা, দেখলে তুমি হেসে মরে যাবে। আর্টিস্টদের ছবি দেখে এস এক্‌জিবিশনে, সেখানে হয় বিদেশের চুরি, নয় ভাঁড়ামি। সাহিত্য! কলেজ স্ট্রীট পাড়াটায় ঢুকতে তোমার গা ঘিন্‌ ঘিন্‌ করবে, যদি তুমি বইয়ের পাতা খুলে দেখ।

সহসা যেন ভুল করে জিজ্ঞেস করে ফেলল সুমিতা, কেন?

আশীষ হেসে ফেলল। বলল, ও, তুমি আবার প্রচুর বাংলা বই পড়। কিছু মনে করো না, কী করে বোঝাব তোমাকে, প্রকৃত সাহিত্যের কাছে সেগুলো কত অন্তঃসারশূন্য। যে ইওরোপকে ওরা অণুপরমাণুতে নকল করে, সেও যে কত অক্ষম নকলনবিশী। আর নয় তো, অবিদ্যার জয়ঢাক সব। ভীষণ হাসি পায়, যখন দেখি এদেশের লোক তা-ই গোগ্রাসে গিলছে, অভিনন্দন জানাচ্ছে।

শুনতে শুনতে অস্থির বিস্ময়ে সুমিতা আঙুল ঘষতে লাগল টেবিলে। শুধু অবহেলা, শুধু ঘৃণা, শুধু অশ্রদ্ধা যেন ওকে রুদ্ধশ্বাস করে তুলল।

বলল, তুমি তো পড়ই না বাংলা বই, ভালমন্দ তুমি জানবে কেমন করে।

—অনেক পড়েছি একসময়ে। পড়ে পড়ে টায়ার্ড। আর পড়িনি। জানি, জানি আমি, ওদের সাধ কতখানি, সাধ্য কতটুক্।

ভ্রূজোড়া লতিয়ে উঠল সুমিতার। যে উনিশ বছরটাকে সে বোবা বধির করে রাখতে চেয়েছে, তাকেই খুঁচিয়ে দিচ্ছে আশীষ বারে বারে। বলল, সব কি তোমার জানা হয়ে গেছে!

এক মুহূর্ত সুমিতার দিকে তাকিয়ে নীরব রইল আশীষ। তারপর অনেকখানি শান্ত হওয়ার চেষ্টা করে বলল, এই যুগটাকে জেনেছি।

বলেই আশীস দু' হাতে মুখ ঢেকে এলিয়ে পড়ল চেয়ারে। তারপর ফিস্‌ফিস্ করে বলল, হীনতা, অক্ষমতা, কাঙালপনা ছাড়া আমি তো কিছু দেখতে পাইনি। রাজনীতি, সাহিত্য, শিল্প, সমাজ, সব, সবকিছু। আমি ছাত্র-মজুর-নেতা-সাহিত্যিক সবাইকে দেখেছি, আন্দোলন আর কালচার, সবকিছুই করে দেখেছি।

মুখ থেকে হাত খুলতে দেখা গেল, যেন ভয়ংকর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে আশীষ। কিন্তু শান্ত গলাতেই বলল, মাফ কর আমাকে সুমিতা, এদেশের কাছে আমার আর কিছু পাবার নেই, দেওয়ারও নেই।

সুমিতার ঠোঁটের কূলে কিল্‌বিল্ করে উঠছে অনেক কথা। কিল্‌বিল্ করছে সাপেরই মত বিষাক্ত কূট প্রশ্ন। কিন্তু সহসা থেমে গেল ও। কত করুণ মনে হল আশীষকে। ওর বিদ্রূপ, বিদ্বেষ, ঘৃণা, ক্ষোভ, সবকিছু মিলিয়ে, বড় অসহায় আর করুণ আশীষ। ওর সাহিত্যে, বন্ধুত্বে, অনেক জায়গায় অনেক আঘাত পেয়েছে। আসল আঘাত কোথায় পেয়ে এমন করে ছিন্ন করেছে নিজেকে, সবখানি বুঝে উঠতে পারে না সুমিতা। শুধু বোঝে, একাকী, সত্যি বড় একাকী আশীষ।

সুমিতা স্নিগ্ধ চোখে তাকিয়ে বলল, তোমার সব কথা আমি জানিনে, সবটুকু তাই বুঝিনে হয় তো।

আশীষ চোখ তুলে তাকাল। বলল, তাই সুমিতা, হয় তো সব বোঝাতে পারিনে। তাই কোথাও যেতে পারিনে, কারুর কাছেই নয়। শুধু তুমি ছাড়া।

সুমিতার একটি হাত টেনে নিল আশীষ। চোখ বুলালো সর্বাঙ্গে, আবার সেই ঢুলুঢুলু চোখে।

আনত হল সুমিতার দৃষ্টি। সহসা কী যেন সিরসির করে পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে উঠে এল ঘাড়ের কাছে। সেইখানে, যেখানে উনিশ বছরের সমস্ত দপ্‌দপানি এক-ঠোঁট জায়গা নিয়ে জলছে। এখানে কোন বিচার নেই মনের। বড় ভয়, তবু এক দুর্বার আকর্ষণ। কী করে গেছে বিনয়, কে জানে। কোথায় কোন্ অদৃশ্যে বাঁধা ডিঙ্গির নোঙর দিয়ে গেছে ছিঁড়ে ওর খেলার পাগলামিতে। এখন আর এই স্রোতে নিজেকে রাখতে পারছে না ধরে সুমিতা।

কত সংশয়, কত প্রশ্ন, কত জটলা মনে আশীষকে নিয়ে, তবু নয়। কেবলি ভাবছে, ভালবাসি। রক্তের মধ্যে একটা ভয়ংকর সর্বনাশ বলছে অহর্নিশ, ভালবাসি।

আশীষ দেখল, সুমিতার মাধবী রং চাদর লুটিয়ে গেছে চেয়ারে। দ্রুত নিশ্বাসে আঁচল কাঁপছে বুকে। বুকের কাছে জামার ফুলতোলা বর্ডারটি যেন হাসছে টিপে টিপে। প্রাক্-ঝড় নিথরতা কোমর থেকে পা পর্যন্ত।

আশীষ কোন কথা না বলে, ওর সবল হাতে সুমিতাকে সামনে টেনে চুম্বন করল। চকিতে যেন সারা শরীর পাথর হয়ে গেল সুমিতার। মনে হল বিদ্যুতাহত হয়েছে ওর শরীর। পরমুহূর্তেই আগুন লাগল সারা শরীরে।

ভাবল, এইটি অসহ্য আনন্দ, ভয়ংকর সুখ, অসীম লজ্জা, নিদারুণ ভয়। একটা রুদ্ধ হাসি না আর কিছু উঠতে চাইছে ওর বুক ঠেলে। এর জন্যেই ওর মন বোধ হয় প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এটা আসলে কী! কী! না, কান্না তো পাচ্ছে না, দুঃখ হচ্ছে না। শুধু প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে এক তুমুল কাড়া-নাকাড়া বাজছে।

আশীষের দিকে তাকাতে গিয়ে দু' হাতে মুখ ঢেকে চেপে রাখল টেবিলে। ফিতে বাঁধা চুল এলিয়ে পড়ল ঘাড়ের এক পাশে। আর ওর সুদীর্ঘ গ্রীবায় পিছলে পড়ছে আলো। যেন এই চেয়েছিল সুমিতা, ওর সেই এক-ঠোঁট জায়গাটুকু তুলে ধরবে আশীষের কাছে।

আশীষের সারা মুখ দপ্‌দপ্ করছে। সুমিতার পিঠে হাত রেখে ডাকল, সুমিতা।

সুমিতা নিঃশব্দ।

—সুমিতা।

যেন অনেক দূর থেকে বলল, উ!

—অন্যায় করিনি তো?

সুমিতা ঘাড় নাড়ল মুখ চেপে রেখেই। কিন্তু দেহের সমস্ত রক্ত ওর তর্‌তর্‌ করে উঠেছে ঘাড়ে। আশীষ ওর ঘাড়ে বারে বারে ঠোঁট ছোঁয়াতে লাগল। তারপর জোর করে তুলে ধরল মুখ। মুখ একেবারে টক্‌টকে হয়ে গেছে সুমিতার। চোখের দৃষ্টি বিহ্বল আরক্ত। হাসিটি কী বিচিত্রভাবে রয়েছে আড়ষ্ট হয়ে।

আশীষ ডাকল, সুমিতা!

অন্যদিকে চোখ রেখে ঘাড় নাড়ল সুমিতা।

আশীষ বলল, এই আমি চেয়েছিলুম। আমি তোমাকে চেয়েছিলুম। তোমার কথা একটু বল।

সুমিতা বলল চাপা স্বরে, কী বলব।

—আমি অপেক্ষা করব তোমার জন্যে।

সুমিতা যন্ত্রচালিতের মত মুগ্ধ স্বরে বলল, আচ্ছা।

আশীষ ওকে দু' হাতে ধরে টেনে নিয়ে গেল আলমারির কাছে। বইগুলি এখনো যেন তেমনি বিদ্রূপ করেই রয়েছে তাকিয়ে। হাসছে নিঃশব্দে ফুলে ফুলে। কালীনাচ মুখোশটা রক্তজিহ্বা মেলে রয়েছে করাল মুখে।

আশীষ মনে মনে একটু অবাক হল। সুমিতার চিবুক তুলে ধরে বলল, কী ভাবছ?

কী ভাবছে সুমিতা! কিছু না, কিছু না। একটা ভয়ঙ্কর সর্বনাশ দাপাদাপি করছে ওর রক্তের মধ্যে।

আশীষ বলল, তোমার ভয় করছে না?

সুমিতা ঘাড় নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

—তবে?

—তবে কী?

অবাক হয়ে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে, আশীষ সবলে আলিঙ্গন করল সুমিতাকে। একটুও বাধা দিল না সুমিতা।

অনেকক্ষণ পর সুমিতা চেয়ার ছেড়ে উঠল। বলল, রাত হল, এবার বাড়ি যাই।

আশীষ বলল, চল, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

বাইরে তখন শীত নেমে পড়েছে। নক্ষত্র ঢাকা পড়েছে হেমন্তিকার আড়ালে। আলোছায়া সজীব হয়েছে রাত্রের নির্জনতায়।

সুমিতা কিছুই বলতে পারছে না। শুধু নির্বোধ হাসি একটু লেগে রয়েছে ঠোঁটে। কী বলা উচিত, কী করা উচিত, সব অনুভূতির অগম্য যেন। কেবলি নানান কথা মনে আসছে। আর যেন ভয়ে ভয়ে জপ করছে, এই তো ভালবাসা। আমি ভালবাসি।

সুমিতার কানের কাছে মুখ এনে বলল আশীষ, আশা করি রাজেন আর মৃণালের মত আমার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

কথাটা শেষ হবার আগেই সুমিতা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠল। থমকে দাঁড়িয়ে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, অ্যাঁ ?

অবাক হয়ে আশীষ সুমিতার হাত ধরে বলল, কী হল ? অমন করে উঠলে কেন ? আমি তো এমন কিছু বলিনি।

পরমুহূর্তেই হেসে বলল সুমিতা, ও ! না, আমি যেন কী ভাবছিলুম।

বলে দাঁড়িয়ে তাকাল একবার আশীষের দিকে। বড় রাস্তা সামনেই। বলল, তুমি এবার যাও, আমি যেতে পারব।

—না না, আমি বাড়ি অবধি যাব।

—কোন দরকার নেই আশীষ।

আশ্চর্য ! হাসিটুকু ঠোঁটের কোণে থাকা সত্ত্বেও কেমন গম্ভীর মনে হচ্ছে সুমিতাকে। বলল, কী আশ্চর্য ! যেতে পারবে ?

হ্যাঁ। মাত্র তো ন'টা বাজে।

বলে হন্‌হন্ করে বড় রাস্তায় এসে পড়ল সুমিতা। আশীষ বলল, কাল যাব।

আচ্ছা।

হঠাৎ যেন পালাচ্ছে সুমিতা। এ কি এ ! সেই সেদিনের স্ট্যাণ্ড রোডের গঙ্গার ধারের পুরনো অনুভূতিগুলি যেন আবার উঠছে কিলবিলিয়ে। এ কেমন প্রাণ ওর, কেমন মেয়ে ! এই তো চেয়েছিল, এই তো চায় বুঝি এখনো। তবে কী ঠেলে উঠছে বুক থেকে। আঁচল চেপে ধরল মুখে। না, কিছুতেই চোখ ঝাপসা হতে দেবে না, হৃৎপিণ্ড বন্ধ হলেও কিছুতেই কোন শব্দ দেবে না বেরুতে মুখ ফুটে। ঘাড়ের দপ্‌দপানি গেছে ওর সারা অঙ্গে ছড়িয়ে। জ্বলছে, পুড়ছে, সমস্ত বুকের মধ্যে কন্‌কন্ করছে এক দুর্বোধ্য অসহ্য

যন্ত্রণায়। করুক। এই তো চেয়েছিল সুমিতা। উনিশ বছরের যে মূক বধির অন্ধ বাঘিনীটা বসে আছে রক্তে, সে তো এই চায়, প্রাণভরে আরো চাইবে।

তবে কে এমন মিথ্যা কান্নায় টিপছে হৃৎপিণ্ডটাকে। অকারণ কতগুলি মনের তৈরি ফাঁকি বুঝি সেগুলি।

(২৪)

জানেনা সুমিতা কিছুই। জীবনের কোন্‌টা সত্যি, কোন্‌টা মিথ্যে, জানে না। মতি কোন্‌টি, কোন্‌টি মন, জানে না তার কোন হদিস। বুক ঠেলে, মাথার সমস্ত শিরা-উপশিরা টনটনিয়ে যে তপ্ত লবণাক্ত জল বিন্দু বিন্দু জমছে চোখের কোণে, সে কান্না নয়। কেননা, ওর কোন বোধ নেই তৃপ্তি-অতৃপ্তির। যে বোধে মানুষ কাঁদে।

আছে শুধু দাহ। যত উন্মাদনা, যত উল্লাস সে শুধু বিধ্বংসী ভয়ংকরী আগুনের। উনিশ বছরের রক্তে মাংসে প্রচণ্ড দাহ! এ আগুনের নাম বিদ্রোহ। আর এ বিদ্রোহের সবখানিই বড় অবুঝ। সে ছাড়াতে চায় নিজেকেও। খোদ যার বুকের ঘরে লেগেছে সেই আগুন। দহনেরও একটি ভয়ংকর সুখ আছে যে। বুকের ভিতর দু'টি শীতল হাত তুলে যে অগ্নিনিরোধ করতে চাইছে, তাকে তাই আঁচল চাপা দিয়ে রাখতে চাইছে সুমিতা। এ কে, এ কী! এ যেন গুলিখোরের জলাতঙ্ক সুমিতার।

এ কী অবুঝ যন্ত্রণা ওর। এ যে সুমিতার ভালবাসা। কিন্তু কাকে বলবে সে কথা! বাইরের নয়, তোলপাড় সব যে ভিতরে। চোখের জলটা তাই আর কিছু নয়, ওটা অবুঝ মনের বিক্ষোভ।

অগ্রহায়ণের রাত্রি ন'টার স্বল্প-ভিড় রাস্তা প্রায় এক নিঃশ্বাসে পার হয়ে এল সুমিতা। চেয়ে দেখল না, রাস্তার মোড়ে আশীষের উদ্দীপ্ত ঢুলু ঢুলু চোখ দু'টিতে চিক্‌চিক্ করে উঠছে ভীরু বিস্ময়! যে সব জায়গা থেকে অশেষ বিতৃষ্ণায় ফিরে আসতে চেয়েছে এক জায়গায়।

বাড়ির কাছে এসে একবার থমকে দাঁড়াল সুমিতা। অন্ধকার নিঝুম বাড়ি। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যেও স্পষ্ট দেখতে পেল সুমিতা বাবার ছায়া।

মিথ্যে নয়, বসেছিলেন মহীতোষ। সারা বাড়িটার নির্জন নিঃশব্দ অন্ধকার গ্রাসের মধ্যে ছটফট করছিলেন বসে বসে। এসে কাউকে দেখেননি। জিজ্ঞেসও

করেননি একবার বিলাসকে। শুধু রুদ্ধ অভিমানে টনটন করেছে বুকের মধ্যে। জামা-কাপড় ছেড়ে, হাত মুখ ধুয়ে চা খেয়েছেন। তারপর ফিরেছেন পায়চারি করে, আর বারবার চোখ তুলে দেখেছেন দরজার দিকে। শুধু তা'তে স্তিমিত হয়েছে দৃষ্টি ক্ষয়ে ক্ষয়ে। সারা জীবনের স্মৃতিভারে এক অসহনীয় একাকীত্ব ওঁকে কেবলি রুদ্ধশ্বাস করেছে। বার্ধক্যের ধীরগতি রক্তধারার মত, সময়ও এখানে চলেছে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে।

কেউ আসেনি, কেউ না। তারপর রাগ হয়েছে অভিমান ছাড়িয়ে। দুম্‌দাম্‌ করে নিজের ঘরে গিয়ে আবার জামা-কাপড় পরেছেন। ফিটফাট হয়ে, ছড়িটি খটখটিয়ে জুতো মসমসিয়ে গেলেন বাইরের ঘরে। দূর থেকে একবার বিলাস তাকিয়ে দেখেছে কাজের ফাঁকে। মহীতোষ বারান্দা দিয়ে নেমে চলে গেলেন বাইরে। ছোট রাস্তা থেকে বড় রাস্তায় গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছেন। হঠাৎ মনে হয়েছে, এর মধ্যেই হয়তো কেউ ফিরে থাকবে ওদের তিনজনের।

যত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসেছিলেন রাগ করে, তত তাড়াতাড়িই ফিরে-ছেন আবার। কান পেতে উঁকি ঝুঁকি দিয়েছেন বারান্দায় উঠে। কেউ আসেনি।

সে অবস্থাতেই তখন থেকে বসে আছেন বারান্দায়। রাগ ছিল যতক্ষণ, ততক্ষণ কত কী ভেবেছেন। যেন ওঁকে কেউ শাস্তি দিচ্ছে অনর্থক। এখন কী করে তার শোধ নেওয়া যায়, সেই ভাবনা।

তারই ফাঁকে কখন স্ত্রীর কথা মনে পড়েছে। আর তিনটি মেয়ের জন্য স্নেহে, বেদনায়, আপ্লুত হয়ে উঠেছে মন। রাগ, অভিমান, সব মুছে দিয়ে অন্ধকারকেই বলেছেন বারবার, ওদের সুখ দাও, শান্তি দাও। আমার যত রাগ, যত অভিমান, সে শুধু ওদের ভবিষ্যতের অন্ধকারের প্রতি, ওদের সুখ-শান্তির কথা ভেবেই।

কিন্তু সুমিতাকে দেখামাত্রই ছেলেমানুষের মত আবার নিঃশব্দে ফোঁস করে উঠল অভিমান। ভাবলেন, এইবার বেরুব।

উঠে আলো জ্বেলে এগুতে গিয়ে থমকে গেলেন। বুকের মধ্যে চমকে উঠল রুমনিকে দেখে। ফিতের বাঁধন উপছে চুল এলোমেলো হয়ে গেছে। কোল-বসা চোখ যেন ভেজা আরক্ত। অথচ দৃষ্টি অস্থির। এসে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল মহীতোষের হাত।

মনের যত অবুঝ দাপাদাপি, তার নিরসনে যেন এইটুকু সুমিতার দরকার হয়ে পড়েছিল এখন।

বলল, কোথায় যাচ্ছ বাবা ?

কোথাও নয়। অভিমান থেকে ছলনাটুকু মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, সুমিতাকে দেখে আর সেইটুকুও রইল না। বললেন, এই একটু এদিকে ওদিকে।

—কেন ?

—এমনি। তোমরা কেউ নেই, তাই।

বলে দীর্ঘশ্বাস চেপে বললেন, কোথায় গিয়েছিলে রুমনো সাহেবা।

মহীতোষের মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে লজ্জায় কুঁকড়ে উঠল সুমিতার মন। বলল আশীষদের বাড়িতে।

অমনি অজস্র প্রশ্নে আবর্তিত হতে লাগল মহীতোষের ভাবনা। সুমিতার হাত-ধরা হয়ে এসে বসলেন চেয়ারে। আর যেন স্পষ্ট দেখতে পেলেন, রুমনির জীবনেরও নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। কিন্তু বুকের মধ্যে কেমন একটা ভয় আসছে ঘিরে। বললেন, তোমাকে এত কাহিল দেখাচ্ছে কেন রুমনো।

সুমিতা মহীতোষের পাশে বসে, এক মুহূর্ত হঠাৎ কোন কথা বলতে পারল না। কেমন যেন ভয় করতে লাগল ভিতরে ভিতরে। মনে হল, ওর রক্তের আগুনটা বুঝি দেখতে পাচ্ছেন মহীতোষ। তারপর বলল, কী জানি! আমার তো কিছু হয়নি।

তাতে ভয় দূর হলো না মহীতোষের। কিন্তু এখানে অনর্থক প্রশ্ন করতে বাধল ওঁর। বললেন, একটু সাবধান থেকো রুমনো, শরীরটা খারাপ করো না। বলে নীরব হলেন। কিন্তু অনেক কথা পিল্ পিল্ করে উঠতে লাগল ওঁর ঠোঁটে। আশীষ, অ[illegible]ষের বাবা-মা, বাড়ি, অনেক কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করল, পারলেন না। কিন্তু যতবারই চোখ পড়ল, ততবারই চমকে উঠলেন মনে মনে। সেই চমকের সঙ্গে টনটনিয়ে উঠল বুকের মধ্যে। ছোট রুমনির এই আড়ষ্ট হাসি, লজ্জা দেখেছেন অনেকবার। কিন্তু চোখের তারায় এমন অসহায়তা দেখেন নি তো কোনদিন।

হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, তোমার জন্মদিন না কবে রুমনো ?

সুমিতা বলল, সামনের মাঘ মাসে। একুশে মাঘ।

ভুলে গেছেন মহীতোষ, কত বছর পূর্ণ হবে সেদিন স্বমিতার। বললেন, কত বছর হবে তোমার সেদিন।

সহসা কণ্টকিত হল স্বমিতা ভয়ে ও লজ্জায়। বলল, উনিশ বছর পূর্ণ হবে বাবা।

উনিশ বছর! অনেক বছর! অবুঝ, অহঙ্কারী, বেহিসেবী, পবিত্র, স্বন্দর, ভয়ংকর ও অসীম। মহীতোষ স্বমিতার পিঠে হাত রেখে বললেন, তবে তো তুমি অনেক বড় হলে রুমনো সাহেবা। জীবনের ভাল-মন্দ বোঝার বয়স তোমার হয়েছে এবার। ছেলেদের কাছে এ বয়সটা বোঝাবুঝির বয়স নয়, মেয়েদের কাছে অনেকখানি। বোঝাবুঝি পেরিয়ে, এটা মেয়েদের যোঝাযুঝির পালা। তোমার বয়সে, তোমার মায়ের কোলে উমনো এসে পড়েছিল।

স্বমিতা কেমন একরকম বিস্মিত বিভ্রান্ত চোখে তাকিয়েছিল বাবার দিকে। মহীতোষের কথা শুনতে শুনতে কেন যেন কান্না উঠে আসতে চাইছিল ওর বুক মুচড়ে।

মহীতোষ হেসে স্বমিতার মাথায় হাত রেখে বললেন, তুমি যেন কী ভাবছ। দুর্ভাবনার কিছু নেই রুমনো। এখন তোমার নিজের ভালমন্দ নিজে ভাববে, যা করবে, ভেবে করবে। এই আমি বলছি।

তারপর স্বমিতার অবস্থা দেখে নিজেই প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন। বললেন, আমি এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে এসেছি রুমনো।

এতক্ষণে মনে পড়ল, মহীতোষকে ছুটি নেওয়ার তাড়া দিয়েছিল স্বমিতা নিজেই। মেজদির বিয়ে। মার্কেটিং, নিমন্ত্রণ করা, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনাই শুধু হয়েছে। কাজ আরম্ভ হয়নি।

স্বমিতা বলল, তা হলে কালকেই আমরা বেড়িয়ে পড়ব বাবা। তুমি আমাকে নিমন্ত্রিতদের লিস্ট তৈরী করতে বলেছিলে, আমি করে ফেলেছি। মেজদির সঙ্গেও একটু বসা দরকার। ওর বন্ধুবান্ধব সকলের নাম তো আমি জানিনে। আর বাবা—

মহীতোষ ফিরে তাকিয়ে অবাক হলেন। স্বমিতার মুখে গাঢ় ছায়া পড়েছে। বললেন, কী হল রুমনো।

স্বমিতা বলল, সবাই আসবে, একজন আসবে না।

কে, সেকথা আর জিজ্ঞেস করবার দরকার হল না মহীতোষের। উনিও কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন স্বমিতার মতই। তারপর বললেন, ঠিক বলেছ

রুমনো। আমি তার বাড়ি গিয়েছি, কলেজে গিয়েছি তোমাদের না জানিয়ে। কোথাও গিয়ে রবিকে আমি ধরতে পারিনি।

সুমিতা বলল, আমি একদিন খুঁজে দেখব বাবা।

—দেখতে পার।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, নিজের দুঃখে যে রবি এ বাড়িতে আসা ছেড়েছে, সেকথা আমি ভাবতেও পারিনে। সে জাতের ছেলে সে নয়। আর কারুর দুঃখ যদি বড় হয়ে বেজে থাকে, তবে কি তাকে আনতে পারবে রুমনো।

আর কারুর বলতে মহীতোষ সুজাতার কথাই বলেছেন।

সুমিতা বলল, আমরা কি ওঁর কেউ নই।

মহীতোষ সুমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, ধর যদি তোমার বড়দি তাড়িয়ে দিয়ে থাকে রবিকে।

বিস্মিত ব্যথায় পাংশু দেখাল সুমিতার মুখ। বলল, তা কেমন করে হয় বাবা।

—হয় কিনা জানিনে। কিন্তু তোমার বড়দি এত অবুঝ হয়ে উঠেছে, তার পক্ষে সেটা বোধ হয় অসম্ভব নয়।

সুমিতা বারবার ঘাড় নেড়ে বলতে লাগল, না, না, না, তা কখনো হতে পারে না বাবা। বড়দি কখনো রবিদাকে সেকথা বলতে পারে না।

মহীতোষ একটু অবাক হয়ে বললেন, না পারলেই ভাল। তুমি রবিকে নিয়ে এসো, যেখান থেকে পার।

মৃণালের নিয়মিত যাতায়াতটা অনিয়মে দাঁড়াল কয়েকদিন। আশীসের অনিয়মটা দাঁড়াল নিয়মে।

কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, মহীতোষের সঙ্গে বেশী ব্যস্ত সুগতা নিজেই। ব্যস্ততাটা অবশ্য ভিন্নরকমের। কেনাকাটার ব্যাপারে মহীতোষের হাত সামলানোর জন্যেই যত ব্যস্ততা। কী-ই বা করে সুগতা। ঘরে বসে আপন মনে হাসতে ওর বড় লজ্জা। আর, ঘুরে ফিরে মনটা সেই এক জায়গায় আসে ফিরে। তখন শত গম্ভীর হয়ে থাকতে চাইলেও, আপনি আসে হাসি। খিল্‌খিল্‌ হাসি তো নয়, সে যেন কেমন একরকম নিঃশব্দ অথচ পরিস্ফুট। তা'তে ওর অন্যমনস্কতা ধরা পড়ে যায় সুমিতার কাছে। মহীতোষের কাছে। জানে, এখন মৃণাল আসবে না কয়েকদিন। তাই মহীতোষের সঙ্গ ধরেছে।

জুয়েলারীর দোকানে, কাপড়ের রঙীন হাটে, সব জায়গায় যাচ্ছে। ধমকাচ্ছে মহীতোষকে, ধরছে হাত, টেনে। কী হচ্ছে বাবা এসব! না, এরকম করলে তোমার বিয়ে দিয়ে কাজ নেই বাপু।

সঙ্গে যদি সুমিতা থাকে, তবে ও আর মহীতোষ হেসে বাঁচে না। মাঝখান থেকে সুগতা-ই লজ্জায় পড়ে যায়। মহীতোষ যা প্রাণ চায়, তাই কেনেন।

সুগতা বলে গম্ভীর হয়ে, তুমি যে এসব কিনছ বাবা, কে পরবে শুনি?

মহীতোষ বলেন, কেন বল তো?

বৈরাগিনীর মত উদাস গম্ভীর গলায় বলে সুগতা, তুমি তো জানো বাবা, এসব নিয়ে কাটাবার মত জীবন আমার নয়।

মহীতোষ বলেন, কিন্তু ঝুমনো, তোমাকে এসব দেব বলে আমি যে এতদিন ধরে বেঁচে আছি। এগুলো আর যাই হোক, শুধু গয়না-কাপড়-খাট-আলমারি তো নয়। তোমার চোখের সামনে এগুলো আমাকে জীইয়ে রাখবে।

সুগতার গলা হঠাৎ বন্ধ হয়ে এসেছে। বলে, বাবা, এছাড়া বুঝি আমার কাছে তুমি জীইয়ে থাকবে না।

—থাকব বৈ কি! ওটা মানুষের আর এক মন ঝুমনো। বাবার মন। তুমি যখন পাশ করেছ, তোমাকে উপহার দিয়েছি। জন্মদিনে দিয়েছি। এবারের দেওয়া আমার সবার বড় দেওয়া। ঝুমনো, এবার তুই স্বামীর ঘরে চলে যাবি।

আর কেউ কথা বলতে পারেনি। দু'জনেরই গলা বন্ধ হয়ে গেছে। চোখ ভিজে উঠেছে দু'জনেরই। তার মধ্যেও একটি আনন্দের সুর বেজেছে নিয়ত।

কাজে যাওয়া, রাত্রে ফিরে আসার মধ্যে কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি সুজাতার। কথাবার্তা হয় তো একটু বেশী বলেছে। নিজে নিজেই বিয়ের জিনিসপত্র দেখেছে ঘেঁটে। বলেছে নিজের পছন্দ অপছন্দের কথা।

চোখের কোণ হয়েছে আরো গভীর। ঠোঁটের রং হয়েছে আরো গাঢ়। মুখের রং আরো পুরু সুজাতার।

আর সুমিতা, সকলের সামনে, সকল কাজের মাঝেও যেন লুকিয়ে ফিরছে নিজেকে নিয়ে। যেন নিজের আগুন দিয়ে বাঁচিয়ে ফিরছে সবাইকে। কখন কোন্‌দিকে সেই আগুন ঝলসে দেবে অপরের চোখ। আঁচ লাগবে কার গায়ে।

মহীতোষ হঠাৎ একটু সচেতন হয়ে উঠেছেন আশীষের সম্পর্কে। আশীষ

এলেই ডেকে বসান। সেই ফাঁকে দু'টি কথাও জিজ্ঞেস করে নেন। আশীষের বাবা, মা, ভাই, বোন নানারকম। আশীষেরও উৎসাহের অভাব নেই জবাব দিতে।

সুমিতা বেরুতে পারে না আশীষের সঙ্গে। বাড়িতেই কথাবার্তা হয়। আশীষ সাহিত্য আর জীবনের কথাটাই বলে বেশী করে। কিন্তু সে জীবনের সবটাই অন্য দেশের। কখনো তা মনের দৃষ্টিতে, কখনো স্তাঁদালের আবিষ্কারে। নিজের চারপাশে শুধু সবই মন্দ, একটুখানি, প্রাণহীন। দুর দুর! ছি ছি! আশীষ দেখে এসেছে খনি-শ্রমিকদের। মাইকা-ম্যাঙ্গানীজ-কয়লা। যে চিন্তার বশবর্তী হয়ে গিয়েছিল আশীষ, শ্রমিকদের মধ্যে তার কিছুই নেই। লোকগুলির কোনকিছুকেই তার একটুও ভাল লাগেনি। দুর্বল, ভীরু কাপুরুষ। তেমনি ওদের চারপাশের মানুষ। ওদের ট্রেড ইউনিয়ন, অর্গানাইজার, সবই একটা নিম্নমধ্যবিত্তসুলভ কেরানীগিরির কারখানা। তেমনি দেখেছে চটকল শ্রমিকদের। না আছে কোথাও হৃদয়ের আগুন, না বুদ্ধির তীব্রতা।

কিন্তু আশীষ কখনো ঢুলুঢুলু চোখ ফেরাতে পারে না সুমিতার দিক থেকে। সুযোগ পেলেই অগোছালো করবে, বেসামাল করবে দলিত মথিত করে। চুম্বনে আলিঙ্গনে বিস্রস্ত করবে।

সুগতার বিয়ের তিনদিন আগে মৃণাল এল হঠাৎ। মহীতোষ একলাই বেরিয়েছিলেন। বাইরের ঘরে সুগতা, সুমিতা, দু'জনেই ছিল।

মৃণাল হাসল, সুগতা, বড় অঘটন ঘটে গেছে একটা।

বিমূঢ় ভয়ে সুগতা কেঁপে উঠল। ওকে কখনো কাঁপতে দেখা যায় না। বলল, কি ব্যাপার! মৃণাল বসে পড়ল সুগতার পাশে। বলল, ব্যাপারটা বিশ্রী। রাজেন হঠাৎ অজয়কে মেরেছে।

সুগতা অবাক হয়ে বলল, কলেজ ইউনিয়নের সেক্রেটারী অজয়?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—সে অনেক ব্যাপার।

সুমিতা কাঠ হয়ে বসেছিল। ওর চোখের সামনে ভাসছিল রাজেনের রুদ্রমূর্তি। কিন্তু পায়ে যেন স্ক্রু গেছে এঁটে। যত গোপন হোক, যত অভদ্রতাই হোক, কিছুতেই উঠতে পারল না।

মৃণাল বলল, সুমিতার সামনে বলতে আপত্তি নেই। ব্যাপারটা অবশ্য এখনো কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে। রাজেন কলকাতায় আছে শুনে আমি গেছলুম নিমন্ত্রণ করতে। দেখলুম, অজয় তার জনদশেক বন্ধু নিয়ে সঙ্ঘের আফিসে, সিঁড়িতে ভিড় করে রয়েছে। রাজেনকে তারা বেরুতে দেবে না।

সুমিতা অসহ্য বিস্ময়ে ভয়ে ও উত্তেজনায় আঁচল চাপল মুখে।

সুগতা বলল, সে কি, নিজেদের মধ্যে মারামারি। কী ব্যাপার, সেটা বল।

—বিজলীকে জান তো? প্রেসিডেন্সীর সেই ফোর্থ ইয়ারের মেয়েটি। খুব সুন্দরী বলে অনেকেই ওর প্রার্থী ছিল। এদিকে মেয়েটি ভাল অর্গানাইজারও বটে।

সুগতা বলল, সেসব জানি। খুব কাজের মেয়ে। কী হয়েছে, তাই বল।

—অজয় অনেকদিন থেকে বিজলীর পেছনে বোধ হয় লেগেছিল। কিন্তু বিজলীর সেটা পছন্দ ছিল না। যাই হোক, সম্মেলনের সময় যেদিন মূল প্রস্তাবের ওপর রাত্রি তিনটে অবধি সভা হয়, সেদিন বিজলী অজয়ও ছিল। তারপর ডেলিগেট ক্যাম্পের পেছনে সেইদিন রাত্রেই নাকি অজয় কীভাবে অপমান করেছিল বিজলীকে। বিজলী আর সেটা কাউকে বলতে পারেনি, রাজেনকে ছাড়া। রাজেন অজয়কে অনেকদিন ডেকে পাঠিয়েছে, সে আসেনি। কাল রাত্রে সঙ্ঘের অফিসে অজয়কে ধরেছিল রাজেন। জিজ্ঞেস করেছে সব কথা। অজয়ও বড় রোখা ছেলে। বলেছে, এসব বিষয়ের কোন কৈফিয়ত আপনাকে দিতে পারব না।

রাজেন বলেছে, তবে সঙ্ঘের সভ্যদের সামনেই দিও। একজন সভ্য যখন এরকম বিশ্রী একটা অভিযোগ করেছে, সত্য মিথ্যা প্রমাণের দায় তোমাদের দু'জনেরই।

অজয় বলেছে, এসব ব্যক্তিগত বিষয় আমি সঙ্ঘের সামনে আলোচনা করতে চাইনে।

রাজেন বলেছে, ছাত্রসঙ্ঘ নাইট ক্লাব নয়, ন্যাড়ানেড়ির আখড়াও নয়। এখানে নিয়ম শৃঙ্খলার দায়িত্ব সকলের। না চাইলেও কৈফিয়ত তোমাকে দিতে হবে।

অজয় বলেছে, ওসব আমার দেখা আছে। জানা আছে সবাইকে।

রাজেন তখন ফিরে বলেছে, তুমি বিজলীর আঁচল টেনে অপমান করেছিলে? সত্য টত্য না হয় রইল। আমি নিজেই তোমাকে জিজ্ঞেস করছি।

অজয় বলেছে, কেন জিজ্ঞেস করছেন?

তখন অজয়ের চুলের মুঠি ধরে রাজেন মেরেছে মুখে। বলেছে, এইজন্যে। আরো জানতে চাও?

সুমিতা পাথর হয়ে বসেছিল। সুগতা বলে উঠল, অজয় অন্যায় করেছে ঠিকই। কিন্তু রাজেন চিরকাল একরকম। ব্যাপারটা অন্যরকমভাবে তো ব্যবস্থা করা যেত। তারপর?

—তারপর আর কী! সবচেয়ে আশ্চর্য! রাজেন কাল রাত্রে বাড়ি ফিরে যায়নি, অফিসেই ছিল। আজো আছে এখনো বসে।

সুমিতা ঢোক গিলে বলল, দরজা বন্ধ করে?

—না। দরজা খোলাই।

—আর অজয়েরা?

—অপেক্ষা করছে।

সুমিতার মনে হল, এখুনি চলে যায় ছুটে। কেন, তা নিজেই জানে না। শুধু ওর বুকের মধ্যে কাঁপছে থরথর করে।

সুগতা উঠে বলল, বসো তুমি, কাপড় বদলে আসছি।

সুমিতাও উঠে দাঁড়াল। বলল, আমি যাব মেজদি।

একমুহূর্ত বিস্মিত চিন্তিত দেখাল সুগতাকে। তারপর বলল, চল্।

ওরা এসে দেখল, সেই একই পরিস্থিতি। সিঁড়িতে অজয়েরা কয়েকজন। ঘরে ঢুকে দেখল, রাজেন একমনে বসে কী লিখছে। সামনে একরাশ ফাইল-কাগজ-পত্র।

স্নান করেনি, উস্কোখুস্কো চুল রাজেনের। কিন্তু কোন দুশ্চিন্তার ছাপ নেই সেখানে। কপালে ও চোখে নেই বিদ্যুতের ঝিকিমিকি। কেবল একটু বিষণ্ণতা রয়েছে চোখের গভীরে।

মুখ তুলে অবাক হেসে বলল, কী ব্যাপার! দল বেঁধে যে!

সুগতা গম্ভীর হয়ে বলল, অজয়েরা সিঁড়িতে বসে আছে, তা' জানো?

রাজেন গম্ভীর হেসে বলল, জানি। কিন্তু তুমি কেন? একেবারে ছোট বোনকে নিয়ে।

সুগতা বলল, ছোট বোন এসেছে তার ইচ্ছেয়। কিন্তু এবার কী হবে?

রাজেন বলল, কী আবার হবে।

—মারধোরটা না করলে চলত না?

রাজেন মুখ নামিয়ে বলল, চেষ্টা করেছিলুম, পারিনি। অন্যায় করেও এত উদ্ধত, তোমারো রাগ হত।

—ওকে এক্সপেল্ করা যেত।

—তা অবশ্য ঠিকই। কিন্তু সেটা ওর কাছে কিছুই নয় সুগতা।

সুগতা আরো গম্ভীর হয়ে বলল, অজয় একটা অন্যায় করেছে। বদলে তুমিও একটা অন্যায় করেছ। সেসব তো পরে হবে। এখন তুমি বেরুবে কী করে এখান থেকে। ছাত্রসঙ্ঘ কি এখন নিজেদের মধ্যে মারামারি করবে?

রাজেন হাসল একটু বিদ্যুৎ চমকের মত। বলল, মারামারি হবে কেন? তুমি এসে বরং ব্যাপারটাকে গম্ভীর করে ফেললে। মৃণাল নিশ্চয় তোমাকে ডেকে এনেছে।

—সেটা খুব অন্যায় করেছে বোধ হয়?

—না, ওরা ভেবেছে, হয়তো আমি খবর দিয়েছি। যাই হোক, আমার কতগুলি রিপোর্ট লেখার ছিল। শেষ করেছি। বোধ হয়, ছাত্রসঙ্ঘে এই আমার শেষ রিপোর্ট। চল, বেরুনো যাক এবার।

মৃণাল বলল, কী বলছ তুমি রাজেন। কী করে যাবে এখন। একটা বিশ্রী কেলেঙ্কারী হবে।

তিনজনেই দেখে এসেছে, কেমন ক্রুদ্ধ হিংস্র হয়ে ওরা বসে আছে সবাই।

রাজেন ফিরে দাঁড়াল মৃণালের দিকে। সারা মুখ ওর দপ্‌দপে অঙ্গারের মত জ্বলছে। অবিন্যস্ত চুল যেন আগুনের শিখা। তীব্র গম্ভীর গলায় বলল, হয়তো একটা আইন আমি ভঙ্গ করেছি। কিন্তু মানুষের আইনটা ভাঙিনি মৃণাল। রাস্তাঘাটে, আমার পাড়ায়, ঘরে এ ব্যাপার ঘটলেও আমি এই করতুম। আমার নিজের কাছে তো কোন অন্যায় বোধ নেই। আমি তো অসাড় নই। এর পরে যদি কোন কেলেঙ্কারী হয়, আমার কাছে তার কোন দাম নেই। দেহে ওরা সবল হয়ে আসতে পারে, আমি তাতে ভীরু হবো না। চল।

নিজেরই অজান্তে সুমিতার গলা দিয়ে অপরিস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল, না না।

রাজেন ফিরে তাকাল। মৃণাল সুগতাও তাকিয়েছিল। সুমিতার ভীরু চোখ সহসা ছলছলিয়ে উঠেছে। ভীত হয়ে উঠেছে মৃণাল সুগতাও।

রাজেন বলল সুমিতাকে, দেখছ তো, সত্যি আমি কতখানি গোঁয়ার। তোমরা এসে পড়েছ, আর বোধ হয় আমি গোঁয়ার হতে পারব না। ভদ্রলোকের মত এবার মার খাব পড়ে পড়ে।

বলে হাসতে গিয়েও ঠিক হাসতে পারল না রাজেন। সুমিতার ভীরু ব্যাকুল চোখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে মৃণালের দিকে ফিরে বলল, তবে তোমরা চলে যাও, আমি পরে যাচ্ছি।

সুগতা বলল, তা হয় না। তোমরা বসো, আমি অজয়কে ডাকছি এখানে।

বলেই, দরজার কাছে গিয়ে সুগতা ডাকল, অজয়, তুমি একটু ওপরে এসো ভাই।

অজয় এলো। এখনো ভ্রূর পাশে নীল দাগ নিয়ে খানিকটা ফুলে আছে তার। কোটের বোতাম খোলা, রুক্ষ চুল। চোখে মুখে রাত্রি জাগরণের ছাপ। আরক্ত চোখ জ্বলছে ধক্‌ধক্ করে। দাঁড়াল এসে মাথা নীচু করে।

কেউ কিছু বলবার আগেই রাজেন দাঁড়াল অজয়ের সামনে। বলল, তোমরা কী আমাকে মারবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছ অজয়?

সকলেরই বুকের মধ্যে কাঁপছে। সুগতা মৃণাল রাজেনের এক পাশে। আর এক পাশে সুমিতা।

অজয় প্রজ্জ্বলিত চোখ তুলে বলল, হ্যাঁ।

রাজেন বলল, মারো। বিজলীকে তুমি যদি অপমান না করে থাকো, তবে আমাকে মারো।

অজয় দু'হাত প্যাণ্টের পকেটে ঢুকিয়ে দাঁড়াল এক পা পেছিয়ে। হাত দু'টি নড়ছে। কী যেন বার করতে চাইছে পকেট থেকে। কিন্তু দৃষ্টি রাজেনের চোখের দিকে।

রাজেন আবার বলল, মারো।

অনুরোধ নয়, যেন দ্বন্দ্বে আহ্বান করছে রাজেন। গায়ের থেকে সুতোর গেরুয়া মোটা চাদরটা ঝুলে পড়েছে আলখাল্লার মত। অজয়ের দৃষ্টিটা ফিরে গেছে অন্যদিকে। বাকী তিনজনের দিকে তাকাতে গিয়ে চোখ ফিরিয়ে নত করেছে মুখ।

কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দ। হঠাৎ অজয় মুখ তুলে বলল, কেন ডেকেছেন সুগতাদি।

সুগতা বলল, তোমরা বাড়ি যাও ভাই আজ। এ বিষয়ে আমরা সবাই একদিন বসব তাড়াতাড়ি।

অজয় তবুও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ সবাইকে রুদ্ধশ্বাস করে। তারপর বলল, বিজলীকে আমি অপমান করেছিলুম সুগতাদি।

বলেও কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে রাজেনের দিকে তাকাল অজয়। দৃষ্টি ওর আশ্চর্য শান্ত হয়ে এসেছে তখন। আর কোন কথা না বলে পিছন ফিরে চলে গেল অজয়। সিঁড়িতে শোনা গেল সকলের চলে যাওয়ার মিলিত পদধ্বনি।

ওরা চারজনেই চুপচাপ নেমে এল রাস্তায়। চা খেল নিঃশব্দে একটি রেস্তোরাঁয় বসে।

সুমিতা একবারো চোখ নামাতে পারেনি রাজেনের মুখ থেকে। বারবার দেখেছে, চোখে তার কিসের ছায়া পড়ে মুখখানি বিষন্ন ব্যথিত হয়ে উঠেছে।

তারপর একসময় রাজেনই বলল, আজ চলি আমি।

সুগতাও আর পূর্ব প্রসঙ্গ টেনে আনল না। বলল, সাতাশ তারিখে আসছ তো আমাদের বাড়িতে।

—নিশ্চয়ই আসব। মৃণালের নিমন্ত্রণ আগেই পেয়েছি। তোমাকে আর চিঠি ফিঠি দিতে হবে না।

—তা জানি। কিন্তু তার আগেই আবার যেন কিছু ঘটিয়ে বসো না।

রাজেনের হাসিতে যত তীক্ষ্ণতা, বেদনাতেও ততখানি তীব্রতা। হেসে বলল, সত্যি, বড় খারাপ লাগে। তোমরা আমাকে ক্ষমা করো ভাই।

বলে সুমিতার দিকে ফিরে ওর কাঁধে একটি হাত রেখে বলল, তুমিও, বুঝলে ?

ধক্ করে উঠল সুমিতার বুকের মধ্যে। হঠাৎ যেন সমস্ত মুখটা ওর পুড়ে গেল, কাঁপতে লাগল বুকের মধ্যে। অস্ফুট গলায় বলল, আচ্ছা।

আবার চোখ তুলে বলল, আসবেন তো সত্যি ?

রাজেন হেসে বলল, অনেকবার ফাঁকি দিয়েছি। এবার নিশ্চিত।

চাদর জড়িয়ে, বিকালের ভিড়ে হারিয়ে গেল রাজেন।

মৃণাল আর সুগতা অবাক হয়ে চোখোচোখি করল পরস্পর। সুগতা ডাকল, আয় রুমনি।

সুমিতা ফিরল।

(২৫)

ফেরার পথে সুগতা বললে মৃণালকে, কোথায় একটা পিকিউলিয়ার চেঞ্জ হয়েছে রাজেনের। কেমন যেন রেস্টলেস।

সুগতার গলায় করুণার রেশ। ওর চোখে মুখে প্রতি অঙ্গে এক বিচিত্র দ্যুতি চমকাচ্ছে নিয়ত। সেটুকু ওর গহীন মনের উৎসবের ঝলকানি। তার মাঝে এই করুণ সুরটা ছেঁড়া তারের মত বেসুরো। করুণা জিনিসটি বোধ হয় এমনি।

আর এই করুণার রেশটুকু মৃণালকেও যেন বিগলিত করে দিল। সুগতাকে মনে হচ্ছিল বিশাল-মনা দেবীর মত। বলল, হ্যাঁ। কিছুদিন থেকেই আমি সেটা লক্ষ্য করে আসছি। ভাবি, হঠাৎ কেন এমন হল।

সুগতা বলল একটু চিন্তিত স্বরে, হঠাৎ নয়। রাজেন বোধহয় এমনি। ব্যাপারটা রাজনীতিগত।

—রাজনীতিগত ?

--আমার মনে হয়। হয়তো নীতির পরিবর্তনটা ওর ধাতে সইছে না। তাই বা বলি কেন। সেটাকে মনে-প্রাণে মেনে নিয়েছে বলেই হয়তো নিজেকে ওর বড় তুচ্ছ মনে হচ্ছে, অকিঞ্চিৎ মনে হচ্ছে। মনে হয়, কী এক অদ্ভুত অদৃশ্য শক্তির পিছনে ফিরছে রাজেন। সেটা ও পাচ্ছে না বলে রেস্টলেস হয়ে উঠেছে। এটা বড়ো করুণ ব্যাপার। এসব থেকেই তো মানুষের ইনস্যানিটি গ্রো করে যায়।

মৃণাল বলল, কোন্ শক্তির কথা বলছ তুমি ?

পাতলা ঠোঁটে একটু বিষাদ-কৌতুক হাসি নিয়ে বলল সুগতা, তা'তো আমিও জানিনে। আসলে সেটা কোনো শক্তিই কি না, তা-ই আমি বিশ্বাস করতে পারিনে। নিজেকে ছাড়িয়ে যাব, ছাপিয়ে উঠবো, এমনি একটা কিছু হবে সেটা। কিন্তু যারা ভাবে, তারা ভেবে দেখে না, কী ছাড়িয়ে ছাপিয়ে

যেতে চায় সে। ত্যাগ করে, নিজেকে দুঃখ দিয়ে, ভেঙেচুরে? কী জানি! এ তো অ্যাবনর্মাল মানুষের লক্ষণ।

একদিন রাজেনের যে জীবনায়নকে সুগতার দুস্তর বিস্তৃত মনে হয়েছে, নিজেকে ভেবেছে ভীরু ও অক্ষম, আজ সন্দেহ সেখানে। আজ মনে হচ্ছে, কোথায় এর অস্বাভাবিকতা ও পাগলামি রয়েছে বাসা বেঁধে।

আবার বলল, আমার কি ভয় জানো মৃণাল। রাজেনের জীবনে এমনি বিপদ এখন ঘটবে বারেবারেই।

পাশে পাশে সুমিতা। সেই মাধবী-রং চাদরটাই গায়ে জড়িয়ে, মুঠি করে ধরে আছে বুকের ভিতরে। কোন কথা যোগাচ্ছে না মুখে। কিন্তু বুকের মধ্যে অনেক কথার ঠেলাঠেলি। কিছুতেই ভাল লাগছে না, সায় দিতে পারছে না এই দু'জনের কথায়। কিন্তু ওরাই রাজেনের বেশী কাছাকাছি, বেশী আপন। চেনে ওরাই ভাল। ভেবে পাচ্ছে না, কেন ওরা শুধু অঘটন দেখছে। ওদের কাছ থেকে ওদের চোখ দিয়েই দেখেছে সুমিতা রাজেনকে। তবে দু'জনের কেন এত সংশয়। সন্দেহ, করুণা।

মৃণাল বলল, শুধু এইটুকু ছাড়া আরো কিছু আছে বলে আমার মনে হয়। মনের দিকটাও ভেবে দেখতে হবে তোমাকে। সেদিক থেকেও রাজেন বোধ হয় ফ্রাস্ট্রেট।

চাপা অনুসন্ধিৎসার ভ্রূ কুঁচকে তাকাল সুগতা। বলল, বুঝলুম না।

মৃণাল সুগতার দিকে একটু ঢলে পড়ে নীচু গলায় বলল, তোমার কথা বলছি। সেটাও—

কথাটা হেসে তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দিতে গিয়েও সুগতার মুখে একটু রং ধরে গেল। সন্ধ্যার এই আবছায়াতে দূর আকাশে চাপা পড়া রক্তাভার মত অদৃশ্য হয়ে রইল সেটা। আসলে ওই রংটুকুই সুগতার আত্মহারা মনের অনিয়ন্ত্রিত বিশ্বাস। উড়িয়ে দিতে কিংবা দুঃখ পেতে গিয়ে ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম একটু হাসি যেন দূর অন্ধকারে জয়ের কেতন উড়িয়ে দিল ওর জীবন ও যৌবনবাসরের। যেন অনেকখানি বিজয়িনী করল ওকে মৃণালের সামনে। এ যদি নিষ্ঠুরতা, তবে সেটা এই জটিল বিশ্বপ্রকৃতির হাত-ধরা।

অসংশয়ের মধ্যেও একটু সংশয়ের মিশেল দিয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে বলল সুগতা, তা নাও হতে পারে।

মৃণাল বলল, আমার তাই মনে হয় সুগতা। হয়তো সেইটিই আসল।

সুগতা ওর মুখে হাসির শাণ চাপতে চাইল বিষণ্ণ হয়ে। মেয়ে মনের এটা একটা অমোঘ তত্ত্ব কিনা জানা নেই। কিন্তু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল সুমিতা। নিজের মনের কাছে কোনই যুক্তি নেই। তবু একটি বিচিত্র বিক্ষুব্ধ বেদনা ওকে মারছে অন্তরে অন্তরে। উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল পালাবার জন্য।

সামনেই, স্টপেজ থেকে বাস ছেড়ে যাচ্ছিল। কণ্ডাক্টরকে হাত দেখিয়ে সুগতাকে বলল, মেজদি তোমরা এস, আমি যাই। আমি আর হাঁটতে পারিনে।

বলে বাসে উঠল গিয়ে চোখের পলকে। কী যে ঘটে গেল। ঘণ্টার দু'টি টিং টিং, তারপর এক্সিলেটরের চাপে একটা ক্রুদ্ধ গর্জন করে বাসটা বেরিয়ে গেল।

সুগতা একটু অবাক হয়ে বলল, কী হল?

মৃণাল হাত ঘুরিয়ে বলল, দেবা ন জানন্তি।

দু'জনেই এক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে রইল। মৃণাল বলল, রমণীর মন, সহস্র বর্ষেরি সখা সাধনার ধন। কিছুই বোঝবার উপায় নেই। হয়তো মনে পড়ে গেছে, কোথাও অপেক্ষা করতে বলেছে আশীষকে। কিংবা রাজেনের কথা ভাবছিল।

সুগতার ভ্রূজোড়া ঢেউ দিয়ে উঠল পাখীর পালকের মত। বলল, রাজেনের কথা?

মৃণাল বলল, অসম্ভব কী? কেমন ত্রস্ত হয়ে ছুটে এসেছিল, দেখলে তো।

—তাতে চলে যাবার কি আছে।

—ভাল লাগছিল না হয়তো আমাদের কথা।

সুগতা কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে হেঁটে যেতে যেতে বলল, কিন্তু রাজেনকে যে রুমনি খুব ভক্তি করে, সেটা বোঝা গেল।

মৃণাল নীচু গলায় বলল, তুমিও করতে।

হেসে বলল সুগতা, সবাই করত।

—তা ঠিক। কিন্তু ভক্তি জিনিসটা সাংঘাতিক। বড় ভয় করে। কোনদিক দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যে কোথায় নিয়ে যাবে, কোন ঠিক নেই।

—নিশির ডাকের মত, না?

—তার চেয়েও সাংঘাতিক। চোরা বালির মত। পড়লে আর রেহাই নেই।

চোখের কোণে কটাক্ষ করে হেসে বলল সুগতা, ভয় হচ্ছে নাকি ?

—তোমার বোনের জন্যে ?

—বোনের জন্যে ভয় আর কি ! সেদিকে তো আশীষ আছে। ভক্তি নিয়ে ওকে কেন ঘুলিয়ে দিচ্ছ। তোমার নিজের কথা বল।

মৃণাল বলল, এখানে সুগতা আছে।

হেসে উঠে সুগতা ঘন হয়ে এল মৃণালের কাছে। বলল, খুব যে।

তারপর হঠাৎ শীতার্ত শব্দ করে বলল, ইস্ ! বড় শীত করছে মৃণাল।

মৃণাল হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল সুগতাকে। বলল, তেমন শীত কোথায় ?

সুগতা লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে উঠল এই জনারণ্যে। বলল, ও কী হচ্ছে ! হাত ছাড়। এখুনি কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে হয়তো।

—হলেও অন্যায় বলবে না। একটু বেহায়া বলবে হয় তো।

—সেটা বুঝি খুব ভাল।

চৌরঙ্গীতে এসে পড়েছে ওরা ততক্ষণে। মৃণালের নজরে পড়ল দূরের নিশি-পাওয়া অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া মাঠটা। বলল, চল একটু মাঠের দিকে ঘুরে আসি।

শীত লেগেছে সুগতার। তবু শহরের গরম ছেড়ে শীতার্ত মাঠের দিকেই গেল দু'জনে। শীত ধরেছে বলে একটু ঘুরে যাবে শীত গুরগুরোনি মাঠে। এমনি বিচিত্র মানুষের মন, বিচিত্র সময়ে !

বাসে উঠে সহসা লজ্জায় এক মুহূর্তে আরষ্ট হয়ে রইল সুমিতা। কিন্তু ওর মন মানেনি। কী করবে। রাজেন ওর কেউ নয়, কিছুই নয়। অনেক-দিনের দেখা, অনেকদিনের বিশ্বাস, মানুষ হিসেবে রাজেনকে অনেকখানি বড় করে দেখেছে। বিশ্বাস দিয়ে হয়তো আরোপ করে বসেছে একটা 'অতি' কিছু। সেই মানুষেরই দুর্ঘটনা শুনে এসেছিল ছুটে। আর কী। আর তো কিছু নয়।

কিন্তু মেজদি আর মৃণালের এই সন্ধ্যার পথে, গায়ে গায়ে, অমন মিঠে মিঠে কথায় রাজেনের বিচারে কন্‌কনিয় উঠেছিল বুকের মধ্যে। ক্ষুব্ধ যন্ত্রণায় ভরে উঠেছিল মন। ওরা না শোনাতে চাইলেও কানে এসে ঢুকছিল ঠিকই। কী হবে অকারণ ওসব কথা শুনে। সুমিতার কী আসে যায়। বরং রাজে-নের নির্ভীক মুখটি মনে করে, নিজেরই কেমন অপমান বোধ হচ্ছিল। রাজ-

নীতি, শক্তি, ইনস্যানিটি, ফ্রাস্ট্রেশন, হঠাৎ এত কথা কোথা দিয়ে কেমন করে এল। কী-ইবা জানে সুমিতা এ-সবের। কিন্তু এত সহজে কেমন করে ধুলোয় লুটিয়ে দেবে ও একটি মানুষকে। রাজেনের সামনাসামনি তো ওদের এত কথার একটু ইশারাও দেখা যায়নি। নিজেই তো দেখেছে সুমিতা, অজয় পালিয়ে গেল। বারে বারে কেন এখন থেকে বিপদে পড়বে রাজেন। এ বিচার যুক্তি, কোথা থেকে পেল মেজদি।

আশ্চর্য! মেজদিও যেন কত বদলে যাচ্ছে। এ যেন সেই চেনা মেজদি নয়। অন্য কোন মেয়ে। সেই দীপ্তিময়ীর সঙ্গে এই তরল প্রেমময়ীর কোন মিল নেই যেন। তবে কী ওটা ফাঁকি।

নিজেকে ধমকে ধিক্কার দিয়ে উঠল সুমিতা। ওদের বন্ধুর বিচার ওরা করছে। সুমিতা এসেছে পালিয়ে ওর ভাল লাগা না লাগা নিয়ে। কী হবে তার এসব ভেবে। এদিকে সন্ধ্যা যাচ্ছে গড়িয়ে। আশীষ বসে আছে হয়তো পথ চেয়ে।

তবু ওর বুকের মধ্য ভার হয়ে উঠছে রাজেনের সেই চাদর জড়িয়ে চলে যাওয়ার ভঙ্গিটি মনে করে। তীক্ষ্ণ ঠোঁটে সেই সুদূর অস্পষ্ট হাসিটি স্মরণ করে। চকিত বিদ্যুৎ চমকে মনে হল, রাজেনেরও কি কোন বন্ধু নেই। মনে মনে সেও কি নির্বান্ধব।

বাড়ি এসে দেখল সুমিতা, কেউ নেই। বিলাসকে জিজ্ঞেস করল, বাবা আসেননি? বিলাস পকেট থেকে একটি চিঠি বার করে বলল, না, আশীষ-বাবু এসেছিলেন। আপনাকে একটা চিঠি দিয়ে গেছেন।

চিঠি নিয়ে পড়ল সুমিতা।--শুনলুম বেরিয়ে গেছ; বোন ও ভাবী ভগ্নিপতির সঙ্গে। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করে কোন আশা পেলুম না। আজ তাই যাচ্ছি একটু আমাদের পুরনো আড্ডায়। যদিও মন ভরেনা সেখানে, তবু নিরুপায়।......

জানে সুমিতা, খুব না হলেও এ বিশ্বসংসারে সেইটিই একমাত্র আড্ডা আশীষের। অধিকাংশই কবি ও সাহিত্যিক। ইংরেজী পত্রিকার অল্পবয়সী দু'একজন। শখ করে একটু আধটু বীয়ার খায়। তা ছাড়া চা সিগারেট পাইপ টোবাকো। ইয়েটস এলিয়ট থেকে কন্টিনেণ্টের নতুন সাহিত্য কিংবা এরেনবুর্গের বিশালতা, হাওয়ার্ড ফাস্টের সুদূর ঐতিহাসিকতা পাক খায় টোবাকোর ধোঁয়ায় ধোঁয়ায়। হাসিটা ফেটে পড়ে দেশের কবি ও

সাহিত্যিকের প্রসঙ্গে। সকলেই যেন আশীষের এপিঠ ওপিঠ। চরিত্রগত একটি আশ্চর্য মিল আছে সকলেরই।

কথাগুলি সুন্দর, যেন ধবধবে ফরশা। অনেক তথ্য আর তত্ত্ব নিখুঁত ছুঁচের কাজের মত ফুটে থাকে ওদের কথায়। তবু টোবাকোর গন্ধে কি না, কে জানে কথাগুলি ধীরে ধীরে কেমন যেন রুদ্ধশ্বাস করে তোলে। দিগন্ত এর সুদূর, কিন্তু এদের কথায় মনে হয়, সেটা নির্বাসনের অরণ্য।

সেখান থেকে বেরিয়েও আশীষ অতৃপ্ত। বলে, এখানেও আমার বড় বিশ্রী লাগে সুমিতা। সবাই এত বেশী জানার ভান করে। আসতে ইচ্ছে করে না।

সুমিতা স্পষ্ট দেখতে পেল, সেখান থেকে বেরিয়েও কেমন একা একা ফিরবে আশীষ। আড্ডাতে গিয়েও কথা বলবে, বসে থাকবে সেই একা মন নিয়ে, বিদ্রূপ-ঢুলুঢুলু চোখে।

বিলাস চলে গেছে ওর কাজে। ফাঁকা নিঃশব্দ বাড়ি। কলকাতাকে এত আশ্চর্য নিস্তব্ধ মনে হয় এক একসময়।

হঠাৎ মনটা বড় ব্যাকুল হয়ে উঠল সুমিতার। টনটনিয়ে উঠল বুকের মধ্যে আশীষের জন্যে। যেন দেখছে দিব্য চোখে, অস্থির ব্যাকুল হয়ে আশীষ তাকিয়ে আছে বাইরের দরজাটার দিকে। আশীষের ভাষায়, ভয়ংকর দরজা ফাঁকা, শব্দহীন, কেউ আসে না। তারপর উঠে চলে যাচ্ছে নিরাশ হয়ে। একা একা, লাইটপোস্টের ছায়ায়।

ছায়ায়, ছায়ায়, একা একা ভেসে উঠল একই সঙ্গে সেই চাদর-জড়ানো মূর্তি। যেন সিনেমার পর্দায় ডিসল্‌ভ করে আর একটি ভিন্ন ছবি দেখছে সুমিতা। এই দ্বিমুখী ভাবনায় কয়েক নিমেষ অর্থহীন স্তব্ধতায় ভরে গেল সুমিতার মন। তারপর নিজের মনেরই হঠাৎ ঝাঁকুনিতে চারদিকে তাকিয়ে অন্ধকার দেখতে লাগল। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে উঠল। একদিন ও ভাবত, মানুষের নিজের মধ্যে কতগুলি 'অসহজ' আর 'সর্বনাশ' আছে জমে। জীবনকে সে কখনো সোজাপথে যেতে দিতে চায় না। এখন সেকথাটি মনে পড়ছে না। ভাবছে, কেন এক নিরর্থক অবোধ কষ্ট ওকে ঘিরে আসছে।

পট্‌ পট্‌ করে ঘরে বারান্দায় সব আলোগুলি জেলে দিল সুমিতা। ছুটে আয়নার সামনে গিয়ে, কপালের চুল সরিয়ে ফিরে আসতে গিয়ে আবার দাঁড়াল। রিবন বাঁধা বেণীটা বুকে ফেলে, চাদরের ভাঁজে ঢেকে তরতর করে

চলে গেল বাইরের ঘরে। যেন একটি সাপের ফণা বুকে চেপে ধরে ছুটেছে। ঠিক করেছে মনে মনে, যাবে আশীষের কাছে, সেই আড্ডায়। যাবেই, নইলে ও কিছুতেই পারবে না।

দরজার কাছে আসতেই দেখল সুজাতা ঢুকছে। মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। চোখের কোলে গভীর খাদ। কিন্তু খাদ পেরিয়ে দু' চোখের দৃষ্টি তীব্র ও তরল। সুমিতাকে বলল, কোথায় যাচ্ছিস।

কী মনে হল সুমিতার। একেবারে সরলভাবে বলল, যাব না কোথাও।

বলে ও যেন অবাক হয়ে দেখতে লাগল বড়দিকে। ঠোঁটের রং শুকিয়ে কালির আভাস ফুটেছে। লেডীজ কোটের বুকটা হা-হা করছে খোলা। শাড়ির আঁচল গেছে বুকের কোন্ সীমানায় হারিয়ে। স্তনান্তরের গভীর খাদে সোনার হারটা অনেকখানি দেখা যাচ্ছে মরা বিছের মত।

কাঁধ থেকে ব্যাগ নামিয়ে বলল, বাড়িতে কেউ নেই বুঝি ?

চেহারায় যত এলোমেলো, অবসন্ন, কণ্ঠে তত নয়। সুমিতা বলল, না। বাবা তো সেই অনেকক্ষণ বেরিয়েছেন, ফেরেননি।

জুতোর হিল টক টক শব্দে ধীরে ধীরে দরজার দিকে যেতে যেতে আবার বলল. ঝুমনো কোথায় ?

শরীরের রেখায় রেখায় নিপাট-বসা হাল্কা লাল কোটটা দুলছে বড়দির। সুমিতা বড়দির পিছন পিছন এগিয়ে বলল, মৃণালদার সঙ্গে বেরিয়েছে।

আর কোন কথা নেই। সুজাতা পর্দা সরিয়ে নিজের ঘরে ঢুকল। সুমিতাও হাজির হল সেখানে।

সুজাতা পিছন ফিরে বলল, কিরে রুমনি ? কিছু বলবি ?

সুমিতা অসঙ্কোচ হওয়ার চেষ্টা করে বলল, হ্যাঁ, বড়দি তোমার সঙ্গে কি রবিদার কখনো দেখা হয় না ?

চমকে উঠল সুজাতা। সহসা যেন অর্থহীন শূন্যতায় অবাক হয়ে বলল, কে ?

—রবিদা।

সুপ্তোত্থিত বিস্ময়ে যেন জেগে উঠল সুজাতা ঘুমের ঘোরে। কোটের মুখ দু'টো বন্ধ করে তাকাল এদিক-ওদিক। বলল, কোথায় ? ভয় পেল সুমিতা। কেন মরতে এ প্রসঙ্গে ভেসে এল ও। বলল, কোথায় তা জানিনে। তোমার সঙ্গে দেখা হয় কি না, জিজ্ঞেস করছিলুম।

সুজাতা এক মুহূর্ত নির্বাক থেকে কোট ছেড়ে দিয়ে বলল, না তো! কেন?

'কেন'র ভয়টাই সুমিতার বেশি। কিন্তু একটা চাপা জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল সুড় সুড় করে বেড়াচ্ছে ক'দিন মনের মধ্যে। এই ভাবনাই হঠাৎ ওকে বিপথগামী করেছে দরজা থেকে। বলল, মেজদির বিয়েতে রবিদাকে ডাকতে যাব ভাবছিলুম।

ততক্ষণে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছে সুজাতা। বলল, কেন, চিঠি দেওয়া হয়নি?

—তা তো হয়েইছে। কিন্তু বড়দি, রবিদা তো আর আসেন না আমাদের বাড়িতে। সে কথার কোন জবাব না দিয়ে কোট খুলল সুজাতা। পিঠে ছড়ানো কোঁচকানো আচলের ওপর পড়ে আছে রুক্ষ বেণী।

সুমিতা আবার বলল, কেন আসেন না, কে জানে। বাবা খোঁজ করেও দেখা পাননি। ভাবছি, আমি কাল যাব।

দূরাগত শব্দ এল সুজাতার, যাস্।

মুরগির মত পা টিপে টিপে এসে যেন অনেক সাহস সঞ্চয় হয়েছে সুমিতার, বলল, তুমি গেলে সবচেয়ে ভাল হয় বড়দি।

আবার চমকে উঠল সুজাতা। প্রায় রুদ্ধশ্বাস গলায় বলল, আমি?

সুমিতা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না, বলছিলুম তোমার যদি সময় থাকে।

সুমিতার এ-ছলনার ধার দিয়েও গেল না সুজাতা। হঠাৎ বিনুনি খুলতে লাগল বেণীর, বুকের ওপর টেনে। সেদিকে চোখ রেখেই বলল, আমি গেলে রবি আসবে না কখনো। বরং তু-ই যাস্।

বলতে বলতে চোখ দু'টি জ্বালা করে উঠল সুজাতার। আসবে না, কে জানে। চোখের জ্বালাটা সেজন্যে নয়। ভাবল, একজন যখন আসে না, তখন অন্য কতজনে আসে।

আফিমের নেশার মত বান্ধবী অমলা। সেও আজ কোন্ সর্বনাশের অপ্রতিরোধ্য চোরাপথে নিয়ে চলেছে টেনে। সে সৌরজগতের অনেকখানি জুড়ে কারদেজোর ম্যানেজার শুভেন্দু। বড় বিস্ময়, লজ্জা, অপমান সুজাতার,

সেই মণ্ডলের একদিকে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে আজ গিরীন। দেহের সমস্ত রক্তবাহী শিরাগুলি অমলা তুলে নিয়েছে হাতে, ছুটেছে নিজের পথে। শুধু মন নিয়ে দাপাদাপি করছে সুজাতা। কিন্তু বিষ আছে রক্তের মধ্যে। সেই রক্তেরই কানে কানে অমলা বলছে দিবানিশি, রাক্ষুসী, কোন্‌দিকে ফিরে তাকাচ্ছিস তুই। কার পরোয়া করছিস তুই। এইভাবেই সম্মান করতে হবে। পোষা জীবের মত এমনি করেই ওদের রাখতে হবে পায়ে পায়ে।

অমলা বলল, ওরা বউকে চায় না। বউকে ওরা নাগরীর বেশে চায় পথের হুল্লোড়খানায়। ধরে বাঁধ্। থেঁতলে মার্।

ভয়ংকরী ক্রোধে জ্বলে অমলা লেলিহান হয়ে। আগুনে গলিত বিন্দু বিন্দু লোনা জলটুকু শুধু পায় না দেখতে। কিন্তু সুজাতা তো জানে, শুভেন্দুর কাছে অমলা ছিল একদিন একেশ্বরী। অস্পষ্টভাবে মনে হয়েছে, হয়তো মেশামিশি হয়েছে গিরীনের সঙ্গেও। বলে, ঘরে শোধ নেওয়া যায়নি, বাইরে ওরা সুদ্ধ শুদ্ধ শোধ দিতে পিল পিল করছে বাদলা পোকার মত।

হয়তো ঠিক। রক্তের মধ্যে জ্বলে ধিকিয়ে ধিকিয়ে। কিন্তু অমলার মত দিগন্ত দগ্ধানো ভয়ংকরী যে কিছুতেই হতে পারে না সুজাতা।

অবাক হয়ে দেখছিল সুমিতা, বড়দির মুখটা ধীরে ধীরে নুয়ে পড়ছে। বিনুনি খুলতে গিয়ে হাত দু'টি ক্রমে শিথিল হয়ে পড়ছে।

এমন সময় এলেন মহীতোষ।—রুমনো, রুমনো সাহেবা।

বলতে বলতে এসে পড়লেন এই ঘরেই। বললেন, এই যে, উমনোও আছিস। দু'জনেই সচেতন হল। ফিরে তাকাল বাবার দিকে। সুজাতা নত চোখেই বলল. কী বলছ ?

একটি জুয়েলারী বাক্স খুলে হেসে বললেন, ছাখ্ তো, ঝুমনোর জন্যে এই নেকলেসটা এনেছি। অর্ডার দিয়েছিলুম আগেই। লোকগুলি ভারি ফাঁকিবাজ। কাজটা শেষ করেও রাখেনি ! বসে. শেষ করিয়ে নিয়ে এলুম। কেমন, ভাল ?

সুমিতা বলল, বেশ সুন্দর হয়েছে বাবা। কিন্তু, সেই এক প্যাটার্ন। বড়দিকেও তুমি বিয়ের সময় ঠিক এমনি একটা নেকলেসই কিন্তু দিয়েছিলে, না বড়দি ?

এক মুহূর্তের জন্যে হঠাৎ কোন্ অদৃশ্যে এল একটু ছায়া ঘনিয়ে। তারপর আমতা আমতা করে, চোরা চোখে একবার সুজাতার দিকে তাকিয়ে মহীতোষ

বললেন, হ্যাঁ, মানে উমনো জানে, এই প্যাটার্নটা আমার বড় ভাল লাগে। তোদের তিনজনকেই এতে বেশ মানায়।

বলতে চাননি মহীতোষ। শুধু ভেবেছিলেন মনে মনে, একটা নেকলেস অশান্তি এনেছে। আর একটা সব অশুভ অশান্তিকে দেবে দূর করে। কোন্ সংস্কার বশে যে এমনটি ভেবেছিলেন, নিজেও জানেন না। সে বুঝি শুধু পিতৃস্নেহের একটি ইচ্ছে।

খুব সকাল বেলা বেরিয়ে পড়ল সুমিতা। আজ আর শুধু সুগতার বিয়ের নিমন্ত্রণেই রবিদাকে চাইনে ওর। চাই অন্য কারণে। আর কোন ফাঁকি নেই সুমিতার কাছে। একটি জিনিস আবিষ্কার করছে ও নিরঙ্কুশভাবে! কোন সন্দেহ সংশয় নেই। তাই যত সংকোচের বালাই আজ ঝেড়ে ফেলেছে। কিছু না হোক সাহস করে আজ সেই কাথাটিই বলতে হবে রবিদাকে।

বেরুবার আগেই স্থির করে নিয়েছে সুমিতা, একবার দেখা করে যাবে আশীষের সঙ্গে। ডাকবে আশীষকে, সঙ্গে যদি যায়।

এর মধ্যেই পুব দিকের আকাশ গেছে সোনার পাতে মুড়ে। নবান্ন নেই কলকাতায়। তবু এই অ্যাসফল্টের রাস্তায়, ইট-কংক্রীটের রাজ্যে, বিদ্যুতের তারে বাঁধা নগরে, শেষ অগ্রহায়ণের রোদ নিয়ে এসেছে নতুন রং। বাতাসে বিচিত্র আমেজ।

শীতও মন্দ নয়। বাতাসটাও আজ হিম ঠোঁটে নিয়ে এসেছে গড়িয়ে উত্তর থেকে। অ্যাভিন্যুর গাছগুলি কেঁপে কেঁপে কুঁকড়ে উঠছে ঠাণ্ডা বাতাসে।

সাজবার অবকাশ হয়নি সুমিতার। জামাকাপড়টা বদলানো হয়েছে মাত্র। চোখে মুখে একটু জল দিয়ে কোন রকমে একটু চিরুনি ঠেকানো। পাউডার পাফ্ বুলনো হয়েছে। কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছে ছোট ব্যাগ।

দরজা খোলা পেয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল সুমিতা। বারান্দায় দেখা হয়ে গেল আশীষের মায়ের সঙ্গে। উলের চাদর জড়িয়ে বসেছিলেন একটি চেয়ারে। বয়সে বৃদ্ধা-ই। কপালে সিঁদুর নেই, সিঁথিতে আভাস। সিঁথি এখন টাক, সাদা চুল পাতা পেড়ে আঁচড়েছেন এই সকালেই। হাতে ছুরি, টেবিলের উপর প্লেটে বড় একখানি কেক।

সুমিতাকে দেখে প্রথমটা একটু অবাক হলেন। তারপর একটু হাসির আভাস ফুটিয়ে বললেন, সেণ্টুর কাছে ?

সুমিতা বলল, হ্যাঁ।

উনি কেক কাটতে লাগলেন। তারপর সুমিতার দৃষ্টি অনুসরণ করেই তাকালেন আশীষের বন্ধ দরজার দিকে। বললেন, ওর ঘুম ভাঙতে তো একটু দেরি হবে। ডাকলে বড় রেগে যায়।

তা হয়তো যায়। কিন্তু ডাকছে তো সুমিতা। সেটা উনি কি বোঝেন না। আড়ষ্ট হেসে, নখ দিয়ে ব্যাগ খুঁটে বলল সুমিতা, একটু দরকার ছিল।

আশীষের মা দেখলেন সুমিতাকে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত। তারপর প্লেটসুদ্ধ কেকটি নিয়ে উঠে বললেন, বসো তুমি, আমি দেখছি।

বলে নিজের ঘরে চলে গেলেন পর্দা সরিয়ে। ঠোঁটের কোণে একটু হাসি লেগে ছিল। সেটুকু ভাল ভেবে কি মন্দ ভেবে, বোঝবার উপায় নেই। এর আগেও একই রকম মনে হয়েছে সুমিতার।

আশীষের বন্ধ-দরজার দিকে তাকিয়ে অ-সবুর হয়ে উঠছিল মন। এ-দরজাটাও ভয়ংকর। যেন কোনদিন খুলবে না। ঠিক এমনি করেই কাল বসেছিল আশীষ। বৃথা তাড়া মনের। আজ একটু শোধ যাবে বৈকি।

কিন্তু শোধ যাওয়ার অনেক আগেই দজরা খুলল আশীষ। বোঝা গেল, ঘুম থেকে উঠে কোন রকমে চোখ ঘষে, জামা গায় দিয়ে বেড়িয়েছে। হেসে ডাকল, এস।

ঘরে গেল সুমিতা। দরজা ভেজিয়ে দিল আশীষ।

সদ্য ঘুমভাঙা ছোট চোখ দু'টি আশীষের টলটলে অথচ বোকার মত দেখাচ্ছে। তারপর আস্তে আস্তে কেমন করে যেন আপনা-আপনি ঢুলু ঢুলু হয়ে ওঠে। নিঃশব্দে শুধু দেখতে লাগল সুমিতাকে।

সুমিতা ব্যাগটা বুকে চেপে বলল, কী দেখছ ?

—তোমাকে। বাংলায় একটা কবিতা আছে জানো, প্রভাতে উঠিয়া আজ দেখেছি তোমাকে, দিনটি—

সুমিতা হেসে উঠে বলল, কবিতা নয়, ওটা পদাবলী গান। প্রভাতে উঠিয়া যবে ও-মুখ দেখিনু, দিন যাবে আজি ভাল।

আশীষ ছলনা করেনি। জানে না সত্যি। বলল, ও-ই হল। এই সব লেখকের বেশ চুটিয়ে প্রেম করবার একটা ক্ষমতা ছিল।

সুমিতা বলল, আর এখন বুঝি তা কেউ পারে না। সে যাক, তুমি পড়াশুনা কর কখন? পরীক্ষা-টরীক্ষা দেবে না?

আশীষ বলল, ভেবে দেখতে হবে। জীবনে একটা মোড় নিতে চাই। সেসব পরে আলোচনা হবে। তুমি বসো।

—না, আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে। কালকে তুমি বাসা থেকে চলে এসেছ, তাই সকাল বেলাই এসেছি।

—পুষিয়ে দিতে?

বলতে বলতেই বিদ্রূপে বেঁকে উঠল আশীষের ঠোঁট। বলল, সেজন্য আমি মোটেই কিছু ভাবিনি। কিন্তু যেজন্যে গেছলে, সেটা শুনেই খুব অবাক হলুম।

কেমন একটা অজানিত ভয়ে সিরসির করে উঠল সুমিতার বুকের মধ্যে, বলল, তুমি জানো?

—জানি বৈকি। অজয়দের কথা আমি বাদই দিলুম। রাজেনের গেঁয়ো ভাড়ামিটা ভেবেই আমি হেসে বাঁচিনে।

সুমিতার বুকের ভয়টা হঠাৎ দূর-শব্দ পাওয়া সাপের মত নড়ে চড়ে উঠল। বলল, কেন!

আশীষ বলল, এই তো আমাদের ছাত্র-আন্দোলনের নমুনা, এই সব নেতা। কেবল চোখে চোখে, ভাবে, কথায় ভঙ্গি সর্বস্বতা। আসলে এই সব মাল।

কিন্তু আশীষ সিরিয়স হয়ে উঠেছে। বলল, আমি জানি, অনেকদিন থেকে আছি সঙ্গে। শুধু একটা উচ্ছ্বাসের ফানুস, হয় রাগের, নয় আনন্দের, তারপর সবটা মিলিয়ে খানিকটা হুড়োহুড়ি দাপাদাপি। মন্ত্র ওদের একটাই। প্রাণ যা চায়। বিদ্যাবুদ্ধির কোন দরকার নেই। কথা বলে দেখ, সবাই চিন্তিত, ব্যস্ত, না জানি কী ঘটিয়ে দেবে এই নওজোয়ানেরা। এদের কাউকে তুমি ইউরোপে পাঠাতে পার তোমার প্রতিনিধি করে। হয়তো দু'এক বছরের মধ্যে তা-ও যাবে। সেই ভেবেই আমার বড় ঘৃণা। লজ্জাও বটে।

ঘৃণা ঘৃণা ঘৃণা। কথা বলবে না সুমিতা। কিছুতেই কোন জবাব দেবে না। যত ব্যথা করুক ঠোঁট, ঠিক এমনি নিঃশব্দ স্মিত-হাসিটুকু ধরে রাখবে প্রাণপণে।

আশীষ আবার বলল, শুনলে তুমি অবাক হবে সুমিতা। লণ্ডনের পথে ইউরিনালের লক্-করা দরজায় এক আনার মত কয়েন ঢুকিয়ে দিলে দরজাটা আপনি খুলে যায় একজনের জন্যে। বেরিয়ে এলে বন্ধ হয়ে যায়। শুনলুম, চারটি বাঙালী ছেলে ওই একটি কয়েন ঢুকিয়ে, দরজাটি ঠেলে রেখে একে একে কাজ সেরেছে। আর 'বোকা' বলে ঠাট্টা করেছে সাহেবদের।

বুকের কুণ্ডলমুক্ত ফুঁসে-ওঠা সেই সাপটাকে পারছে না সুমিতা দাবিয়ে রাখতে। পারছে না, তবু ঠোঁটে হাসি রেখেই বলল, এসবের অনেক জবাব আছে আশীষ। কয়েক জনের খেলা নিয়ে তুমি গোটা দেশের বিচার করতে চাও?

—এ কেমন খেলা? সভ্যতা নিয়ে খেলা?

—না হয় গুটিকয়েক ছেলের অসভ্যতা-ই। তার চেয়েও খারাপ কাজ তো সাহেবরা করছে এদেশে।

—ভাল কাজ তার চেয়েও বেশি করেছে।

—সেটা বিচার সাপেক্ষ। কিন্তু ছাত্রদের ওইটাই একমাত্র পরিচয় নয়।

কিন্তু কিছুতেই বলতে ইচ্ছে করছে না এসব কথা। কেন এসব কথা তুলছে আশীষ।

থাক না এসব। ও যে ব্যাকুল হয়ে এসেছিল ছুটে, আশীষকে কষ্ট দিয়েছে বলে। আশীষের একলা জীবনের কথা মনে করে এসেছিল। সুমিতার মুখ লাল হয়ে উঠেছে উত্তেজনায়। তবু মিনতি-ভরা হাসি নিয়ে বলল, থাক না আশীষ এসব প্রসঙ্গ।

আশীষ বলল, হ্যাঁ থাক। আমি তোমাকে শুধু এদের মিথ্যে ফাঁকিবাজি-গুলি বোঝাতে চাইছিলুম। এরা কী! তার মধ্যে রাজেনের মত চণ্ডাল তো থাকবেই। শুনি এখন সে শ্রমিকদের কাছে যাচ্ছে। ব্যাপারটা কী জানো, যুবক গরীব হলেই এদেশে রাজনীতি করতে আসে। যেন ওটা ওদেরই একচেটিয়া। গরীবের ছেলে, সে গুণ্ডা বদমাশ, মূর্খ, যা খুশি তাই হোক। রাজেন যদি অর্থবান হত···

শুনতে পেল না আর সুমিতা। যত রুষে উঠছে মনে, ততই কান্না পাচ্ছে। রাগ তো হচ্ছে না পুরো। শুধু অসীম করুণায় ও বেদনায় কান্না পাচ্ছে এখন। পাগলামি, ভয়াবহ একটা পাগলামি। কী দিয়ে তুষ্ট হবে এ-ছেলে।

মানুষ যখন, তখন ক্ষোভের কারণ আছে নিশ্চয়। কিন্তু কোথাও তার তৃপ্তি থাকতে হবে, হাসতে হবে, বাঁচতে হবে।

কিন্তু তর্ক কিছুতেই আসছে না সুমিতার। ও শুধু চাপা গলায় ডাকল আশীষ।

থামল আশীষ। হঠাৎ যেন ঘাবড়ে গেছে, একাকী করুণ বিষণ্ণ ভাবটা এসেছে ফিরে। দু'হাতে জড়িয়ে ধরল সুমিতার একটি হাত।

শান্ত মমতায় হাসল সুমিতা। গ্রাস করতে চাইল সব ক্ষোভ যন্ত্রণা।

আশীষ বলল, তুমি রাগ করছ সুমিতা।

সুমিতা বলল, না। থাক ওসব কথা। তোমার কাছে এসেছি। আমি যাব এক্ষুণি। তুমি যাবে আমার সঙ্গে।

—কোথায়।

রবিদার কাছে।

আশীষ এক মুহূর্ত নীরব থেকে বলল, সেই একই মানুষের দল। আমার ভাল লাগে না সুমিতা। কেমন যেন গুরুগম্ভীর ক্লাউন মনে হয়—

—থাক্ থাক্।

সুমিতা ব্যাগটা বুকে চেপে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করল। —থাক্, জোর করছিনে তোমাকে।

—কিন্তু সুমিতা—

ফিরে তাকাল সুমিতা। আশীষ দু'হাতে বেষ্টন করল ওকে। চোখে ওর নেশার রক্তাভা, অভুক্ত বিষণ্ণতা।

এই, শুধু এইটুকু ভালবাসে আশীষ, বাসুক। কোন কথা বলে না। যা খুশি তাই করুক, যা খুশি। মুখ বাড়িয়ে নিয়ে এসে বলল সুমিতা, কী বলছ?

আশীষ চুম্বন করল সুমিতাকে। গ্রীবাগণ্ড হাত ভরে দিল।

তারপর নিশ্বাস নিতে গিয়ে নিরস্ত হতেই সুমিতা বেরিয়ে এল। বাইরে এসে বলল, যাচ্ছি। এসো সন্ধ্যাবেলা।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মনে হল, এখুনি ফেটে পড়বে হৃৎপিণ্ড। চীৎকার করে উঠবে হয়তো, একটা ভারি ইঞ্জিনের ব্রেক কষার মত। যেন আগুন লেগেছে, গায়ে নয়, গভীর প্রদেশে। যত মন উথালিপাথালি, তত সে রাগছে। এমনি করে কি পালাতে হবে ওকে সবখান থেকে।

রাস্তায় বেরিয়ে মনে হয়েছিল স্মিতার, কোথাও যেতে পারবে না এখন আর এ মন নিয়ে। কথা বলতে পারবে না কারুর সঙ্গে।

তবুও যন্ত্রচালিতের মত পথ চলেছে। ওদিকে অগ্রহায়ণের বেলা যেন লাগিয়েছে লুকোচুরির খেলা। কোন ফাঁকে যেন পাক খেয়ে উঠে এসেছে আকাশের অনেকখানি। চারদিগন্ত উদ্ভাসিত।

রবিদার কাছে আর যেতে পারবে না মনে করেও হাজির হল রবির বাড়ির দরজায়। ডাকতেও ভয়। বাড়ির লোকেরা টের পেলে রক্ষে নেই। দেরি তো হবেই। মিন্‌মিনে গলায়, টিপে টিপে অতি আড়ষ্ট ভদ্রতায় প্রাণটা ওষ্ঠাগত হয়ে উঠবে স্মিতার। চাকর থেকে কুকুরটা পর্যন্ত সচেতন হয়ে উঠবে এ বাড়ির বিশেষ ভঙ্গিমায়।

তবু স্মিতা টিপে দিলে বিজলী-ঘণ্টা-বোতামটা। চাকর বেরিয়ে এসে বলল, কাকে চান?

—রবিবাবু আছেন?

চকিত মুহূর্তে একবার স্মিতার আপাদমস্তক দেখে চাকর বলল পর্দা তুলে, আপনি বসুন, খবর নিয়ে আসছি। কি নাম বলব?

কিন্তু বাধা দিল স্মিতা। জানে, ওইটি হল চাকরের প্রতি নির্দেশ। আছে কি নেই, কিছুই বলতে নেই বাইরের লোককে। কেবল সংবাদটা নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু বাড়ির ভিতর সংবাদ গেলে অন্তত রবিদার দিদির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। মেজদি-মৃণাল, গোটা কলকাতার বিচিত্র সব সংবাদ পেড়ে বসবেন।

স্মিতা বলল, বসব না। তুমি জানো কি না বল না, তোমার সেজদাদা-বাবু আছেন না বেরিয়ে গেছেন?

বোঝা গেল, চাকর বেচারী একটু ফ্যাসাদে পড়ে গেছে। বাড়ির কর্তৃপক্ষের নির্দেশের চেয়েও বড় কথা, সেজদাদাবাবুর সঙ্গে চাকরবাকরদের সম্পর্কটা একটু অন্যরকম। একটু বেশী প্রীতি ও বিশ্বাস আছে সেখানে। একবার পিছন দিকে দেখে চাকর বলল, একটু আগেই তিনি বেরিয়ে গেছেন।

—কোথায় ?

—কলেজে নাকি তাড়াতাড়ি যেতে হবে, তাই খেয়েদেয়ে—

কথা শেষ হল না। সুমিতা বলল, আচ্ছা ঠিক আছে। বলে নেমে এল। চাকর বলল, ফিরে এলে কিছু বলব ?

—না।

না, আর কোথাও যাওয়া হবে না। হাতের ঘড়িতে দেখল, ছোট কাটাটা প্রায় লাফাতে লাফাতে ন'য়ের ঘরটা পেরিয়ে গেছে। কলেজের কথা ভাবাও যায় না। সেই উত্তর কলকাতা ঘেঁষে। নিশ্চয়তা বা কতটুকু পাওয়ার।

কিন্তু পা' চলল ওর সেইদিকেই, যেদিকে গেলে উত্তরে যাওয়ার ট্রাম বাস ধরা যায়।

বুকের মধ্যে কারা মেতেছে এক প্রলয়ঙ্কর মারামারিতে। যেন এ বুক, এ মন সুমিতার নয়। শুধু মারামারির সমস্ত আঘাতগুলি ক্ষতবিক্ষত করছে ওকে। কোথাও ওকে যেতে হবে, কথা বলতে হবে, হাসতে হবে। বাড়িতে গেলেই একটি কোণ নিয়ে থাকতে হবে মুখ বুজে। তার চেয়ে নিজেদের কলেজে, সংঘের অফিসে হিরণ্ময় কিংবা যার কাছে হোক, যাওয়া দরকার।

রাগ হচ্ছে, অভিমান হচ্ছে রবিদার ওপর। কিন্তু রবিদাকে যদি পাওয়া যেত—যে কোন অছিলায়, যে কোন ছলনার আড়ালে রুদ্ধ কান্নাটাও পারত মুক্ত করে দিতে।

কী ভিড় বাসে! মেয়ে পুরুষের সমান ভিড়। অফিসের সময়। দাঁড়িয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় রইল না। দলে মুচড়ে এলোমেলো হয়ে খালাস পেল বাস থেকে। কলেজে ঢুকে প্রফেসরস্ রুমে গিয়ে যাকে প্রথম পেল, তাকে জিজ্ঞেস করল। গুরুগম্ভীর অধ্যাপক ভদ্রলোক নিশ্চয় এই কলেজের ছাত্রী ভেবেছিলেন সুমিতাকে।

'স্যার' না বলায় কিংবা যে কোন কারণেই হোক্, কেমন একটু রুষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কে ?

—রবিবাবু।

—বলতে পারিনে।

আর একজন ছিলেন, এক তরুণ অধ্যাপক। নতুন বলে কি না কে জানে, ছাত্রী অছাত্রী যা-ই হোক, শুধু মেয়ে বলেই তার নাকের ডগাটি যেন

লাল হয়ে উঠল। সুমিতার মুখের গাঢ় হতাশার ছায়াটুকু দেখেও তিনি কিছু বলতে পারলেন না।

সুমিতা একবার তাকাল সেইদিকে। ভদ্রলোক আরো গভীর মনোনিবেশ করলেন কাগজে। বেরিয়ে আসতে গিয়ে চাপরাসীটাকে জিজ্ঞেস করল।

চাপরাসী বলল, রোটিনটা দেখিয়ে দিন।

মনের সমস্ত রুটিনটাই কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। লেখা রুটিন দেখে আর কী হবে। দেখা হবে না। অসহায় অভিমানে ওর গলার কাছে এসে ঠেকে রইল রুদ্ধ কান্না।

বারান্দা দিয়ে যাওয়ার সময় একটি মেয়ে ডাকল, সুমিতা না?

ফিরে দেখল, ওদের কলেজ থেকে চলে আসা একটি মেয়ে। ফেল করেছিল। এখানে এসে ভর্তি হয়েছে। কাছে এসে বলল, এখানে যে?

সুমিতা বলল, রবিবাবুকে একটু খুঁজছিলুম।

মেয়েটি তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে দেখল সুমিতাকে। বলল, আমাদের রবিবাবুকে?

হ্যাঁ।

—কেন বল্ তো?

প্রশ্ন শুনে মুখ তুলে তাকিয়ে বিস্ময়ে রাগে এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল সুমিতা। কী বিশ্রী হাসি ও অনুসন্ধিৎসু চাউনি মেয়েটির। বলল, দরকার ছিল একটু।

বলে পা বাড়াল সুমিতা। মেয়েটি বলল, কিছুক্ষণ আগে প্রিন্সিপালের রুমে যেতে দেখেছিলুম।

এই বারান্দার শেষেই প্রিন্সিপালের ঘর। ভিতরটা দেখা যায় না সব। বাতাসে দুলছে পর্দা, দরজার মুখে।

কিন্তু সমস্ত আশাটা এমনভাবে মার খেয়ে থতিয়ে গেছে, কোন ভরসা নেই সুমিতার। তবু পায়ে পায়ে এগুলো ও ওই ঘরের দিকেই।

এমন সময়ে পিছন থেকে ডেকে উঠল রবি। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ফিরেই হাসতে গিয়ে, চোখ ফেটে জল এসে পড়ল সুমিতার।

রবির স্নিগ্ধ হাসি একটু বিব্রত হয়ে উঠল। বলল, অনেকক্ষণ এসে বসেছিলে বুঝি? রাগ করো না ভাই রুমনো। চল আমরা বাইরে যাই।

এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে দশজনের সামনে চোখের জলটা রোধ করা উচিত ছিল সুমিতার। কিন্তু পারেনি। সেই ভেবে লজ্জা করল নিজেরই। নতমুখেই বলল, চলুন।

রাস্তায় আসতে আসতেই রবি বলল, তোমাকে চিনতেই পারিনি। আশ্চর্য!

তোমাকে তোমার বড়দি বলে ভুল করে ফেলেছিলুম। তুমি যে এর মধ্যেই অনেক বড় হয়ে গেছ। আর হুবহু সুজাতা।

রবিদার গলার এই অন্তরঙ্গ স্বর যেন অনেক গ্লানি, দুঃখ, অভিমানকে ভাসিয়ে দিল। আর কী আশ্চর্য খুশি খুশি ভাব রবিদার। না তাকিয়েও বুঝতে পারছে, সেই বুদ্ধিদীপ্ত বিষণ্ণ চোখ দু'টি কেমন চক্‌চক্‌ করছে হাসিতে, তবু হতাশা ও অভিমানের রেশটুকু কাটিয়ে উঠে কথা বলতে পারছে না এখনো।

রবিই বলল, খুঁজে না পেয়ে খুব রাগ হয়েছিল বুঝি?

সুমিতা মাথা নেড়ে জানাল, না।

—তবে? কথা বলছ না যে?

লজ্জা কাটিয়ে বলল সুমিতা, ভয় হয়েছিল, পাব না আপনাকে।

রবি হেসে উঠল। কিন্তু সুমিতাই মুখ ভার করল আবার অভিমানে। বলল, আর কেনই-বা আপনার সঙ্গে কথা বলব? আপনি তো ছেড়ে দিয়েছেন আমাদের সংস্রব।

রবির খুশি মুখে একটু বিষাদ উঠল চম্‌কে। বলল, না না, সংস্রব ছাড়ব কেন?

সুমিতা দাঁড়িয়ে পড়ে তাকাল রবিদার মুখের দিকে। বলল, না? অমনি একটা যা তা বলে উড়িয়ে দিতে চাইছেন?

কিন্তু বলতে বলতে ওর মনটা চমকে উঠল বিস্মিত ব্যথায়। রবিদার সেই ভরাট মুখখানি অনেকখানি কৃশ হয়ে গেছে। এখানে ওখানে পড়েছে কয়েকটি রেখা। ওর সেই বিষণ্ণতার মধ্যে একটি সুদূর অবসন্নতার আভাস। বলল, উড়িয়ে দিচ্ছিনে। তা বলে রাস্তায় দাঁড়িও না। চল এগোই।

তারপর রবি বারকয়েক সুমিতার আপাদমস্তক দেখে বলল, তোমাকে এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন? কখন বেরিয়েছ?

—অনেক সকালে।

—সে কি, কিছু খেয়ে বেরোওনি ? এত বেলা হয়েছে—

সুমিতার ঠোঁট আবার একটু ফুলল। বলল, কী করে তা বেরুব। তা হলে কি আর আপনার দেখা পেতুম।

একেবারে ছোট রুমনির মতই বলল সুমিতা, চলুন কোথাও, আমার বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।

বলতে হল না, উদ্‌ব্যস্ত হয়ে উঠল রবি নিজেই। ছি ছি, একেবারে পাগল। কিন্তু পরে পরেই বিদ্যুতের কষাঘাতে চমকে উঠল রবির মন। সুজাতা ঠিক এমনিই ছিল যেন। এমনি খামখেয়ালী, কিন্তু পরিষ্কার কথাবার্তা।

ওয়াই এম সি এ-র রেস্তোরাঁয় পর্দা ঢাকা কেবিনে গিয়ে বসল দু'জনে। সুমিতা বলল, মেজদির বিয়েতে না যাওয়া স্থির করেছেন বোধ হয় ?

—কে বলল তোমাকে ? নিমন্ত্রণ পত্র পেয়েছি, কাকাবাবুও বাড়িতে গেছলেন শুনেছি. যাব না মানে ? মৃণালও নিমন্ত্রণ করে এসেছে। তুমি বুঝি অতবড় ছোটলোক ভেবেছ আমাকে !

—শুধুই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে, না ?

বলতে বলতে বড় বড় ফোঁটায় জল জমে উঠল সুমিতার চোখে। যে কান্নাটা রুদ্ধ হয়েছিল, কেবিনের এই আড়ালে, তাকে আর সামলাতে পারল না। এর মধ্যে ওর সব সুখ দুঃখই ছিল। ওর যত গ্লানি মনের, এমন কি রবিদাকে পাওয়া, ওর ক্লিষ্ট চেহারায় বেদনাটুকুও।

রবি কিছু বলবার আগেই আবার বলে উঠল সুমিতা, রবিদা আপনি আমাদের সবাইকে ভুলে গেছেন।

ব্যথিত গম্ভীর মুখে রবি সুমিতাকে সান্ত্বনা দিল মাথায় হাত রেখে। বলল, শোন ভাই রুমনো, কেঁদো না। নিজের সুখ কিংবা দুঃখের জন্যে যাইনি, এমন স্বার্থপর আমাকে মনে করো না। আমাকে নিয়ে যদি কারুর অশান্তি হয়, কেউ অপমান বোধ করে, সেখানে যাই কেমন করে এ মুখ নিয়ে। তুমি সত্যি বড় হয়েছ রুমনো, বুঝতে পার তো তুমি।

সুমিতা বলল, সে তো সত্যি নয় রবিদা।

রবি ব্যথিত মুখে দৃঢ় হেসে বলল, সত্যি রুমনো।

সুমিতার এই কান্নার মাঝেও লজ্জা করছিল। তবু বলল, না, তা' নয় ! রবিদা—

—বল।

—আমার বড় কষ্ট হয় আপনার আর বড়দির কথা ভেবে।

বিদ্যুৎ চমক ছাড়িয়ে গুরুগুরু ডাক দিল রবির বুকে। কঠিন পাথর ফেলে বুকের যে জলপ্রপাতটাকে সে রেখেছে বন্ধ করে, রুমনি ধাক্কা দিয়েছে সেই পাথরে। কেঁপে উঠল বুকের মধ্যে। ফ্যাকাশে মুখে বিস্মিত ভয়ে হেসে বলল, ও কিছু নয়—

কিন্তু সেদিকে কান দিল না সুমিতা। বলল, রবিদা, বড়দি আপনাকে ভালবাসে।

জলপ্রবাহের তীব্র গর্জনে পাথরটা যেন পিছলে পড়ার উদ্যোগ করল। প্রচণ্ড শক্তিতে নিজেকে শক্ত করে বলল রবি, রুমনো, লক্ষ্মী ভাই, ওসব কথা থাক্।

রবিদার মুখের দিকে তাকিয়ে নীরব রইল সুমিতা। জল মুছল চোখের। দু'জনেই চুপ করে রইল অনেকক্ষণ। 'বয়' এসে দিয়ে গেল খাবার সাজিয়ে।

তখন আর খেতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু দু'জনেই খুঁটে খুঁটে একটু একটু খাবার মুখে পুরতে লাগল। আবার চুপচাপ। কিন্তু চুপ করে নেই ভিতরটা। এতই উচ্ছ্বাস, উপ্‌চে পড়তে চাইছে। নীরব থাকতে পারল না সুমিতা। বলল, কেন এমন হয়, কিছুই বুঝিনে রবিদা।

রবি ততক্ষণে অনেকখানি ধাতস্থ হয়ে এসেছে। সুমিতার এই অসহায় ব্যথিত প্রশ্ন শুনে সেও কথা না বলে পারল না। বলল, মানুষের মনটা-ই অমনি রুমনো। যেখানে থেকে যেমন তার মনের গড়ন তৈরী হয়েছে, সেখানে অতৃপ্তির বীজটা কোন্ এক অশুভ মুহূর্তে যেন ছড়ানো হয়ে যায়। বাড়লে পরে দেখা যায়, চাওয়ার সঙ্গে পাওয়ার কোন মিল নেই।

সুমিতা রবির মুখের দিকে অনুসন্ধিৎসু চোখ মেলে রেখেই বলল, রবিদা, সবাই যা বলে, এসব কি শুধু গরীব-বড়লোকেরই ব্যাপার?

—সেটা অনেকখানি। কিন্তু সবটুকু নয় বোধ হয়। সবটুকু হলে কেমন যেন উপন্যাসের কপচানি হয়ে যায়। সেটা জীবন নয়। অমিল? সে তো বড়লোকের ঘরেও দেখা যায়।

দু'জনেই চোখোচোখি করে এক মুহূর্ত দৃষ্টি ফিরিয়ে চুপ করে রইল। যেন এই কথার অন্তরালে ঢাকা আছে একটি ছবি। আবার বলল রবি, রুমনো, কথায় বলে, মন গুণে ধন, দেয় কোন্ জন। তার মধ্যেও কথা আছে। চাওয়ার সঙ্গে পাওয়ার সাহসটা থাকা দরকার। ভয় মানুষের সব চেয়ে বড়

শত্রু। জীবনের সব জায়গায় আমরা আজ পঙ্গু হয়ে আছি এই ভয়ের মারেই। আমাদের মন জুড়ে যত লীলা, সব তারই।

—কিসের ভয় রবিদা?

—জীবনধারণের ভয়। ভয় জীবনে জীবন যোগ করার।

—তবে তো সেই একই কথা হল?

—না তো। আর্থিক সমস্যা যেদিন থাকবে না, সেদিন কোথায় থাকবে সমাজের প্রশ্ন। রুমনো, অর্থের কথা ছাড়ো। তুমি যদি ভালবাস সেই মানুষকে, যে সমুদ্রের মাঝি, পাড়ি দেবে ভয়াল অজানা লোকের সন্ধানে, তা' হলে সেই সাহসে সাহস যোগ করতে হবে। খাওয়া পরার বাহ্যিক সুখটুকু না হয় রইল তোমার ষোল আনা, কিন্তু সমুদ্রের সাহস? এ যে কর্ম আর আদর্শের সঙ্গে যোগাযোগ। মন বল, ভালবাসা বল, সেগুলো ওসব ছেড়ে নয়। আমি একেই বলি জীবনধারণের ভয়।

—রবিদা, আমাকেও কি তার সঙ্গে যেতে হবে সমুদ্রে?

—সমুদ্রের বেলায় সশরীরে না-ই বা গেলে, মনে মনে তো যাবেই। যার তুমি প্রেয়সী, সে সমুদ্রের মানুষ। নিয়ত সংশয় যার প্রাণে, সে তোমার প্রাণের ধন, তোমারো প্রাণে সেখানে নিয়ত সংশয় যে! এ সংশয়ের মুখে পা দিয়ে চলা বড় কঠিন। আমি হয় তো তোমাকে বোঝাতে পারলুম না ভাই রুমনো।

সুমিতা ওর দু' চোখের দৃষ্টি নিয়ে যেন হারিয়ে গেছে কোন্ সুদূরে। বলল, বুঝেছি রবিদা, বুঝেছি। সে যে বড় কঠিন।

রবি তার বিষণ্ণ চোখ দু'টিতে স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়ে বলল, কঠিন বৈ কি ভাই। দু'জনের ভালবাসা। একজন জগৎসংসার মিলিয়ে ভালবাসে, আর একজন শুধু মানুষটির সবটুকু মিলিয়েই ভালবাসে। ভালবাসা বটে, কিন্তু এক্ষেত্রে একজনকে পালাতেই হয়। মনে মনে পালায়, পালিয়ে ফেরে একই ঘরে, এক বিছানায়। তবু বলি, অর্থের সমস্যাটাই আজ আমাদের সমাজের সব চেয়ে বড় পাপ। আমাদের ব্যক্তিজীবনের কষ্টিপাথরটা অনেকখানি আড়াল করে রেখেছে ওই পাপ।

সুমিতা তবু বড়দির কথাটি তুলতে পারল না। বলল, রবিদা, যদি রাগ না করেন, তবে একটা কথা বলি।

—বল।

—বড়দির এ জীবনটা তবে কী হবে?

—মনের দিক থেকে হয় তো কোন গণ্ডগোল আছে। হঠাৎ হেসে বলল, কিন্তু একটি সংবাদ তোমাকে দিতে পারি। গিরীনের সঙ্গে তার প্রায়ই দেখা হয়। মনে হয়, খুব শীগ্‌গিরই হয় তো কোনো বোঝাপড়া হয়ে যাবে ওদের মধ্যে।

বিস্ময়ে চমকে উঠল সুমিতা। সহসা ওরই মুখটি যেন পুড়ে কালো হয়ে গেল। তবে কী দেখল ও কাল রাত্রে। কেমন করে মনে হয়েছিল এত কথা বড়দির সম্পর্কে। রবিদার ওই দীপ্ত হাসিটা যেন দু' চোখে চেয়ে দেখতে পারছে না সুমিতা।

রবিই তাড়াতাড়ি বলল, মুখ ফেরাচ্ছ কেন রুমনো। এতে লজ্জার কিছু নেই, চমকাবারও কিছু নেই। এইটুকুই তো আমরা সবাই চেয়েছি।

সুমিতা তাকাল রবিদার দিকে। এই প্রথম ওর নজরে পড়ল, রবিদার কপালের রগের কাছে, কানের পাশে কয়েকটি চুল সাদা হয়ে গেছে। কিন্তু চুল পাকার বয়স তো ওঁর হয়নি।

রবি বলল, আর নয়, এবার চটপট খাও।

খাওয়ায় মনোযোগ দিয়ে একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল সুমিতা। বারোটা বেজে গেছে। বলল, এ কি, আপনাকে কলেজে যেতে হবে না?

—না, আমার ক্লাস আছে দু'টোয়।

—তবে এত সকাল সকাল বেরিয়েছিলেন যে?

—ছাত্রসংঘের অফিসে একবার যেতে হয়েছিল। তুমি তো শুনেছ রাজেনের ব্যাপারটা। রাজেনও সকালবেলাই আমার ওখানে হাজির। অবশ্যি, অন্যায়টা অজয়েরই, অপরাধ অতি জঘন্য। কিন্তু মুশকিল হয়েছে রাজেনের মত ছেলেদের নিয়ে।

জিজ্ঞেস করতে চায়নি, তবু আপনি মুখ ফুটে গেল সুমিতার, কী মুশকিল?

সুমিতার বিস্মিত উদ্বেগ দেখে মনে মনে অবাক হলেও, স্নেহের হাসি হেসে বলল রবি, ওই যে, যে ভয় নিয়ে আমার অত বক্তৃতা, সেই ভয়টুকু নেই ওসব ছেলের। আগুন লাগতে দেখলে আর দমকলের মুখ চেয়ে থাকতে রাজী নয়। অমনি ঝাঁপ দিয়ে পড়বে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে ওরা

নিয়মকানুনগুলির কথা যায় ভুলে। তাতে অনেকসময় গুরুতর বিপদ যায় ঘটে।

সুমিতা উৎকণ্ঠা চাপতে না পেরে বলল, আবার কিসের বিপদ?

রবি বলল, না, আর কোনো বিপদ ঘটেনি। বিষয়টা মিটে গেছে। কিন্তু এদের বিপদ তো পদে পদে। আরো সহ্যশক্তি না থাকলে কখন যে প্রাণটিও যাবে। নিজের প্রাণের ভয় ওদের নেই ঠিক, কিন্তু নিজেকে বাঁচিয়ে রাখাটাও ছোট কথা নয়। তার জন্য শান্ত হওয়া দরকার।

—আচ্ছা রবিদা—

বলতে গিয়েও থেমে গেল সুমিতা। রবি বলল, কী বলছ?

লজ্জা ও সঙ্কোচে কণ্ঠরোধ হচ্ছে বারে বারে। তবু বলল, মেজদির প্রতি রাজেনদার……মানে……অনেকে বলে, সেজন্যেই রাজেনদা ছাত্র ফ্রণ্ট ছেড়ে……

একি, এত ধক্‌ধক্‌ করছে কেন সুমিতার বুকের মধ্যে। ওর কিসের ভয় এত।

রবি যেন চাপা স্বরে প্রায় ভর্ৎসনা করে উঠল, ছি, ওসব কথায় একদম কান দিও না রুমনো। এই তো আজ সকালেই এ সব বিষয়ে আমার সঙ্গে কথা হয়েছে। এর আগেও অনেকবার হয়েছে। সেদিকে আমিই সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলুম। জিজ্ঞেসও করেছিলুম, রাজেনকে। বললে, 'রবিদা বিশ্বাস করবেন কি না জানিনে; প্রেম কাকে বলে, সবটুকু বোধ হয় বুঝিনে, আর ঠিক সেইভাবেই ব্যাপারটা বাড়েইনি আমার দিকে। বছরখানেক আগে মনটা কেবলি উস্‌খুস্‌ করত সুগতার কথা ভেবে। ওকে দেখলে খুশি হয়ে উঠতুম। চারদিকে কিছু কানাঘুষা শুনে, নিজেও প্রায় বিশ্বাস করেছিলুম, সুগতাকে আমি ভালবাসি। ভাল তো বাসিই। ওর চিঠিগুলি পড়ে অবশ্য আমার সংশয় হত, কেন জানিনে আমার একটু একটু হাসি পেত, কষ্টও হত। সেসব আমার কেটে গেছে অনেকদিন, তা' নিয়ে আমার আফসোস নেই। সেটা সম্ভবও নয়।'

রবি হেসে উঠল, আর এমন ছেলে, কোন চাপাচাপির ধার ধারে না। বলল, 'রবিদা, সুগতা মৃণালকে বিয়ে করবে, এটা বুঝে হঠাৎ আমার কষ্ট হয়েছিল কিন্তু। এখন ভাবি, সেটা যে কী অস্বাভাবিক কাণ্ড হত একটা।'

সুমিতা বলল, মনে কি একটুও লাগেনি বলছেন ?

—কি রকম লেগেছে, সেটা তো তোমাকে বললুম। রাজেনের গভীরে সেটা শিকড় গাড়তে পারেনি।

কিন্তু সুমিতার চোখে মুখে কোথায় একটু রং বদলেছে। হয়তো গরম চা'য়ে চুমুক দিয়েই ওর নাকের ডগা, ঠোঁটের ওপর-তটে দেখা দিয়েছে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

রবি বলল, আর একটি কথা বলেছে রাজেন, তোমার কথা।

হাসতে গেল সুমিতা, কিন্তু চায়ের কাপটাই শুধু বেঁচে গেল পড়তে পড়তে। বলল, আমার কথা ?

—হ্যাঁ। বললে ! সুগতার ছোট বোন সুমিতা বোধ হয় ভেবেছে আমার মত গোঁয়ার মানুষ খুনও করতে পারে। সেজন্যে, আমার দিকে তাকিয়ে দেখে ওর আর বিস্ময়ের সীমা নেই। মেয়েটি বড় ভাল রবিদা।

এতক্ষণে যেন মনে হল সুমিতার, বড় এলোমেলো হয়ে আছে ওর সবকিছু। আঁচল গুছোল, বিনুনি ঠিক করল। তারপর মূঢ়ের মত একটু হেসে বলল, ও !

কিন্তু ভিতরে ভিতরে কোথায় একটি বিশাল পাথর হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ছে ওর।

হঠাৎ রবিদা সুমিতার কাঁধে একটি হাত রেখে সস্নেহে বললেন, ঝুমনো, আজ এত কথা তুমি বললে, তাই তোমাকেও একটি কথা বলি। তোমার প্রাণেও দাগ লেগেছে ভাই। নয় কি ?

হাসতে গিয়েও কেমন যেন গম্ভীর হয়ে উঠল সুমিতা। বলল, বুঝতে পারিনি রবিদা।

—আমি শুনেছি আশীষের কথা। লজ্জার তো কিছু নেই।

বলেই যেন লজ্জা দিলে রবিদা। কিন্তু তীব্র হয়ে উঠল আবার বুকের মাঝে সেই প্রলয়টা। কী একটা বলবার জন্য মুখ তুলতে গিয়ে, লাল হয়ে উঠল সুমিতা। সেই মুহূর্তেই ওর বুক ঠেলে আবার একটা ঢেউ আবর্তিত হতে লাগল গলার কাছে।

রবিদা বলল, ভালই তো। তোমার মন চেয়েছে, আর কাকাবাবুরও আপত্তি থাকার কথা নয়। চাকরিজীবী হলেও বিত্তশালী এবং কালচার্ড পরিবার ওদের।

সুমিতাই বাধা দিয়ে বলে উঠল, কিন্তু আপনার যাওয়ার কথা তো কিছুই হল না রবিদা।

—যাব তো বললুম।

রবিদার হাত ধরে বলল সুমিতা, শুধু সে-যাওয়া নয়। বিয়ের বাড়িতে ভিড় থাকবে, তাই আগেই বলে যাই, মাঝে মাঝে আপনার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে বড় হাঁপিয়ে উঠি রবিদা। আপনি আসবেন তো মাঝে মাঝে?

বিষণ্ণ চোখ দু'টি তুলে এক মুহূর্ত নিশ্চুপ রইল রবি। বলল, অন্তত তোমার কথা শুনতে যাব মাঝে মাঝে।

বিয়ে হল রেজিস্ট্রী করে। প্রীতিভোজের আসর বসল রাত্রে। ঘরে বারান্দায়, আসবাবপত্র সরিয়ে চেয়ার টেবিল পাতা হয়েছে। ম্যারাপ বেঁধে বাগানে হয়েছে বসবার বন্দোবস্ত।

এসেছে সকলেই, বাদ যায়নি কেউ। প্রথম প্রথম সবাই কেমন যেন গুচ্ছ গুচ্ছ হয়েছিল এক এক জায়গায়। ছাত্রদল, বয়োজ্যেষ্ঠ রাজনীতিকেরা, বাবার চেনাশোনা অফিসার দল। মেয়েরাও ছড়িয়ে আছে ওই রকম থাকে থাকে। আশীষের বাড়ির সকলেই নিমন্ত্রিত। আশীষের বাবার সঙ্গে কয়েকবার মহীতোষকে কথা বলতে দেখেছে সুমিতা। চোখোচোখি হয়েছে আশীষের সঙ্গেও। দু'জনেরই নজরটা এক জায়গাতেই পড়ছিল বোধ হয় থেকে থেকে।

বাগবাজারের জ্যাঠাইমার সঙ্গে জমেছে মৃণালের বুড়ি দিদিমার। কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় শুনতে পেয়েছে সুমিতা দু' একটি কথার টুকরো।—হ্যাঁ, অদ্ভুত সব সাহেবী নিয়মকানুন হয়েছে আজকাল। কিন্তু কি করা যাবে, কিছু তো বলবার উপায় নেই।

—বটেই তো। নিজেদেরই ছেলেমেয়ে নাতিনাত্নী সব। ফেলবারও উপায় নেই।

আশীষের মা, তাপসীর মা, রবিদার বড়দি ওঁরা সব একখানে। ছাত্রদলের দিকে বেশী কলরোল। শুধু রাজেনকে সেখানে একলা মনে হচ্ছিল। কেউ প্রায় কথাই বলছে না তার সঙ্গে। তারপর দেখা গেল কখন সে সুজাতার সঙ্গে কথা শুরু করে দিয়েছে। কী দুর্বার শক্তি ওখানে টেনে নিয়ে গেল সুমিতাকে। বলল, ভোলেননি তা' হলে আসতে?

রাজেন বলল, যার বিয়ে তার তো মনে থাকে না। কিন্তু বাকী আর একজনকে ফাঁকি দেওয়াই মুশকিল।

দুর্জয় অভিমানে উপ্‌চে এসেছিল ঠোঁটের তটে একটি কথা, মিথ্যে কথা, শুধু মনে রাখা। কিন্তু বুকের মধ্যে একটি দুর্বোধ্য কোলাহল নিয়েই শুধু পালাতে হল ওকে।

আর মাঝে মাঝে আশীষ ওর ঢুলঢুলু চোখে ফিস্‌ফিস্‌ করছিল কানের কাছে, তোমার গিন্নীপনা দেখে, আমিই উঠছি পাগল হয়ে।

আবার এ বাড়িতে এরকম আর একটি দিন আমি কল্পনা করছি।

তারপরে, পরিবেশটা কী জঘন্য হয়ে উঠেছে। এক মুহূর্ত আর ভাল লাগছে না সুমিতার। কি করবে সুমিতা। এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপায় নেই।

আবার চোখ পড়ে রাজেনের দিকে। বিজলী আলো ওর প্রশস্ত কপালে পাথরের মত চক্‌চক্‌ করছে। আর আপন মনেই যেন হাসছে বিস্ময়কুঞ্চিত চোখে।

ওদিকে অমলা আর শুভেন্দু কাছাকাছি, আশেপাশে, সুজাতাও। রবিদা গেছেন ভিড়ে বয়োজ্যেষ্ঠ রাজনীতিকদের মধ্যে। সুগতা আর মৃণাল সকলের কাছে কাছে ঘুরছে। মহীতোষ বয়স্কদের আশেপাশেই বেশী।

হিরণ্ময় একবার বলে গেছে, ছাত্র ইউনিয়নের জরুরী মিটিংএ পরশু তোমাকে থাকতেই হবে।

শুধু দু'জন নেই। একজন গিরীন, আর একজন বিনয়। দু'জনের জন্যেই সুমিতার মনটা খচ্‌খচ্‌ করল অন্যমনস্কতার মধ্যেও।

তাপসী ওর ঠোঁটে চোখে নিয়ে বেড়াচ্ছে রং-এর চাবুক। ওরা সপরিবারে নিমন্ত্রিত। বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে তাপসীর। অনেকবার ঠোঁট বেঁকিয়ে, চোখ কুঁচকে নানারকম নিঃশব্দ ইঙ্গিত করছে সুমিতাকে। বলেছে, চোখে চোখে রাখছি তোকে, কোন ফাঁকে আবার তোর লাভারের সঙ্গে মীট্‌ করে আসিস্‌। সব টের পেয়েছি ম্যাডাম, পরে বোঝাবো।

কিন্তু ও নিজে যে কতজনের সঙ্গে চোখে মুখে 'মীট্‌' করছে, তাই দেখেই অবাক হচ্ছিল সুমিতা।

আর একজনের কথা মনে পড়ছিল সুমিতার—শিবানী আসেনি, শ্বশুরবাড়ি গেছে!

প্রেজেনটেশনে ভরে গেল টেবিল। খেতে বসার হুল্লোড়ে গুচ্ছ গেল ভেঙে। কে যে কোথায় বসল।

বিদায়ের সময়ে আরো এলোমেলো। আশীষ যাবার আগে, হাত চেপে ধরে সুমিতার কানে কানে বলে গেছে কাল আসব।

হিরণ্ময় গেল, রবিদা গেল, শুভেন্দু, অমলা, তাপসী, বিজলী···

—চলি, কেমন ?

চমকে ফিরে দেখল সুমিতা, রাজেন। সহজ হয়ে হেসে বলল, আচ্ছা। আবার আসবেন তো ?

—এখন অনেক দূরের মানুষ হয়ে গেছি কলকাতা থেকে। চেষ্টা করব।

উৎসব শেষে নিভল আলো। গভীর রাত্রে বড়দির ঘরে বড়দির পাশে শুয়ে, জ্যোতিষ্কের কেমন এক দুর্বোধ্য শূন্যতায় দু' চোখ চেয়ে রইল জেগে সুমিতা। সুজাতার নিশ্বাসও ঘুমন্ত নয়।

মৃণালের দিদিমা রয়েছেন। হিন্দু প্রথায় কিছু না হলেও তিনি আজকে বাসর হিসাবেই দেখছেন। আগামীকাল কালরাত্রি। পরশু তিনি তাঁর বাড়িতে ফুলশয্যা করবেন। মহীতোষ শুয়েছেন বাইরের ঘরে। জ্যাঠাইমার সঙ্গে মৃণালের দিদিমা শুয়েছেন ওর ঘরে।

পাঁচদিন পরে সুগতাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল মৃণাল। সারা ভারতটাই ওদের প্রোগ্রামে আছে। অবশ্য তার মধ্যে সুগতার আছে কিছু সারা ভারত ছাত্র সংঘের কাজ।

সব যেন কেমন নিঃঝুম হয়ে রইল কয়েকদিন। পৌষের তীব্র শীত পড়ল ঝাঁপিয়ে কলকাতায়। রস নিংড়ে নিংড়ে ফেলে ছড়াতে লাগল গাছে পাতা।

সুমিতাও যেন কেমন শীত-আক্রান্ত গাছের মত রইল কুঁকড়ে বাড়িতে, পড়ার বই খুলে রেখে সামনে।

(২৭)

এ জীবনে সব কিছু সুস্থির হয়ে বসে দেখা বড় কঠিন। দেখা মানেই অনুসন্ধান। মানুষ এমনি জীব, যখন তার নিজের জীবনে উত্তরজ অস্থিরতা

দেখা দেয়, তখন সে সুস্থির হয়ে সবকিছু দেখতে চায়। বুঝতে চায়, কোথায় কি ঘটেছে।

কিন্তু এ যুগ তার নিজের জালে জড়িয়ে বেঁধেছে গোটা সংসারটাকে। এখানে স্থির হয়ে সবকিছু দেখতে গেলে বাড়ে শুধু অস্থিরতার দৌরাত্ম্য। কেননা, সব কিছু দেখতে যাওয়ার বিড়ম্বনা অনেকখানি।

তবুও সুমিতা সবকিছু দেখতে চাইল। নিজের জীবনে এত জট-জটিলতা জড়িয়েছে পাকে পাকে, তার অন্ধিসন্ধি খুঁজতে গিয়ে, ওর চেনা-অচেনা সবাইকে কেমন যেন এক বিশেষ রূপে দেখতে পেল।

নমো নমো করে এ বছরের পড়া-পরীক্ষা সাঙ্গ করেছে।

মহীতোষ গান শুনতে চান। দুঃখ হয় সুমিতার, গান ওর তেমন জানা নেই। রেওয়াজ নেই বলে ভুল হয় প্রচুর। তখন মহীতোষ নিজেই ধরেন, 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে।'...সুরের ভুল হয় না, অতিরিক্ত আবেগে বিকৃত শোনায় সেই গান। বাইরের লোক শুনলে হাসত। লুকিয়ে হাসতে বাধা ছিল না সুমিতারও। হাসতে পারে না। এমন একটি সকরুণ আকুতি থাকে মহীতোষের গানে, মনে হয়, সত্যি কোথাও নিজের আবেদনকে পৌঁছে দিতে চান। কোন্ এককালে একটু-আধটু গান করেছেন। এখন সেটুকু নিয়ে নিয়মিত নাড়াচাড়া করেন। হঠাৎ কেন যে এ ইচ্ছে জাগল, বোঝা দায়। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, যখন উনি নিজে গিয়ে বসেন অর্গ্যানে। অর্গ্যানটার 'রীডে' গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। কোথায় ফুট ধরেছে বেলোটার ভিতরেও। জায়গায় জায়গায় হাঁফ ধরা নিঃশ্বাসের মত গলাফাটা শব্দ বেরোয়।

বলেন, এসো রুমনো, 'আলোকের এই ঝরনা ধারায়'...এক সঙ্গে গাই আমরা।

সুমিতার লজ্জা করে। কেন যেন টনটন করে বুকের মধ্যে। কেবল মনে মনে অবাক বিস্ময়ে দেখে চেয়ে চেয়ে।

আশীষ আসেই। প্রতিদিন হয় তো নয়, তবু প্রায় প্রতিদিনই। পড়াশুনা ছেড়েই দিল। শ' পাঁচেক টাকার একটি চাকরি পাচ্ছে। আশীষ বলে, এটাই ও অ্যাক্সেপ্ট করবে। টাকার নাকি ওর বড় দরকার। ঢুলুঢুলু চোখে হেসে যেটুকু বলে, মনে হয়, সুমিতাকে নিয়ে সে একটি আদর্শ নিকেতন

গড়ে তুলবে। সেই স্বর্গের ঠিকানাটা জানা যায় না। হয় তো আশীষ নিজেও জানে না। তবে ওর চারপাশের এই পরিবেশ ছাড়িয়ে নিশ্চয়ই। এই নীচতা, ভণ্ডামি ও ভাল্গারিটির কোন ছায়াই থাকবে না সেখানে। নতুন যে বইটি লিখতে শুরু করেছে, তার বিষয়বস্তুও সে বেছে নিয়েছে এই পরিবেশের মধ্যে।

সুমিতা ক্লান্তি বোধ করে। 'কেন', বলে বলে ও অবসন্ন হয়ে পড়েছে। এই ভয় প্রতিমুহূর্তে, আশীষের যন্ত্রণাটা যেন ধরা পড়ে যাচ্ছে ওর কাছে। এ যেন সেই রুগ্ন ছেলেটি, যে বিশ্বসংসারের সব ভুলেছে, নজর শুধু মায়ের হাতের কমলালেবুর কোয়াটির দিকে। আর কোন কিছুতেই যার মন নেই। কিছু না চা'ক, সুমিতাকে নিয়ে নিজের মনের মতন জীবন গড়বে, সেটা স্থির।

সুমিতা যতই নীরব হয়, করুণ চোখ দু'টি তুলে তাকিয়ে থাকে আশীষের দিকে, আশীস ততই তার জীবন-ব্যাখ্যা শুনিয়ে যায়। যত শোনায়, ততই ওর মুখে একটি তৃপ্তির ছবি ফুটে উঠতে থাকে। সুমিতা ভেবে পায় না, ওর মন কেন এত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

রবি আসে, যেমন কথা দিয়েছিল। তাকে দেখলেই আশীষ কোন অছিলা করে উঠে চলে যায়। তবু সুমিতার অবসন্ন চোখে হঠাৎ আলো চিক্‌চিক্ করে ওঠে। রবি আসে সুমিতার কথা শুনতে। কিন্তু কথা যা হয়, সবই অন্য কথা। কখনো কখনো সুমিতার।

সুজাতার কথা উঠলেই রবি কেমন পালাই পালাই করে। মহীতোষের সঙ্গেও তার দেখা সাক্ষাৎ কমই হয়। যে সময়ে সে আসে, সে সময়ে সুজাতা কিংবা মহীতোষ কেউ-ই বাড়ি থাকে না। কোন কোনদিন বেরিয়ে পড়ে রবিদার সঙ্গেই। শুধু একটি না-বলা কথা অদৃশ্য সেতু রচনা করেছে দু'জনের মধ্যে। গিরীনের সঙ্গে সুজাতার মিলন। রবি এ বিষয়ে বিশ্বাস রাখে। সুমিতার সংশয়।

কত কথাই বলে রবিদা। সংসারে কিসে সুখ, কিসে দুঃখ, কোথায় সেই জটিল ঘূর্ণি নিয়ত আবর্তিত হচ্ছে। রাজনীতি, সাহিত্য, কত কী! তবু কোথায় যেন রবিদা এক ভিন্ন মানুষ। সেখানে একটি ব্যথাতুর একলা মানুষ নিজেকে রেখেছে আড়াল করে।

কলেজে গেলে হিরণ্ময় আসে ঘন হয়ে। বলে অনেক কথা। কিন্তু সে শুধু একটি কথা। বাকী কথা শুধুই কথা। সেই একটি কথা বলবার সুযোগ

কখনো দেয় না সুস্মিতা। হিরণ্ময় তো জানে না, নিজের জীবনে কী এক দুর্বিসহ জটিলতায় জড়িয়ে পড়েছে সুস্মিতা। হিরণ্ময় বলে, সে ভাগ্যবিড়ম্বিত। ঘরে নিদারুণ অর্থাভাব, পড়তে চায় না। ছাত্র হিসেবে সে অবশ্য ভাল নয়, কিন্তু এখুনি পড়া ছাড়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। বাড়িতে টাকা চায়। সে দিতে পারে না। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি তার অখণ্ড ক্রোধ। সে যেন সব সময়েই আছে লড়ায়ের ময়দানে। নিজের জীবনকে সে উৎসর্গ করতে চায়। তবু সৈনিকেরও থাকে অন্তরে অনেক সাধ।

কেমন যেন, মুখস্থ বলার মত হিরণ্ময় কথা বলে। হয় তো, একদিনের দশ মিনিটের কথা বলতে দশদিন ভাবতে হয়েছে ওকে। কেমন যেন আবোল তাবোল, ফাঁকা ফাঁকা লাগে হিরণ্ময়ের কথা। বিনয় বয়সে ছোট ছিল, কিন্তু ফাঁকা কথা বলেনি কোনদিন। হিরণ্ময় যে দরিদ্র, সেটা নাকি ওর বড় গৌরব। বড় নাকি ভাগ্য ভাল তার, বড়লোকের ঘরে জন্মায়নি। সেইটি ওর জয়তিলক।

সুস্মিতা শোনে। তাকিয়ে দেখে, কোথায় সেই জয়তিলক। দেখতে পায় না। শুধু একটি কথাই বোঝে। বুঝে শুধু পালাতে হয় সুস্মিতাকে।

তাপসী আসে। বলে ওর ভাবী বরের কথা। বলে, জানিস্ সে কেমন মানুষ। তুলনাই হয় না তার। এই ধর, বাস থেকে সে যদি আমার আগে নেমে পড়ে ভুলক্রমে, তবে আবার উঠবে লাফ দিয়ে। কেন না, ওটা ঘোরতর অনিয়ম। আমাকে আগে নামিয়ে তবে যে ওকে নামতে হয়। বলে হাসে খিলখিল করে।

হয়তো এতখানি সত্যি নয়, কিন্তু মানুষটিকে বোঝা যায়। তবু তাপসী বলে, রাস্তায় ওর সঙ্গে হাঁটতে গিয়ে যদি একটু জোরে হেসে ফেলি, তাহলেই বেচারীর চোখ মুখ একেবারে লাল হয়ে যায়। কথা শুনতে হলে তো রক্ষেই নেই। একেবারে কানের কাছে মুখ নিয়ে যেতে হবে। মনে হয়, গলায় যেন গুঁজে কি রেখে দিয়েছে। কী ফর্মাল ভাই। এক ঘরে যখন থাকব, তখন কী হবে?

সুস্মিতা বলে, কী আবার হবে। তখন সবই ঠিক হয়ে যাবে।

বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলে তাপসী, এইটা। লোকটা সব বিষয়েই শেষ পর্যন্ত না অনুমতি প্রার্থনা করে বসে।

তাপসীর কথার ইঙ্গিতে লাল হয়ে ওঠে সুস্মিতা। তাপসী বলে, তখন

আমিও বলব, এক্স্‌কিউজ্‌ মিঃ স্যার। কিন্তু তুই অত লাল হচ্ছিস কেন। আমার জানতে তো কিছু বাকী নেই।

—কি জানিস্‌?

—তুই বুঝি ভেবেছিস, আশীষই সব জানে।

—তা নয়, তুই কী শুনেছিস্‌।

—শুনিনি, দেখেছি।

অবাক হয় স্থমিতা। তাপসীর চোখের দিকে তাকায়। সেখানে মিটমিট্‌ করে রহস্যের হাসি। বলে, তোদের আড়ালে গিয়ে কি আর আমাকে দেখতে হয়েছে! তোকেই তো দেখছি। চিবুক নেড়ে দিয়ে বললে, ভাইনি, কিছুই যেন জানিসনে। আসলে সবই যে লেখা রয়েছে তোর চোখে মুখে। সে কি সবাই ধরতে পারবে। দেখে তো মনে হবে, ভাজার মাছটিও উল্টে খেতে জানিস্‌নে। তা হলে ফাইন্যাল হয়ে গেছে দু'জনের মধ্যে? হাসতে গিয়েও কেমন যেন একটি চাপা উৎকণ্ঠা দেখা দেয় স্থমিতার চোখে। তাপসী বলে, কি ব্যাপার বল্‌তো। কোথায় যেন একটু দড়কচা মেরে আছে?

তা কি জানি, একটি সরল রেখা হঠাৎ কোথায় বাঁক নিয়েছে। কিন্তু সেকথা তাপসীর সামনে বলতে বড় কুণ্ঠা। ভয়ও লাগে। বলে, কই, কিছু নেই তো।

তাপসী বলে ঠোঁট টিপে, উঁহু, কোথায় একটা গণ্ডগোল যেন আছে মনে হচ্ছে। আশীষটা তো ডুবেছে, আর কাউকে জজিয়েছিস্‌ নাকি?

না না, ছি! কাউকেই তো জজায়নি স্থমিতা। যা কিছু, সবই যে ওর নিজের মন জুড়ে। ডোবানো, জজানো, যা কিছু, সব ওর নিজেকেই। বলে, কি যে বলিস্‌। নিজেই আছি জজিয়ে। আমি আবার কাকে কি করব।

—ছেলের অভাব তো নেই। যে আগুন নিয়ে বেড়াচ্ছিস তোর রূপে!

তারপরে বলে, আমার ওসব ঢাক ঢাক গুড়গুড় নেই। যার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হয়েছে, তাকে ছাড়া সবাইকে আমার ভাল লাগে, সত্যি! সে হাসবে মেপে, কথা বলবে মেপে, প্রেমও করবে মেপে, এ কেমন মানুষ বুঝিনে ভাই। শুনি, সমাজে নাকি সোনার টুকরো। ঘরে বাইরে কোথাও পান থেকে চুন খসবার উপায় নেই।

শুনতে শুনতে চমকে উঠে দেখে স্থমিতা, তাপসীর মত সর্বনাশী মেয়েও কাঁদে।

—কাঁদিস্ কেন, তাপসী ?

—ঘেন্নায় কাঁদি। সংসারে এত ছেলে থাকতে ওই সংএর পেরুটাকে আমাকে বিয়ে করতে হবে কেন বল দেখি।

কেন, কেন, কী সেই অমোঘ নিয়ম। কে সেই নিয়ন্তা। কত কথাই মনে আসে সুমিতার, কত কথাই বলতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কী এক ভয় এসে গলা বন্ধ করে দেয়। অথচ ওই ছেলের স্ত্রী হতে পারার জন্যেই হয় তো ওকে কত মেয়ের হিংসার পাত্রী হতে হয়েছে।

শিবানী শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে শুনে, বাগবাজারে দেখা করতে যায় সুমিতা। দেখে গর্ভবতী শিবানী। চোখের কোণে কালি। মুখখানি করুণ। হাত-পাগুলি রোগা। ক্লিষ্ট বিষণ্ণ মুখখানিতে বয়স বোঝা যায় না। কথাগুলি কেমন ভারি ভারি পাকা পাকা।

বলে, ছোট পিসি এসেছ। চল ছাদে যাই।

সেই ছাদে। যেদিন শিবানীকে বরের বাড়ির লোকরা দেখতে এসেছিল, এই ছাদে কথা বলেছিল দু'জনে। এর মধ্যেই শিবানীকে আর চেনাই যায় না। বলে, ছোট পিসি ইস, তোমাকে দেখতে কি সুন্দর হয়েছে।

রুগ্ন চোখ দু'টি ওর জলে দপ্‌দপ্‌ করে। চিন্‌চিন্ করে জ্বলে বোধহয় বুকের মধ্যেও। ওর স্বামীর চাকরি, ব্যস্ততা, সংসারের ঝক্কি, কত কী বলে।

এক সময় জিজ্ঞেস করে সুমিতা, তোমাকে খুব ভালবাসে, না ?

মুখ তুলে হ্যাঁ বলতে গিয়েও, অসহায় চোখ তুলে একটু সময় তাকিয়ে থাকে শিবানী দূরের আকাশে। বলে, আমি কি তার যোগ্য ছোট পিসি ?

—এ কথা কি বলে নাকি তোমার বর ?

—না, সে বলবে কেন। আমারই মনে হয়। সে কত কাজের মানুষ আমি যে অকাজের। স্তব্ধ শিবানীর চোখের কোলের গভীর গর্তে জমে জল।

সুমিতা ভাবে, এ কি শুধু ওরই চোখে পড়ে। এত হাসি, এত কথা, কাজ, খেলা, তার মাঝে এত বিড়ম্বনা, এত ব্যতিক্রম কি শুধু সুমিতার চোখে পড়ার জন্যেই। এই যে বড়দিনের এত উৎসব গেল, বছরের নতুনদিনে এত

স্ফূর্তি হল, বাতি জ্বলল, গান হল, রাজনীতির আসরে এত যে বিষম গণ্ডগোল অবনিবনা, মারধোর, পুলিস, জীবনের এতসবের মধ্যেও এ ব্যতিক্রমগুলির স্থান কোথায়। না কি, এ সংসারে সুমিতা একটা, শিবানী একটা, আশীষ রবিদা, হিরণ্ময়, তাপসী, সবাই একটা একটা। গোটা সংসারে ওরা কি কেউ নয়। যদি কেউ হয়, তবে এত উৎসব ও নিরুৎসবের মধ্যে মানুষের এত ব্যতিক্রমের সেই যাদুকরটি কে? এ কি শুধু সেই সাহস আর ভয়েরই লীলা।

বড়দি, সুজাতার কাছে সে প্রশ্ন আরো জটিল, ভয়ংকর, তীব্র।

জানুয়ারীর শীতার্ত রাত্রি পার্ক সার্কাসের ক্লাবে জ্বলছে তীব্র তাপে। গুম্ করতে করতে হঠাৎ ক্র্যাকারের মত ফাটছে মত্ত হাসিতে। দাবানল জ্বলছে রক্তে মাংসে।

কারদেজো থেকে বেরিয়ে আজ অমলাকে দেখতে পায়নি সুজাতা। অথচ আসার কথা ছিল। শুভেন্দু বেরোয়নি এখনো। মাঠ ভাল লাগে না, বেড়াতে ভাল লাগে না, পথে ঘুরতে শরীর বহে না। একটি অদৃশ্য হাতছানি শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেল ক্লাবে।

অমলা থাকলে তবু নিজেকে বাধা দিতে পারে সুজাতা। অমলাকে প্রতিবোধ করতে গিয়ে যুক্তি আসে মনে। যত একা, তত হতাশ মনে হয়, ততই নিরুপায় মনে হয় নিজেকে। এই প্রথম আরক্ত মুখে, 'বয়ের' কাছ থেকে পানীয় নিয়ে প্রাইভেট কেবিনে গিয়ে বসল একা একা। ক্লাবের এদিকটা নির্জন। তবু কনসার্ট শোনা যায়! নাচের উল্লাস আসে ভেসে। আর আসে উন্মত্ত কণ্ঠের ঝঙ্কার।

কে একটা মেয়ে কোথায় হাসছে খিল খিল করে। যেন কেউ কাতুকুতু দিয়েছে। কারা যেন কেবিনের পাশ দিয়ে চলে গেল আলিঙ্গনাবদ্ধ উন্মত্ত সশব্দ চুম্বনের আবেশে।

চমকে আড়ষ্ট হয়ে রইল সুজাতা। মনে হল, ওরই ঠোঁট দু'টি যেন দপ্ দপ্ করছে। চারদিকে তাকাল সুজাতা। কেবিন ঠিক নয়, প্রায় আলাদা একটি ঘর। স্লীপিং কোচ্, তীব্র আলো, নগ্ন শ্বেতাঙ্গিনীর ছবি। কিন্তু দরজাটি ভেজানো! থাক্, অমলা আসুক। আসবেই, হয়তো আটকে পড়েছে কোথাও।

তবু সারা শরীরের মধ্যে কী একটা অস্বস্তি ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগল। গলা থেকে ক্লোকের ফিতেটা দিল শিথিল করে।

কে যেন কোথায় শিস্ দিচ্ছে। কে যেন ছুটছে, কে যেন ছুটেছে তাকে ধরবার জন্য।

দরজায় শব্দ হল টক্‌টক্ করে। চেনা ঘর, নিশ্চয় অমলা। সুজাতা বলল; আয়।

বলেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠে দাঁড়াল সুজাতা।

—আসতে পারি?

তীব্র আলোয় চক্‌চক্ করছে গিরীনের সার্জের সুট! সেইজন্যেই কি অমলা আসেনি আজ। এই ক্লাবে ক'দিনই মুখোমুখি হয়েছে দু'জনের। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলেনি। শুধু অমলা বলেছে, 'গিরীনকে ডাকা যাক।' ওর সেই সর্বনাশা প্রয়াস। এমনি করেই নাকি ওদের মারতে হবে, স্ম্যাশ করতে হবে।

সুজাতা বলেছে, না, তাহলে আমাকে জন্মের শোধ পালাতে হবে।

কিন্তু এমন অভাবিত ব্যাপার কল্পনাও করেনি সুজাতা। আজ অমলা নেই, ঠিক আজকেই গিরীন উপস্থিত। টেবিলের উপর খাবারের প্লেট, শ্যাম্পেনের গেলাস। ক্রোধ ও ভয়, যুগপৎ ধেয়ে এল সুজাতার বুকে। তবু একবার তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল গিরীনের স্থির কিন্তু সংশয়-অপ্রতিভ চোখের দিকে। ক্লোকের গলার ফিতে চেপে ধরে কঠিন নীচু স্বরে জিজ্ঞেস করল, কি চাই?

আবেদনের ভঙ্গিতে বলল গিরীন, দু'টি কথা বলতে চাই, কয়েক মিনিট।

শুধু সংশয়, অপ্রতিভতা নয়, গিরীনের দু' চোখ তীব্র-পিপাসা-ক্লিষ্ট।

সুজাতা ওর অদৃশ্য ভয়টার মুখে থাবাড়ি মেরে, অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, কিন্তু আমার একদম ভাল লাগছে না কোন কথা বলতে।

ভয়-ভয় গাঢ় গলায় বলল গিরীন, সনির্বন্ধ অনুরোধ, কয়েকটা মিনিট স্পেয়ার করতে বলছি।

বলে, দীর্ঘ শরীর পিছন ফিরে ছিটকিনি বন্ধ করে দিল গিরীন।

(২৮)

ছিটকিনি বন্ধ করতেই একটা বিচিত্র ভয়ের শিহরণ সুজাতাকে যেন অবশ করে দিল। মনে হল, শত অনিচ্ছাতেও ওরই চোখের সামনে হাত-পা বেঁধে, দেহটাকে ছুঁড়ে দিয়েছে ফেলে কোন্ অন্ধ কোণে। চোখে মুখে যতই সেটাকে আড়াল করতে চাইছে, ততই সেটা ভিতরে ভিতরে আকুল হচ্ছে অন্তর্স্রোতের চোরাবানে।

গিরীন ফিরে দাঁড়াতেই বলল সুজাতা, কয়েকটা কথা বলতে কি দরজা বন্ধ করারও দরকার হয়।

অনুনয়ের সুরে বলল গিরীন, বাইরের লোকের সামনে তোমারই আপত্তির কথা ভেবে বন্ধ করলুম। মানুষকে অকারণ অনেক কিছু সন্দেহ করবার অবকাশ দিয়ে লাভ কী। সে শুধু গল্পই হবে, আর তো কিছু নয়।

মানুষ এখানে কে আছে, কে জানে। রাত্রের ক্লাবের মানুষ, নিজেরাই দিশেহারা। তারা কোথায় ঘুরবে অপরের পারিবারিক ছিদ্রান্বেষণে। তবু সে যে শুধুই গল্প হবে, তাতে যেন কোথায় একটু মুক্ত আক্ষেপের সুর বাজল গিরীনের গলায়। সে এসে বসল সুজাতার পাশের সোফায়। মাথা নীচু। বোতাম খোলা কোটের ফাঁক দিয়ে একটি অতিকায় রক্তজিহ্বার মত গাঢ় লাল টাইটা পড়েছে এলিয়ে টেবিলের ওপর। তার সর্বাঙ্গে, চোখে মুখে একটি অপরাধীর অস্বস্তি। হাসতে চাইছে, পারছে না যেন। আঙুল দিয়ে টেবিল ঠুকছে আস্তে আস্তে।

কিসের এত ভয় সুজাতার। কেন এত ঢিপ ঢিপ ওর বুকের মধ্যে। সবটাই অজানা। কী চায় গিরীন। আর কিছু নয়, কী বলতে এসেছে সে। কোন্ দিক দিয়ে, কি ভাবে, কী একটা আসবে আচমকা, সেই ভয় সুজাতার। ঠিক এমনি করেই একদিন এসেছিল গিরীন। এমনি অপ্রস্তুত, লজ্জিত। কিন্তু অপরাধীর ভাব ছিল না, একটি মুগ্ধহাসি, একটা প্রসন্ন আবেগ জড়িয়ে ছিল তার সর্বাঙ্গে। সেটা মিথ্যে ছিল না। কিন্তু গিরীন-চরিত্রের ওটা সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। আজকের এটুকও হয়তো মিথ্যে ছলনা, কিন্তু সব নয় নিঃসন্দেহে। আরেকজন আছে এর মধ্যে, যে আসল। যে অনেকখানি, বোধহয় সে-ই সবখানি।

যতই আড়ষ্ট কঠিন হয়ে উঠেছে সুজাতা, ততই বাড়ছে উত্তেজনা। আর যত উত্তেজনা, ততই সেটাকে চাপবার জন্য, ঢোকে ঢোকে নিঃশেষ করছে গেলাস। তাতেও একটা কঠিন লজ্জার মুখে পা দিয়ে, দুর্বিনীতা বিদ্রোহীনীর মত সতেজ থাকতে চাইছে। চুলে এই বাঁধন, কপালের ওপর ছড়ানো চূর্ণ কেশ। আরক্ত হয়েছে গাল, কানের দু'দিক পুড়ছে তীব্র দাহে। ক্লোকের বাঁধনটাই শুধু টিপে টিপে কযুনি দিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করছে।

ক্লাবের মত্ততা বাজছে অর্কেস্ট্রার তালে তালে। কে যেন কোথায় গান ধরেছে জড়ানো বেসুরো গলায়। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে হাততালির অসমান শব্দ।

গিরীন মুখ না তুলেই বলল, এখনো তোমার রাগ যায়নি বোধহয়?

রাগ? নিমেষের মধ্যে সুজাতা ওর সারাটা অন্তর হাতড়ে দেখল। কই, কোথায় রাগ। নিজেরই বিস্ময়ের সীমা নেই। এত ঝগড়া, বিবাদ, হাতাহাতি। কিন্তু রাগ! সে কোথায়? একটি অবোধ শূন্যতার পাশাপাশি শুধু অস্পষ্ট একটা ভয়!

বলল, এসব প্রশ্ন নিরর্থক।

গিরীন চোখ তুলে তাকাল সুজাতার দিকে। ভীরু ব্যাকুল দৃষ্টি সেই চোখে। বলল, একেবারেই নিরর্থক করে দিতে চাও? রাগ যদি শান্ত হয়ে থাকে, বিরাগ তো আছে নিশ্চয়ই?

তা-ও বা কোথায়। সেইটাই তো সবচেয়ে আশ্চর্য! যদি রাগ-বিদ্বেষ জমা থাকত মনে, তবে কেমন করে আসত সুজাতা এই ক্লাবে। গিরীনের জীবনের সব জেনেও কেমন করে নিশ্চিন্তে চলে যেতে পারত তার চোখের সামনে দিয়ে। একটু অপমানও তো বাজতো। তা-ও তো বাজেনি। শুধু চোখের সামনে বলেই একটু অস্বস্তি হয়েছে মনের মধ্যে। তাছাড়া আর কিছু তো নয়। এই লোকটি তার বিরাট প্রতিষ্ঠানের গুরুদায়িত্ব মাথায় নিয়ে ফিরছে। প্রতিষ্ঠান, কর্মচারী, অর্গানাইজেশন, সর্বোপরি ব্যবসায়ের বিরাট প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কঠোর নিয়মে চলেছে সমস্ত বাধা অতিক্রম করে। সেদিকটায় তার চূড়ান্ত জয়। বে-সরকারী হলেও প্রায় সরকারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বই তার প্রেসে। যশ, সুনাম, অভাব নেই কোন কিছুরই। সেখানে সে প্রতিভাধর।

বাইরের জীবনে নিয়ম-নীতি বিশ্বাস, সবটাই তার নিজের মত। মূল্য তার

কানাকড়িও হয়তো নেই। আছে শুধু একটা বিশ্বগ্রাসী তৃষ্ণা। সুজাতার কাছে এসেছিল সেই তৃষ্ণা নিয়েই। কাজের জীবনের প্রতিভা কোথায় একটা বিধ্বংসী আগুন রেখেছিল জ্বালিয়ে লোকটির প্রাণে। সুজাতার দীপ্ত রূপের কাছে সেইটাকে ছাড় করতে চেয়েছিল।

যে অপরাধের সূত্র ধরে চলে এসেছে সুজাতা, গিরীনের জীবনে সেটা অপরাধই নয়। আজ মনে হচ্ছে সুজাতার, হয়তো একটা বিতৃষ্ণা জেগেছিল ওর প্রাণে। কিন্তু রাগ-বিরাগ কোন কিছুই তো জমা নেই আজ। এত দ্বন্দ্ব, বিদ্রোহ, রোষা-ফোঁসা সেসব তবে কিসের জন্য দেখিয়ে বেড়িয়েছে সুজাতা। কই, এই মানুষটির স্বামিত্বে মন লালায়িত হয়ে আর একটি প্রতিদ্বন্দ্বিনীর কথা ভেবে ঘৃণায় ও অপমানে জ্বলে উঠছে না তো আজ। তবে, তবে?

মুখের কাঠিন্য অনেকখানি সরল হয়ে এসেছে সুজাতার। তার পরিবর্তে ওর সারা মুখ কেমন যেন রক্তাভ চক্চকে হয়ে উঠছে। ভয়টাও অনেকখানি এসেছে স্তিমিত হয়ে, কিন্তু বুকের কোন্ সুদূরে কন্ কন্ করছে। বলল, রাগ-বিরাগের কথা থাক। আর কোন কথা যদি থাকে, তবে তা-ই হোক।

গিরীন সুজাতার দিকে একটু ঝুঁকে বলল, রাগ-বিরাগের কথাই তো সর্বপ্রথমে আসে সুজাতা। তাকে বাদ দিয়ে অন্য কথা বলব কেমন করে।

নুয়ে-পড়া, ভাঙা-শির, বিষাদ-শান্ত গিরীন। কিন্তু সুজাতার দিকে তাকিয়ে তার চোখে একটি স্তিমিত দীপশিখা যেন উস্‌কে উঠছে আস্তে আস্তে।

সুজাতা বলল, আমার কথায় বিশ্বাস করার কোন কারণ আছে কি না জানিনে। তবু এইটুকু বলতে পারি, রাগ-বিরাগ ওসব কিছুই নেই আমার মনে।

গিরীন বলল, তবে টাকাটাও ফিরিয়ে দিলে কেন তুমি? হয়তো সেটা খুবই কম হয়েছিল। আমি সেটাকে বাড়িয়ে একেবারে এক হাজার করে দেব। তাতে তো তোমার আপত্তি নেই?

সুজাতা প্রায় চমকে উঠে কঠিন গলায় বলল, না, না, তার কোন দরকার নেই।

—কেন সুজাতা?

কেন যেন এই কথাটিই মনে হয়েছিল। ঠিক এই টাকার কথাটিই বলবে গিরীন। কিন্তু এই বোধহয় সবচেয়ে বড় বিচিত্র, গিরীনের ওপর ওর রাগ-বিরাগ কিছুই নেই বলে টাকাটা কোনদিনই পারবে না নিতে। বলল, আমার দরকার নেই।

—দরকার না থাকলে তুমি কারদেজোর শুভেন্দুর পাল্লায় কেন পড়েছ ?

—সেখানে আমি চাকরি করি।

—তা জানি। শুভেন্দুকে জানি বলেই এমনি করে বললুম। সেটা আমার বড় বাজে বলেই তোমাকে ছেড়ে দিতে অনুরোধ করছি।

—তা হয় না। কারুর মুখ চেয়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

—শুধু মুখ চেয়ে থাকা ? অধিকার-অনধিকারের কোন কথা নেই ?

না।

না ?

হঠাৎ চুপ করে গেল সুজাতা। কী করে জানাবে ও গিরীনকে, এখানে আজ সমস্ত অধিকার-অনধিকারের প্রশ্ন সত্যি হারিয়ে গেছে একেবারে। রাগ-বিরাগের মত সেটাও লয় হয়ে গেছে। অথচ সবাই জানে, ওই প্রশ্নগুলি নিয়েই সুজাতার জীবনে সবচেয়ে বড় বিপর্যয় ঘটে গেছে। এত বড় মিথ্যে হয়ে গেছে সেগুলি কেমন করে। কোনকালেই কি সেগুলি 'সত্যি' ছিল সুজাতার জীবনে। কী একটা উৎকণ্ঠা চেপে বসেছে মনের মধ্যে। আর এসব কথা বলতে পারছে না সুজাতা। বলল, এসব কথা থাক।

এসব কথা থাকবে, অথচ এই গিরীনই ওর স্বামী। স্বামী ওর পিছনে ফিরছে। ক্ষমা চাওয়ার চেয়েও আত্মদানের আরো বড় রূপ ধরে এসেছে। আর সুজাতার রাগ নেই, দ্বেষ নেই, তবু তাকেই ছেড়ে যেতে চায় ও। জীবনের এই এত বড় ভয়ংকর বিপর্যয়টা কেমন করে জানাবে লোককে। কেমন করে জানাবে, সবচেয়ে বড় ফাঁকিটা ও নিজেকেই দিয়ে বসে আছে। যেটাকে ও সমুদ্রের মোহনা বলে মনে করেছিল, সেটা আসলে অনেক নদীর মুখ। পথ ঘুরে সে ঘন অরণ্যের জালে জড়িয়ে, আর এক ধারায় একা একা বুক চেপে চেপে শুরু করেছে পুনর্যাত্রা। আরো কত ভয়ংকর দুর্গম পথ পার হয়ে পাবে সে সমুদ্র-সঙ্গম। তাই আজ তুচ্ছ হয়ে গেছে বাকী আর সবই।

অন্তর থেকে চাইতে ওর ভুল হয়নি, প্রাণ ধরে পেতে গিয়ে মেরেছে নিজেকে। এ-যুগে ওই চাওয়া-পাওয়ার হিসেবটাই সবচেয়ে বড় মান। তারই থাবায় পড়েছে সুজাতা। নিজেকে নিয়ে ন'কড়া-ছ'কড়া কেমন করে বোধ করবে ও। ওর সেই পাওয়ার ভুলের পথ ধরেই এসেছিল গিরীন। আজ তাই দায়-দাবি রাগ-দ্বেষ কিছুই আসে না যে। আর এমন করে কোনদিনই তো এসব কথা মনে হয়নি। চায়ওনি মনে করতে। শুধু বিপথের মারই খাচ্ছিল পড়ে পড়ে।

আবার বলল সুজাতা, এসব কথা থাক।

গিরীন বলল, কতদিন থাকবে সুজাতা।

চিরদিন। কিন্তু মুখ ফুটে সে কথা বলতে বাধলো সুজাতার। প্রশ্ন ক্রমে বাড়বে গিরীনের। বলল, সেকথা কেমন করে বলব ?

গিরীন সরে এসে বলল, অতীতটা কি কিছুই নয় সুজাতা।

কিছু হয়তো, তবু যেন কিছু নয়। দুকূল প্লাবিত অন্তরঙ্গ জীবনে সে যেন শুধু আজ বড় জাহাজের ঢেউ কেটে যাওয়া। সেই উত্তরঙ্গ নদী আজ আবার নিস্তরঙ্গ। আপন স্রোতে ও-পথে ধাবিত। গিরীনকে নিয়ে সেখানে আর কোন আবর্ত নেই। এই কথাটিই সুজাতা আর কারুর সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারবে না। বাবা নয়, গিরীন নয়, এ-সংসারে কাউকে নয়। ওর নির্বাক প্রাণে শুধু পাক দিয়ে উঠল তীব্র যন্ত্রণা।

গিরীন আবার বলল, জিজ্ঞেস করতেও ভয় হয় সুজাতা। কোনদিন কি আমাকে ভালবাসনি ?

সুজাতার বুকের মধ্যে কে যেন নিঃশব্দ তীক্ষ্ণ গলায় চীৎকার করে উঠল, না, না, না! এত বড় ভয়ংকর সত্য কথাটা চাপতে গিয়ে যেন চমকে উঠে দাঁড়াতে হল ওকে। ছলনা করতে চাইছে গিরীনের সামনে নীরব থেকে।

কি বলবে সুজাতা। বলবে, জল তো কখনো রঙ্গ-জাহাজের হালের টানে পথ ঘোরে না। টান তার সাগরে। না যদি পায় সেই পথ, ঘুরে মরবে একূলে ওকূলে। এই তো সেই মরণ। মরা ডোবায় হাজির হয়েছে সুজাতা। না পেরেছে ওদিকে যেতে, না এদিকে। অমলার মতও হতে পারল না। আর বিবাহিত স্বামী সামনে দাঁড়িয়ে করজোড়ে। কী বিচিত্র! একে তো কিছুই বলার নেই সুজাতার।

গিরীন আবার বলল চাপা থরো থরো গলায়, বল উমনো।

সুজাতা তাকাল গিরীনের চোখের দিকে। তার গলা যত বিনীত-বিষাদ-করুণ, চোখের কোলে ছায়া যত গাঢ় আর ছড়ানো, গভীর আঁকাবুকি, চোখের দীপশিখা তত জ্বলছে দপ্‌ দপ্‌ করে। সেখানে কোন রূঢ় বিদ্রোহের ছাপ নেই। ব্যাকুল চঞ্চল একটি পতঙ্গ পুড়ছে নিজেরই দু' চোখে। যেখানে ছাপ পড়েছে সুজাতার প্রতি অঙ্গের। মনে-মনে চমকে উঠল সুজাতা। একেবারে কিছুই মনে পড়ে না, তা নয়। গিরীনের সুদীর্ঘ দীপ্ত মূর্তিতে ছায়া ঘনিয়েছে বটে এক বছরের মধ্যেই। তবু এই চোখ মুখ চিনতে ভুল হয় না। হয় না, কারণ গিরীনের কোন মূল্য থাক বা না থাক, ও নিজে তো মেয়েমানুষ। এমনি মূর্তি নিয়েই হয়তো গিরীন ঘোরে দোরে দোরে। এমনি করেই তাকায় অমলার দিকে, আরো অনেকের দিকে। তারপর গভীর রাত্রে যখন একলা, তখন দু' চোখ জ্বলা বিরাট লেফ্‌টহ্যাণ্ড ফোর্ডটা নিয়ে ছোটে বাঘের মত। তাতে আজ কোন ঘৃণা-বিদ্বেষ নেই সুজাতার গিরীনের প্রতি। অমলার কথায়, হয়তো এমনি করেই মারতে হয় গিরীনদের। কিন্তু গিরীনকে কোন রকমেই যে মারার কিছু নেই সুজাতার। মার খাওয়ার পালা যে শুধু ওরই। আসলে অমলার কাছেও ও যে মিথ্যাবাদিনী। তাই শুধু একটি সর্বনাশের পথেই ঠেলে দিতে পেরেছে অমলা।

পরিষ্কার গলায় বলল সুজাতা, গিরীন! বৃথা আমাকে এসব জিজ্ঞেস করো না। ভালবাসার আমি কিছুই বুঝিনে, তাই আমার কোন জবাবও নেই।

বলে, সোফা থেকে ব্যাগ কুড়িয়ে নিতে গেল সুজাতা।

গিরীন একমুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর হঠাৎ হাত বড়িয়ে সুজাতার একটি হাত ধরল। চাপা গলায় ডাকল, সুজাতা।

লুব্ধ বুভুক্ষু আর্ত চোখ গিরীনের। বিনীত কিন্তু অসঙ্কোচ কামনায় যেন গলে যাচ্ছে। রক্তবর্ণ টাইটা যেন লক্‌লক্‌ করছে ক্ষুধিত জিভের মত। এক মুহূর্তের জন্য চলন্ত মেশিনের ব্রেক কষার মত থমকে গেল সুজাতার হৃৎপিণ্ড। পরমুহূর্তেই সেই প্রথম ভয়টা কলকল করে ছুটে এল রক্তের মধ্যে। গলায় স্পষ্ট স্বর পর্যন্তও নেই। হাত টেনে নিয়ে বলল, ছাড়ো গিরীন, আর আমি বসতে পারব না।

হাত ছাড়ল না। ব্যাকুল কম্পিত গলায় বলল গিরীন, আমি তো তোমার কাছে এসেছি নত হয়ে। রোজ আসি, ফিরে যাই। অধিকার না-ই থাক, দয়া কর।

চীৎকার করে উঠতে চাইল সুজাতা, কিন্তু স্বর নেই। সর্বাঙ্গ শক্ত করে, রুদ্ধশ্বাস হয়ে উঠল। দয়া করবার সব ক্ষমতা লুপ্ত হয়েছে এ জীবনে। দয়ার পাত্রী সুজাতা নিজে। জোর করতে গিয়ে ওর ক্লোকের বোতাম গেল খুলে। বন্ধ ছিটকিনিটার দিকে তাকিয়ে ও নিজেই নিজের যন্ত্রণায় ফিস্‌ফিস্ করে বলল, তোমাকে কেমন করে বোঝাব গিরীন, এ আর হয়না। তুমি আমাকে দয়া কর, দয়া কর।

ক্রুদ্ধ বিক্রম নেই, কিন্তু যেন নিশি-পাওয়া উন্মাদ গিরীন। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে তার উন্মত্ত সর্বগ্রাসী ঠোঁট লুটিয়ে দিল সুজাতার মুখের উপর। এ কি ভয়ংকর বিস্ময় ও বিদ্রূপ সুজাতার জীবনে। এই ওর বিবাহিত স্বামী। তবু যেন মনে হয়, কোন্ এক সম্পর্কহীন লোক অপমানে ও পীড়নে দলিত করছে। ভয়ার্তস্বরে মাথা বাঁচিয়ে বারবার বলতে লাগল, পায়ে পড়ি তোমার গিরীন, পায়ে পড়ি।

বাঁচতে না পারি, এমনি করে মরতে পারব না। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।

কিন্তু আশ্চর্য কৌশলে গিরীন হাত বাড়িয়ে সুইচটা দিল অফ করে। ঘোর অন্ধকারে, নিজেরই রক্তাবর্তে নিঃশেষে হারিয়ে গেল সুজাতা। কঠিন পাশ বন্ধ হয়ে, উজানবাহী রক্তধারা লুপ্ত করে দিল ওর দেহাশ্রিত মেয়েটাকেই।

তার পরের একটা ভয়াবহ শূন্যতা, দলা দলা অন্ধকার আর ঘুষঘুষে জ্বরের মত ক্ষয়িষ্ণু নিস্তেজ সবকিছু। অর্কেস্ট্রা বাজছে, হাসি, গান সবই হচ্ছে, তবু যেন সে কোন্ সুদূরে।

গিরীন ডাকল, সুজাতা।

জবাব নেই। অনেকবার ডেকেও জবাব না পেয়ে, সহসা শঙ্কিত গিরীন উঠে আলো জ্বালাতে গেল। সেই মুহূর্তেই মৃত আত্মার মত ক্ষীণ গলা শোনা গেল, চলে যাও গিরীন। '

—সুজাতা—

তেজোদৃপ্ত নয়, অনুনয়ও নয়। কেমন একটা বেসুরো শূন্য সরু গলা আবার শোনা গেল, কিছু বলোনা, চলে যাও।

কেমন একটা নিশি-ঘোর-দৈববাণীর মত শোনাল কথাটা। ছিটকিনি খুলে, কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে বেরিয়ে গেল গিরীন। তার পিছনে পিছনেই একটা অদৃশ্য দমকা বাতাস এসে যেন আবার বন্ধ করে দিল ছিটকিনিটা। তারপর প্রকাণ্ড কেবিনটার মাঝখানে প্রেতিনীর মত অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল সুজাতা! একটা ভয়ংকর অর্থহীন যন্ত্রণা ওকে পাগল করে তুলতে লাগল। চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে, ইচ্ছে করছে কাপড় ছিঁড়তে, সব কিছু ভেঙ্গে ফেলতে, লণ্ডভণ্ড করতে।

সোফার হাতল ধরে দাঁড়াল শক্ত হয়ে। না, কিছু করবে না সুজাতা। এমনি করে দাঁড়িয়ে থাকুক, যতক্ষণ পারে। অদ্ভুত। এমন ক্লাবের প্রাসাদেও মশা গুন্ গুন্ করছে। কোথায় ডাকছে একটা বেড়াল।

যেন সুজাতা সত্যি পাগল, দাঁড়িয়ে আছে পথের ধারে। আর এই গোটা যুগটা বিদ্রূপ-অট্টহাসে ওকে ঢিল ছুঁড়ে, বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চীৎকার করছে। এই ঠিক। ও না পেরেছে পুরোপুরি নিজেকে ফাঁকি দিতে, না পেরেছে পরকে। হৃদয় সঁপেছে ও প্রেমের দেবতাকে, আর রত্নহারের জন্ত ছুটে গিয়ে গলা বাড়িয়ে দিয়েছে ঐশ্বর্যের নিত্য সুখের দেবরাজকে। ভয়ে যখন ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়েছে ফিরে, তখন দেখছে নিজেকে উইলসনের নাইট ক্লাবে। দেখল, ওর সঙ্গে লড়বার জন্যে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে এই যুগটা। সে আজ গিরীনের বেশে একটা পুরুষ পাঠিয়েছে। কাল যদি পাঠায় আর একজনের বেশে। ও যে মেয়ে। রং, হাসি, দীপ্তির মাঝেও ওকে যে এমনি করেই মেরে দুর্বল করবে সে। হৃদয় নিয়ে আপোস না করে, লড়তে গিয়ে দেখছে, দু'য়ের মারে ওর সেই বিপাকে-পড়া মেয়েটিই মরো মরো।

কি করবে সুজাতা। সহসা বুক ঠেলে ওঠা অসহায় আর্ত চীৎকারটা চেপে ধরল সোফার কোলে। আর দু' চোখ ফেটে এই কঠিন অন্ধকারটাকে প্লাবিত করতে লাগল অশ্রুজল। বাবার কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে মায়ের সেই স্নেহস্নিগ্ধ মুখখানি। জীবিত কিংবা মৃত, তাদের কারুর কাছে আর ছোট উমনোটির মত ফিরে যেতে পারবে না।

যার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে, আবার খেলা করতে গিয়ে মরেছে সুজাতা, আজ এই মুহূর্তে শুধু তার কাছে যাওয়া যায়। কিন্তু সে যে কত বড় বাধা। আত্মাভিমান, অহঙ্কার, অপমানের বাধা নেই তার কাছে। কিন্তু রবি যদি তার এ যন্ত্রণা একটুও না বুঝে থাকে, তবে কেমন করে যাবে

সুজাতা। এত আদর্শ, এত রাজনীতির মধ্যে যন্ত্রণাটাও কি ছলনা বলে মনে হবে চিরদিন।

(২৯)

মিসেস্ উইলসনের নাইট ক্লাবের এক অন্ধ কোণে যখন এই ঘটনা ঘটছে, তখন ক্লাবের দোতলার বারান্দায় এক টেবিলে মুখোমুখি বসে আছে অমলা আর শুভেন্দু। মোটা পর্দা ঢাকা বারান্দাটাও পান-ভোজনে, আলাপ-গুঞ্জনে সরগরম।

শ্যামলী অমলার আরক্ত মুখ পেঁয়াজের খোসার মত রং ধরেছে। আরশোলার পাখার মত চকচক করছে চোখ। বোঝা যাচ্ছে, পানীয়ের হল্‌কায় তেতে উঠেছে সে। চোখের দৃষ্টি মাতাল বন্ধ নয়। শুভেন্দুকে ছাড়িয়ে যেন কী দেখছে তার সুদূর তীব্র চোখে। ঠোঁটের কোণে ড্যাগার-তীক্ষ্ণ-বাঁকটুকু যেন বহু ইতিহাস-দেখা স্ফিংক্‌সের হাসি। উদ্ধত বন্যতা নিশ্বাস ফুঁসছে তার সর্বাঙ্গে।

মুখোমুখি শুভেন্দু। ধবধবে ফর্সা রং এখন রক্তবর্ণ অঙ্গার। ছোটছোট চোখ দু'টিও টকটকে লাল। মত্ত, কিন্তু ক্ষিপ্ততা নেই সেখানে। আছে এক ব্যাকুল জিজ্ঞাসা। সেটাও পাশবিক কিন্তু পোষমানা। কামনার দীপশিখা দিয়ে সেটা অমলার আরতি নয়। শুধু বোবা অস্থির অনুসন্ধিৎসা। জানুয়ারীর রাত্রেও বিন্দু বিন্দু ঘাম তার কপালে। গোটা শরীরটা যেন ফেঁপে ফুলে ফেটে পড়তে চাইছে কোট প্যান্ট ছাড়িয়ে। দৃষ্টি তার এক নিমেষের জন্যেও অমলার চোখ থেকে নামল না।

জানে অমলা, শুভেন্দু তাকিয়ে আছে। জানে বলেই বোধহয় তার ঠোঁটের কোণ আরো সূক্ষ্ম বাঁক নিয়েছে। চিরদিন এমনি করেই তাকিয়ে থেকেছে, কারদেজোর চিরকুমার ম্যানেজার। অমলাকে পাওয়ার আগে এমনি করে তাকিয়ে থেকেছে সুধার দিকে। সুধার বেলায় মিস্ মিলারের দিকে। আর কারো দিকে নিশ্চয়—মিসেস্ মিলারের বেলায়।

আজ সুজাতার বেলায় তাকিয়েছে অমলার দিকে।

এটা অভিশাপ কিনা কে জানে, কিন্তু এইটি শুভেন্দুর জীবন। গোটা কারদেজো প্রতিষ্ঠানটা তার কাছে অশেষভাবে ঋণী, মানুষ হিসেবে কাউকে

সে এ জীবনে কাছে টানতে পারেনি। সে পেয়েছে অনেককে। ছেলে আর মেয়ে বন্ধু বান্ধবী। সবাই তাকে ছেড়েই গেছে, নয়তো ছাড়তে হয়েছে। টিঁকে থাকার জন্য কেউ আসেনি। সে দেখেছে, কি বিবাহিত আর অবিবাহিত জীবনে, একসঙ্গে টিঁকে থাকার জন্যে জোড় বাঁধে না কেউ এ সংসারে। তাই, ওদিকটাকে ছেড়ে এক আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে সে ঘুরে মরছে যৌবনে। যত ঘুরছে, পিপাসাটা বাড়ছে তত। সেইজন্যে লোকে তাকে ঠিকই জানে, অসচ্চরিত্র, লোভী এবং পাপী বলে।

চোখ না ফিরিয়েই অমলা বলল, শুধু শুধু ওরকম করে তাকিয়ে থেকো না শুভেন।

শুভেন্দুর মস্ত বড় লাল মুখখানি একবার আবর্তিত হল। প্রায় গালফোলা একটি ছেলেমানুষের মত বলল, কেন ?

অমলার ঠোঁটের কোণ আরো তীক্ষ্ণ হল। বলল কোন কারণ নেই, তাই। কিন্তু শুভেন্দুর চোখের জিজ্ঞাসা ঘুচল না তাতে। বলল, তুমি যে এত পরোপকারী আমি তা জানতুম না অমলা।

ভ্রূ কাঁপিয়ে বলল অমলা, পরোপকারী ?

কাঁপা মোটা গলা শোনা গেল শুভেন্দুর, তাই তো দেখছি। স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ মিটিয়ে দিচ্ছ তুমি।

নিঃশব্দ হাসিতে বিলোলিত হল অমলার সর্বাঙ্গ। মত্ততার ঘোরে রুমাল দিয়ে ঠোঁট মুছতে গিয়ে, লিপস্টিকের রং লেগে গেল কষে। কিন্তু কোন কথা বলল না।

শুভেন্দু তেমনি চোখে তাকিয়ে আবার বলল, শুধু আমাকে ঘুরিয়ে মারলে এতদিন।

অমলা বিলোল কটাক্ষ করে বলল, আমার জন্যে কি আর তুমি ঘুরে মর ? বলে, শুভেন্দুর নির্বাক রক্তাভ বোকা বোকা মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল খিল্‌খিল্ করে।—তোমাকে একটা হোঁৎকা টিক্‌টিকির মত দেখাচ্ছে শুভেন। প্লিজ, একটু হাসো। অন্যান্যদিন এতক্ষণে তোমার কতরকম ক্ষ্যাপামি শুরু হয়ে যায়। জানি, আমার জন্যে তুমি আমার কাছে বসে থাক না। শুধুই আর একজনের আশায়। সেদিক থেকে তোমাকে তো আমি নিশ্চিন্ত থাকতে বলছি।

এখনো ?

—এখনো।

—আজ, এই মুহূর্তেও ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আজ এই মুহূর্তেও।

অতিকায় গিরগিটির মত ঝুলে পড়ল শুভেন্দুর থুত্‌নির তলা। বারে বারে ঢোঁক গিলতে গিয়ে, গলার মাংস দলা পাকাতে লাগল। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল আবার নিঃশব্দে। তাকে টিক্‌টিকি বলার জন্যে একটুও বিকৃত হল না মুখ।

অমলার মনে কি হচ্ছে, কিছুই বোঝবার উপায় নেই। শুধু ঠোঁটের কোণে হাসিটুকু ছাড়া। তার সামান্য হাত পা চালানো দেখে বোঝা যাচ্ছে, ঈষৎ বেসামাল হয়ে পড়েছে। যেন এটা নাইট ক্লাব নয়। ধু-ধু বালুপ্রান্তরে দাঁড়িয়ে যুগ যুগ ধরে দেখছে জনপদের দিকে, এমনি সুদূর-তীব্র-শ্লেষ দৃষ্টি ও হাসি।

হঠাৎ বলল, শুভেন, তুমি আর এভাবে কতদিন চালাবে ?

শুভেন্দু চমকে উঠে বলল, কিভাবে ?

—এভাবে, পরস্ত্রীর পিছনে ঘুরে ?

হাতের রুমালটা দলতে দলতে, ছিঁড়ে ফেলার উপক্রম করল শুভেন্দু। বলল, যতদিন স্ত্রীরা এভাবে ফিরবে।

অমলা একটু অবাক হল শুভেন্দুর কথা শুনে। এরকম করে যে শুভেন্দু কথা বলতে পারে, ধারণাই ছিল না। হেসে বলল, স্বামীত্যাগিনীদের জন্যে তা হলে তুমিই আছ। কিন্তু এর চেয়ে একটা রেগুলার লাইফ কাটাওনা কেন ?

—এটা কি ইরেগুলার।

—এই রেগুলারিটির কথা বলছি না। তোমার স্বজন নেই, কাউকে পুষতেও হয় না। আঠারশো টাকা মাইনে পাও, কারদেজোর ম্যানেজার তুমি। একটি ভাল মেয়েকে বিয়ে করে······

বদ্ধ মাতালের মত শুভেন্দু টেবিলে মুখ চেপে হেসে উঠল। শিশু যেমন করে কেঁদে ওঠে মুখ লুকিয়ে। হাসির দমকে মনে হল, কোটের সেলাইগুলি খুলে যাবে পড়্‌পড়্‌ করে। একটু সামলে নিয়ে বলল, ঠাট্টা করছ অমলা।

—ঠাট্টা কেন ?

—নয় ?

বলে হাসতে গিয়ে হঠাৎ থেমে, অমলাকেই আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, এইরকম আর একজন মেয়ের নাম্বার তুমি বাড়াতে বলছ? কিংবা সুধার মত, মিসেস মিলায়ের মত, সুজাতার মত? অ্যাবসার্ড। আর যে করে করুক, আমার দ্বারা হবে না।

অমলা অবাক হয়ে বলল, সবগুলোকে এক করে দেখছ কেন শুভেন? তুমি অনাদি (অমলার স্বামী) নও, গিরীনও নও। সংসারের সব মেয়ে অমলা সুজাতাও নয়।

মত্ত ভঙ্গিতে ঘাড় দুলিয়ে উঠল শুভেন্দু, না, না। সব এক। আমি সব জায়গায় তাই দেখেছি। আমার বন্ধু বান্ধবী, কেউ বাকী নেই। তাই বিয়ের চেয়ে এত ঘৃণা আমি আর কোনকিছুকে করিনে। আই হেট্। রোদের বুকে বৃষ্টি হলে, লোকে বলে শেয়ালের বিয়ে হচ্ছে। এসব বিয়ের চেয়ে তাও ভাল, অনেক ভাল লাগে ভাবতে।

অমলার দু'চোখে চিক্‌চিক্ করে উঠল বিস্ময়। দেখল, শুভেন্দু ভয়ংকর উত্তেজিত। কোনদিন এত উত্তেজিত তাকে দেখেনি অমলা। কোনদিন এ প্রসঙ্গ ওঠেনি বলেই বোধহয়। আবার বলল, অকারণ আরেকটা ভাল মেয়ের জীবন নষ্ট আমি করব না এভাবে।

অমলা বলল, ভাল মেয়ে?

—হ্যাঁ। আমি জানি অমলা, তোমরা সবাই ভাল মেয়ে। তুমি, সুধা, সুজাতা, সবাই। তোমরা মেয়েরা সবাই বড় ভাল। ছেলেরাও ভাল। অনাদি, গিরীন, কেউ খারাপ নয়। শুধু এ যুগে বিয়ে করলেই সব খারাপ হয়ে যায়। আই হেট্। আর যা-ই বল, বিয়ের কথা আমাকে বলো না।

দপ্‌দপ্ করে জ্বলছে শুভেন্দুর মুখ। চোখেও একটা বোবা ভয়ংকরতা। একবার দাঁড়াল উঠে, আবার বসে পড়ল তখুনি। 'বয়' এল ছুটে ঊর্ধ্বশ্বাসে। ভেবেছে, তাকেই বুঝি দাঁড়িয়ে উঠে ডেকেছে সাহেব। ডাকেনি বটে, কিন্তু নিরাশ হতে হল না। আবার নতুন ড্রিঙ্কের অর্ডার দিল শুভেন্দু।

আজ অমলাকে নির্বাক করেছে সে। দেখছে, কী বিস্ময়কর ঘৃণা শুভেন্দুর। অমলার শক্ত বুকেও একটা তরঙ্গের দোলা দিয়েছে সে।

বলল, শুভেন, এ বিট্ এক্‌সাইটেড তুমি।

শুভেন্দু বলল, ন্‌না, না। আমি একেবারেই এক্‌সাইটেড নই, খুব নির্লিপ্ত আমি আমার জীবনে। আমি দেখছি, পৃথিবীটা এক্‌সাইটেড, এই এক্‌সাইটেড

পৃথিবীটা। গরীবদের কথা আমি কিছু জানিনে, বুঝিনেও। ওরা কেন বিয়ে করে, আমি জানিনে। তুমি আমি, আমরা কেন করি, তা জানি। আমরা কত হীন এবং শয়তান, শুধু সেটা দেখার জন্য। কার কথা বলব বল? কোন্ বন্ধুর কথা বলব? এই ক্লাবে যারা এসেছে, তাদের সংখ্যা কি কিছু কম আছে? কোন্ সাহসে বিয়ে করব আমি? এ যুগে আমাদের বিয়ে করতে নেই, কখনো নয়।

স্বীকৃতি অস্বীকৃতি, ঠিক কিছুই নেই অমলার। তবু এই সিনিক মাতালটার কথার মধ্যে কোথায় একটা কুৎসিত 'সত্য' গর্জন করছিল

গলা ভিজিয়ে বলল আবার শুভেন্দু, অমলা।

—বল।

—তুমি ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করেছিলে?

বিস্ময়ে চমকে উঠে বলল অমলা, হ্যাঁ, কেন?

—আই-এ তে তুমি প্রথম হয়েছিলে কলকাতায়, ম্যাট্রিকে ফার্স্ট হয়েছিলে মেদিনীপুর জেলায়। তুমি ভাল গান গাইতে পার। দুস্থ ছাত্রদের জন্য দল বেঁধে তুমি ভিক্ষে করে বেড়িয়েছ এককালে, জীবনে তুমি কারুর কোন ক্ষতি করোনি। কিন্তু তোমার কেন এমন হল।

অমলার বুকের মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ নিঃশব্দ আর্তনাদ উঠল। এসব কি বলছে মাতালটা। এটা মিসেস্ উইলসনের নাইট ক্লাব। আর এই রঙ্গচারিণী অমলা। স্বামীর ওপর শোধ তুলতে গিয়ে, এখন শুধু ওইটাই তার পরিচয়। এই লাল টকটকে গাল ফোলা বোকা বোকা কিংবা বীভৎস শুভেন্দু কেন তাকে এসব বলছে।

হাসবার চেষ্টা করে বলল অমলা, ওসব বক্তৃতা রাখ শুভেন।

—কেন রাখব। তুমি আমাকে বিয়ে করতে বললে কেন? এর চেয়ে ভাল মেয়ে আর কোথায় পাওয়া যায়, আমি জানিনে। অথচ তার আজ এই হাল।

বুকের মধ্যে ভিতরে ভিতরে একটা অন্তর্টিপুনি যেন পিষে মারছিল অমলাকে। সেটাকে আড়াল করে হেসে উঠল অমলা। ফুলে ফুলে, আঁচল লুটিয়ে, বুকের দোলনে জামাটাকে তটস্থ করে হেসে উঠল। বলল, তুমি মাতাল হয়ে গেছ শুভেন্দু।

গাল ফুলিয়ে বলল শুভেন্দু, আমি তাও পারি, তোমরা সেটাও পার না।

যেন হেসেই ধম্‌কে উঠল অমলা, কি বলছ তা হলে। বিয়ে করবে না তো, কি করবে সবাই?

—তা কি জানি। বিয়ে যেখানে শেয়ালের বিয়ের চেয়েও জঘন্য, সেখানে বিয়ে হতে পারবে না।

অমলা যেন ভয় পেয়েছে। সে চাপা দিতে চাইছে, শান্ত করতে চাইছে শুভেন্দুকে। বলল, বেশ, হবে না, মিটে গেল। এবার থাম।

কে থামবে। আজ লোকটার আর একটা অনাবিষ্কৃত দরজা গেছে খুলে। বলল, অনাদিটা কত মুখচোরা ছিল, মেয়ে দূরের কথা, ছেলেদের দিকে তাকিয়েই কথা বলতে পারত না। ও কেন এমন হল। ওর স্বজন আছে, সব আছে, অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীর সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, কিসের অভাব ওর।

অমলার সেই ঠোঁটের কোঁচ সহসা ঝরে পড়ে গেল। পেঁয়াজের খোসার চম্‌কানিটুকু ফ্যাকাশে দেখাল যেন। ডাকল, শুভেন!

শুভেন তখন তার 'টাই'-টাই চটকাচ্ছে। বলল, আমি জানি অমলা, অনাদি কলকাতা ছেড়ে পালাচ্ছে। জব্বলপুরে কিংবা বোম্বেতে ট্রান্সফার নিচ্ছে সে। আমি জানি তোমাকে সে ফেলে যাচ্ছে—

অমলার মনে হল, কে যেন তাকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে অনেক উঁচু থেকে। দেখছে, সে জানে, জীবনের খুব কাছের আলসেটার পরেই সুগভীর নীচুতে মৃত্যুর মত এক টুকরো শাণ চকচক করছে।

দাঁড়িয়ে উঠে, তীক্ষ্ণ চাপা গলায় বলল অমলা, শুভেন, আমি চলে যাচ্ছি।

ছেলেমানুষের মত দু' হাত বাড়িয়ে বলল শুভেন, না না, এখন যেও না।

—তবে তুমি চুপ কর।

—আচ্ছা, আচ্ছা।······

সোফায় এলিয়ে পড়ে, চোখ বুজে জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে লাগল অমলা। ওর বিস্রস্ত বেশবাস অনেকেই দেখছিল তাকিয়ে তাকিয়ে।

সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভীরু দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে উঠল শুভেন্দু। বলল, অমলা, কেন তুমি আমাকে বিয়েটিয়ের কথা বলছ? তুমি কি আমাকে নিরাশ করছ?

অমলার ঠোঁটের কোণে আবার একটু হাসির আভাস উদিত হল ধীরে ধীরে। বলল, না।

—কিন্তু অনেক আশা দিয়েও তুমি গিরীনকে মীট্ করিয়ে দিলে।

—সেটা তোমারই সুবিধের জন্যে।

শুভেন্দুর মুখের লাল মাংস দলা পাকিয়ে বোবা আর বোকার মত দেখাতে লাগল। চোখের কোলে লোভী অনুসন্ধিৎসা। বলল, কেমন করে?

এত কথা বলতে পার আর এটা বোঝ না?

চোখ না খুলেই বলে গেল অমলা, তুমি যা চাও, গিরীনও তাই চায়। সুজাতার কাছে তুমি আর গিরীন এখন একই। কোন তফাত নেই। কিন্তু ফার্স্ট ব্রেকটা গিরীনকে দিয়েই সহজ হবে। তারপর—

—তারপর?

অমলা তাকাল। দু'চোখ তার রক্তবর্ণ। দেখল, আশায় ও উল্লাসে ভয়ংকর দেখাচ্ছে শুভেন্দুকে।

অমলা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল শুভেন্দুকে।

অস্ফুট গলায় শুধু বলল শুভেন্দু, শী ইজ্ লাইক ফায়ার! ফায়ার! কবে অমলা?

—কাম এ্যাণ্ড ওয়েট।

অমলার গলাও ফিস্‌ফিস্ করছে। বোধহয় কথা বলতে পারছে না। স্বর নেই গলায়। আবার মাথা এলিয়ে, চোখ বুজে চুপ করে রইল।

বোধহয়, দু'জনেরই মনে পড়ছিল, প্রথম অমলাকে যেদিন নাইট ক্লাবে দেখেছিল শুভেন্দু, সেদিনও সুধার কানের কাছে এমনি করেই কথা বলেছিল সে। সেদিনের তফাত ছিল শুধু সুজাতা আর অমলার তফাত যতখানি।

কলেজে যাওয়া হল না সুমিতার। মহীতোষ বেরিয়ে গেছেন একটু সকাল সকাল। বছর শুরুর বেলায় কাজ কিছু বেড়েছে ওঁর।

সুমিতা চান করে খেতে বসেও দেখল, বড়দি বেরোয়নি তখনো ঘর থেকে। সকাল থেকেই বেরোয়নি। কাল রাত্রে খায়ওনি।

বিলাস বলল, বড়দিদিমণি অঘোরে ঘুমুচ্ছেন।

অঘোরে ঘুমুচ্ছে। সকাল থেকে এত বেলা অবধি! খেতে বসে স্বস্তি পেল না সুমিতা। অনেক সময় অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোয় বড়দি। কিন্তু এত বেলা তো কোনদিন হয় না। খাওয়া রেখে, বড়দির ঘরে গেল ও। মিথ্যে নয়। সুজাতা তখনো শুয়ে রয়েছে। চোখ বোজা, কিন্তু অঘোরে ঘুমন্ত বলে মনে হল না।

কাছে গিয়ে ডাকল সুমিতা, বড়দি।

এক ডাকেই, ফিরে তাকাল সুজাতা। তাকানো মাত্রই ভয়ে চমকে উঠল সুমিতা। যেন চোখ বুজে ছিল বলেই, চোখের কালিমা এমন গাঢ় হয়ে দেখা দেয়নি। চোখের চাউনি এমন তীব্র মনে হয়নি। সারা মুখে এমন রুগ্ন ক্লিন্নতার ছাপ দেখা যায়নি। চুল এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে আছে সারা বালিশে। রক্তাভ কম্বল জড়ানো গায়ে। সুমিতা উৎকণ্ঠিত গলায় বলল, কি হয়েছে বড়দি?

সুজাতা শান্তস্বরে বলল, কিছু হয়নি তো?

—তুমি বেরুবে না আজ?

—না।

—উঠবে না? অনেক বেলা হয়েছে। বাবা বেরিয়ে গেছেন।

কথায় কথায় সুমিতার খুঁটে খুঁটে দেখাটা বড় অপ্রস্তুত করছিল সুজাতাকে। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, উঠব। শরীরটা বড় ভার ভার লাগছে।

সুমিতা উপুড় হয়ে বড়দির কপালে হাত দিল। না, জ্বর নয়। কিন্তু কি যেন হয়েছে। বড়দির চোখ মুখের ভাব দেখে কেমন যেন ভয় করতে লাগল সুমিতার। জ্বর নয়, কিছু নয়, শুধু ভার। কিন্তু আর কিছু জিজ্ঞেস করাও চলে না। কেননা, আর কিছুর সঙ্গে বড়দির বাইরের জীবনটা শুধু ভয়ের। শুধু ভয় নয়, আরো কিছু।

সুজাতার কপাল থেকে হাত না সরিয়ে, নির্বাক সুমিতা তাকিয়ে রইল শুধু। তারপর বলল, তুমি কিছু খাওনি তো সকাল থেকে। কাল রাত্রেও খাওনি।

সুজাতা উঠে বসল। বলল, এবার স্নান করে খাব। আমি যাচ্ছি, তুই যা।

সুমিতা চলে যাচ্ছিল। সহসা ডাক শুনতে পেল, রুমনি!

ফিরে বলল, কিছু বলছ বড়দি?

সুজাতা মুখ নামিয়েই রেখেছিল। মুখ তুলতে গিয়ে হঠাৎ ওর গায়ের মধ্যে কাঁটা দিয়ে উঠল। ধক্‌ধক্ করতে লাগল বুকের মধ্যে। এ কি কথা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল সুজাতা। রবি আসবে কি না! কখন আসবে। ছি! তা কেমন করে হয়। তাড়াতাড়ি সহজ হওয়ার চেষ্টা করে বলল, না থাক্, আমি উঠছি।

বুকের মধ্যে কেমন একটা অসহজ আড়ষ্টতা নিয়ে বাইরের ঘরে এসে দাঁড়াল স্মিতা। এই অসহজ আড়ষ্টতাই আজ জীবনের পায়ে পায়ে। চারদিকে ঘেরাটোপ। নিজেকে নিয়েই দুর্বোধ্য সংশয়। নিজেকে নিয়েই ওর গভীর সন্দেহ, সহস্র প্রশ্ন প্রতি পদে পদে আটকাচ্ছে। নিজেকেই এত নিরর্থক বোধ হচ্ছে, আর সবকিছুই একটা মহাশূন্যের মত ঠেকছে। মনে করেছিল, বেরিয়ে পড়বে। পারল না। কোন কারণ নেই। কলেজের টানটাও যেন কেমন নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে।

এক সময়ে সুজাতাই এসে ডাকল ওকে। তুইও খাস্‌নি এখনো? চল্‌ খাবি। কলেজে গেলি নে?

—ভাল লাগল না।

সুজাতা তাকাল একবার। খাওয়ার পরে আবার ঘরে ঢুকল সুজাতা।

বাগানের রোদে পিঠ দিয়ে পড়ে রইল স্মিতা সারাটি দুপুর।

বেলা তিনটে নাগাদ ধড়ফড়িয়ে উঠল স্মিতা। বেরুবার জন্যে ছটফট করে উঠল মনটা। বিকেল আসছে, সেই যেন ভয়। বিকেলকে ওর ভয় হল কবে থেকে। এমন সময় দেখা দিল রবি। স্মিতা ছুটে গিয়ে বারান্দায় হাত ধরে বলল, উঃ আপনাকেই মনে মনে চাইছিলুম রবিদা। এত চাইছিলুম, একটু আগেও তা জানতুম না।

রবিও যেন আগের তুলনায় অনেকখানি প্রাণহীন। সেই বুদ্ধিদীপ্ত বিষণ্ণ চোখ দু'টি এখন যেন নিয়তই ছায়াঘেরা। বলল, তা যেন চাইছিলে। তোমার চোখ মুখ এত লাল দেখাচ্ছে কেন?

তাইতো! শুকনো ঘাম শাড়িতে, চুলে। এলোমেলো বেশ, খালি পা, মাটি আর পাতা খুঁটে খুঁটে হাত ময়লা। রোদ ওকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে লাল করেছে। বলল, রোদে ছিলুম। সত্যি, আপনাকে মনে মনে যে কত ডাকছিলুম রবিদা, নিজেই বোধহয় জানতুম না। আপনি কি করে এলেন এত সকালে?

রবি বলল, সে কি. ভুলে গেলে, তুমি আজ বেলা বারোটায় ক্লাস শেষ করে আমাকে ডেকে নিয়ে আসবে, তারপরে কোথায় কোথায় যাবে।

স্মিতা বলল, খুব ভাল হয়েছে, আমি বেরুইনি। বড়দি আজ সারাদিন বাড়িতে রয়েছে। শরীরটা খুব খারাপ, বেরোয়নি। আমিও বেরুইনি।

রবির মুখ হঠাৎ আরক্ত হল। বলল, ও!

সুমিতা সহসা রবির কাছে ঘেঁষে, মুখ তুলে বলল, রবিদা, একটু যাবেন?

আবার! আবার সেই বুকের পাথারটায় আরো জোরে আঘাত করেছে সুমিতা। ফ্যাকাশে মুখে, হাত টেনে বলল চম্‌কে, কোথায়?

—বড়দিকে দেখতে?

বুকের মধ্যে ধক্‌ধকিয়ে উঠল রবির। পুড়ে যাওয়া মুখখানিতেও বিষণ্ণ হাসি ফুটিয়ে বলল, সব জেনে তুমি কেন এমনি করে বল রুমনো?

সুমিতা বলল, কিছু জেনে বলিনি রবিদা। আপনাকে না বলে পারলুম না কিছুতেই। কেন জানিনে, বড়দিকে দেখে বড় কষ্ট হচ্ছিল।

রবি সহসা কোন জবাব দিতে পারল না। সুমিতা হাত ধরে টানল, আসুন।

ঠিক সেই সময়েই, মরিস মাইনরটা এসে দাঁড়াল গেটের কাছে। কালো গগল্‌স চোখে নিয়ে নামল অমলা। রাঙানো ঠোঁটের ফাঁকে ঝিক্‌মিকিয়ে উঠল সাদা দাঁতের সারি।

রবি আর সুমিতা, দু'জনেই চোখোচোখি করে থম্‌কে দাঁড়াল। অমলা বারান্দায় উঠে এসে হাসল রবির দিকে চেয়ে। বলল, ভাল আছেন?

রবি হাসবার চেষ্টা করে হাত জোড় করে বলল, হ্যাঁ, আপনি?

ঘাড় হেলিয়ে বলল অমলা, ভাল।

তার আগেই, আড় চোখে দেখে নিয়েছে সে, রবির প্রায় বুকের কাছে দাঁড়িয়ে শক্ত মুখ ফিরিয়ে রেখেছে সুমিতা। চকিতে কী একটু ভেবে নিল অমলা। হেসে জিজ্ঞেস করল, তোমার বড়দির ব্যাপার কি? বেরোয়নি আজ, না?

সুমিতা বলল, না। শরীরটা ভাল নয়।

ঠোঁট কাম্‌ড়ে ধরে হঠাৎ একটু বিচিত্রভাবে হেসে উঠল অমলা। রবির দিকে তাকিয়ে বলল, কাকাবাবু (মহীতোষ) থাকলে সুসংবাদটা দিয়েই যেতুম। গিরীনের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত মিটমাট হয়েই গেল বোধ হয়। কাল তো সারাদিন সুজাতার দেখাই পাইনি। ক্লাবে গিয়ে শুনলুম, গিরীনের সঙ্গেই সারা সন্ধ্যা আর অনেক রাত্রি অবধি কাটিয়েছে। আই মাস্ট কংগ্রেচুলেট হার।

এমন আনন্দের সংবাদেও সুমিতার মনে হল ওর বুকের ভিতরটা পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। কী একটি নিশ্চিত ইঙ্গিত ছিল অমলার কথার মধ্যে। বার বার বড়দির কালিমাচ্ছন্ন চোখ দু'টির কথা মনে পড়ল সুমিতার।

অমলা আবার বলল সুমিতাকে, সুজাতাকে একটু ডেকে দাও না ভাই তুমি। মুহূর্তে যেন আরো শক্ত হয়ে উঠল সুমিতা। বলল, আপনি যান, বড়দি ওর ঘরেই আছে।

আচ্ছা!

শরীরের একটি বিচিত্র দোলন দিয়ে, বাইরের ঘরে ঢুকে, ভিতরের দালান দিয়ে সুজাতার ঘরে গিয়ে ঢুকল। ঠোঁটের কোণ দু'টি অমলার কুঁকড়ে উঠছে তখন।

সুমিতা একমুহূর্ত নির্বাক থেকে বলল, চলুন রবিদা, একটু বেরুই।

দু'টিই লজ্জার। এখন যেন থাকাও লজ্জার, বেরিয়ে যাওয়াও লজ্জার। একটা ভয়ঙ্কর অপমান ও বেদনা, তাকে স্থাণুর মত নিশ্চল করে দিল কয়েক মুহূর্ত। এক নিমেষের জন্য সুমিতার ওপরেও বিরূপ হয়ে উঠল মনটা। রবি সৎ, বলিষ্ঠ তার জীবনাদর্শ, সবই ঠিক ছিল। মন তার এত হীন কি না কে জানে যে, সে খুশি হয়েছিল সুজাতার দাম্পত্য বিচ্ছেদে। কিন্তু নিজের মনকে মানুষ ফাঁকি দেবে কত। মনের সেই গহনদেশে, যে আজ সুমিতার হাত টানে কেমন একটু সুর-বিলোলিত হয়ে পা' বাড়িয়েছিল, সেও যেন আজ নির্লজ্জ দুরমুশে গেছে ছেঁচে, সুজাতার সুসংবাদে। নিজেরই কাছে, লজ্জায় বারবার মরে যেতে লাগল রবি।

সুমিতা এর আংশিক অনুমানে নিজেও পুড়ছিল মনে মনে। তাই পালাতে চায় রবিদাকে নিয়ে। ওর অপরাধের যে সীমা নেই। বলল, চলুন, যাই।

রবি শান্তভাবে বলল, থাক্ না রুমনো। এসো বসি।

—না না, চলুন বেরুই।

—তবে তুমি থাক, আমি বরং যাই।

—না, আমিও যাব।

বলতে বলতে কণ্ঠরুদ্ধ হল সুমিতার। বলল, চলুন, পায়ে পড়ি রবিদা, চলুন বেরিয়ে যাই।

একটি কঠিন বস্তু রবির বুকেও ঠেকেছিল। লজ্জা ও অপমানকে যেন স্বীকৃতি দিয়েই স্মিতার সঙ্গে বেরুতে হল তাকে।

অমলার ঘরে ঢোকা টেরও পেল না সুজাতা। দাঁড়িয়েছিল নিশ্চল হয়ে, বাগানের জানালার কাছে। ডাক শুনে ফিরে তাকিয়েই চোখ দু'টি জ্বলে উঠল একবার। পরেই ছায়া ঘনিয়ে এল আবার। মার খেয়েও মার ফিরিয়ে দিতে তো পারবে না সুজাতা। কী লাভ আজ আর অমলাকে ঝাঁঝ দেখিয়ে। শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, কি খবর অমলা?

অমলা সপ্রতিভভাবে হেসে বলল, কী আবার! সারাদিন ফোন করে করে আমার কান ঝালাপালা করে ফেলল শুভেন। তুই অফিসে যাসনি কেন?

সুজাতা বলল, কাল থেকে আবার যাব। বোস্, চা খাবি?

আশ্চর্য! সুজাতাকে নিয়ে খেলা করবার বাসনা অমলার। তবু কালকের কথা জিজ্ঞেস করতে পারছে না। বলল, খাব।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, রবি এসেছে দেখলুম।

সুজাতা ফিরে তাকাল। শান্ত স্বরেই বলল, এসেছে নাকি?

বলেও খানিকক্ষণ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নিশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠছে সুজাতার। আবার বলল, চল্, বাইরের ঘরে গিয়ে বসি।

বাইরের ঘরে এল দু'জনে। সুজাতা নত-চোখ। কিছুতেই সামনে তাকাতে পারছে না। যেন কার সঙ্গে চোখোচোখি হওয়ার ভয়।

বারান্দার সামনে ছায়া দেখে চোখ তুলতেই দেখল বিলাস। কেমন যেন চম্‌কে উঠে, বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, রুমনো কোথায়?

—ছোটদিদিমণি রবিদাদাবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে গেছেন।

—ও!

অমলা দেখল, সুজাতার মুখখানি হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে গেল। সময়ের মুখ চেয়ে সেদিন বিদায় নিল সে চা খেয়ে। সন্ধ্যা ঘনাঘন আশীষ এসে দেখল সারা বাড়িটা একেবারে নিঝুম।

কোন কথাই জমল না আজ দু'জনের। অধিকাংশ সময়েই নীরব রইল রবি। কোন কথা খুঁজে পাচ্ছিল না যেন। স্মিতাও তাই।

শীতে কোঁকড়ানো, বিষণ্ণ-আলো, নিঃশব্দ ফোর্ট এলাকা ছেড়ে দু'জনেই আবার জনমুখর পথে এসে পড়ল।

সুমিতা বলল, অরুণাদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন না রবিদা?

অরুণা রবির সহপাঠিনী ছিল এককালে কলেজে। এখন চব্বিশপরগনার মফঃস্বলের বালিকাবিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী। শোনা যায়, কোন এক কালে সে ভালবাসত রবিকে। রবি বলেছে সুমিতাকে, সে সব কিছু নয়। খুব ভাল মেয়ে। যদি চায় সুমিতা আলাপ করতে, পরিচয় করিয়ে দেবে। রবি বলল, দেব, এখন দেরি হয়ে গেছে। তা' ছাড়া, অরুণার চাকরিটাও গেছে শুনেছি।

—কেন?

—পলিটিক্‌সের জন্যেই।

—ও!

আবার চুপচাপ। অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর মনুমেণ্টের কাছে এসে ডাকল রবি, ঝুমনো।

—বলুন।

স্বর শুনে চমকে, হাত ধরে কাছে টানল সুমিতাকে রবি। দেখল, দু' চোখ ভেসে গেছে সুমিতার। রবি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ছি ঝুমনো, তুমি কাঁদলে যে আমার লজ্জা বাড়ে।

সুমিতা ফিস্‌ফিস্ করে বলল, আমি মূর্খ রবিদা, কিছু বুঝিনে, কিছু না।

রবির সমস্ত অপমানের জ্বালাটা বিষাদ-ভার হয়ে উঠেছে। তাই সে স্বাভাবিকভাবেই বলল, তুমি যা বুঝেছ ঝুমনো, ঠিক বুঝেছ। সব কিছুকে সহজভাবে নাও। আমরা মানুষ, সুখ দুঃখ ভুল ত্রুটি, এ না হবে কেন। তাতে নিজেকে গাল দিলে, বাড়াবাড়ি করলে যন্ত্রণা বাড়েই।

ফিরে গেল দু'জনে, যে যার পথে।

কিন্তু কোথায় সেই সহজ জীবন। বাবা যান কাজে। বড়দি আজকাল চলে আসে তাড়াতাড়ি বাড়িতে। কিন্তু চেহারাটা কী দ্রুত ভাঙছে ওর। রক্তশূন্য, রুগ্ন। প্রায়ই অফিস কামাই করে।

মাঘ শেষ না হতেই বাতাসে পাগল হয়ে গেল কলকাতা। পার্ক আর ফুটপাথ থেকে শুকনো পাতা ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল ট্রাম লাইনে আর পথে।

এখানে সেখানে হঠাৎ শিমূলের রক্তজটা, কৃষ্ণচূড়ার রক্তমুকুট, শহরটাকে করছে উল্লসিত।

বোম্বের একটি ইংরেজী সাপ্তাহিকে সুগতার ফটো আর বক্তৃতা ছাপা হয়েছে। নীচে লেখা আছে, "যৌবন কখনো মিথ্যা বলে না—আমরা 'সত্যকে' কায়েম করতে চাই সারা বিশ্বে, বলেন বাংলার যুব-নেত্রী সুগতা।" সুগতা হাসছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে হাসছে কারলেকর।

সুগতা চিঠি দিয়েছে; মৃণাল আর ও ফিরে আসবে সপ্তাহ দু'য়েকের মধ্যেই।

বঙ্গোপসাগর থেকে উদ্দাম বাতাস যতই এসে ঝাঁপ দেয় এই কংক্রীটের রাজ্যে, থুবড়ে পড়ে অ্যাসফল্টের কঠিন বুকে, ততই যেন সুমিতার জীবনের ঘেরাটোপটা আসে কুঁকড়ে, জড়িয়ে, ছোট হয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে।

আশীষ আসে, সুমিতা মুখ খুলতে পারে না। জবাব দিতে পারে না আশীষের সেই একই কথার। সেই একঘেয়ে কথার ঘ্যানঘ্যানানি, রুগ্নপরিবেশ থেকে আজকাল পালাতে মন চায় সুমিতার। তার জন্যেও ধিক্কার হানে ও নিজেকে। একা, কী ভয়ঙ্কর একা আশীষ।

কিন্তু কোথায় সেই সহজ জীবন। তারপর এক একসময় ভয়ে চমকে তাকিয়ে দেখে মনের দিকে, আশীষ নেই সেখানে। কে ওকে এমন করে এলোমেলো করছে। কে ওকে নিয়ত ডাক দিয়ে ফিরছে খোলা আকাশের তলায়। না, ছি, কেমন করে যাবে ও সেখানে। দু' হাত দিয়ে ঠেলে ও বন্ধ করে রাখে ভিতরের দরজা। সেটা খোলা পেলেই বাইরের দরজাটাও মড়মড় করে ওঠে।

এই কি জীবন। নিজের সঙ্গে এ কি ভয়াবহ মারামারি সুমিতার। শেষটায় যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তখন ভগবানকে ডাকে। উনিশ বছরের এই সর্বাঙ্গে আশীষের পুরুষ-দাগটা কিছুই নয়। কিছুই নয়। সেটা তবে কি। এই দেহের 'সত্য' কি কিছুই না। এ ও কেমন মেয়ে। বলে, ভগবান, তুমি আশীষকে ওর ব্যর্থতা থেকে, মিথ্যে থেকে মুক্তি দাও, নইলে ওর মৃত্যু শুধু আমাকেই নিমিত্ত করবে। তারপরে সুমিতা আবার শুদ্ধ হয়। আশীষ আসে। বলে, জনমতটা একটা রাক্ষস। মস্তিষ্ক নেই, আছে একটা

ভয়ঙ্কর ক্ষুধা। কি কুৎসিত! জানো রুমনি (আজকাল রুমনি বলে) এদেশে জনমত মানে একটা ক্রুড, ভালগার উল্লাস। এরা ভাল জিনিস নেয় না কখনো, মাতালদের মত পচা চাট এদের উপাদেয়।

এখানে কিছুই ভাল নেই। সুতরাং এখানকার কোনকিছু দিয়েই কিছু হয় না।

পালাবার জন্যে ছটফট করেও সুমিতা বসে থাকে শক্ত হয়ে।

থেকে থেকে কেমন যেন গভীর স্বরে বলে আশীষ, আমি মনে-প্রাণে কোনকিছুতেই এদেশের কেউ নই।

—কেন আশীষ, কেন বলছ তুমি একথা।

কী ভয় সুমিতার। মনে হয়, চেঁচিয়ে উঠবে বুঝি।

আশীষ—এদেশে আর আমার মধ্যে কোথাও আমি ভালবাসা খুঁজে পাইনে।

কেন ?

কেন। আশীষ নীরব। সুদূর দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে। সুমিতা দু' চোখ ভরে ভয় নিয়ে দেখে, শুধু ব্যর্থতা। নিজের সমস্ত বুদ্ধি ও মননের ব্যর্থতায় অধৈর্য আশীষ একেবারে নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে।

সুমিতা ওর নিজের মনটাকেই ভগবান ভেবে বলে, ওকে শান্ত কর, ধৈর্য দাও, শক্তি দাও।

কিন্তু বিষণ্ণ নিঝুম সন্ধ্যায় আবার আশীষ আবেগ ফিস্‌ফিস্ গলায় বলে, রুমনো টাকা জমিয়ে আমরা বিলেত যাব। তুমি আর আমি। সেখানকার অধিবাসী হয়ে, চাকরিবাকরি করে থাকব।

সুমিতা চাপা বিস্মিত গলায় জিজ্ঞেস করে, বিলেতে ?

—হ্যাঁ, লণ্ডনে। কি দরকার আমার এদেশকে।

'কেন' শব্দটা একটা ভয়ঙ্কর চীৎকার হয়ে বেরিয়ে আসতে চায়। পারেনা। শুধু হাঁসের গায়ে জলের ছিটার মত ওর দেহের পালকে পালকে আশীষ খেলা করতে থাকে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুমিতা ওর ভিতরদরজার ডাকটা সামলাতে পারলেনা। সে বাইরের দরজাটাকে ভেঙ্গে দিয়ে নিয়ে গেল ভাসিয়ে। ঘোর সন্ধ্যায় নিজেকে ও দেখল হাওড়া-স্টেশনের কাছে। বাস ধরে এসে নামল হাওড়ার একটি ঘিঞ্জি রাস্তার লোকারণ্যের ভিড়ে। ঠিকানাটা কবে থেকে লটকানো

ছিল ওর ভিতর দরজায়। লেখা ছিল নানান জনের কাছে শুনে শুনে পথের নির্দেশ।

একটি সরু গলিতে ঢুকে, ভিড় ঠেলে অগ্রসর হতে লাগল। স্বল্পবাতি আলো আঁধারি পথ। মানুষগুলিকে কিরকম ভাঙাচোরা, কুৎসিত দেখাচ্ছে। পচা তেল পোড়ার দুর্গন্ধ, তার সঙ্গে চকিতে চকিতে ফুলের গন্ধ। কে একটা লোক গায়ে পড়তে পড়তে পাশ কাটিয়ে গেল। মোটা গলায় কে একটা অশ্লীল গান গাইছে। তারপরেই সরু কাসরভাঙা গলায় হেসে উঠল একদল মেয়ে।

চমকে পাশ ফিরে দেখল সুমিতা, একটা মেয়েকে একটি ভয়ঙ্কর-দর্শন লোক বুকের মধ্যে ফেলে ঝুলিয়ে নিয়ে চলেছে। মেয়েটা হাসতে হাসতে গালাগাল দিচ্ছে অশ্রাব্য ভাষায়।

একটা লোক শিস্ দিয়ে উঠল সুমিতার দিকে তাকিয়ে। একটি এক-চিলতে জামা গায় দেওয়া মেয়ে সুমিতাকে ডেকে বলল, কে গো ?

কোথায় এসে পড়ল সুমিতা। এই কি সেই পথ। এই পথে কি সেখানে যাওয়া যায়। মনে হল, চারদিক থেকে ওকে কারা যেন ঘিরে আসছে। ও যতই আশেপাশে চাইছে, ঘামছে দরদর করে, ততই পথটা সুদূর অন্ধকার হচ্ছে। ততই একটা নিদারুণ ভয় ওর পায়ের তলার মাটি নিচ্ছে সরিয়ে।

বেলফুল, চা, তেলেভাজা আর কেরোসিন আলোর দলাদলা কালি। আর মদমত্ত ধ্বনি।

জীবনে এ পথ কোনদিন দেখেনি সুমিতা, এ মানুষদের এ পরিবেশের একটি আবছা কল্পনা ছাড়া আর কিছু নেই।

ভয়ে ও আরো তাড়াতাড়ি চলতে লাগল। ততক্ষণে কান্নায় ওর বুক ভরাট হয়ে উঠেছে। এ কি করল ও। অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই যে দেখা যায় না। একটা লোক পাশ থেকেই হেসে উঠল খ্যাল খ্যাল করে। দৌড়ুতে উদ্যত হল সুমিতা।

সামনে কালাপাহারের মত বিরাট গোঁফওয়ালা একটি কালো মূর্তি দাঁড়াল। আশ্চর্য শান্ত ও নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, আপনি কাঁহা যাইবেন বেটি ?

সুমিতা নিজেকেই যেন আঁকড়ে ধরল আঁচল জড়িয়ে। নামটা বলে ফেলল।

লোকটা কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, তোবা তোবা। ভুল পথে আসিয়েছেন বেটি মা। আমার সাথ, চলে আসুন। ই রাস্তা খারাব, আপনার যানা আনা চলে না। আসুন।

ভয়ঙ্কর-দর্শন হলেও লোকটির গলায় কোথায় একটি পরম আশ্বাসের সুর ছিল। ঘেমে দুর্বল হয়ে, মন্ত্রমুগ্ধের মত কয়েকটি অলিগলি পার হয়ে হঠাৎ একটি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল লোকটি। দরজা খোলা, সামনের বারান্দায় মাদুর পেতে একটি লোক আর দু'টি লোককে কি যেন বলছে।

সেই একটি লোককে দেখিয়ে সুমিতার বিভীষণ-দর্শন সঙ্গী বলল, উন্‌কে আপনি চান তো বেটিয়া।

দেখতে দেখতে সুমিতার দু' চোখ জলে ঝাপসা হয়ে গেল। দেখল, সেই লোকই, সেই কপালে ও চোখে বিস্ময় বিদ্যুৎ-চমক।

লোকটি ওর কান্না দেখে, সস্নেহ গলায় বলল, হ্যাঁ, রোবেন না, আপনার তথ্‌লিফ হয়েছে বেটিয়া। উন্‌ আদমি আমাদের রাজিন্দর বাই আছেন।

(৩০)

পথপ্রদর্শক কালপাহাড়তুল্য লোকটিই বাড়ির ভিতরে ঢুকে ডেকে নিয়ে এল রাজেনকে। অনেকদূর এসেছে সুমিতা। না ডেকে নিলে এ বাড়ির চৌকাট ডিঙ্গিয়ে ঢুকবে কেমন করে। জলভরা ঝাপসা চোখে ও দেখল রাজেন এগিয়ে আসছে। সুমিতার লজ্জা বাড়তে লাগল। লজ্জা আর কান্না, দুই-ই ওকে তুলল অবশ করে। কে বলবে, ও কি বলবে। কি জবাব দেবে এই বিস্ময়কর নির্লজ্জতার।

গম্ভীর সপ্রশ্ন গলায় শোনা গেল, কে ইনি ইয়াকুব?

জায়গাটা অন্ধকার। রাজেন চিনতে পারল না। কি বলবে সুমিতা। কে ও! নাম বলে পরিচয় দিতে হবে নাকি?

সেই বিভীষণ দর্শন ইয়াকুব জবাব দিল, হাম তো পয়চানা নহি। ই তল্লাটে কভি দেখে নাই। দেখলাম, ভামী গোয়ালনীর গল্লি ভিতরে আসছেন। খারাব, গল্লি, চেহারা দেখে মালুম করলাম, ই দুস্‌রা দুনিয়ার মানুষ। তাই আমি বললাম—

কথা শেষ হওয়ার আগেই দু'পা এগিয়ে এসে রাজেন বিস্ময় চকিত হয়ে বলে উঠল, সুমিতা নাকি?

অন্ধকারেও মুখ নামিয়ে রেখেছে সুমিতা। বলল, হ্যাঁ।

একমুহূর্ত রাজেনও নির্বাক বিমূঢ় হয়ে রইল। শুধু বলল, আশ্চর্য!

কিন্তু কিছু ভাববার অবকাশ ছিল না। পরমুহূর্তেই ব্যস্ত হয়ে বলল, এস ভেতরে এস। কী আশ্চর্য!

শুধু আশ্চর্য! পরমাশ্চর্য! রাজেনের পিছনে পিছনে ঢুকল সুমিতা। ইয়াকুব বিদায় নিল। আর যে দু'টি লোক বসেছিল মাদুরের ওপর, তারা উঠে দাঁড়াল। তেল কালি মাখা জামা আর প্যান্টে, এবড়োখেবড়ো মুখে আর উদ্দীপ্ত নির্বোধ চাহনিতে অর্ধেক মানুষ বলে মনে হচ্ছিল লোক দু'টিকে।

একজন বলল, আমরা তা' হলে আজ চলে যাই রাজেনদাদা।

—চলে যাবে? একটু অনিচ্ছার স্বর বেজে উঠল রাজেনের গলায়। বলল, আচ্ছা, তাই যাও। কাল আমি স্কুলে দেখা করব।

চলে গেল লোক দু'টি। আড়চোখে একবার তাকিয়ে দেখে গেল সুমিতাকে। গালে কপালে ছড়ানো চুল সুমিতার। যেন অনেক দূরের যাত্রা শেষ করে, রাত জেগে এসে পৌঁছেছে। কোন সাজ নেই ওর অঙ্গে। তবু যেন কী এক সাজ রয়েছে সর্বাঙ্গে। পথের দুঃখ মনের লজ্জায়, বাতাসের দাপটে, ধুলোর প্রলেপে, এই অ-সাজের ভূষণ ওকে যোগিনীর বেশ দিয়েছে। আসবে বলে তো আসেনি সুমিতা। তৈরী হওয়ার সুযোগ কোথায় ছিল। দেহে মনে, কোথাও ওর অবকাশ মেলেনি সাজবার। ও যে বিরাগিনী হয়ে এসেছিল। সব ছেড়ে সব রেখে, লুটিয়ে পড়েছে এসে ভিতর দুয়ারের নির্দেশে। চোখের কোলে এখনো জলের দাগ। এখনো শঙ্কা, এখনো প্রাণ দুরু দুরু। তবু কী লজ্জা! কী লজ্জা!

রাজেন বিস্মিত হেসে বলল, কী ব্যাপার! কোন খবরই নেই, আসনি কোনদিন, কি বলে পা দিলে এ পথে।

কী বলে সুমিতা পা দিয়েছে এ পথে! কোন আয়োজনই তো ছিল না। অনেক আয়োজন করে আসারই পথ যেন এটা। হঠাৎ আবার ঝাপসা হয়ে উঠল সুমিতার চোখ। নতমুখেই রুদ্ধগলায় বলল, কী ভয়ঙ্কর পথ!

কান্না দেখে এক নিমেষ বিমূঢ় নির্বাক হয়ে রইল রাজেন। চোখে তার বিস্মিত-অনুসন্ধিৎসার আলোছায়া। বলল, জানা থাকলে পথের আগে বেড়ে নিয়ে আসতুম তোমাকে। কিছুই যে জানিনে। তুমিও জানো না, আরো পথ ছিল। ইয়াকুব না থাকলে আরো ঘুরতে হত।

সান্ত্বনা আছে, শঙ্কা নেই রাজেনের গলায়। একটু হেসে বলল, যাক, ওতে আর মন খারাপ করে লাভ নেই। এসে তো পড়েছ। বোস।

সুমিতা বারান্দায় উঠে বসল মাদুরে। চোখ মুছল আঁচল দিয়ে।

রাজেন বলল, কিন্তু কি ব্যাপার বল তো?

সুমিতার বুকের মধ্যে ধুক্‌ধুক্ করে উঠল। সত্যিই তো। কি ব্যাপার। কি বলবে। কেন জানি ওর কেবলি সেই ঝড়ের দিনটির কথা মনে পড়ছে। সেই বাতাসের হুঙ্কার, হুড়মুড় করে গাছের ডাল ভেঙে পড়া তাণ্ডব। তারপর ঝড় থামা নিঃশব্দ শান্ত সন্ধ্যাটা অনেকগুলি পায়ের শব্দে হকচকিয়ে উঠেছিল। বাইরের ঝড় থেমেছিল, কিন্তু সেই-ক্ষণেই ঝড় উঠেছিল সুমিতার বুকে। সেই মুহূর্তে। বুকের সেই ঝড় নিয়ে কত দিগন্ত পার হয়ে এসেছে। পার হয়ে আজ এসে পৌঁছেছে এখানে। জীবনের কোনখানেই কোন যুক্তি নেই সুমিতার। কি ব্যাপার, কি বলবে ও। এই তো সেই রাজেন, আজো যার প্রশস্ত কপালে এলানো চুল সাপের ফণার মত। সেই পাঞ্জাবি গায়ে, খোলা বোতাম। নিয়ত বিস্মিত দৃষ্টি চোখে।

মুখ নামিয়ে রেখেই বলল সুমিতা, কিসের ব্যাপার?

রাজেন বলল, হঠাৎ এলে যে?

চোখ তুলতে গিয়েও পারল না সুমিতা। বলল, আসতে নেই?

রাজেনের চোখে মুখে দূর-দর্শনের হিলি-বিলি। বলল, মন চাইলে নিশ্চয় আছে। কিন্তু ঠিক করে বল তো। তোমাদের বাড়ির খবর সব ভাল?

—হ্যাঁ।

—তোমার বাবা, দিদিরা—

—ভাল। মেজদিরা ফেরেনি এখনো। ফিরবে শীগগিরই।

—ও! তুমি ভাল তো?

সুমিতা আরক্ত হয়ে উঠল। চোখ তুলতে গিয়ে দৃষ্টি বিনিময় হল রাজেনের সঙ্গে। হেসে নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

তারপর এদিকে ওদিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, আর কেউ নেই এ বাড়িতে?

জিজ্ঞাসা মিটল না রাজেনের। বলল, হ্যাঁ আছে, অনেকে আছে, দেখতে পাচ্ছ না।

সুমিতা অবাক হয়ে চারদিকে দেখতে লাগল। কোথায় অনেক লোক। বাড়িটার শেষ কোথায়, তাই খুঁজে পেল না। উঠোনটাও হারিয়ে গেছে কোথায়। এখানে সেখানে আগাছার ভিড়। এদিকে ওদিকে বুড়ো আম-জাম নারকেল গাছ দুলছে বাতাসে। ভাঙ্গা জীর্ণ খসা ক্ষওয়া দোতলা বাড়ি। সেকেলে খিলান, খসা পলস্তারা, নোনাধরা সহস্র সহস্র ইট যেন নোংরা-দাঁত-বিকশিত নিঃশব্দ হাসির মত। খাঁ খাঁ নিরালা পড়োবাড়ি যেন।

কেমন একটু উৎকণ্ঠিতবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল সুমিতা, এটা কি আপনাদের বাড়ি?

—হ্যাঁ। কেন বিশ্বাস হচ্ছে না?

রাজেনের দিকে তাকিয়ে, আবার বাড়িটার দিকে ফিরে বলল সুমিতা, বিশ্বাস হবে না কেন?

কিন্তু লোকজন কোথায়?

—সবাই অন্যদিকে থাকে। যেদিকটা এখনো বাসপোযুক্ত আছে। এদিকটার এক এক জায়গা বেশ খারাপ হয়ে গেছে। যে কোন সময় ভেঙ্গে পড়তে পারে। খুব বড়-লোকের বাড়ি ছিল তো।

—তাই নাকি?

সুমিতা রাজেনের হাসি-মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনারা খুব বড়লোক ছিলেন বুঝি?

রাজেন ঠোঁট কুঁচকে হেসে বলল, হ্যাঁ খুব বড়লোক। দেখে বুঝতে পারছ না। তবে এখন এটা দু'তিন পুরুষ ধরে চট-কলের মিস্তিরি আর কেরানীবাবুদের বাড়ি হয়েছে। এক এক ঘরে, এক এক পরিবারের বাস। পায়রার খোপ বলতে পার।

—তারা কারা?

—সেই বড়লোকদের বংশধরেরা। এই আমার মত আর কি! আমারই কাকা জ্যেঠা ভাইবোনেরা আছে।

সুমিতা বলল, আর আপনার মা। তিনি কোথায়?

—মাও অন্যদিকে।

সুমিতা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, ওকে আমি একটু দেখব।

ঠিক এমনি করেই যেন একদিন সুগতাও উৎসুক হয়ে উঠেছিল। কৌতুহলের বান ডেকেছিল চোখে। কত না বিস্ময়। কি বিচিত্র পরিবেশ।

সব দেখবে খুঁটে খুঁটে। মাকেও দেখবে। তবে সুগতা এমন আচমকা এক বিস্ময়কর পথ ধরে আসেনি সুমিতার মত। এমন না বলে কয়ে, এলোমেলো হয়ে।

হেসে বলল রাজেন, বেশ তো দেখবে। দেখার কিছু নেই, আমার মা আমারই মত।

—আপনার মত?

রাজেন বলল, মানে, আমারই মায়ের মত।

সুমিতা হেসে ফেলল। হেসে, মুখে আঁচল চেপে বলল, গোঁয়ার?

রাজেনও হেসে বলল, তা বলতে পার। কোন অংশে কম নয়। মাঝে মাঝে আমাকে এমন বয়কট করে দেবে, কিছুতেই আর কথা বলানো যাবে না। আমি তো একেবারে ছটফটিয়ে মরি।

সুমিতা হাসতে গিয়েও অবাক হয়ে তাকাল রাজেনের মুখের দিকে। ভাবতেও পারে না, মা দু'দিন কথা না বললে এ মানুষ আবার ছটফটিয়ে মরে। কিন্তু কোথায় একটি আশ্চর্য কোমলতা, শিশুর আভাস রয়েছে লেগে চোখে মুখে। বলল, তবে চলুন, আগে দেখেই আসি।

—চল। সে প্রায় আর এক পাড়ায়। কিন্তু—রাজেন তাকিয়ে দেখল সুমিতার আপাদমস্তক। সেই দৃষ্টি অনুসরণ করে সুমিতা নিজেকে দেখে, আঁচল টেনে বলল উৎকণ্ঠিত হয়ে, কী হয়েছে?

রাজেন বলল, তুমি তো আমার কথার জবাব দিলে না সুমিতা।

আবার দুরু দুরু বুকের মধ্যে। আবার আরক্ত হল মুখ। একটা বিচিত্র অভিমান বিষণ্ণতাও ফুটে উঠল। বলল, জবাব আবার কিসের। অপরাধ তো করিনি কিছু?

রাজেন কোন কথা না বলে, হ্যারিকেনটি হাতে নিয়ে বলল, চল।

সহসা মুষড়ে পড়ল সুমিতার মন! রাজেনকে যেন গম্ভীর মনে হল। সমস্ত ভঙ্গিটার মধ্যে কেমন একটি নির্বাক কাঠিন্য উঠল ফুটে। কিন্তু কি কথার জবাব দেবে ও? কিছু বলতে হবে ভেবে তো সুমিতা আসেনি।

রাজেনের পিছনে পিছনে চলল ও নিঃশব্দে। বারান্দা দিয়ে খানিকটা গিয়ে বাঁদিকে একটি গলির মধ্যে ঢুকল। দু'দিকেই ঘর। পুরনো রাবিশের গন্ধ, ঠাণ্ডা কিন্তু তবু যেন দম চেপে আসে। ঘরগুলির কোনটির দরজা খোলা, বন্ধ কোনটি। কিন্তু লোক নেই একটিও। তারপরে একটি শিশুর কান্না

শুনতে পেল। কোথায় কি নিয়ে মেয়ে-পুরুষ গলার তর্কাতর্কি, কে যেন কোন্ শিশুকে ডাকছে, আর কোথায় বাজছে একটি বেলো-ফাটা হারমোনিয়াম। সেই সঙ্গে একটা সিনেমার গানের আপ্রাণ চেষ্টা।

কেমন যেন পৃথিবী ছেড়ে-আসা কোন্ এক সুদূর জগতে এসেছে সুমিতা। ভয়, বিস্ময়, কৌতূহল, সব মিলিয়ে একটা স্বপ্ন বলে বোধ হচ্ছিল। দু'পাশেই স্বল্পালোক ঘর, মানুষগুলি অস্পষ্ট ছায়া-ছায়া কিম্ভূত। বাড়ির মধ্যেই, তবু ফিরে চেয়েও দেখছে না, কে যায়, কারা যায়। এরাই কি রাজেনের সেই আত্মীয়স্বজনেরা।

প্রায় রাজেনের গা ঘেঁষে চলেছে সুমিতা। একবার বলল রাজেন, হোঁচট খেওনা যেন।

ঠিক তখুনি হোঁচট খেল সুমিতা। বাঁচিয়ে দিয়েছে স্লীপার জোড়া। আবার বলল রাজেন, ভয় করছে না তো?

অস্পষ্ট, প্রায় চাপা স্বরে বলল, কেন ভয় করবে?

কেন ভয় করবে। রাজেন মনে মনে হাসল। ভয় পেয়েছে সুমিতা। তাই জিজ্ঞেস করছে কেন ভয় করবে। আবার এল ঠিক তেমনি একটি বারান্দা। বাঁ পাশ ফিরে একটি কোণের ঘরের কাছে আসতেই, চাপা মিষ্টি একটি সরু গলার গান শুনতে পেল সুমিতা।

আমাকে না দিয়েছ ধনজন,
দিয়েছ তো প্রাণমন
বুক ভরে আছে আমার
সে নীল রতন॥

সুমিতা অবাক হয়ে বলল, কে গান গাইছে?

হ্যারিকেনের আলোয় ভাল করে মুখ দেখা যায় না রাজেনের। বলল, দেখতে পাবে এখুনি। এস, ভেতরে এস।

ঘরের পাশে আর এক ঘর। সেখানে উনুন জ্বলছে গন্‌গন্ করে। উনুনের পাশেই বসে কুটনো কুটছিলেন সুধা। রাজেনের মা। ইলেকট্রিক নেই, তার ওপরে ঘরের পাশেই গুমটি ঘরের মত বদ্ধ কূপে উনুন জ্বলছে। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এল সুমিতার। কিন্তু কৌতূহল আর বিস্ময়, সেসব টিকতে দিল না। দেখল, সেই মহিলাই গান করছেন।

রাজেন ডাকল, মা, এদিকে এস।

সুধা বঁটি কাত করে বললেন, এত তাড়াতাড়ি এলি যে ?

তারপর ঘরে এসে একমুহূর্ত সুমিতাকে দেখেই, বিস্মিত-উল্লাসে বলে উঠলেন, ওমা, কী সুন্দর মেয়ে! কোত্থেকে নিয়ে এলি খোকা।

রাজেন বলল, নিয়ে আবার আসব কেত্থেকে ? ও নিজেই এল। সুগতার ছোট বোন ও।

ততক্ষণে সুধা কাছে এসে পড়েছেন সুমিতার। সুমিতার বড় আশ্চর্য লাগছিল সুধাকে দেখে। হঠাৎ মনে হয়, বড়দির সমবয়সী যেন। দেহে একটু খাটো, দোহারা মানুষ। কিন্তু এখনো যেন নিটুট কুমারী মেয়েটি। থান পরেছেন। কাজের ফাঁকে, ঘোমটা গেছে খসে। কালো কুচকুচে চুলের মাঝখানে ধপধপে সাদা সিঁথি। ঠিক রাজেনেরই মুখের ভাব। কিন্তু রাজেনের চেয়েও যেন কাঁচা, কচি ঢলঢলে মুখখানি। সারা অঙ্গে যেন মাখা স্নিগ্ধ হাসি। তার পাশে রাজেন অনেক লম্বা, গুরু গম্ভীর পুরুষ।

কথা শুনে, কি বলবে ভেবে পেল না সুমিতা একমুহূর্ত। তারপর হঠাৎ সুধার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

সুধা দু'হাতে সুমিতার হাত চেপে ধরে বললেন, ছি, মা, ছি। বামুনের মেয়ে হয়ে অমন করে যেখানে সেখানে পায় হাত দিও না। তাতে যে আমাদের অকল্যাণ হয়।

অকল্যাণের কথা শুনে অপ্রতিভ হয়ে পড়ল সুমিতা। কিন্তু রাজেনও মনে মনে কম অবাক হল না। জাত বিচারে নয়, প্রণাম করাটা সুমিতার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল একেবারে! বোধহয় নীতিবিরুদ্ধও বটে। জীবনের পরিবেশ বলেও একটা জিনিস আছে। বাঙ্গালিপনার এ কারুমিতিটুকু সুমিতা আয়ত্ত করল কেমন করে।

সুধার কথার জবাবে সুমিতা অস্পষ্ট ভীরু স্বরে জিজ্ঞেস করল, কেন ?

হেসে বললেন সুধা, কেন আবার কি ? সংসারে ধর্মটাকে মানতে হয় যে। তার জন্যে তোমাকে অত মুখ চুন করতে হবে না। তোমার নাম কি মা ?

—সুমিতা।

—বাঃ, সুগতার বোন সুমিতা।

বলে রাজেনের দিকে ফিরে বললেন, কিন্তু ছাখ্‌ খোকা, সুগতার চেয়ে সুমিতা আরো সুন্দর।

সুমিতা একবারে লাল টুকটুকে হয়ে উঠল। কিন্তু এমন করে বলেন সুধা, কোন গ্লানি নেই। কিছু মনে করাকরির তুচ্ছতা নেই। সবই ভাসিয়ে নিয়ে যান স্নিগ্ধ তরল স্রোতে।

রাজেন বলল, তা বলে ওর সামনে তুমি ওর দিদির নিন্দে করোনা।

সুধা চোখ কপালে তুলে বললেন, ওমা! আমি কি ওর দিদির নিন্দে করলুম নাকি? ছি, ছি, তুই যেন কী! সুগতা তো সুন্দরই, সুমিতা যেন আরো সুন্দর। এতে আর নিন্দে কি করলুম। হ্যাঁ মা, নিন্দে করেছি।

আরও আড়ষ্ট হয়ে উঠল সুমিতা লজ্জায়। শুধু ঘাড় নাড়ল নিঃশব্দে।

সুধা ছুটে গেলেন রান্নাঘরে, বোস মা, উনুন জ্বলে যাচ্ছে আমার। তরকারিটা চাপিয়ে দিয়ে আসি।

সুমিতা যেন কোথায় ভেসে গেছে। অবুঝ যে কতরকমের হয়, তাই ভেবে ওর বিস্ময়ের সীমা নেই। বাগবাজারে জ্যাঠাইমার বাড়ির মানুষও একরকমের মানুষ। সেখানে শহরের এক গ্লানিকর অপরিসরতা। তবু শহর, ইলেকট্রিক আলো, সবকিছুর মাঝখানে মানুষগুলিকেও কেমন যেন অপরিসর মনে হয়। এখানে, কোন্ মান্ধাতা আমলের বুকচাপা হেলে-পড়া বিবর্ণ বাড়িটার রন্ধ্রে রন্ধ্রে আর কোথায় কি আছে কে জানে। কিন্তু এ-ঘরে অদৃশ্য এক প্রসন্নময় মহানন্দ প্রাণের এক বিচিত্র স্বাদ নিয়ে বসে আছে।

সুমিতার ছুটে আসার গ্লানি খানিকটা মিটেছিল রাজেনকে দেখে, বাকীটুকু সুধাময়ীকে পেয়ে কোথায় উবে গেল বাষ্পের মত। কোথাও আড়ষ্টতা নেই, চাপাচাপি, রাখ্‌ঢাক নেই। যা আছে, এই তার সবটুকু। নবাগতের সঙ্কোচ যদি হয়, হল। এ-গৃহের সঙ্কোচ নেই।

চেয়ে দেখল সুমিতা সারা ঘরের দিকে। পুরনোর দৈন্যে ভরা, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ফিটফাট। কুলুঙ্গিতে মিটমিট করে প্রদীপ জ্বলছে। সেখানে কাঁচে বাঁধানো ঠাকুরের ছবি, তার পাশে একটি ফটো। প্রাচীন একটি উঁচু খাট পাতা এক কোণে। সামান্য পাতলা বিছানাটা চোখেই পড়ে না। খান দুই-তিনেক কাঁসার থালা ঝকমক্ করছে এক পাশে।

তারপরে হঠাৎ চোখে পড়ল রাজেনকে। সুমিতার দিকেই তাকিয়েছিল সে।

সমস্ত প্রসন্নতা যেন রাজেনের মধ্যে গম্ভীর ও চিন্তাশীল হয়ে উঠেছে। তবু ঠোঁটের কোণে মিটমিট করছে হাসি।

রাজেন বলল, বেরুবে ?

অবাক হয়ে বলল সুমিতা, কেন ?

রাজেন বলল, এমনি, যদি তোমার ইচ্ছে হয়ে থাকে। মা হয়তো তোমাকে সহজে ছাড়বে না।

আহত হল সুমিতা মনে মনে। বুকের মধ্যে টনটন করে উঠল অভিমানে। যেন ও সহজে ছাড়া পেতে চেয়েছে। ওকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দিতে চায় রাজেন। আর কেউ হলে এত সহজে অভিমান করতে পারত কিনা নিজেও জানে না সুমিতা। বলল, যেমন আপনার ইচ্ছে।

রাজেন বিস্মিত হয়ে বলল, আমার আবার ইচ্ছে কি? সবটাতো তোমারই ইচ্ছেয় হচ্ছে। আমি তো কিছু-ই জানিনে।

সুমিতা তাকাল রাজেনের দিকে। রাজেনও তাকিয়েছিল। চোখোচোখি হতেই চোখ ফিরিয়ে বলল, ওঁর সঙ্গে দেখা না করে কেমন করে যাব।

বলতে বলতেই সুধাময়ী এসে পড়লেন। বললেন, ওমা, খোকা ওকে একটু বসতেও দিস্‌নি। এসো মা, বোস, একটু শুনি তোমার কথা। তাড়া নেই তো।

সুমিতা বলল, না, তাড়া কিসের। কিন্তু আপনার রান্না—

—ভারী তো দু'টি পেটের রান্না। তুমি বোস। খোকাও বোস্ না, ফিরেছিস্ যখন তাড়াতাড়ি।

মা নয়, দেখায় যেন রাজেনের দিদির মত।

রাজেন নিরুপায়। বসল খাটের একপাশে। আর একপাশে সুমিতাকে নিয়ে বসলেন সুধাময়ী। যেন কতদিনের চেনা, এমনি করে জিজ্ঞেস করলেন সুধা সুমিতাদের বাড়ির কথা, বাবার কথা, দিদিদের কথা, সুমিতার পড়াশুনার কথা।

তারপর সুমিতা সলজ্জ হেসে বলল, আপনি বুঝি গান করছিলেন ?

সুধাময়ী হেসে উঠে তাকালেন রাজেনের দিকে, রাজেনের ঠোঁটের কোণে হাসিটুকু আছে, কিন্তু তাকিয়ে আছে অন্যদিকে।

সুধাময়ী বললেন, তুমি শুনেছ বুঝি ? তাতে কি মনে হল, আমি গান জানি !

—গলাটা বড় মিষ্টি লাগছিল।

—কথাগুলো শুনেছিলে তো?

রাজেন বলে উঠল, এই, এই তুমি শুরু করলে তো মা?

সুধাময়ী বললেন, শুরু আবার কি? ও ভাববে আমি বুঝি গায়িকা— সে-ভুল ওর ভেঙে দিই।

বলে সুমিতার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মুখখানি যেন করুণ হয়ে উঠল। বললেন, দেখ না, আমি একদণ্ড ছেলে ছেড়ে থাকতে পারিনে। আমার তো দশটা-পাঁচটা নেই, একটি। কিন্তু একদণ্ডও আমি ছেলেকে কাছে পাইনে। তাই এখন ধরেছি। ওকে নিয়েই আমার গান।

রাজেন বলল উঃ, এমন করে বল কথাগুলো, শুনলে হাসি পায়। সুমিতাও মনে মনে হেসে মরে যাবে।

হাসবে কি, দু'জনকে দেখে সুমিতার বিস্ময়ের শেষ নেই। একি বিচিত্র মা আর সন্তান।

সুধা বললেন, হাসল তো হাসল। আমার জায়েরা তো জ্বলে যায় আমার কথা শুনলে। তোরা হাসবি, এ আর বেশি কথা কি। কিন্তু আমার নিজের কাছে তো কোন ফাঁকি নেই।

বলতে বলতে সুধাময়ীর চোখে জল এসে পড়ল। কিন্তু চোখে জল নিয়েও হেসে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন সুমিতার দিকে ফিরে, আর ছেলে তো আমার যেমন তেমন ছেলে নয়।

রাজেন কুঁকড়ে, ছটফটিয়ে উঠল। উঃ মা, থামো, থামো।

—ওরে না, না, তোকে আমি মস্ত বড় লাট-বেলাট বলিনি। তুই আমাকে এত জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাস্। তোর জ্বালায় অমি পাগল, পাগল। আমি সেই কথাই বলছি। তোর ঘর নেই, বাড়ি নেই, ছিরি নেই, ছাঁদ নেই। মস্ত বড় চাকরিও নেই। কতখানি পড়েছিস্, তা-ও বুঝিনে। লোকে বলে, তুই নাকি বড় বিদ্বান, কিন্তু কুলিমজুর ক্ষেপিয়ে বেড়াস্। আমি শুনি। আমার কথা তুই কি বুঝবি খোকা। তোকে নিয়ে নাকি আমার বড় অহঙ্কার। তার চেয়ে যে কত বেশি যন্ত্রণা, তা তো কেউ জানে না।

সুমিতার দিকে ফিরে আবাব বললেন, গান জানিনে মা, পাগলের মত গুন্ গুন্ করে বেড়াই। তবু মনটায় শান্তি থাকে। খোকাকে পাইনে, কিন্তু এ দেশটায় মায়েদের এত গান আছে, থই পাওয়া যায় না। কথা বলা

অভ্যাস। তা-ও বলতে পাইনে। ছেলে না হলে থাকতে পারিনে, তাই ওকে ভেবে ভেবে গাই।

রাজেন বলে উঠল হেসে, আর রাগ করলে কথা বন্ধ।

কে আর স্থমিতাকে দেখে। আর স্থমিতাই বা সে দেখাদেখির কথা ভাববে কখন।

স্থধাময়ী বললেন, বটেই তো। ওটা আমাদের রীতি। যেখানে অন্যায় বলে মনে হবে, সেখানে অসহযোগ। অন্যায় রাগ তো আমি করিনে।

রাজেন বলল, তা হলে, আমিই বুঝি শুধু অন্যায় করি?

স্থধাময়ী বললেন, যার যার অন্যায়, তার তার কাছে।

কত বিস্মিত প্রশ্ন যে স্থমিতার মনে জেগে উঠেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য মা আর ছেলে। অপরকে একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে যায় নিজেদের কথা। তবু না বলে পারল না ও, আপনাদের ঝগড়া হয়?

স্থধাময়ী হেসে উঠলেন। বললেন, তোমার বুঝি ভয় হচ্ছে।

—না, না। আরক্ত হেসে বলল স্থমিতা, বড় শুনতে ইচ্ছে করছে।

স্থধাময়ী বললেন, খুব ঝগড়া হয় মা। সে ঝগড়া দেখলে তুমিও শিউরে উঠবে। মনে হবে এ-ঘরটা এখুনি দম ফেটে মরে যাবে।

তারপরেই আবার ছুটলেন রান্নাঘরের দিকে।—ওমা, একটু চা খাওয়াব ভাবলুম। বোস, জলটা চড়িয়ে দিয়ে আসি।

রাজেন বলল, তোমার দেরি হয়ে যাবে স্থমিতা।

স্থমিতা যেন প্রায় স্থধাময়ীর মত তাকাল রাজেনের দিকে। বলল, হোক্ আর একটু বসি।

(৩১)

স্থধাময়ী গলা তুলে বললেন রান্নাঘর থেকে, বোস তোমরা, আমি একেবারে চা'টুকু করে নিয়ে যাই।

এই বুকচাপা বাড়িটার পুরনো ঘরে বসে, কি এক অজানিত বিস্মিত আনন্দে স্থমিতার প্রাণের দুই কূল প্লাবিত হয়ে গেল। এ পরিবেশ ওর অচেনা। মানুষগুলিরও পুরো পরিচয় আগে থেকেই জেনে আসেনি। তবু, মন যেন কি এক আশ্চর্য স্রোতে আপনি গেল ভেসে।

কাছে বসে রাজেন। জানে, ওই কর্মী চিন্তাশীল মানুষটি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকেই। ভাবছে, এ কি রকম মেয়ে। বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ এসে হাজির। এখন বসে বসে মা আর ছেলের কাহিনী শুনছে।

শেষ পর্যন্ত সুমিতা বলেই ফেলল, আচ্ছা, মেজদি তো কখনো বলেনি আপনার মায়ের কথা।

রাজেন বলল, মেজদির তো খেয়ে দেয়ে আরো কাজ ছিল। আর বলবারই বা আছে কি, বল?

—কিসের?—বলতে বলতে এসে পড়লেন সুধাময়ী। স্বেদবিন্দু সারা মুখে। একটু লাল হয়ে উঠেছেন। প্লেট নেই, শুধু কাপে করে চা নিয়ে এলেন। বললেন, মনে কোনো বিঘ্নি করো না মা। আমার আয়োজন নেই, সরঞ্জামও নেই। খোকা নিজে তো কিছুই দেখাশুনো করে না। সব আমাকেই করতে হয়। এই কাপে করেই চা-টুকু খাও, কেমন।

কুণ্ঠা-বিব্রত গলায় বলল সুমিতা, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাতে কি হয়েছে? আপনি এসব কেন বলছেন?

না বললেও সুমিতা অবাক হত, বললেও তাই। এমনি করে চা খাওয়ার রীতি তো ওদের বাড়িতে নেই। নেই চলা ফেরার চেনা সীমানার মধ্যেও। কিন্তু, এখানে, এই ঘরে, এই মানুষের কাছে, ডিশ্‌টা থাকলে যেন বাড়তি বলেই মনে হত। সব জিনিসের মানানসই আছে তো। অবাক হলেও, মন খারাপ করার কিছু নেই। এর মধ্যে অসামঞ্জস্য নেই কোথাও।

সুধাময়ী রাজেনকেও এক কাপ চা দিলেন, নিজেও নিলেন। বোঝা গেল, রান্নাঘরের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছেন। বললেন, কি বল্‌ছিলি খোকা?

রাজেন বলল, সুমিতা বলছিল, ওর মেজদির মুখে কখনো তোমার কথা শোনেনি কেন। আমি বললুম মেজদির তো খেয়ে দেয়ে আরো কাজ ছিল। মিছিমিছি তোমার কথা বলে সময় নষ্ট করবে কেন সে।

সংশয়ে হেসে তাকাল সুমিতা রাজেনের দিকে। এ কি মেজদিকে বিদ্রূপ, না শুধু এই মাকেই নাকাল করা।

সুধাময়ী বললেন, শুনলে তো কথা! আমি তো জানি সুগতা আমাকে কত ভালবাসত। মানুষ তার দশ কাজে যদি আমার কথা বলতে ভুলে যায়, তাতে কি আমি কখনো ছোট হই, না সে ছোট হয়।

রাজেনের সব কথার ভাব বোঝা দুষ্কর। বলল, আমি ছোট বড়োর কথা বলিনি। বলছি, সব কথা তো সকলের জন্যে নয়, তাই বলেনি সুগতা। কিন্তু মা—

—বল্।

সুমিতা হঠাৎ একদিনের জন্যে এসেছে। ওকে তুমি কেন অকারণ এত কথা বলে বিব্রত করতে যাচ্ছ?

সুধাময়ী চম্‌কে ফিরে তাকালেন সুমিতার দিকে। বললেন, তুমি কি মা একদিনের জন্য এসেছ? আমার তো তা মনে হয়নি। আর কোনদিন কি আসবে না?

কী বিচিত্র প্রশ্ন। সুধাময়ীর চোখে চোখ পড়তেই লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠল সুমিতা। বলল, আসব না কেন?

তবে? সুধাময়ী রাজেনের দিকে ফিরে বললেন, ও তো এখানে যাত্রা থিয়েটার দেখতে আসেনি, যে হঠাৎ একদিন এসে পড়েছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন কতদিনের বাঁধন ছিঁড়ে ছুটে এসেছে ও। না মা?

কী সর্বনাশ! সুধাময়ী কি অন্তর্যামী নাকি! যুগপৎ ভয়ে ও লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে উঠল সুমিতা। ঘাড় নেড়ে 'না না' করে উঠতে গেল। কিন্তু চোখের পাতা নামিয়ে শুধু হাসল। তাও যেন ধরা পড়ে যাওয়ার হাসি।

সুধাময়ীই আবার বললেন, তা বলে কি তুমি শুধু খোকার কাছে এসেছ, না, খোকাকেই দেখতে এসেছ। ওটা উপলক্ষ মাত্র। আসলে এদিকটা তোমাকে টেনেছে আজ।

তারপর সুমিতার আড়ষ্টতা দেখে বললেন, তোমাকে আমার বড় ভাল লাগছে মা। তোমার চোখের চাউনি, তোমার মুখ দেখে, কথা আপনি বলতে ইচ্ছে করে। আমাদের ঝগড়ার কথা বলছিলুম মা—

রাজেন বাধা দিয়ে বলল হেসে, অন্য কথা বল মা। ঝগড়ার কথা কেউ কাকে বলে নাকি আবার।

—আমার তো ওই এক কথাই আছে খোকা। যে যা-ই বলুক, তোর সঙ্গে আমার ঝগড়াটাই তো আসল।

—তা হলে আমি বরং উঠি মা। সুমিতাকে বলল, তুমি বসো, আমি বরং আমার ঘরে গিয়ে বসি। শুধু শুধুই হয়তো ফিরে যাবে অনেকে। আর তুমিও বারে বারে বাধা পাবে মা। একটু পরে আমি আসব।

রাজেন উঠে দাঁড়াল। একটু ছায়া ঘনিয়ে এল সুমিতার চোখে। রাজেনের চলে যাওয়াটা ও চায়নি। সামনাসামনি বসে কথা বলবে দু'জনে, সুমিতা শুনবে। সুধাময়ী বললেন, তোর কোনো বাধাকেই তো আমি মানিনে খোকা। সে ভয় আমি করিনে। মেয়েটা এসেছে, বোস্ না। ঝগড়ার কথা না হয় না-ই বললুম, আমার দুঃখের কথা বলব তো।

ভীরু সংশয়ে তাকিয়েছিল সুমিতা রাজেনের দিকে। কিন্তু রাজেনের মুখে রাগবিরাগের কোনকিছুরই ছায়া পড়েনি। বরং একটু হাসিই যেন লেগেছিল তার ঠোঁটের কোণে। বলল, এত যে দুঃখ দুঃখ করছ মা, দুঃখ তো তোমার একটি।

সুধাময়ী যেন ছেলেমানুষের মত চোখ বড় করে হেসে বললেন, সেটা কি বল্ তো?

—কেন এ বাড়িটা ছেড়ে যাইনে আমি।

সুধাময়ী বললেন, সেটা একটা দুঃখ বটে। আচ্ছা, তুমিই বল তো মা, এই বিরাট পোড়ো বাড়িটার অর্ধেক মালিক খোকা। আমি বলি, এটা তুই বিক্রী করে দে। আমি তার বদলে রাজপুরী চাইনি। আমার লোভ নেই, সাধ তো আছে। এটাই বরং রাজপুরী। রাজা নেই, এ যেন বন্দপুরী। তার চেয়ে সব বিক্রি করে, নতুন একটা ছোটখাট বাড়ি করে চল্ আমরা একটু খোলামেলা যায়গায় যাই। তা নাকি যেতে নেই।

রাজেন হেসে ফেলল।—যেতে নেই বলিনি মা। যাওয়া চলে না। নতুন বাড়ি করতে যে অনেক টাকা লাগবে।

—এ বাড়ির অর্ধেকটা বিক্রি করলে কি টাকা পাওয়া যায় না?

—যায়।

—কিন্তু তুই পারিস্নে। তুই যে বিপ্লবী হয়েছিস্, তাই তোর আবার বাড়িঘর কিসের, নাকি?

রাজেন গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, বিপ্লবী বলে ঠাট্টা করছ কেন মা।

—ছি খোকা! তোকে আমি কোনদিন ঠাট্টা করিনি এসব নিয়ে।

—না-ও যদি করে থাক, আমার বিশ্বাসকে তুমি অসম্মান কর।

সুধাময়ীর চোখে শঙ্কার ছায়া। বললেন, মিছিমিছি অত বড় বড় কথা বলিস্নে খোকা। তোর বিশ্বাসকে আমি অসম্মান কোনদিনও করিনি। তা বলে যেটা আমার ফাঁকি বলে মনে হয়েছে, সেটা আমি বলব না?

—কোন্‌টা ফাঁকি মা। বাড়ি না করাটা?

—হ্যাঁ বাবা, ওটাও একটা।

সুধাময়ীর গলার স্বর নেমে এল হঠাৎ। বললেন, কি এক নির্দয় নীতি আর আদর্শ তোর, যেন বাড়িটা একটা পাপের মত তোর কাছে। যেন, তোর যা পথ, সে পথে চলতে গেলে ভালভাবে বাস করাটাও অন্যায়। এ বাড়ি ছেড়ে যদি তুই আজ বস্তিতে গিয়ে থাকিস্‌, তাইতেই কি তোর উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে। তোর গোঁড়ামি কেন? তুই কুলি মজুর নোস্‌, সন্ন্যাসীও নোস্‌। পরকে ঠকিয়ে বড়লোকও হোস্‌নি। সুবিধে অসুবিধের কথাও বলিস্‌নে কখনো। যেন তোর আদর্শেই বাদ সেধেছে।

রাজেন বলল, তাও বলতে পার মা। সব জীবনে সব জিনিস তো খাটে না।

—তা' হলে ভেক নিয়েছিস্‌ বল্‌।

—কিসের ভেক?

—এই ধার্মিকদের মত ধর্মের ভেক। এ করতে নেই, ও করতে নেই। যোগীদের ভিক্ষে পাওয়ার মত তোদের আদর্শেও ভেক না হলে চলে না?

—তোমার ওই যোগীদের মত ভেক আছে কি না জানি নে। কিন্তু আমার আদর্শ নীতি দল সমস্ত কিছুরই একটা পরিচয় আছে।

—কি পরিচয় খোকা। তোকে চিরকালই বাউণ্ডুলে হয়ে পথে পথে ঘুরতে হবে। ঘর নয়, বাড়ি নয়, স্ত্রী-পুত্র পরিবার নয়, দুঃখ দিয়ে দিয়ে মারবি নিজেকে। মরণের একি তপস্যা তোদের, খোকা···

সুধাময়ীর কণ্ঠস্বর চেপে এল। জল দেখা দিল চোখে। বললেন, জানি, তোকে নিয়ে আমি আর দশটা মায়ের মত সুখে দুঃখে ঘর করতে পারব না। তুই জেলে যাবি, হয়তো সেখান থেকে কোনদিন আর ফিরবি না তুই। কিন্তু তোদের এ সবই যে নীতির জন্যে নীতি করা। যন্ত্রের মত। প্রাণ দিতে হবে, তাই প্রাণ দেওয়া।

সুমিতার যত ভয় করছিল, ততই চোখ ফেটে জল আসছিল সুধাময়ীর কথাগুলি শুনে। ঘরের আবহাওয়া গম্ভীর আর ভারী হয়ে উঠেছে। মা আর ছেলেকে দেখে এখন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে উঠেছে যেন। সুধাময়ী কথা বলতে বলতে এমন জায়গায় এসে পড়বেন, কল্পনাও করতে পারেনি সুমিতা।—

রাজেন বলল, তুমি যে সবই আমার বিকৃত করে দিলে মা। আমার গোটা জীবনের পেছনে কি কোন উদ্দেশ্য নেই।

—আছে বৈ কি খোকা। সবাই বলে, সে একটা কিছু পেতে চায়। বাড়ির কথাটা কিছু নয়। ওটার সঙ্গে তোর মনেরই কোন মিল না হয় নেই—তবু, মন সবার বড় জিনিস। সে যদি তৈরী থাকে, কোন কিছুই আটকায় না খোকা। চারদিকে তোদের এত নীতির বেড়া, সে যেন কাঁটা তারের বেড়া।

—কাঁটা তার নয় মা। কিন্তু নীতি কঠিন হওয়াই তো প্রয়োজন। নইলে নীতিবিচ্যুতি ঘটবে পদে পদে। সুশৃঙ্খলভাবে তাকে চালিত করতে হবে। সেখানে কোন ফাঁক রাখলেই সব ভেসে যাবে মা।

সুধাময়ী এবার হাসলে। সুমিতাকে বললে, দেখ মা, খোকার ভয় দেখ। এ তো ভয়ের কথা, সাহসের কথা তো নয়। সুশৃঙ্খল মানে, পায়ে-বেড়ি-শেকল নয় তো রে। নীতি তো তোর আসল কাজকে তলিয়ে দেওয়ার জন্যে নয়। তোদের যেন সব পায়ে বেড়ি, পদে পদে মন্ত্র আওড়াচ্ছিস্। রুক্ষ, নিষ্ঠুর, কঠোর। কিন্তু আনন্দ কই তোদের। আনন্দ ছাড়া যে কোন কাজই হয় না।

রাজেন দৃঢ়স্বরে বলল, তুমি ওসব ধোঁয়াটে কথা বলো না মা।

সুধাময়ী বললেন, ওরে, ধোঁয়াটে কথা নয়। আনন্দ না থাকলে মানুষের প্রাণের মহাপ্রাণী যে দম চাপা পড়ে মরেন।

রাজেন তেমনি স্বরেই বলল, ধোঁয়াটে কথাই বলছ মা। এসব তোমার ভগবৎ প্রেম। যে কোন বড় কাজের জন্যেই নীতি আর শৃঙ্খলা চাই।

—চাই। একটা সংসার চালাতে গেলেও নীতি-শৃঙ্খলা চাই। কিন্তু সেটা দিবানিশি রক্তচক্ষু দেখিয়ে নয়। বাধ্যতামূলক নয়। বুঝলুম, তোর ভগবৎ-প্রেম নেই, একটা প্রেম তো আছে। মানুষে প্রেম।

—মানুষে প্রেম মানে এ নয় মা, আমার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে নীতি বিচ্যুতিকে প্রেম দেখাব।

—কারুর বিচ্যুতি কাটাতে গেলেও তাকে ভালবাসতে হবে। তাকে আঘাত করে নয়। যে গরীব মানুষগুলোকে নিয়ে তোর কাজ, তোর নীতি, তাদের তুই মানতে বাধ্য করতে পারিস? তাদের তুই জোর করে নিজের পথে চালাতে পারিস্?

—নীতিকে সে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে নিলে, তখন বাধ্যবাধকতা থাকবে বৈকি।

সুধাময়ী তীক্ষ্ণ-চাপা গলায় বলে উঠলেন, কখ্‌খনো না। তাদের তো তুই শাসন করিস্‌নি, পথ দেখাস্‌। তাদের তুই ভালবাসিস্‌, তুই তাদের বন্ধু। এই ভালবাসাকেই আমি বলি আনন্দ। এ আনন্দ না থাকলে, তুই তোর কাজকর্মে দিশা পাবি কেন? তুই বলিস্‌, মা, আমি দেশটাকে বুঝতে চাই, দেখতে চাই। সে শুধু আদর্শ দিয়ে। প্রাণ দিয়ে নয়? খোকা, ভয় আর ভক্তি বড় খারাপ জিনিস। আমি যে মাঝে মাঝে দেখতে পাই, তোকে অনেকে ভয় পায়, ভক্তিও কম করে না। কিন্তু তারা তোর কাছ থেকে দূরে পালিয়ে থাকতে চায়। যেটুকু আসে, সেটুকু এক ছিটে ভালবাসা বোধহয় আছে বলেই।

রাজেন তীব্র হেঁসে বলল, তারা ভীরু মা?

সুধাময়ী আরক্ত হয়ে উঠলেন। কঠিন গলায় বললেন, হ্যাঁ, তারা ভীরু, মূর্খ, কুসংস্করাচ্ছন্ন। রাজেনদাদাকে তারা বোঝে না, তাদের নাকি সে ভাল করতে চায়, জীবনের সব অন্ধকার দূর করতে চায়, তাই তার কাছে আসে। রাজেনদাদা ভাবেন, লোকগুলোর আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, আমি তাদেয় উপায় করছি, না?

দু'জনে যেন ভুলেই গেছে, কাছে বসে আছে সুমিতা। সর্বনাশ, এই কি মা আর ছেলের ঝগড়া। সুমিতা যেন মন্ত্রমুগ্ধ। একটি নিঃশ্বাস ফেলেও নিজের অস্তিত্ব জানাতে চায় না। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে ভয় হচ্ছে, কখন কি একটা অঘটন না জানি ঘটে যায়।

রাজেনের মেঘমন্দ্রিত কণ্ঠস্বর এই বুকচাপা ঘরটার মধ্যে গম্‌গম্‌ করে উঠল, জানিনে মা তোমার ভালবাসার কী মানে হয়, কী তার রূপ। কিন্তু আমি জানি, নীতি নিয়ম শৃঙ্খলাকে বাদ দিয়ে ভালবাসা হয় না।

সুধাময়ী অন্যদিকে তাকিয়ে আছেন। বললেন, মিথ্যা। ভালবাসা ছাড়া নীতি নিয়ম কিছু নয়। সংসারের মহাপ্রাণীর কিছুই যায় আসে না তোর নিয়ম নীতিতে।

রাজেন নীরব। তার বিদ্যুচ্চকিত দৃষ্টি থির বিজুরী আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে হারিয়ে গেল শূন্যে। সারা কপালটি জুড়ে যেন স্থির বিজলী মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছে।

সুধাময়ী যেন শিউরে উঠে ডাকলেন, খোকা।

রাজেন বলল, মা, তুমি শুধু ভালবাসা ভালবাসাই বল।

সুধাময়ী বললেন, এছাড়া যে আর কিছু বুঝতে শিখিনি বাবা।

—কিন্তু মা, আমি দেখি এ সংসারে হিংসা, অপমান, পীড়ন প্রতি পদে পদে। আমি দেখি, মানুষ বড় অসহায়, তারা মার খাচ্ছে পড়ে পড়ে। আমি যে শুধু জ্বলি এসব দেখে। তোমার ভালবাসার কথা শুনলে ভয় করে আমার। ভয় করে, আমি হারিয়ে যাব।

সুধাময়ীর দু' চোখ জলে ভেসে গেল। বললেন, ওই জ্বলুনিই তোর ভালবাসা খোকা।

—কী জানি। ভালবাসা রাত পোহালে হবে। কোন অন্যায় আর পাপ নিয়ে আমি এগোইনি। সারা মানুষের জীবনে যে সর্বনাশ উদ্যত, তার সর্বনাশ করতে আমরা কঠোর হব, নিষ্ঠুর হব ; নিয়মে নীতিতে নির্ভুল কঠিন পথ ছাড়া হবে না।

সুধাময়ী ফিস্ ফিস্ করে বলতে লাগলেন, আক্রোশ, আসল মনের কথা নয়। ঘেন্না দিয়ে কোন বড় কাজই হয় না। তারপর সহসা চমকে উঠলেন সুমিতার দিকে তাকিয়ে। তাড়াতাড়ি ওর একটি হাত চেপে ধরে বললেন, ছি ছি, খোকা, ঝগড়ার কথা বলতে গিয়ে এ মেয়েটার সামনে ঝগড়া করে ফেললুম রে। তুমি বোধ হয় রাগ করছ মা ?

সুমিতা ওর চোখের জলের লজ্জা ঢাকতে গিয়ে বলল, না না একটুও রাগ করিনি। ভয় করছিল···

সুধাময়ী জড়িয়ে ধরলেন সুমিতাকে বুকে।—দেখলে তো আমাদের ঝগড়া। এ ছাড়া, চালডালের জন্যেও কম ঝগড়া করিনে ?

রাজেনও লজ্জিত হয়ে পড়েছে অনেকখানি। সুমিতার দিকে তাকিয়ে তার মুখ কোমল হয়ে এল। বলল, হল তো মা'কে দেখা ? এরপর কথা বন্ধের ব্যাপারটা তো বলাই হল না। সে সব আরেকদিন হবে, আজ চল। অনেক দেরি হয়ে গেছে। তোমার বাড়ির সবাই ভাববেন।

সুধাময়ীকে আবার প্রণাম করতে যাচ্ছিল সুমিতা। উনি ধরে ফেলে, চিবুকে আঙুল ঠেকিয়ে চুমা খেয়ে বললেন, আবার এসো মা, তোমার পথ চেয়ে থাকব।

আবার সেই, দু'পাশে ঘর-চাপা সরু স্যাতা গলি-পথ। হ্যারিকেন হাতে আগে আগে রাজেন। সুমিতার ভয় নেই, হোঁচট লাগল না। আবার সেই বারান্দা। ডানদিকে ঘুরে গিয়ে, একটি ঘরের দরজা খুলল রাজেন। রাজেনের ঘর, তার গোটা সংসারটা এখানেই।

পলেস্তারা খসা, পুরনো ঘরটিতে, শ্রীহীনের মধ্যে এতখানি শ্রী আশা করেনি সুমিতা। একপাশে, তক্তপোশের কঠিন শয্যা। দেয়ালের দু'দিকে সস্তা কাঠের শেল্‌ফ দেয়াল জুড়ে রয়েছে। তাতে শুধু বই, বই আর বই। অধিকাংশই যেন পুরনো বই। পিজ্‌বোর্ডের বাঁধাই পেরিয়ে হঠাৎ এক আধটু রেকসিন্ মরক্কোর চাকচিক্য। বৈরাগীর মাটিতে লুটনো আলখাল্লায় এক আধ চিলতে সিল্ক বেনারসীর মত। কোথাও অগোছালো নেই, ধুলোর আস্তরণ পড়ে নেই। বোঝা যায়, সর্বদাই একটি সাবধানী পরিচ্ছন্ন হাত ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে এই শেল্‌ফে। পুরনো টেবিল, ভাঙ্গা চেয়ার, ফাইল-পত্র, ফ্ল্যাগ, পোস্টার, সবই আছে ঘরটিতে। কিন্তু ছড়িয়ে ছত্রাকার নয়। প্রত্যেকটি জিনিস সাজানো গুছানো।

রাজেন বলল, মায়ের ঘর দেখলে, এবার ছেলের ঘরখানিও দেখে যাও।

সুমিতার সবই ভাল লাগছিল। তবু সুধাময়ীর ঘরে প্রাণের স্পন্দন। এখানে যেন কী এক কানুন দ্বারা বেষ্টিত। সেখানে সব সাজানো, এখানেও। তবু কোথায় একটি ব্যবধান রয়ে গেছে। সেখানে মেঝেতে এক ফোঁটা জল পড়লে, আঁচল দিয়ে মুছে দিতে ভাল লাগে। এখানে কোন কিছুতে হাত দেওয়ার আগে যেন একবার ভাবতে হবে।

সুমিতা বলল, কে এমন পরিপাটি করে রেখেছে এ ঘর।

—কে আবার! আমার সবকিছু আমিই রাখি। কারখানা ছুটির পর এখানে আসে অনেকে। কিন্তু আমি ময়লা হতে দিইনে। চারদিকে জঞ্জাল ছড়িয়ে রাখা ভাল লাগে না আমার। একেবারে কাজ করতে পারিনে নোংরা থাকলে।

কিন্তু সুমিতা দেখেছে যদিও কম, শুনেছে বেশী যে, রাজেনের-গোত্র মানুষগুলির দেহ থেকে বাসস্থান, সবই বিশৃঙ্খল। আর এ যেন রাজেনের

পুজোর ঘর। বৈরাগীর আলখাল্লা বটে। সেটি ধূলিমলিন নয়। যেন সাজি মাটি দিয়ে কাচা। কোথাও ত্রুটি নেই। অনুষ্ঠানের সবকিছু সাজানো থরে থরে।

রাজেনের কথা শুনতে শুনতে, এক সময়ে আর চোখ ফেরাতে পারল না সুমিতা। যেন আর এক মূর্তিতে দেখছে সুমিতা রাজেনকে। চোখের দৃষ্টি তার যেন কোন সুদূরে নিবদ্ধ। যেন ধ্যান-ভাঙা চকিত রাজেন রুদ্র সন্ন্যাসীর মত দেখছে চারদিকে। কী এক সর্বগ্রাসী অনাচার দেখে, প্রাণ তার ফুঁসছে ভিতরে ভিতরে। জীবনে কোনো ভান নেই তার। টান নেই ঘরের, প্রেমের, কোনো মানুষের। তার শক্ত নিষ্ঠুর বিশাল কপালে আঘাত করছে ঝড়। কিন্তু ঝড়োপাখীটা তীক্ষ্ণ চোখে খুঁজে বেড়াচ্ছে তার আসল ঠাঁই। অস্থির, উদ্দীপ্ত, কিন্তু মন যেন পুরোপুরি বিক্ষিপ্ত। তাকে এক জায়গায় কেন্দ্র করে, নিশানা ঠিক করতে পারছে না।

অথচ বাইরে সেই বিক্ষুব্ধ অন্তরের কোন ঢেউ খুঁজে পাওয়া যায় না। মনের মধ্যে বার বার চমকে উঠল সুমিতার। একটা সুদূর ভয় ওর প্রাণের দরজায় নাড়া দিতে লাগল। কিন্তু নিকটে ওর সমস্ত প্রাণটা ব্যাকুল হয়ে উঠল। চোখ ফেটে জল আসছে ওর। দুঃখে নয়, এক বিচিত্র আশায়, আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠতে লাগল সারা অন্তর।

এ কিসের অনুভূতি, জানে না সুমিতা। রাজেনকে দেখে ওর আশা মিটছে না। রাজেনকে দেখে ওর প্রাণে ভয়েরও সীমা নেই। এত সুন্দর মানুষ কাউকে দেখেনি সুমিতা। কিন্তু এত ভয় ভয়ও কাউকে দেখে হয়নি।

হঠাৎ রাজেনের দৃষ্টি পড়ল সুমিতার ওপর। বিদ্যুৎ চমকালো তার চোখে। বলল, কিছু বলছ সুমিতা।

এক মুহূর্ত লাগল সুমিতার সম্বিত ফিরে আসতে। পরমুহূর্তে আরক্ত মুখে যেন মাটিতে মিশিয়ে গেল লজ্জাবতী। ঘাড় নেড়ে জানাল, না। নির্বাক বিস্ময়ে রাজেন সুমিতার দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক নিমেষ। তারপর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, চল তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

সুমিতা বলল নীচু গলায়, কত আর দেরি হয়েছে।

রাজেনের গম্ভীর গলা শোনা গেল, অনেক। চল, আর নয়।

সুমিতা মুখ তুলে দেখল, বলেও রাজেন ফিরে আছে অন্যদিকে। টেবিলের উপর কী যেন দেখছে ঝুঁকে। সুমিতা ডাকল, রাজেনদা।

রাজেন ফিরল। তার মুখে নেমেছে গাম্ভীর্য। সুমিতা বলল, কি হয়েছে? আপনি কি রাগ করেছেন।

রাজেন হাসবার চেষ্টা করে বলল, না তো। রাগ করব কেন? ভাবছিলুম।

—কী ভাবছিলেন?

—আমার নিজের কথা ভাবছিলুম সুমিতা। শোনবার মত কিছু নয়। চল তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

—চলুন।

বেরিয়ে এল দু'জনে। রাজেন শিকল তুলে দিল দরজায়। উঠোন পার হয়ে এসে পড়ল দু'জনে রাস্তায়। একেবারে ভিন্ন রাস্তা ধরে এগুলো রাজেন।

সুমিতা নিজেই বলল, ওঁর কথাগুলো কিছুতেই ভুলতে পারছিনে।

ওঁর অর্থাৎ সুধাময়ীর।

রাজেন বলল, তোমার খুব ভাল লেগেছে বুঝি?

একটু যেন শ্লেষের আভাস রাজেনের গলায়। সুমিতা বলল, শুধু ভাল-লাগা নয় রাজেনদা। এমন কথা আমি আর কখনো শুনিনি।

রাজেন বলল, শুনেছ, হয় তো এমনি করে শোননি। বাংলা দেশের সব মায়েরাই ওই কথাই তো বলে।

সুমিতা বিস্মিত-ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে বলল, সত্যি! আমার মাকে তো মনেই পড়ে না। কিন্তু আর কারুর মাকে তো আমি এমন কথা বলতে শুনিনি কখনো।

রাজেন বলল, কোন্ মা চায় সুমিতা, ছেলে তার শুধুমাত্র বিপ্লবী আন্দোলন করুক।

দৃঢ়স্বরে বলল সুমিতা, আপনার মা তো চান।

—সেটা ভুল সুমিতা। মা তা চান না। চাননা বলেই তো মায়ের এত যুক্তিতর্ক। আমি যদি আজ বিয়ে করে সংসারী হই, সব ছেড়ে দিই, তবেই মা সুখী।

সুমিতা প্রথমে মনে করেছিল, রাজেন ঠাট্টা করছে। কিন্তু মুখের দিকে

তাকিয়ে বুঝল, সেখানে একবিন্দুও ঠাট্টা নেই। সুমিতা বলে উঠল, কখখনো নয়। উনি তো আপনাকে ফিরে আসতে বলেননি। আপনার ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন।

রাজেন হেসে বলল, আমি একটা নীতির দ্বারা চালিত। মা কি করে আমার ভুল শোধরাবেন।

—তা হলে আপনাদের নীতিও উনি জানেন।

—না, নীতির ধার ধারেন না আমার মা। সব কিছুই যাচাই করে মা তার বিশ্বাস দিয়ে।

—সে বিশ্বাস তা হলে অনেক বড় রাজেনদা। উনি ভালবাসায় বিশ্বাস করেন।

রাজেন বিক্ষুব্ধ নয়, বরং হেসেই বলল, বুঝেছি, তুমি আমার মায়ের দলে ভিড়ে গেছ। মানব-কল্যাণের বিশ্বাসটা আমারো আছে। কিন্তু নীতি-বিহীন নয়।

সামনেই জনমুখর বড় রাস্তা দেখা যাচ্ছে গলির ভিতর থেকে। এ গলি, সে গলি নয়। মফস্বল শহরের এ গলি এর মধ্যেই নিঝুম হয়ে এসেছে। অল্প দু' একজন পথচারীর দেখা পাওয়া যায়।।

একটু নীরব থেকে বলল সুমিতা, আপনি রাজনীতি করেন, নীতি তো আপনার থাকবেই। কিন্তু আমার বড় ভয় করে রাজেনদা, আপনাদের নীতি শেষপর্যন্ত যান্ত্রিক না হয়ে ওঠে।

রাজেন বলল, যান্ত্রিক শব্দটাকে অমন করে অশ্রদ্ধা করছ কেন? সারা বিশ্বেও ওটা আজ ফেল্‌না নয়, বরং না হলেই চলে না।

সুমিতা চোখ নামাল রাজেনের চোখ থেকে। বড় রাস্তায় এসে পড়তেই, রাজেনের বিশ্ব উন্মুক্ত হয়ে পড়ল। কেউ ছুটে এসে কথা বলে। কেউ বলে দূর থেকে। হাত তুলে ইশারা করে কেউ। রাজেনও বলে। অধিকাংশই কলকারখানার মজুর। যেন সবাই ওরা এক সংসারের মানুষ। সেলাম নমস্কারের বালাই নেই। কেউ বলে মিলের কথা, সাহেবের কথা কেউ। ইউনিয়নের বিষয়ও আলোচনা করে যায় ওর মধ্যেই। সমস্তটা জুড়ে, এছাড়া যেন আর কিছু নেই রাজেনের জীবনে।

সুমিতা দেখল, রাজেনও যেন স্বপ্ন দেখে জেগে জেগে। দু'চোখে তার অহঙ্কার নয়, সত্যি সত্যি যেন স্বপ্নই নেমে এসেছে। এক বিচিত্র অনুভূতি

যেন ভর করেছে তার মধ্যে। মফঃস্বলের এই পথে, এক বিশাল বলিষ্ঠ উন্নত মানুষ মনে হচ্ছে রাজেনকে।

আবার কথা ভুলে যায়, তর্ক হারিয়ে যায় সুমিতার। এক নতুন মানুষকেই বারবার দেখে সুমিতা। যার তুলনা ও কাউকে দিয়ে পায় না।

রাজেন বলল, দাঁড়াও সুমিতা, এখান থেকে বাসে উঠতে হবে।

সুমিতা দাঁড়াল। কিন্তু চলে যাওয়ার জন্যে যেন প্রস্তুত হয়নি এখনো ওর মন। ঘরের ভিতর রাজেনের সেই মুখ ফিরিয়ে থাকাটা সংশয়ান্বিত করেছে সুমিতাকে। কেবলি মনে হচ্ছে, আমি ধরা পড়ে গেছি রাজেনের কাছে, ধরা পড়ে গেছি। কিন্তু তাতে সুমিতার কোনো লজ্জা নেই। রাজেন কি কিছু বলবে না আর ওকে। আর একবারও কি ইচ্ছে করে জিজ্ঞেস করবে না, কেন এসেছিল, বললে না তো সুমিতা।

বাসটা হু হু করে আসছে ধেয়ে। কপালের আলোটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে।

কেন এসেছিল আজ সুমিতা। শুধু কি দেখতে এসেছিল ছুটে রাজেনকে। তা তো নয়, জীবনের একটা বেড়াজালকে ভেঙ্গে, মুক্ত আকাশের তলায় এসেছিল ছুটে। ছোট মেয়েটির মত, সব বাধা ভেঙ্গে পাগলিনী হয়ে এসেছিল। কিন্তু মুক্ত আকাশের পিপাসা যে মেটে না কিছুতেই। এখুনি যে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না ঘরে।

কিন্তু বাইরের সংসারটা তাড়া দিচ্ছে ওকে। এবার ফিরে যেতে হবে।

বাস এসে দাঁড়াল। জল এসে পড়ল সুমিতার চোখ ফেটে। হাতল ধরতে যাচ্ছিল হাত বাড়িয়ে। হাতটি ধরে সরিয়ে আনল রাজেন। বলল, দাঁড়াও সুমিতা, পরের বাসে যেও।

অসহ্য লজ্জায় ও এক বিচিত্র অনুভূতিতে চোখের জলের প্লাবনটা কিছুতেই রোধ করতে পারল না সুমিতা। কোনরকমে প্রায় চুপিচুপি বলল, না না, থাক্। আরেকদিন আসব।

রাজেন বলল, না, পরের বাসে যেও। চল, আমরা ওই রাস্তাটা ধরে যাই। সামনেই গঙ্গার ধার পড়বে, মাঠের পথ দিয়ে একটু ঘুরে যাব।

অপেক্ষাকৃত নির্জন একটি রাস্তায় পড়ে সুমিতার লজ্জাটা বেড়েই উঠল। রাজেন ওর পাশে পাশে। যেন প্রচণ্ড একটা বিস্ময়ের ধাক্কাতেই কথা হারিয়ে গেছে তার।

রাজেন বলল, বাড়ি থেকে খুব মন খারাপ করে বেরিয়েছিলে বোধহয়।

সুমিতা নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে জানাল, না।

তবে ?

তবে ? তবে ? কিসের তবে। কেন কেঁদেছে সুমিতা ? সব কথা কি বলা যায়, না সব কারণ জানা আছে সুমিতারই। সুধাময়ী যে বললেন, 'সব বাঁধন ফেলে ছুটে এসেছে সুমিতা,' সে কথাটিও কি মনে নেই রাজেনের।

চোখ তুলল সুমিতা। রাজেনও তাকিয়েছিল। চোখ নামিয়ে নিল সুমিতা।

বোঝা যায় গঙ্গা কাছেই। বাতাস ছুটছে হু হু করে নির্জন পথ দিয়ে। দু' পাশে পাঁচিলের ধাক্কা খেয়ে, আবর্তিত হয়ে উঠছে।

রাজেনের আজানু-পাঞ্জাবিটা উড়ছে। খোলা বুকের বিশাল সীমানায় পড়ছে ঝাঁপিয়ে। সুমিতার সবই এলোমেলো, এলোচুল এসে পড়েছে ওর বুকের আঁচলে।

দু'জনেই যেন সব জিজ্ঞাসাবাদ পার হয়ে এসেছে। তারপরেও যেন কি একটা রয়ে গেছে দু'জনের মাঝখানে। তাকে প্রশ্ন করে জানা যায় না। যেন, যতদিন না জানা যাবে ততদিন দু'জনে এমনি করেই চলবে, বাতাস ঠেলে এলোমেলো হয়ে। এমনি নিঃশব্দে পাশাপাশি।

সুমিতা মুখ খুলল ! বলল, অনেকদিন আসব ভেবেছি পারিনি।

রাস্তার আলোয়, রাজেনের ঠোঁটের কোণে হাসিটুকু দেখা গেল। বলল, আজ পেরেছ।

আবার নীরব।

বাতাস ক্রমেই বেড়ে উঠছে। রাস্তার শেষ সীমানার মাঠ দেখা গেল। নীচেই গঙ্গা। দূর অন্ধকারে, নক্ষত্র প্রতিবিম্বে চিকচিক করছে জলধারা। বোঝা যাচ্ছে, ঢেউ নেই। জোয়ারে ভরে উঠেছে।

সুমিতার বুকের মধ্যে ধুকধুক করতে লাগল। হয় তো মেজদির কথা বলতে রাজেন হেসে উঠবে বিদ্রূপ করে। বলবে, তোমার মেজদিও একদিন এই চেয়েছিল সুমিতা। কিংবা হয় তো জিজ্ঞেস করবে আশীষের কথা।

কিন্তু রাজেন কিছুই বলল না। শুধু সুমিতার একটি হাত তুলে নিল নিজের হাতে। বলল, অবাক হতে গিয়েও হতে পারলুম না সুমিতা। এই

যেন স্বাভাবিক। মনে আমার কোনো গ্লানি নেই। কিন্তু দুঃখ পাচ্ছি এই সংশয়ে যে, জীবনের সবটা এখানেই নয়। তারপরেও অনেক থেকে যায়।

সুমিতার বুকে পশেছে বাতাস। পাগলা ঝোরা বইছে সেখানে। বলল, থাকবে কেন। জীবনের সবটা যেখানে, সেখানে তো কোন বিধিনিষেধ নেই।

—বিধিনিষেধ নেই, বাধা আছে অনেক।

—সব বাধা ফেলেই এসেছি।

—সেকথা আমি চিরদিন মনে রাখব সুমিতা। কিন্তু আজ সবে শুরু। সুমিতা মাথা নত করে বলল, শুরু হলে, শেষও হয়। আমার শুধু একটা ভয়—

—কিসের ভয় সুমিতা?

—আপনাকে বড় কঠিন মনে হয়।

—আমি কঠিন নই সুমিতা। আসলে এই বিশ্বসংসারটাই বড় কঠিন। আমাদের কাজকর্ম বিশ্বাস নীতি চিন্তা, সবই জড়িয়ে গেছে তার মধ্যে। আমার কাছে কোনো কিছুই সহজ নয়। গোটা জীবনটাই কঠিন। তুমিও কঠিন। হয় তো, এই মুহূর্তে তা বোঝা যাচ্ছে না। জীবনের ওই কঠিন জায়গাটাই আমাদের সকলের পাশ ফেলের জায়গা। ফেল করি আমরা বেশী। পাশ করা বড় দুরূহ।

সুমিতা তাকাল রাজেনের চোখের দিকে। অন্ধকারে চকচক করছে চোখ দু'টি। রাজেন ওর আর একটি হাত তুলে নিয়ে বলল, কি দেখছ?

সুমিতা মুখ নামিয়ে বলল, তোমাকে।

রাজেনের চোখেও হাসি। এই মুহূর্তে রাজেনের মুখখানি যেন সুধাময়ীর মত সকরুণ সুন্দর অথচ পৌরুষ মণ্ডিত। বলল, কবে থেকে দেখছ সুমিতা।

—বোধ হয়, প্রথম যেদিন দেখেছিলুম।

গেটে ঢুকতে গিয়েই মহীতোষের সামনে পড়ল সুমিতা। দু' চোখ ভরা উৎকণ্ঠা নিয়ে মহীতোষ দেখলেন সুমিতাকে। এ কি ধূলিধূসর বৈরাগিনী মেয়ে। বললেন, কোথায় ছিলে রুমনো এত রাত অবধি?

বাবার কাছে কথা লুকনো অভ্যাস কোনদিন নেই সুমিতার। কিন্তু নিজেকে নিয়ে বড় বিব্রত ও। এমন মূর্তি কেউ কোন দিন দেখেনি ওর। চোখে মুখে কোথাও ওর ক্লান্তি নেই। বরং কী যেন নিয়ে এসেছে চোখের চাউনিতে, ঠোঁটের হাসিতে। বলল, একটু হাওড়ায় গেছলুম।

মহীতোষের চোখেও বিস্মিত অনুসন্ধিৎসা। বললেন, হাওড়ায়? কাদের বাড়ি গেছলি?

যেন অবাধ্য বাতাসের মত সুমিতার চোখ মুখ কি একটা বলতে চাইছে। বলল, রাজেনদার সঙ্গে একটু দেখা করতে গেছলুম।

আর কোন কথা বলবার অবসর না দিয়েই জিজ্ঞেস করল, বড়দি ফিরেছে?

মহীতোষ বললেন, ফিরেছে। কিন্তু তুমি একটু খবর দিয়ে যাওনি কেন ঝুমনো।

—এত দেরি হবে, বুঝতে পারিনি বাবা।

—আমি সারাটা সময় বসে আছি তোমার পথ চেয়ে। আশীষ এসে বসেছিল অনেকক্ষণ। তারপর মনে হল, যেন একটু রাগ করেই সে চলে গেছে।

—রাগ করে?

—রাগ নয়, দুঃখই বলতে পার।

কথাটা শেষ হওয়ার আগে বাবার সঙ্গে আবার চোখোচোখি হয়ে গেল সুমিতার। তারপর প্রায় পালিয়ে গেল সুমিতা। মহীতোষ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন ওর পথের দিকে।

পালাবারই সময় এল সুমিতার। আশীষ এলে ও চা করে দেয়। অনেকক্ষণ ধরে কথা শোনে। তারপর আশীষ জিজ্ঞেস করে, তোমার কি শরীর ভাল নেই ঝুমনো?

সুমিতা একটু বিব্রত হয়ে বলে, ভালই তো।

কিন্তু সর্পিল হয়ে ওঠে আশীষের কপাল। ঢুলুঢুলু চোখে একটা রুগ্ন অস্থিরতা ওঠে ফুটে। বলে, আমার কথা কি তোমার ভাল লাগে না ঝুমনো?

সুমিতা বলে, কথা তুমি কতটুকু বল আশীষ। সবই তো তোমার যন্ত্রণা, বিদ্বেষ, অবিশ্বাস······

বলতে বলতে থামে সুমিতা।

আশীষ যেন ভীরু বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। কেমন যেন শক্ত হয়ে থাকে সুমিতা। আশীষ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারে না।

সুমিতাও যেন নতুন করে বিস্মিত হয়। রাজেনের কাছে যাওয়াটা যেন স্বপ্ন বলে বোধ হয় এক এক সময়। এ বাড়িতে বসে, বাবা, দিদি, আশীষ, এই সমস্ত-কিছু থেকে, হাওড়া এত দূরে, মনে হয় সে পথের দূরত্বের সীমা পরিসীমা নেই। সেই বাড়ি, সেই পরিবেশ, সমস্ত কিছুই এক ভয়ঙ্কর বেশে দেখা দেয় ওর সামনে। ভাবে, অসম্ভব, একেবারে অসম্ভব। কেমন করে যাবে ও সেখানে। জীবনের মনের, কোন কিছুর সঙ্গেই যে রাজেনের মিল খুঁজে পায় না সুমিতা। এখানে তো কোন দিনই পাবে না রাজেনকে। সব সময় যে রাজেনের কাছেই যেতে হবে। কিন্তু রাজেনের জীবনে ওর দাঁড়াবার জায়গাটা কোথায়।

ভাবে, আবার স্বপ্নটা দুঃস্বপ্নের মত বিদায় নেয়। অস্থির হয়ে ওঠে রাজেনের কাছে যাবার জন্যে।

ইতিমধ্যে সুগতা এল ফিরে। সারা দেহে তার রূপের বান ডেকেছে। চলতে ফিরতে যেন টলোমলো করে। উপচে পড়তে চায়। দূর দেশ থেকে, স্বাস্থ্যের রক্তাভা নিয়ে ফিরেছে গালে।

কখনো এ বাড়িতে থাকে, কখনো মৃণালের ওখানেও থাকে। মৃণালেরও স্বাস্থ্য ফিরেছে। সে একটা নতুন বাড়ি কিনতে ব্যস্ত। দু'জনেই নানান জায়গায় বাড়ি দেখে ফিরছে। তারপর মধ্য কলকাতায় আশী হাজার টাকায় বাড়ি কেনা হয়ে গেল। মহীতোষও হেঁকে ডেকে ছুটোছুটি করে বাঁচেন না। ওরা দু'টিতে যেন সচ্ছল আনন্দময় জীবনসাগরে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে।

মৃণালকে দেখা গেল, ব্যবসা নিয়ে চিন্তা করতে। আজ এখানে যায়, কাল সেখানে। সুগতা ওর নতুন বাড়িটাকেই নিজের কর্মক্ষেত্র করে ফেলল প্রায়। ওরই বাড়িটা ছাত্র সঙ্ঘের অফিস হয়ে উঠল প্রায়।

অর্থের সঙ্গে কি একটা যোগাযোগ আছে বাইরের জীবনের। সুগতার নেতৃত্বটা প্রচারিত ছিল অনেকখানি। সেটা যেন ফেঁপে উঠল হঠাৎ।

মাসখানেক পরে, হঠাৎ একদিন বিকেল পাঁচটা নাগাদ তাপসী ডাকল সুমিতাকে। ওদের বাড়ির ফোনে কে ডেকেছে সুমিতাকে। রিসিভার তুলে নিয়েই বড়দির গলা চিনতে ওর ভুল হল না। সুজাতা একটা ঠিকানা দিয়ে বলল, কাউকে না বলে একবার চলে আয় রুমনো।

যে ঠিকানায় এল সুমিতা উর্ধ্বশ্বাস ভয়ে, সেটা একটা নার্সিং হোম। নার্স ওকে একটা কেবিনে পৌঁছে দিল। দেখল, সেখানে সুজাতা রয়েছে শুয়ে। গর্তে বসা দু'টি অপলক করুণ চোখে তাকিয়ে আছে।

সুমিতা প্রায় কেঁদে চেঁচিয়ে উঠল, কি হয়েছে বড়দি।

সুজাতা বলল, বোস্, বলছি।

তারপর সুজাতার দু' চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে অনেক কথা বলল, সুজাতা। আজ আর বড় ছোটর কোনো বাধা রইল না দুই বোনের। রুমনিকে ছাড়া আজ আর কাউকে ওর সব চেয়ে বড় কলঙ্কের কথা বলবার লোক পায়নি খুঁজে। সুজাতা যতটা সম্ভব পরিষ্কার করে জানাল সুমিতাকে সব কথা। গিরীনকে ও স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে পারেনি, তাই গিরীনের দেওয়া সন্তান ধারণও সম্ভব হয়নি সুজাতার পক্ষে। মরবে না সুজাতা, এতে মানুষ মরে না। ও যেন বাবাকে একটা কিছু গুছিয়ে বলে। কেননা সুজাতার মাথায় কিছুই আসছে না।

তারপর সুমিতার দু'টি হাতে নিজের মুখ চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে উঠে বলল সুজাতা, একথা কাউকে বলিসনে রুমনি, শুধু তোর রবিদাকে ছাড়া। সে ছাড়া আমার কলঙ্কের কথা বলার আর কেউ নেই।

সুমিতার মনে হয়েছিল, ও বুঝি চীৎকার করে কেঁদে উঠবে।

ডাক্তার এসে সুজাতাকে শান্ত হতে বললেন।

ফিরে এল সুমিতা। ফেরবার পথেই রবির বাড়ি গেল, পাওয়া গেল না। রবিদার দিদি বললেন, রবি দিন সাতেকের জন্যে বাইরে গেছে।

সাত দিন পরে সুজাতা বাড়ি ফিরে এল। সুমিতা বলে রেখেছিল, বড়দি আমাকে বলে গেছে, সাত দিনের জন্যে সে ছুটি নিয়ে বেড়াতে গেছে এক বান্ধবীর বাড়ি।

সেইদিনই একটা চিঠি এল, শুভবিবাহের প্রীতিভোজের। রবিদার সঙ্গে অরুণাদির বিয়ে হয়ে গেছে গতকল্য। আগামীকাল প্রীতিভোজ।

(৩৩)

রবিদার বিয়ের প্রীতিভোজের চিঠি। চিত্রার্পিতের মত কয়েক মুহূর্ত অনড় হয়ে রইল সুমিতা। আজ পূর্ণ হয়েছে সাত দিন। আজই যে ওর

যাওয়ার কথা ছিল রবিদার কাছে। নিজের সংশয়, রবিদার সংশয়, সব সংশয়ের কুয়াশা যে এক লহমায় দূর হয়ে গেছে সুমিতার চোখে। সব সংশয় পেরিয়ে ও যে পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে, বড়দি কার মূর্তি বুকে করে ফিরছে। মনে প্রাণে এই বিশ্বাসই যে ছিল সুমিতার। মনে মনে তো তৈরি করেনি। যে সত্যকে দেখেছিল বড়দির চোখে, তাকে সুমিতা সাজিয়েছিল ওর মনের ইচ্ছে দিয়ে।

মহীতোষ চলে গেছেন কাজে। সুগতা ওর নিজের বাড়িতে। কিছুক্ষণ আগেই ফিরেছে সুজাতা। শুয়ে আছে তার ঘরে।

বৈশাখের বাতাস ফিরছে আগুন নিয়ে।

সুমিতার মনে হল, ওরই অসহায় জীবনের সমস্ত সান্ত্বনা, সব আশা ব্যর্থ করে গোটা সংসারটা পুড়ছে রুদ্র-চণ্ড-তাপে। মনে হল, রবিদার কাছে সঁপে দেওয়ার জন্যে নিজেই যেন প্রতীক্ষা করে ছিল এতদিন। বড়দি নয়, সুমিতা নিজেই সেই ছদ্মবেশিনী অভিমানিনী প্রেমিকা। যার বুক বিদীর্ণ হয়েছে অন্তরে অন্তরে, কিন্তু মুখ ফোটেনি। জীবনের ফুল আর ফলহীন পাতাবাহারের রঙ-ঝাড় যাকে বিপথে নিয়ে মেরেছে এলোপাতাড়ি। মার খেয়েও সে হৃদয়ের নির্দেশে উজানে দিয়েছে পাড়ি। কিন্তু পাড়ি দেওয়ার সব সাহসকে ভেংচে, শ্লেষ করে ওঁর হাতের চিঠি যেন হাসতে লাগল।

রবিদার মুখখানি মনশ্চক্ষে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল সুমিতা। কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ল না। কিছুতেই না। চোখ ফেটে জল এসে পড়ল, এমন কি, রবিদার গলার স্বরও যেন বাজতে লাগল কানে। তবু কি এক বিচিত্র কুয়াশা ঢেকে রাখল রবিদাকে।

ঠিক এই মুহূর্তে, একেবারে পিছনেই সুজাতার ডাক শুনে চমকে উঠল সুমিতা। ওর বুকের অকূলে চিঠি লুকোতে উদ্যত হয়েই থেমে গেল।

সুজাতা বলল, কিসের চিঠি ওটা ঝুমনো।

রং নেই সুজাতার মুখে। রূপে ও স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে এক অদ্ভুত তীক্ষ্ণতা ঘিরে থাকত ওকে। সে মূর্তি শাণিত, খরো। এখন সেই দীপ্তিটুকু শান্ত, স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে।

লুকোবার অবসর পেল না সুমিতা। সহসা কোন মিছে কথা যোগাল না মুখে। শুধু ব্যথিত-উৎকণ্ঠায় আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এক নিমেষ। তারপর চিঠিটা বাড়িয়ে দিল সুজাতার দিকে।

চিঠি পড়ে কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল সুজাতা। চিঠির প্রতিটি শব্দ যেন পুড়িয়ে ছাই করে দিল সারা মুখখানি। নীরক্ত মুখে কল কল করে স্বেদধারা গড়িয়ে পড়ল। হাত বাড়িয়ে একটা চেয়ার ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

সুমিতা পালিয়ে যাবার জন্যে ছটফট করেও পালাতে পারছে না। ভয় হচ্ছে, বড়দি সামলাতে পারবে না।

একটু একটু করে যেন সুজাতা ফিরে এল নিজের কাছে। চিঠিটা রেখে দিল টেবিলের ওপর। তারপর সুমিতার দিকে ফিরে, কাছে এসে শান্ত গলায় বলল, কাঁদিসনে ঝুমনো।

কথাটির মধ্যে ঘটনার সবচেয়ে মর্মান্তিক রূপটিই যেন ধরা পড়ে গেল। সুমিতা আঁচল চাপল মুখে।

সুজাতা সুমিতার পিঠে হাত রেখে কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, বিলাসকে ডেকে বল্ ঝুমনো, একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে।

সুমিতা ওর ভেজা চোখে উদ্বেগ নিয়ে বলল, কোথায় যাবে বড়দি?

সুজাতা যেন বড় শান্ত। ধীর পায়ে একটি সোফায় গিয়ে বসল। বলল, একবার কারদেজোর অফিসে যাব।

—আজ থাক না বড়দি।

সুজাতা বলল, কোনো ভয় নেই ঝুমনো। শরীর আমার ভাল আছে।

সুজাতার শান্ত স্থির মূর্তির দিকে তাকিয়ে ভয়ে কেঁপে উঠল সুমিতার বুক। কাছে এসে বলল, হঠাৎ কেন যেতে চাইছ বড়দি।

সুমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল সুজাতা। স্নিগ্ধ-শান্ত সেই হাসিতে যেন একটি স্বপ্নের সুদূর অস্পষ্টতা। বলল, একটু কাজ আছে। শুভেন্দুকে কয়েকটি কথা বলতে হবে।

—আমি যাব তোমার সঙ্গে।

কেমন যেন ক্লান্ত সুজাতা, বাধা দেওয়ার ক্ষমতাটুকুও নেই। বলল, চল্।

গাড়ি ডেকে নিয়ে এল বিলাস। সুজাতা কাপড় বদলে, পাউডার বুলিয়ে, কালো গগল্স আঁটল চোখে। লিপস্টিক বুলিয়ে নিল ফ্যাকাশে ঠোঁটে। প্রতিটি মুহূর্তে সুজাতার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি লক্ষ্য করে দেখল সুমিতা। কি এক গভীর ভাবনায় বিভোর বড়দি। থেকে থেকে কুঁচকে উঠছে ভ্রূ-লতা। ঠোঁটের কোণে একটি সর্পিল রেখা চিকচিক করে উঠছে বিদ্যুতের মত। যেন কি ভুলে গেছে। কি মনে পড়ছে থেকে থেকে।

কারদোজোর লিফ্‌টে ওঠবার সময় মনে হল, বড়দির মধ্যে একটি চাপা উত্তেজনা থম্‌থমিয়ে উঠছে।

শুভেন্দুর সুসজ্জিত ঘরের কাছে এসে সুমিতা চুপি চুপি বলল, আমি ভিতরে যাব বড়দি ?

সুজাতা বলল, যাবি বৈকি।

ঘরে ঢুকতেই শুভেন্দু এক নিমেষ স্তব্ধ হয়ে রইল। পরমুহূর্তেই প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, হেল্লো, এসো।

সুমিতাকে দেখে আরো উৎসাহিত হয়ে উঠল। কিন্তু বিস্ময়ে তার রক্তাভ মুখ আরো লাল হয়ে উঠল। বলল, আসুন, আসুন।

সুজাতা বলল, আমার ছোট বোন সুমিতা।

—আই সী! চিনি তো আমি।

একটি অ্যাংলো মেয়ে সুজাতার টেবিলে কাজ করছিল। শুভেন্দু তার দিকে ফিরে বলল, ইউ মিস্‌, ইফ্‌ ইউ কাইণ্ডলি লীভ আস্‌ ফর এ ফিউ মিনিটস্‌।

—ও, শিওরলি!

মিস্‌ তার কালো চোখের কটা চাউনি দিয়ে দুই বোনকে দেখে বেরিয়ে গেল হিল্‌ খট্‌খটিয়ে।

সুমিতা অবাক হয়ে দেখল, শুভেন্দু এক পলকের জন্যও চোখ ফেরাতে পারছে না বড়দির উপর থেকে। ঠিক নির্লজ্জ নয়। মুগ্ধ নয়নে যেন সঁপে দিতে চাইছে।

শুভেন্দু বলল হঠাৎ যে, আজ তো জয়েনিং ডেট নয়।

সুজাতা বলল, একটু বিরক্ত করতে এলুম।

শুভেন্দুর মুখ দপ্‌দপিয়ে উঠল। আত্মহারা স্বরে বলল, সো কাইণ্ড অব ইউ।

সুজাতা মুখ নামিয়ে বলল, একটা বিশেষ প্রত্যাশা নিয়ে এসেছি। শুভেন্দুর যেন বুক দুরু দুরু করছে। উত্তেজনায় কথাও বলতে পারছে না বুঝি। কোনরকমে অস্পষ্ট গলায় বলল, উপায় থাকলে কোন ত্রুটি হবে না।

সুজাতা বলল, তেমনি মুখ নামিয়ে রেখেই, কারদেজোর বোম্বে অফিসে আমি যেতে পারিনে কোনরকমে ?

ঠিক যতখানি চম্‌কে উঠল সুমিতা, ততখানি শুভেন্দু। বলল, হঠাৎ ?

হঠাৎ নয়, অনেকদিন থেকেই ভাবছিলুম। বলতে ভরসা পাইনি। ব্যাকুল চোখ মেলে ধরল সুজাতা শুভেন্দুর উপর। দু'চোখে তার অশেষ মিনতি।

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ নিস্তব্ধতা সারা ঘরে। শুভেন্দু চোখ সরিয়ে নিল সুজাতার মুখ থেকে। পেন্সিল দিয়ে রাফ প্যাডের উপর হিজিবিজি কাটতে লাগল। হিজিবিজি, কেবলি হিজিবিজি। শুভেন্দুর মগজটাই যেন কাগজে দাগ ফেলছে। সুস্মিতারও।

সংশয় ছিল, নানান কথা জিজ্ঞেস করবে শুভেন্দু। কেন, কি হয়েছে। কিন্তু কিছুই না জিজ্ঞেস করে, হঠাৎ পেন্সিলটা রেখে দিয়ে বলল, ইয়েস্, ইউ ক্যান্।

আমার সাতদিন সময় চাই। হেড অফিস থেকে ব্রাঞ্চে পাঠাতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না।

সাতদিন ?

সুজাতা এতটা আশা করেনি। কি যে বলবে ভেবে পেল না খানিকক্ষণ। তারপরে বলল, নিশ্চয় হবে। সাতদিনের দু'দিন বেশী হলেও ক্ষতি নেই। শুধু যাওয়া হলেই হয়।

শুভেন্দু যেন ফুলছে আর লাল হচ্ছে। বলল, হবে, হবে না কেন! এটা আমারই ক্ষমতার মধ্যে। অথরিটির সঙ্গে একটু কথা বলে নিতে হবে, একটা চিঠি পাঠাতে হবে বোম্বের অফিসে। যেদিন জবাব আসবে, সেইদিনই তুমি স্টার্ট করতে পারবে।

এবার যেন সুজাতার পক্ষ থেকেই কিছু বলার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। শুভেন্দু যে এমনি করে রাজী হবে, ভাবতেও পারেনি। তাড়াতাড়ি এই আবহাওয়াটা কাটাবার জন্যে বলল, অমলা আসে ?

শুভেন্দু আবার আগের মত দেখছে সুজাতাকে। বলল, হ্যাঁ আসে। তোমার কথা রোজই বলে। ওর স্বামী চলে গেছে। একলা আছে এখন।

—কোথায় আছে ?

—ওই বাড়িতেই। তবে ছেড়ে দেবে দু' চারদিনের মধ্যেই। পার্কসার্কাসে কোথায় একটা ছোট্ট ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে। তুমি আসার আগেই ফোন করছিল। আজ তো শনিবার, ও টালিগঞ্জে গেছে।

রেস্ খেলতে গেছে অমলা।

আবার খানিকক্ষণ নীরবতা। সুজাতা বলল, কি হবে ওর, মিঃ কর ?

শুভেন্দু একবার সুমিতাকে দেখে, আবার সুজাতার দিকে ফিরে বলল, কার কি হবে, আমরা কি কেউই জানি ?

সুমিতাও বুঝল, কথার ছলে এ শুধু শুভেন্দুর বড়দিকেই বিশেষ জিজ্ঞাসা।

সুজাতা বলল, তা ঠিক। আমরা কেউ কিছু জানিনে।

শুভেন্দু বলল চাপা মোটা গলায়, নিজেদের কথাই আমরা জানিনে। আমি কেন কলকাতায় আছি, তুমি কেন বোম্বেতে যাচ্ছ, অমলা কেন টালিগঞ্জে গেছে।

বলে ভাবলেশহীন মুখে হঠাৎ একটু হেসে উঠে বলল, আর কেনই বা সুমিতা দেবী তোমার সঙ্গে ঘুরছেন।

আরক্ত হয়ে উঠল সুমিতা। কিন্তু এই লোকটার উপর অনেকদিন ওর যে মনটা বিরূপ ছিল, সে হঠাৎ ব্যথিত হয়ে উঠল।

সুজাতা বলল, ওকে আপনি বলার দরকার নেই। মনটা বোধ হয় ভাল ছিল না, তাই বেরিয়ে পড়েছে আমার সঙ্গে।

শুভেন্দু বলল, না না আমি কোন কারণ জিজ্ঞেস করিনি। বলছিলুম, আমরা কেউই কিছু জানিনে।

—ওর সামনে কোন সঙ্কোচের কারণ নেই।

শুভেন্দুর মনের উত্তেজনা দেহেও চাপা থাকে না। বলিষ্ঠ পেশল শরীরটা তার জামা-প্যান্টের ভাঁজে ভাঁজে ছটফটিয়ে মরতে লাগল। চোখ দু'টিও লাল হয়ে উঠেছে আগের তুলনায়। বলল সঙ্কোচ করব কেন। আই অ্যাম্ নট এ ব্রুট লাইক আনফেইথফুল, বাট আই অ্যাম্ এ নন বিলিভার। আমাকে তুমি একটা ঘাগী অবিশ্বাসী বলতে পারো, তার জন্যে আমার ব্যবহার নিশ্চয় তোমাকে ঘৃণা করতে শিখিয়েছে আমাকে।

—না, না······

—দেন, ইউ হ্যাভ এ গ্রেট হার্ট। করলেও আমার বলার কিছু থাকত না। আমি যা, আমি তাই। তাতে যদি তুমি দুঃখ পেয়ে থাক, আমার মুখের কথায় শুধু দুঃখ দূর হবে না। শেষ পর্যন্ত আমরা কেউ কিছু জানি বা না জানি, একটা জিনিস জানি। আমরা সবাই সুখ চেয়েছি। আমি তোমার সুখ কামনা করি।

—সুখ ?

—হ্যাঁ। শান্তি পাওয়া সবচেয়ে কঠিন, ওটা কেমন করে পাওয়া যায় আমি জানিনে। আর……

—আর?

—যদি বোম্বে থেকে কখনো ফিরে আসবার ইচ্ছে হয়, আমাকে লিখতে পার।

সব বলেছে শুভেন্দু কিন্তু কেন সুজাতা চলে যাচ্ছে, একবারও জিজ্ঞেস করল না।

পথে বেরিয়ে সুমিতা বলল, একি করলে তুমি বড়দি।

সুজাতা যেন অনেক দূর চলে গেছে নিজেকে নিয়ে। তেমনি সুদূর হেসে বলল, কি আবার করলুম?

—তুমি চলে যেতে চাইছ আমাদের ছেড়ে?

—কাছে থেকেও যে অনেকদিন পালিয়ে বেড়ালুম রুমনো। নিজের কাছে থেকেও পালিয়ে বেড়িয়েছি সব সময়। এবার একটু নিজের কাছে ধরা না দিয়ে আর কিছুতেই পারব না ভাই।

বলতে গিয়েও হাসল সুজাতা। জল আসে সুমিতার চোখে। কিন্তু রাস্তার মাঝখানে সেটা ওকে ঠোঁট টিপে রোধ করতে হল।

বলল, বড়দি, একটা কথা বলব?

—বল।

—চল, একটু রবিদার সঙ্গে দেখা করে আসি।

একটুও চমকালো না সুজাতা। একটু চিন্তিত দেখাল। কিন্তু আশ্চর্য! কি এক সর্বনেশে শান্ত হাসি যে লেগে রয়েছে ঠোঁটে। একটু চুপ করে থেকে বলল, যেতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু একটু ভেবে দেখতে হয় রুমনো। রবি হয়তো বড় অস্বস্তি বোধ করবে।

মিথ্যে নয়। সুমিতা বলল, আমি একটু যাই বড়দি?

—যাবি? যা!

এ যেন সেই সুজাতাই নয়। মনের সব দরজাগুলি সপাটে খুলে দিয়েছে। বাতাস লুটোপুটি খাচ্ছে সেখানে। কোনো বাঁধন নেই, বাধা নেই। ভাবনা নেই, চিন্তা নেই।

সুমিতা এল রবির বাড়িতে। রবির বাড়ি নয়, অরুণাদির বাসা। রবির এইটাই ঠিকানা ছিল চিঠিতে। ভেবেছিল, এসে একটা খুব হৈ চৈ দেখবে।

কিন্তু কোন সাড়া শব্দই তো নেই। কড়া নাড়ল। দরজা খুলে সামনে

দাঁড়াল অরুণা। চিনতে পারল না সুমিতাকে। বলল, কাকে চান? সুমিতা দেখল, এর মধ্যেই সিঁদুর উঠেছে অরুণার সিঁথেয়। মনে হয় কতদিনের বিবাহিতা মেয়ে যেন। বলল, আমার নাম সুমিতা। রবিদা আছেন? অরুণা সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে ধরল সুমিতার একটি হাত। হেসে বলল, ওমা, তুমি! তোমাদের কথা কত শুনেছি। এসো, রবি শুয়ে আছে।

একেবারে শোবার ঘরে নিয়ে গেল অরুণা সুমিতাকে। রবি প্রথম দৃষ্টিপাতে একটু অবাক হল। তারপর হেসে বলল, রুমনো সাহেবা যে!

নিমন্ত্রণ তো কাল, তোমার উপস্থিতি এত অগ্রিম কেন?

সুমিতা মনে মনে অস্থিরভাবে ভগবানকে ডাকতে লাগল। হে ভগবান, আমাকে যেন কাঁদিও না, আমাকে কাঁদিও না। হাসবার চেষ্টা করে বলল সুমিতা, খবর পেয়েই ছুটে এলুম। না জানিয়েই বিয়ে করে ফেললেন যে?

রবি আর অরুণা একবার চোখোচোখি করল। বলল, তোমাকে না জানানোটা আমার বড় অন্যায় হয়ে গেছে রুমনো সাহেবা। কিন্তু কাজটা বড় হঠাৎ হয়ে গেছে।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল সুমিতা ওর রবিদাকে। কই, কোথাও তো কোনো পরিবর্তন হয়নি। সেই মানুষ, সেই হাসি, সেই চাউনি। কবেই বা পরিবর্তন হবে। কালকেই তো রেজিস্ট্রি হয়েছে। দু'জনের আলাপ পরিচয় অনেকদিনের।

অরুণা আদর যত্নের ত্রুটি তো করলই না। বরং কোথায় একটা সংকোচ তাকে সুমিতার আরো কাছেই এনে দিল। দু' একবার বড়দির কথাও জিজ্ঞেস করেছে। মেজদিকে চেনে খুব বেশী, যাতায়াতও আছে। ঘনিষ্টতাও কম নেই দু'জনার মধ্যে।

কালো অরুণা, অত্যন্ত সাদাসিধে চোখ মুখ। তবু, কালো সাধারণ অরুণার চোখে মুখে একটি আশ্চর্য অসাধারণত্ব ছিল, যেখানে মাথা নত করতেই হয়, ভালবাসতেও ইচ্ছে করে।

শেষ পর্যন্ত অরুণাকে ভালবেসেই ফিরল সুমিতা। এগিয়ে দিতে এল রবি। জিজ্ঞেস করল, রুমনো, তুমি কিছু বলতে এসেছিলে আমাকে।

আর কেন যে জিজ্ঞাসা। বড় মর্মান্তিক কথাই যে বলতে আসার কথা ছিল সুমিতার। কিন্তু সে কথা আর কোনদিন বলার দরকার হবে না।

বলল, না, কিছু বলতে আসিনি। চিঠিটা পেয়ে না এসে পারলুম না। কিন্তু রবি একবারো জিজ্ঞেস করল না, অরুণাকে কেমন লেগেছে সুমিতার। বলল, কাল আসছ তো ?

সুমিতা ঢোঁক গিলে বলল, আসব।

—কাকাবাবুকে বলো, নিজেই যেতুম। সময় করে উঠতে পারছিনে। তারপর সুগতার কথা, অন্যান্য বিষয় আলোচনা হল।

রবি জিজ্ঞেস করল, সুজাতা চাকরি করছে ?

কাঁদিও না, হে ভগবান, আমাকে কাঁদিও না। নিঃশব্দে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল সুমিতা।

রবি বলল, আমাকে তোমার খারাপ লাগছে না তো ঝুমনো।

—না না, রবিদা।

—তবে তুমি বল, কি বলতে এসেছ।

সহসা যেন কি ম্যাজিক হয়ে গেল। সুমিতার ভগবান তার চোখের জল ধরে রাখল না। বলে ফেলল বড়দির কথা, যে কলঙ্কের কথা সুজাতা শুধু রবিকেই বলতে বলেছিল। সুজাতার বোম্বে যাওয়ার কথাও বলে ফেলল।

অনেকক্ষণ চুপচাপ, রবি হেঁটে চলল সুমিতার পাশে পাশে। তারপর হঠাৎ এক সময়ে দাঁড়াল। সুমিতা দেখল, রবির মুখখানি যেন অনেকখানি উদাস-গম্ভীর হয়ে উঠেছে। বলল, আর নয়, এবার ফিরি ঝুমনো। কথাটি যে এমন হঠাৎ বলবে, ভাবতে পারেনি সুমিতা। সুমিতার বিস্ময় দেখে রবি বলল, ফিরে যাই ভাই ঝুমনো। অনেক দূর এসে পড়েছি। একটা কথা তোমাকে বলি, এ জীবনে আমরা কে কতখানি সুখ পেয়েছি কি দুঃখ পেয়েছি, কে কি হারিয়েছি আর পেয়েছি, সে হিসেব যেন কেউ না করি। হিসেব করে লাভ নেই, কেননা, আমরা তো যা খুশি তাই করতে পারিনে। জীবন তো অকৃপণ নয়, তার কোটি কোটি হাত বাড়ানো রয়েছে। আমরা যেন সবই নতুন করে শুরু করতে পারি।

এই শেষ কথা রবিদার। সুমিতার ভয়ের কোন কারণ ছিল না। সুজাতা ওকে কিছুই জিজ্ঞেস করেনি রবিদার কথা। মাঝখান থেকে, কাছে কাছে থেকে শুধু শুধু বাবাকেই পাগল করল সুজাতা।

মহীতোষ কাঁদতে পারলেন না। কিন্তু ওঁর নীরবতায় একটা সীমা ছিল বরাবর। এবারকার নীরবতা কোন সীমা মানল না। সুজাতার যাওয়ার দিন খালি সকালবেলা বললেন, উমনো, আমাকে একটা করে চিঠি দিস সপ্তাহে সপ্তাহে।

সুজাতা বলল, দেব বাবা।

সব ব্যবস্থাই করেছে শুভেন্দু। এমন কি, বোম্বেতে সুজাতার নিরাপদ বাসস্থান পর্যন্ত।

সবাই মিলে তুলে দিতে গেল সুজাতাকে। সুগতা, সুমিতা, মহীতোষ, চাকর বিলাস। ছিল না শুধু মৃণাল।

গাড়ি ছেড়ে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে সুজাতা সুমিতাকে কাছে টেনে বলল, ছুটির সময় আমার কাছে আসিস রুমনো। বাবাকে দেখিস।

"লোকে থিয়েটার দেখতে যায় কত কী বিচিত্র ধারণা ও কৌতূহল নিয়ে। অডিটরিয়মে বসে নাটক দেখতে দেখতে মানুষ যেন কোন্ অন্য জগতে চলে যায়। প্রতিটি নাটকীয় মুহূর্তে মানুষ হাসিতে আনন্দে ভয়ে কেমন করে। সে তো নাটক, লেখা নাটক। নাট্যকারকে তখন দূর অদৃশ্য থেকে মনে হয় তিনি যেন এক অতিমানব। রহস্য-ঘেরা মানুষ।

"তুমি বল, ওসব ভাববাদীদের কথা ছাড়ো সুমিতা। জীবনটাকে নাটক বললে, আমাদের দেশে তার খারাপ মানে হয়। যত অসামাজিক জীবগুলো যে পেয়ে যায়। ভাবে, তবে সংসারটা বুঝি সত্যি রঙ্গমঞ্চ। কোথায় কোন্ এক নাট্যকার বসে বসে আমাদের নিয়ত গড়ছেন, তিনিই আমাদের নিয়তি। তিনি যেমন গড়েছেন, আমরা তেমনি। যেমন যেমন পাঠ লিখেছেন, আমরা তেমন তেমন বলি। সবগুলো মিথ্যুকের দল। নিজেদের অন্যায়কে, অক্ষমতাকে ঢাকবার জন্যে অকারণ এক কাল্পনিক নাট্যকারের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া। এত সহজে কি চিঁড়ে ভেজে? বেঁচে থাকতে হলে সুদ সমেত সব কিছুর শোধ দিয়ে যেতে হবে। অথর্বের হাতের মোয়া নয় জীবনটা। আর সাহিত্যের কথায় যদি বল, তবে এইটুকু জানি, রঙ্গমঞ্চের নাটকটাও আমাদের জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। যা খুশি তাই করবার অধিকার নেই নাট্যকারের, যেমন সেই আকাশের নাট্যকার নাকি করে থাকেন।

"সে ঠিক কথা। কিন্তু আজ আমারও বলতে ইচ্ছে করছে জীবনটা

বুঝি সত্যি নাটক। আর সেটা থিয়েটারের চেয়ে অনেক বড় নাটক। এতখানি নাটকীয়তা কোনো স্টেজের নাটকেও বোধ হয় থাকে না। বড়দির কথা তোমাকে লিখেছিলুম। শুনলে অবাক হবে, আমার বড় ভয় করছে, মেজদির সঙ্গে মৃণালদার বড়ো রকমের ফাটল ধরেছে। ধরেনি, ফাটল ছিল। দু'জনের জীবনের আসল ভারটুকু পড়তেই ফাটলটা অনেকখানি ফাঁক হয়ে পড়েছে। আর বড়দির ব্যাপারের জের কাটতে না কাটতেই, এ ব্যাপারটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বাবা শুধু মুখের দিকে তাকাচ্ছেন আমাদের। আমি বোধ হয় বড় স্বার্থপর। বাড়িতে এই অবস্থা। লেখাপড়া আমার মাথায় উঠেছে। তার ওপরে ভাবছি, আমার কি হবে! আমি যে পাষাণে প্রাণ বেঁধেছি কি না, তাই বড় ভয়, বড় ভয়।"

এই পর্যন্ত রাজেনকে লিখে সুমিতা থামল।

(৩৪)

প্রথমে ভাবল সুমিতা, নিজের কথাটুকু কেটে দেবে। তারপরে আবার কি ভেবে লিখলে, "নিজের কথা থাক। যা লিখতে বসেছি, তাই লিখি।

"বাড়িটা যে কি সাংঘাতিক রকম ফাঁকা, লিখে বোঝাতে পারিনে। দেখতে দেখতে কতদিন কেটে গেল। একমাস আগেও তোমার কাছে গিয়েছি। কিন্তু সে যেন এক যুগ আগের কথা। কারণ আর কিছুই নয়, বড় ফাঁকা।

"বাবা চলে যান বেলা দশটার মধ্যেই। বড়দি তো নেই-ই। তবু প্রতিমুহূর্তেই মনে হয়, বড়দি রয়েছে ওর ঘরেই। অচলা প্রতিদিন বড়দির ঘরটা পরিষ্কার করে রাখে। পর্দাটা ঠিক তেমনি বাতাসে দোলে। একটু বেশী সরে গেলেই যেন দেখা যাবে, গালে হাত দিয়ে বসে আছে বড়দি। কয়েকদিন বড়দির ঘরে শুতে গিয়ে ফিরে এসেছি। কেবলি মনে হয়, একটা রুদ্ধশ্বাস যন্ত্রণা ওই ঘরটার মধ্যে অষ্টপ্রহর পাক খাচ্ছে। দেয়ালের ছবিগুলির দিকে এখন নিঃসঙ্কোচে তাকিয়ে থাকি অনেকক্ষণ। মনে হয় ছবির চরিত্র গুলির প্রাণেও যন্ত্রণা। এ বাড়ির যা-কিছু, সব আমারই চোখে বেশী করে পড়ে। আমিই এখন বেশীক্ষণ থাকি এ বাড়িতে। একলা থাকি। তবু কি

আশ্চর্য! আমি যেন দেখতে পাই, দু'টি অদৃশ্য করুণ চোখ নিয়ত এ বাড়ির প্রতি রন্ধ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিঃশব্দ নির্বাক সেই চোখ শুধু করুণ নয়, বড় অসহায়।

"সেই চোখ দু'টি বাবার। আড়াল থেকে দেখেছি, বাবা প্রতিদিন একবার বড়দির ঘরে যান। টেবিলের সামনে বড়দির চেয়ারটিতে বসেন একটু। কোনো কোনোদিন বিলাসকে ওইখানেই চা দিয়ে যেতে বলেন। আর কিছুই না। কথা আজকাল কমই বলেন। কিন্তু চোখের চাউনিটা একেবারে বদলে গেছে।

"আজকাল বাড়ি এসে আগে একটি কথাই জিজ্ঞেস করেন আমাকে, ঝুমনো এসেছিল? এলে বলি হ্যাঁ, নইলে না।

"আমার যেখানে ভয় ধরেছে, বাবার সেখানে সংশয় দেখা দিয়েছে। এই সংশয়ের বশেই বাবা আমার দিকেও যেন কেমন করে তাকান। ভাবটা, যেন পৃথিবীটার চেহারা ওঁর চোখে অন্যরকম হয়ে গেছে। কোথাও তার তল খুঁজে পান না।

"আগে মেজদি একেবারেই আসত না। প্রায় ভুলেই গেছল আমাদের। এখন প্রায় রোজই আসে। কোনো কোনোদিন থেকেও যায়। বাবা যদি বলেন, মৃণাল ভাববে না? মেজদি এমনিতে চিরকালই একটু সোজা কথার মানুষ। জবাব দেয়, কি আবার ভাববে। আজকে আর ওখানে যেতে ভাল লাগছে না।

"সবচেয়ে আশ্চর্য, মৃণালদাও কোন খোঁজ নিতে আসে না। এর অর্থ, হয় দু'জনের জানাজানি আছে। নয়তো কেউ কারুর খবর রাখে না। রাখলেও দুর্ভাবনা নেই।

"কিন্তু আমার সবচেয়ে বড় ভয়, জানাজানি কিছু বোধহয় নেই আর ওদের। তাই যে কোনো নাটকের চেয়ে, জীবনের এই নাটকে অন্তহীন বিস্ময়। ভয়ের আগে যেদিন আমার মনে প্রথম সংশয় দেখা দিল, বড় অস্থির হয়ে পড়েছিলুম। কলেজ ছুটি হলেই তাই মেজদির বাড়ি যাচ্ছিলুম কিছুদিন ধরে। একটানা নয়, দু'একদিন বাদে বাদে। কেননা, ওরাই যদি আবার কিছু ভেবে বসে। কিন্তু আমি তো গোয়েন্দাগিরি করতে যাইনি। আমি যে না গিয়ে পারিনি। তুমি যেন ঘুণাক্ষরেও ভেবো না, মেজদি মৃণালদার ব্যাপার বলে তোমাকেই বিশেষভাবে লিখছি। তোমাকে ছাড়া আর কাউকে

আমার কিছু জানাবার নেই। বড়দিকে জানাতে পারতুম। কিন্তু সে বিদেশে একলা থাকে, তাকে কোনো দুঃসংবাদই আমি দিতে চাইনি।

"প্রথমটা দেখলুম, মেজদি-মৃণালদা দু'জনেই ব্যস্ত। মেজদি ওর ছাত্রফ্রণ্ট নিয়ে, মৃণালদা ব্যবসা। মৃণালদার দিদিমা মারা গেছেন। সম্পত্তি ও অর্থ যা পাওয়ার, পেয়ে গেছে সে। বাবা মায়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই। সেসব মৃণালদার বড় একটা ছিল না কোনকালে। এসব অবশ্য আমার চেয়ে তুমিই ভাল জানো। মৃণালদা তোমাদেরই বন্ধু। আমি এবং সবাই দেখছে সে উপার্জনে ব্যস্ত। কিন্তু খরচের ধাক্কাটাই প্রবল। আয় নেই, ব্যয় জলের মত হচ্ছে। অথচ সেসব নাকি নতুন আয়ের জন্যেই। মৃণালদা যে ব্যবসার জন্যে কোনোদিন উঠে পড়ে লাগবে, আগে মানুষটিকে দেখে কিছুই বোঝা যায় নি।

"একসময়ে যেমন মেজদিকে নিয়ে ঘুরেছে পাগলের মত, এত অল্পদিনের মধ্যেই, তেমনি পাগলের মত ফিরছে ব্যবসার পিছনে। লোহার বাজার থেকে বিল্ডিং মেটেরিয়েল্‌স্‌ এবং ইন্সিওরের ফার্ম পর্যন্ত।

"মেজদি এসব জিনিসকে কিভাবে নিয়েছে, বোঝা মুশকিল। ও শুধু স্থির গম্ভীরভাবে সব দেখছে চেয়ে চেয়ে। বাড়িতে ওর কাছে যারা আসে, তাদের সঙ্গে মৃণালদা খুব ভালভাবেই কথা বলে। ভাবখানা যেন, আমি আছি তোমাদের সঙ্গে। কাজের চাপে বড় ব্যস্ত। তাই এখন আর সর্বক্ষণ কাছে কাছে থাকতে পারিনে।

"কিন্তু মেজদির দিকে চাইলেই বোঝা যায়, সেখানে যেন কি থম্‌ থম্‌ করছে। মৃণালদা মেজদির দিকে তাকিয়ে ভাল করে যেন কথাই বলতে পারে না। মৃণালদা এসেই হয় তো বেরিয়ে পড়তে চায়।

"মেজদি হঠাৎ ডাকে, কোথায় চললে আবার ?

"মৃণালদা কেমন যেন থতিয়ে যায়। বলে, অ্যাঁ, না, কোথাও নয়। বাড়িতেই আছি।

"কিন্তু সেটা যে ছলনা, আমি তা ধরে ফেলেছি। নিজেই, ভয়ে বিস্ময়ে নিঃশব্দে বারংবার চীৎকার করেছি, কেন, কেন, কেন ওরা তো মেজদি আর মৃণালদা! ওদের মধ্যে এ কিসের ছলনা। হঠাৎ কি হল ? ওরা যে দু'জনকে অনেকদিন দেখে, অনেক ভেবে পরস্পর ঘর বাঁধলো, সেই মাখামাখি হাসাহাসিটা এর মধ্যেই বালুর মত ছাড়া ছাড়া লাগছে কেন।

"এখন কি রকম হয়েছে জানো? মেজদি যেন নীরবে শত চক্ষু মেলে মৃণালদাকে আগলে বেড়াচ্ছে। আর মৃণালদা সেই শত চক্ষু এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সবসময়েই একটা অপরাধীর ভাব। যদি ধরে নিতুম মৃণালদার সেই পুরনো অভ্যাস মদ খাওয়াটা আবার ফিরে এসেছে তাই মেজদির দুশ্চিন্তা। কিন্তু তাতো নয়। আমার মনে হয়েছে প্রাণ থেকে না হোক, মৃণালদাকে কাছাকাছি রাখার জন্যে সেই লাইসেন্স মেজদি তাকে দিয়েছে। অন্তত সেটা ওদের মাঝখানে বিশেষ কোনো বাধা নয়। যেন, এটা যে হবে, মেজদি আগে থাকতেই জানতো। ও বলেছে, মদ খেলেই তো মানুষ সম্মান হারায় না। আমার সঙ্গে যাদের কাজ ও চলাফেরা, তারা যেন তোমাকে অসম্মান না করে। আমিও অসম্মানিতা না হই।

"আমার কাছে যত বিস্ময় মৃণালদার এই পুনরুত্থানে, তত বিস্ময় মেজদির সম্মতিতে। কিন্তু মরুকগে আমার বিস্ময়। আসলে, ওটা যে কোনো প্রশ্নই নয়, ব্যাপার আরো গভীরে। আমি তার কিছুই বুঝিনে।

"মৃণালদাকে আমি পুরোপুরি চিনিনে। শুধু জানি, তার একটি অতীত জীবন ছিল। ছাত্র-আন্দোলনের মাঝে এসে, মেজদির সংস্পর্শে এসে, মৃণালদা ত্যাগ করেছিল সে জীবন। আজ ভাবি সে কি ত্যাগ নয়? এ যেন সে মৃণালদাই নয়। অতীতটা তার ফিরে আসছে কিনা জানিনে, মেজদির প্রতি সেই ব্যাকুল ভিক্ষা আর তার নেই।

"মেজদির একটা আদর্শে আস্থা আছে। ও ভাবছে, কথা শুনে আমার যা মনে হয়েছে যে, মৃণালদা যেন পাপ-লিপ্ত হয়েছে। মেজদি তাকে সংশোধন করবে।...ওর চেহারাটা খারাপ হয়ে গেছে। দেখলেই বোঝা যায়, অষ্টপ্রহর টো-টো করে ঘোরা দস্যি মেয়ে মেজদি, প্রাণের কোথায় আঘাতে আঘাতে দীপ্তি হারাচ্ছে। ওর 'ফ্যানের' দল রীতিমত কুপিত। ফ্যান (Fan) বললুম বলে কিছু মনে করো না। সদর্থেই লিখছি। ঘরোয়া মিটিং বৈঠকে, নানান আলোচনায় ওকে সবাই আগের মতোই হাসি-খুশি, দৃপ্তনেত্রী দেখতে চায়। তাদের নিঃশব্দ অভিশাপ নিয়ত বর্ষিত হচ্ছে মৃণালদার ওপর। এ-ও শোনা যাচ্ছে, মেজদি এবার ছাত্র-ফ্রন্ট ছেড়ে গ্রামের দিকে যাবে। অদ্ভুত সব জল্পনা কল্পনা চলেছে ওকে নিয়ে। কারুর সঙ্গে দু'দণ্ড ঘুরে বেড়ালেই সবাই একটি করে গল্প তৈরী করে। বলে সুগতা এবার অমুকের সঙ্গে ভিড়ে পড়ল বোধহয়।

"মৃণালদাকে নিয়েও জল্পনা কল্পনার অভাব নেই। তার বাপ মায়ের ধারণা মেজদিই মৃণালদার সর্বনাশ করছে। মৃণালদার অতীত জীবনের ক্ষেত্রেও যেহেতু পদস্খলন ঘটেছে, সবাই বলছে, মেয়েদের পিছনে ঘোরা অভ্যাসটা নাকি সে ছাড়তে পারে নি। ওই পিছনে ঘুরতে গিয়ে সে একসময়ে চলে এসেছিল মেজদির কাছে। কিন্তু 'পরিক্রমা' নাকি তার স্বভাব। মাঝে সেই কবি-পত্নী চিত্রাভিনেত্রীর পিছনে তাকে দেখা গেছে। তারপরে কেতকীদির সঙ্গে। সেই কেতকীদির—রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য ও অভিনয়ে বাংলাদেশে যার জুড়ি মেলা ভার। এই যদি মৃণালদার চরিত্র হয়, মেজদি কি পারবে একসঙ্গে থাকতে।

"পুরুষেরা বলে রমণীর মন, সহস্র বর্ষের সখা সাধনার ধন। আর পুরুষের মন! সে-যে কোটি কোটি বর্ষের। ছকে ফেলে কারুরই বিচার চলে না। জটিল সকলেই।

"তোমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু আর্টিস্ট বিভূতিবাবু। সে সম্প্রতি একটি পোর্ট্রেট এঁকেছে মেজদির। তারো আগে, দেশজোড়া এক বিরাট মিছিলের ছবি এঁকেছিল সে। সেই মিছিলের প্রথম সারিতে যে মেয়েটির ছবি আছে, সবাই বলে সেটি মেজদির। নীরব কিন্তু তীক্ষ্ণ। অতল-মগ্ন ভাবুক বিভূতিকে প্রায়ই এখন মেজদির সঙ্গে দেখতে পাই। তাকে দেখায় বড় নিরীহ। কিন্তু চোখের দিকে তাকিয়ে দেখেছি, চোখ তার সর্বক্ষণই অস্থির। সবসময়েই যেন কিসের ঝড় ঠেলে চলেছে। সেজন্যে এলো-মেলো, বহির্জীবনে বড় আত্মভোলা। তাই বোধহয় নিরীহ দেখায়? মেজদির পোর্ট্রেটখানা ঠিক যেন দা-ভিঞ্চির লুক্রেজিয়া। লুক্রেজিয়ার ইতিহাস এখানে বক্তব্য নয়, কিন্তু ঠিক যেন সেই নিষ্পলক চোখে কিসের দ্যুতি, ঠোঁটের কোণে হাসি কিংবা রাগের একটি অস্পষ্ট রশ্মি-রেখা বিচ্ছুরিত।

"ভাবি, মেজদি কেন এমনি করে তাকিয়ে বসেছিল বিভূতির সামনে।

"আমি এই 'কেন-কেন' করেই মরলুম। সব মিলিয়ে আমার ভয়ের সীমা নেই। ভাবি, এই যদি জীবনের সত্য হয়, তবে স্টেজের নাটকগুলি তার কাছে তো তুচ্ছ। এর নাটকীয়তার যে তুলনা নেই।

"মেজদি যখন আসে আমাদের এখানে, রাত্রিবাস করে, তখন বড়দির ঘরে শোয়। আমার ভয় বাড়ে। আমি আর বড়দির সঙ্গে ওকে আলাদা করতে পারিনে। কিন্তু ওর সঙ্গে তো আমার বড়দির মত 'ভাব' নেই।

তাই আমি বিশেষ কিছু বলতে পারিনে। যদি জিজ্ঞেস করি, মেজদি, মৃণালদা আসবে ? মেজদি এক কথায় জবাব দেয়, না। তার বেশী একটুও বলবে না।

"একদিন ওদের নতুন বাড়িতে গিয়ে দেখলুম, মেজদি নেই। মৃণালদা একলা রয়েছে বাড়িতে। অনেককিছু জিজ্ঞেস করবার জন্যে ছটফট করতে লাগলুম মনে মনে। কিন্তু কিছুই আসছিল না মুখে। জিজ্ঞেস করলুম, 'মেজদি কোথায় ?' মৃণালদা বললে, 'কোথাও বেরিয়েছে।'

"তারপর হেসে, একটু ছলনা করেই, না জিজ্ঞেস করে পারলুম না, আপনাদের কি ঝগড়া চলছে নাকি ?

"এক মুহূর্তে চোখোচোখি করে মৃণালদা কেমন যেন টেনে টেনে বলল, ঝগড়া ঠিক নয়। তবে, আমার তো অনেক দোষ।

"যথা ?

"যথা···যথা···অনেক দোষ। ধরো, তোমার মেজদির তুলনায় আমি অনেক অ-সৎ।

"মনে হয়নি তো আগে !

"সবকিছুই কি আগে বোঝা যায়। বলে, হেসে উঠে পড়ল মৃণালদা। এইদিনই প্রথম ভয়টা আমার সবচেয়ে তীব্র হয়ে উঠল।

"আর লিখব না। এতবড় চিঠি তুমি কখন বা পড়বে, তাই ভাবছি। কিন্তু সব দেখে শুনে, আমার অস্থিরতা যে কী ভীষণ, তোমাকে লিখে বোঝাতে পারব না। এদিকে যতই দেখছি আড়ো আড়ো ছাড়ো ছাড়ো, ততই তোমার কথা আমার বেশী করে মনে পড়ছে। যত মনে পড়ছে ততই ব্যাকুল হয়ে উঠছি। আর, আর বলতে পার, কেন আমার প্রাণে এত ভয় ? তুমি তো মস্ত নির্ভীক মানুষ। আমাকে একটু নির্ভয় করতে পারো না ?

"মাকে আমার নমস্কার দিও। বলো, শীগগিরই একদিন যাবো।"

—সুমিতা।

তিনদিন আগে এসেছে সুগতা এ বাড়িতে। সাধারণত যাওয়া আসাই করে। রাত্রিটুকু থেকে দিনের বেলা চলে যায় আবার, এবার ফেরবার নাম-ই নেই।

মহীতোষ শেষ পর্যন্ত আর কথার আড়ে আড়াল দিয়ে চলতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন ঝুমনো, আমার বড় ভয় করছে মা?

সুগতা 'কেন' দিয়ে কোনো ছলনার আশ্রয় নিল না। বলল, তা জানি কিন্তু ভয় করে তো কোনো লাভ নেই। যা হবার তা হবেই।

মহীতোষের রেখা-বহুল মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। বললেন, ঠিক বুঝলুম না ঝুমনো। মৃণালের সঙ্গে কি তোমার কোনো বিবাদ হয়েছে?

সুগতা বলল, আমি আর সেখানে যাব না বাবা।

ভীত উৎকণ্ঠিত গলায় বললেন মহীতোষ, আর যাবে না? এক বছরও পূর্ণ হয়নি তোমাদের। এর মধ্যেই—

—হ্যাঁ।

বড় কঠিন মেয়ে সুগতা। ওর চোখে জল দেখা যায় না। কিন্তু আজ দু'চোখ ভেসে গেল সুগতার।

আঙুল চেপ্টে যাওয়া ছেলেমানুষের মত বিকৃত হয়ে উঠল মহীতোষের মুখ। বোঝা যাচ্ছে, ঢোক গিলে তিনি চোখের জল রোধ করতে চাইছেন যেন। সুগতার মাথায় হাত রেখে ডাকলেন ঝুমনো।

রুদ্ধ গলায় বলল সুগতা, আমার ওপর রাগ করো না বাবা।

মহীতোষের ইচ্ছে হল চীৎকার করে ওঠেন। পারলেন না। সব চিন্তাশক্তি জট পাকিয়ে গেল মাথায়। ভাবলেন, পালিয়ে যাবেন। কিন্তু, সুগতাকে বুকের কাছে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, স্থির, অকম্পিত কাঠের পুতুলের মত।

সুমিতা ছুটে পালিয়ে গেছে বাগানে। আড়াল থেকে আর কিছু শোনবার ছিল না ওর। সব যে শেষ হয়ে গেছে, জানা হয়ে গেছে সেটুকু। ভয় ওর অমূলক ছিল না।

সুগতা বলল, বাবা, বিয়ে গড়া আর বিয়ে ভাঙার মধ্যে কোনো গৌরব নেই। কিন্তু আজকের দিনে এটা বাড়বে বই কমবে না বোধহয়।

এ অপমান শুধু বাইরের নয়, নিজের মনের মধ্যেও পুড়ে যাচ্ছে। সব মেয়েরই যায়, যে থাকতে চায় এ সংসারে। কিন্তু এজন্যে আমি কাউকে দোষ দিতে পারব না। মৃণালকেও না। দোষ শুধু আমার। তবু ভাবি, তখন তো দোষ করার মতলব নিয়ে আমি বিয়ে করিনি। এখন দেখছি আমাদের দু'জনের অনেক তফাত।

অপরিস্ফুট গলায় যেন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন মহীতোষ, কিসের তফাত ঝুমনো?

জবাব দিতে গিয়ে এক মুহূর্ত থামল স্বগতা। দু'জনের নিঃশব্দ কান্নার অশ্রু যেন সন্ধ্যাবেলার একটি নিস্তরঙ্গ নদী। কথাগুলি এক জীবন-সন্ধানী নৌকার মত ভেসে চলেছে।

স্বগতা বলল, বাবা, বড়দির ব্যাপার তুমি বুঝেছ। গিরীনদা ওকে ভালবেসেছিল, ও ভালবাসতে পারেনি বলেই এত দুর্ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে কোনো পক্ষে সেটুকুও ছিল কি না সন্দেহ। বাবা আমাকে ঘৃণা করো না। আমি বুঝিনি। বুঝতে পারিনি। তুমি যেভাবে মানুষ করেছ, সে জীবনটাকেও ভালবেসেছি। সেটাই বোধহয় আমার রক্তে রক্তে। কিন্তু জীবনে আমি বিশ্বাস করেছি অন্যত্র। সেখানে আছে আমার রাষ্ট্র ও সমাজের ভাবনা। কিন্তু এ পরিবারের মেয়ের সঙ্গে ওই 'বিশ্বাসের' কোনো মিল নেই। এই দোটানায় টলছি। এই টলোমলো অবস্থায় আমার সব ভণ্ডুল হয়ে গেছে। তাই হাজারো নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও এ ভুল সব মেয়েরই হতে পারত। আমাকে ক্ষমা কর। যাকে সত্য বলে জেনেছি, তাকে গ্রহণ করতে দাও।

(৩৫)

মহীতোষের বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা থরথর করে কাঁপছিল। রক্তচাপ-রোগ-দেহে, বদ্ধ শিরায় শিরায় কারা যেন ধাক্কা মারছে। মনে হচ্ছিল, শরীরটা আগুন-পোড়া লোহার মত দুমড়ে যাচ্ছে যেন। তবু নিশ্চল হয়ে অবোধ দু'টি চোখে তাকিয়ে রইলেন স্বগতার দিকে। ঝুমনো বলে, 'সত্য'কে গ্রহণ করতে দাও! কী সে 'সত্য'। কেমন তার স্বরূপ। এ 'সত্যের' সংজ্ঞা কি?

স্বগতা ডাকল, বাবা।

মহীতোষ যেন লুকোচুরি খেলছেন। চাপা গলায় বললেন, বল ঝুমনো! আমি বুঝিনে তোমার কথা। তবু আমি না শুনে পারছিনে। কি তোমার 'সত্য,' কাকে তুমি গ্রহণ করতে চাও।

স্বগতা বুঝল, ভয় ও বেদনা গ্রাস করেছে মহীতোষকে। আর ওর

নিজেকে গ্রাস করেছে অশেষ অপমানের বেদনা। শুধু কথা বলে ও শুনে কারুর প্রাণই শান্ত হবার নয়। তবু না বলে পারল না স্বগতা। বাবা, আমার জীবনে যে কলঙ্ক ঘটেছে, তার চেয়ে বড় 'সত্য' এখন আর কিছু নেই। কলঙ্কটা যে কত বড় ভয়ঙ্কর, তাকে বাইরে থেকে বোঝবার উপায় নেই। সে আছে আমার মনের অন্ধকারে। তাই তো বার বার তোমাকে বলছি, আমার ওপর রাগ করো না, ঘৃণা করো না আমাকে।

মহীতোষ নিজেকে অবিকৃত আর শান্ত রাখবার জন্যে ভগবানকে ডাকতে লাগলেন। বললেন, ঝুমনো, বার বার ও-কথাটা বলো না। তোমাকে ঘৃণা করব, সে সাহস আমার নেই, ওটা আমার ধর্মও নয়।

স্বগতা মহীতোষের বুকে হাত রেখে কথা বলতে গেল। পারল না। বাবার কথাগুলি যতই শোনে, ততই যেন এক অবোধ শিশুর মত ওর বলিষ্ঠ বুক রুদ্ধ যন্ত্রণায় টনটন করে।

একটু পরে বলল, জীবনে যেখানে আমার 'বিশ্বাস' সেই বিশ্বাসের পথ থেকে মৃণাল অনেক দূরে। আমার সবার বড় পাপ তাকে আমি জেনেও স্বীকার করিনি। যে মত, পথ ও দর্শনে আমার প্রাণ টেনেছে, যে পথে আমি চিরকাল চলব ভেবেছি, সেই পথ যে কত কঠিন, দুরূহ, মুখে যা-ই বলি, আমার অন্তর তা মর্মে মর্মে জানে।

আমি এ দেশের নিদারুণ দারিদ্র্য, অপমান আর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে চেয়েছি। কত কি চেয়েছি। কিন্তু সে যে শুধু আমার মুখের কথাই হয়ে গেছে। আমার নিজের জীবনধারণে তার কোনো প্রমাণ আমি রাখিনি। নিজেকেই ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছি মৃণালের কাছে। ভেবেছি, এই ভাল, এই আমার ভাল। নিজের জন্যে আমার কোনো ভাবনার এক তিলও রইল না, পরের ভাবনা ভাববার জন্য রইল আমার সবটুকু। কি বিচিত্র! কত অ্যাবসার্ড আনরিয়েল সব চিন্তা। তা কি কখনো হয়। নিজের জন্যে কোনো ভাবনা নেই, ভাববো পরের জন্যে। প্রকৃতি তা মানবে কেন? সে-ই আমাকে শোধ দিলে। দেখলুম, মৃণাল আমার জন্যে নয়। ওকে নিজের করতে হলে এ সংসারে আর 'কেউ' বলতে শুধু ওকেই রাখতে হয়, ওর কাছেই ওর মত করে সব সঁপে দিতে হয়। আর কারুর ভাবনা আমার ভাবা চলে না। ভেবেছিলুম, মৃণালই আসবে আমার পথে। মৃণাল ভেবেছিল, ধীরে ধীরে একদিন আমিই যাব ওর পথে। দু'জনে এই আশা করেই এতদিন

আগে বেড়েছি। এই 'আশার' ওপরেই অপেক্ষা করছিল, আমরা দু'জনকে কে কতখানি পেয়েছি।

বলতে বলতে লজ্জায় ও কান্নায় কণ্ঠরুদ্ধ হল সুগতার। ভাঙা চাপা গলায় তবু বলল, বাবা, যত লজ্জাই করুক, তোমাকে ছাড়া আর কাউকে তো আমি আমার সব সঙ্কোচ, সব লজ্জা-কলঙ্কের কথা বলতে পারব না। আমার সোজা কথায় তুমি বিরক্ত হওনি কোনোদিন, আজো হয়ো না। বাবা, এই আমার 'সত্য'। এই কলঙ্ক যেমন সত্য, তাকে স্বীকার করাও আমার সত্য। তার চেয়েও বড় সত্য কলঙ্কমোচন।

কিন্তু একটি নীরব প্রশ্ন বারবার মহীতোষের বুকে মাথা খুঁড়তে লাগল। আর একটি নিঃশব্দ জবাব, সুগতার লজ্জাবিষ্ট অন্তরে জবাবদিহি করতে লাগল নিজেকেই।

মহীতোষ ভাবছিলেন, বিয়ে করে এক সঙ্গে বাস করার আগে কি এ সমস্যার সমাধান অসম্ভব ছিল?

সুগতা ভাবছিল, হ্যাঁ ছিল। আসলে ওটা মেয়ে-পুরুষের দেহের প্রশ্ন। দেহ যেন এ ক্ষেত্রে জীবন-মঞ্চের একটি মসলিনের পর্দা। যত তার বাহার, তত তার রং। ওটা নিজের হাতে স্পর্শ করে যতক্ষণ না অন্দরে প্রবেশ করা যায়, ততক্ষণ আসল রংটা কিছুতেই বোঝা যায় না। ওটা প্রথম। তারপর পরতে পরতে, ভাঁজে ভাঁজে আছে সাজানো জীবনের অভিসন্ধি। ওই দরজাটা পার না হলে তাকে পাওয়া যায় না। যে পায় তার ভাগ্য, পরম ভাগ্য। সেটা লাখে না মিলল এক। সেটা যে অন্তরের সঙ্গে মিলন। অন্তরের মিলন দেহকে ছাড়িয়ে যায়।

কে যেন নিষ্ঠুর বিদ্রূপে হেসে প্রশ্ন করে, তবে কি দেহটা কিছুই নয় তোমাদের কাছে। শুধু মিলনের পর্দা? অন্তর যাচাইয়ের জন্যে দেহটা একটি নিমিত্ত মাত্র?

ছি ছি! মেয়ে হয়ে সুগতা তা মানবে কেমন করে। দেহ কখনো ছোট নয় মেয়েদের কাছে। সুগতার বড় কলঙ্ক তো সেইখানেই। সবচেয়ে বড় জ্বালা ও যে ভালবাসেনি। ভালবাসাবাসি কিছুনা বলেই মানিয়ে নেওয়ার প্রশ্ন ওঠেনি। তাই কোনো মূল্য পাওয়া যেত না, সারা অন্তর ও চোখ দিয়ে মৃণালকে আগলে বেড়ালেও। ভালবাসেনি বলেই দেহটা তুচ্ছ হয়েও অপমানটা বিঁধে রয়েছে বড় যন্ত্রণায়।

মহীতোষ তেমনি সুগতার মাথায় একটি হাত রেখে তাকিয়ে রইলেন অসহায়ভাবে। অনেকক্ষণ পর প্রায় চুপি চুপি বললেন, আমি কিছু বুঝিনে ঝুমনো। তোমাদের মন, জীবন সবই আমার কাছে বড় দুর্বোধ্য। উমনোকে যা বলেছি, সে সব কথা তোমাকে ঘুরিয়ে বলার কোনো মানে হয় না। প্রাণ-ভরে আমি তোমাদের সুখী দেখতে চেয়েছি। না দেখলে প্রাণভরে যে কষ্ট, তাও দু' কথায় যাবার নয়। ঝুমনো, আমি একটু শুয়ে পড়ব এবার।

ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে উঠল সুগতার মুখ। মহীতোষের হাত টেনে বলল, বাবা, কি রকম মনে হচ্ছে তোমার?

মহীতোষ কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলেন। শান্তভাবে বললেন, কিছু নয়। তোমার মত আমারো একটু কষ্ট হচ্ছে।

সুগতার সঙ্গে নিজের ঘরে এসে টেবিলের কাছে দাঁড়ালেন মহীতোষ। বললেন, ঝুমনো, একটা কথা। তবে কি তোমার রাজেনকে বিয়ে করাই উচিত ছিল?

সুগতা চমকে রুদ্ধশ্বাস হয়ে বলল, না না বাবা, সে সাহস আমার আজো নেই। কোনোকালেই ছিল না।

—তবে?

—সেই তবেটাই আমি বুঝিনে বাবা। রাজেনকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমাকে যে সবাই এত শক্ত মেয়ে বলে, আমার সেই শক্তিও রাজেনের জীবনের কঠোর ব্যাপ্তিকে ভয় পায়। ওকে বিয়ে করেও আমি কোনোদিন ওর নাগাল পাবো না। এইটুকু জেনেই আমি রাজেনের ভাবনা কোনদিন আর ভাবিনি।

সুগতার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে অসহায় অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন মহীতোষ। জানালা দিয়ে বাইরের রাস্তাটা দেখা যায়। সেখানে আলো-অন্ধকার ছড়িয়ে আছে হাত ধরাধরি করে। পথচারীদের দেখাচ্ছে বড় বিচিত্র! কখনো ছায়া, কায়া কখনো।

মহীতোষ বললেন, ঝুমনো, এখনো দেখি মানুষ ধন-মানের গৌরবে লালায়িত হয়ে ফিরছে! আমাদের যুগ থেকে তাকেই জানতুম সত্য বলে। তার জন্যে আমরা সংগ্রাম করেছি, সম্মান বোধ করেছি। শুধু নিজেরাই করিনি, লোকেও আমাদের সম্মান করেছে। নিজেদের মধ্যেকার বিবাদ চেপে রেখেছি নিজেদের মধ্যে। আপোস করেছি পরস্পরে। কিন্তু ওই ধন,

মান, যশ তাকে মন দিয়ে প্রাণ দিয়ে চেয়েছি, চেয়েছি আর পেয়েছি। কিন্তু তলে তলে আর একটা যুগ এসে গেছে চোরাবানের মত। তাকে আমরা টেরও পাইনি। স্থূল অর্থে সে আর ধন-মানের প্রত্যাশী নয়। বোধহয় তা সম্ভবও নয়। তার বিবেক, বুদ্ধি, আত্মসম্মান ধন-মানের মুখ চায় না। কি এক নতুন 'সত্যের' জন্য সে প্রাণপণ করছে, যে সত্যের চেহারা আলাদা। পুরনো সত্যগুলি বদলে যাচ্ছে একেবারে। সে এক কথায় রাজ্যপাট ছেড়ে রুদ্র সন্ন্যাসী হয়ে বেড়িয়ে পড়তে চায় যেন! আমি একে চিনিনে ঝুমনো। বুঝিনে একে আমি। সে এত নিষ্ঠুর, এত কঠোর যে, জীবনের কোথাও সে সামান্যতম গোপনতাকে প্রশ্রয় দেবে না। প্রাণ না মানলে, যুক্তি না পেলে কেবলি ভাঙ্গবে আর গড়বে, আবার ভাঙ্গবে। একে আমি চিনিনে, চিনিনে। কিন্তু ঝুমনো—

—বাবা।

—আমার বড় ভয়, সেই সত্যকে তুইও চিনিসনে। আমি তোর বাবা, তাই আমি বুঝতে পারি, তুই বড় অসহায় ঝুমনো। তুই আমার সেই ছোট মেয়েটির মতই আজকে নিরুপায়। তোরা—আমাদের এই সমাজের মেয়েগুলি কি করবি?

—ঠিক বলেছ বাবা, 'সত্য'টার সবটুকু বুঝিনে বলেই পায়ে পায়ে আমাদের কলঙ্ক রটবে। আমরা কি করব? সত্যকে পাওয়ার জন্যে আজকে এই দুঃখ রোধ করা বোধ হয় যাবে না। তুমি শুধু আমাদের সমাজের কথা বলছ? তা বোধ হয় নয় বাবা। ধাক্কা লেগেছে আজ ওপরে-নীচে, সবখানে।

—তবে? বলছিল্ অগৌরব। কিন্তু বিয়ে ভাঙ্গা-গড়া যে বাড়বে।

—তাও তো বাড়বেই। যত লোভ, যত পাপ, যত ভুল-ভ্রান্তি, যত মোহ ও মিথ্যে পিপাসার ক্লেদ জমেছে আমাদের সবখানে, সে কি ছেড়ে কথা কইবে? বিয়ে ভাঙ্গা-গড়াটা তো সেখানে কিছুই নয়! সে যে কত বাড়বে তার তুলনা নেই। পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ়া, ঠাকমা-দিদিমারাও যে বিয়ে ভাঙ্গা-গড়া করবে না তারই বা নিশ্চয়তা কি? আমাদের যুগে তাও হয়তো দেখতে হবে।

যেন ভয়ে উৎকণ্ঠায় বাকরুদ্ধ মহীতোষ বোবার মত তাকিয়ে রইলেন সুগতার দিকে। নীচুস্বরে বললেন, ঝুমনো তোমার বড়দির কথা মনে পড়ছে

আমার। সে কোথায় চলে গেল। তোমার জীবনের কথা তুমি ভাব, সুখী হও।

সুগতা চলে গেল বাইরে। ব্যাকুল ভীত চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন মহীতোষ। যেন একটি ছেলেমানুষের মত পা টিপে টিপে উঁকি দিয়ে দেখলেন দরজার দিকে। তারপর বাইরের দিকে তাকালেন। কিন্তু ঘরটা এত ছোট মনে হল যেন কিছুতেই থাকতে পারছেন না। জামা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। লোকের ভিড়ে ঘুরতে লাগলেন ধীর পায়ে। আর যত মেয়ে পড়ল সামনে, প্রত্যেককে চেয়ে চেয়ে দেখলেন। যেন অনুসন্ধান করে ফিরছেন সকলের চোখে মুখে কি আছে।

তারপর যখন একটি পার্কে এসে বসলেন, তখন ওঁর বৃদ্ধ বুকের একটি অসহায় বেদনা কিছু কিছু জমে উঠল চোখের কোণে!

(৩৬)

দিন চলে গেল দিনের মনে। মানুষের জীবনে কত কী ঘটে। এ সংসারে কত সমস্যা। কত ভাঙে, কত গড়ে। লোকে কত কথা বলে। যার যেমন, সে তেমনি বলে। কেউ বলে, দিনগুলি কোথা দিয়ে কেটে যায় টেরও পাইনে। কেউ বলে, দিনগুলি যেন কাটতেই চায় না।

তবু দিন চলে যায়। কারুর মন রাখতে গিয়ে সে আসে যায় না। লোকের মনের কাছে দু' দণ্ড ধরা দিয়ে বিলম্ব করে না। যে অমোঘ নিয়মের বশবর্তী সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহ, সেই নিয়মেই নির্ধারিত দিনের গতি।

জীবনের সব ভাঙাগড়া নিয়ে মানুষের জীবনও তাই। তার জীবনও একটি প্রকৃতি। তার নিজের রীতি-নীতি নিয়ে সেও একটি অমোঘ নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। বিশ্বপ্রকৃতির মত জীবনের প্রকৃতির মধ্যেও আছে ভয় এবং অভয়। আছে, প্রসন্নতা ও ভয়ংকরতা। দান আছে, প্রতিশোধ আছে। সে নিরন্তর। সেই নিরন্তরের খুঁটিনাটি আমরা সব সময়ে দেখতে পাইনে।

দিন চলে যায়। সুমিতা দেখে। দিন চলে যায়, জীবনও চলে ধেয়ে নানা পথের অলি-গলি দিয়ে। দূর থেকে উঁকি দেয় অনাগত ফাইন্যাল পরীক্ষার দিনগুলি। যদিও তার দেরি আছে এখনো অনেক। তবু বর্ষা গেছে। ধূলি-ধূসর কলকাতার গাছে গাছেও শরতের রোদ ঝিক্‌মিক্ করে

সোনার মত। অ্যাভিন্যুর পথটি যখন জলে ভেজে, স্কোয়ারে তখন ঝলমল করে রোদ। মহুমেণ্টের শির যখন মেঘ-চাপা পড়ে, ডালহৌসীর আকাশ তখন নির্মেঘ নীল। শারদোৎসবের নানান বিজ্ঞাপনে কলকাতার সারা দেয়াল চিত্রিত হয়ে যায়। বারোয়ারী পুজোর চাঁদার বিল-বই পথরোধ করে সর্বত্র। কলকাতার কোন্ গোপন ঘুমন্ত প্রাণ জাগে যেন ধীরে ধীরে। শহরের সেই উত্তরপ্রান্তে, কুমারটুলীর কুমোরের ঘরে ঘোচে আহার-নিদ্রা। তারা প্রতিমা গড়ে। ইংরেজী-বাংলা, নাচ-থিয়েটার, পত্র-পত্রিকা সব কিছুতেই চোখ মেলে চায় ঘুমন্ত কলকাতা।

এ হল বাইরের দিন। এদিনও যাবে। আর আছে ভিতরের দিন। সে দিনও যাবে। কিন্তু কেমন করে যাবে, সেই ভয়। চারদিকে তার কত সংশয়ের বেড়া। সুমিতা দেখে, জীবন-প্রকৃতি বড় ভীষণ ও ভয়ংকরী। বিশ্ব-প্রকৃতির ভূমিকম্প, বন্যা, মহামারীর মত, জীবন-প্রকৃতিও যেন কি এক নিদারুণ প্রতিশোধের জন্য দাঁড়িয়েছে ওর মুখোমুখি। ঘরে এখন মেজদি আর বাবা। বাইরে রাজেন। রাজেন তো শুধু একটি মানুষ নয় ওর কাছে। সে যে একটি মহাজীবনের বিস্তৃতি নিয়ে ছড়িয়ে আছে সুমিতার সামনে। কিন্তু ঘরে-বাইরে সুমিতা দেখে, জীবনের দিকে দিকে বড় ভয়াল আবর্ত। ওর অকূল-পাথার মনপ্রাণ নিয়ে, ও যে উজানে চলেছিল, জীবন-প্রকৃতি ওকে সেখানেই ধরেছে কঠিন হাতে।

বাংলা সাহিত্যের ছাত্রী সুমিতা, বৈষ্ণব পদাবলী পড়তে গিয়ে দেখেছে, শ্রীরাধা দয়িত-সন্ধানে উজানগামিনী। ও তো শ্রীরাধা নয়। এ-যুগের এক মেয়ে, নিজের জীবনের ব্যাস পেরিয়ে নতুন গোলার্ধে পা দিয়েছে ও। আপনি আপনি দেয়নি। সুধাময়ী যে মহাপ্রাণীর কথা বলেন, ওর সেই মহাপ্রাণী সব বাধা পার হয়ে গেছে। তার আপন বেগে সে ছুটে গেছে উজানে। দুই দিদির জীবনের শেষ না হোক, অনেকখানি দেখে, উজানে না গিয়ে সুমিতা পারবে কেমন করে। কিন্তু জীবনের ঢল যেদিকে, গড়ান যে-পথে, তারই ঘূর্ণিতে পড়ে এখন মরছে পাক খেয়ে।

তবু ওর মহাপ্রাণ, সে যে উজানে।

এসব কথা যত ভাবে, তত ছুটে যায় হাওড়ায়। ওখানকার রুদ্ধশ্বাস, ঘিঞ্জিপথ আর ওর পথ আটকায় না। আর কোনো ভুল হয় না অলি-গলি চিনতে। জীবনের ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন কোনো গলিপথ আর পারে না

সুমিতাকে ভয় দেখাতে। বারে বারে এসে সব ওর সড়োগড়ো হয়ে গেছে। চিনে গেছে অনেক মানুষের মুখ।

সেই পুরনো প্রাচীন ভাঙা বাড়িটার প্রতি রন্ধ্র এখন ভাসে চোখের সামনে। তার স্যাঁতা গলিপথ, দু'পাশের দমচাপা ঘর, ভাঙা রক, সবখানে, সব কোণে রেখে এসেছে নিজের স্পর্শ। মন-প্রাণের সব আকাঙ্ক্ষা।

আজকাল সব সময় দেখা-ও পাওয়া যায় না রাজেনের। মাঝে যখন দু'দিন দেখা হয়নি, তৃতীয় দিন আরো ব্যাকুল হয়ে ছুটে গেছে সুমিতা। সুধাময়ী দু-হাত বাড়িয়ে তুলে নেন আদর করে। বারে বারে চেয়ে চেয়ে দেখেন। চিবুক তুলে, মুখখানি দেখেন কাছে এসে।

সারাদিন গেছে। বসে থেকেছে দু'জনেই। সাজ গেছে, লজ্জা গেছে। সব জলাঞ্জলি দিয়ে বসে থেকেছে সুমিতা।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে সুমিতাকে দেখে টনটনিয়ে উঠেছে সুধাময়ীর বুক। উৎকর্ণ হয়ে শুনেছেন প্রতিটি শব্দ। সকালে বেরিয়েও সেদিন ফেরেনি রাজেন। তাঁর আবেগ একবার প্রকাশ পেলে আর চাপতে পারেন না। পাত্রপাত্রী জ্ঞান থাকে না।

বিকেলের দিকে যখন দু'টি প্রাণ প্রতীক্ষায় মরো মরো, তখন হঠাৎ, সুমিতাকে বুকের কাছে টেনে, ভাঙা গলায় বলে উঠলেন সুধাময়ী, কেন, কেন এমন কাজ করলি মা।

চোখের জল ধরে রাখতে পারল না সুমিতা। কোনো সঙ্কোচ, কোনো লজ্জা রাখল না। বলল, আমি তো অন্যায় কিছু করিনি মা।

সুধাময়ী রুদ্ধগলায় বললেন, অন্যায়, হাজার বার অন্যায় করেছ মা।

তুমি দেখেও শিখলে না, তোমার মেজদি ওকে কেমন করে ছেড়ে দিয়ে গেল, ফেলে রেখে গেল—

সুমিতা যেন ভয়ে ত্রস্তোশে চীৎকার করে উঠল, বলবেন না, বলবেন না মা ওসব কথা। ওকথা আমি শুনতে পারব না।

সুধাময়ীর ঠোঁটে স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠল। দু'চোখ ভরে তার কী এক আলোর ছড়াছড়ি। রাজেন তার ছেলে। নিজে তো জানেন, রাজেন তার কী! বড় দুঃখে বলেছেন। এর চেয়ে কঠিন কথা বলতেও তার আটকায় না। কিন্তু সুমিতা যে তারই প্রাণের একটি অন্তরঙ্গ ছায়া, তা এমন করে আর কোনদিন যেন টের পাননি।

সুধাময়ীর চোখে জল, মুখে হাসি। বললেন, কেন বলব না মা?

মুখ নীচু করে, দৃঢ়স্বরে বলল সুমিতা, কে কাকে ছেড়ে গেছে, সে খোঁজে আমার কি দরকার। আর—

—আর কি, বল?

কেউ কি কাউকে ছেড়ে যেতে পারে মা। সংসারে তো এমন মানুষও আছে, যাদের ছাড়া যায় না। যেতে হলে, পালাতে হয় তার কাছ থেকে।

সুধাময়ী নিঃশব্দে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন সুমিতার দিকে। দেখতে দেখতে তাঁর ঠোঁটের সব হাসিটুকু অদৃশ্য হল। গম্ভীর মুখে, ভারী গলায় বললেন, সুমিতা, বুঝেছি মা, তোমার বড় সাহস। যার কাছ থেকে তোমার মেজদি পালিয়ে গেছে, তার কাছেই তোমার প্রাণ টেনেছে। বলে সুমিতার মুখখানি তুলে ধরে বললেন, আমি বুঝেছি, তুমি পালাতে পারবে না। তোমার মুখ দেখে বুঝেছি, তোমার আসা দেখে বুঝেছি, তোমার বেশ দেখে চিনেছি মা। যেদিন থেকে দেখেছি, সেইদিন থেকেই মনে মনে বলেছি, এ কি করল মেয়েটা।

—কেন?

—কেন? তুমি পালাতে পারবে না, কিন্তু পালাবার ছল করে রাজেনের সঙ্গে কি লুকোচুরি খেলতে পারবে মা?

সুমিতা আবার মুখ নীচু করল। বলল, ও আপনার ছেলে। আপনি তো জানেন, ও সেই ছেলে নয়, যার সঙ্গে মেয়েরা লুকোচুরি খেলতে পারে। যে পারবে, তাকে যে ও শ্রদ্ধা করতে পারবে না।

সুধাময়ী সরু চাপা গলায়, চোখ বড় করে বললেন, আমি যে সেই কথাই তোকে বলছি মা, সেই কথাই বলছি। তুই পালাতে পারবিনে, লুকোচুরি খেলতে পারবিনে। কেন? না, তুই তো ওকে শুধু মানুষ বলে দেখিস্‌নি, একটা জীবন ভেবে দেখেছিস্‌। সেই জন্যেই তোকে যে শুধু কপাল কুটে কেঁদে মরতে হবে। আমি যে জানি, রাজেন আমার ছেলে। তুই ওকে ফেলে পালাতে পারবিনে, কিন্তু মা, তোকে ত্যাগ করতে হতে পারে রাজেনকে।

সুমিতার চোখে-মুখে যেন ছোট্ট মেয়েটির ভয় ও ব্যথা। শিউরে উঠে মুখ ঢেকে চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। তারপরে যেন চুপি চুপি বলল, কেন মা?

সুধাময়ী বললেন, তুই তাকিয়ে দেখিস্‌নি মা, রাজেনের চোখের দিকে।

ওর দু'চোখে কী পরিমাণ জ্বালা। মাগো, কী আগুন ওর দু'চোখে। শুধু রাগ, শুধু ঘৃণা, বিদ্বেষ। ও যে শুধু রুদ্র; কিন্তু রুদ্র যে শুধু পোড়ায়। কেবলি সর্বনাশ খোঁজে। ওর আর একটা চোখ নেই, আমরা যাকে বলি ত্রিনয়ন। ও দু'চোখে যা দেখে, তাই ওর সব। তাই যদি ওর সব, তবে ও রাজেন কেন। তবে আমার কিসের গর্ব, তুই কেন ছুটে আসিস্‌ এমন করে। ওর যে-আগুন দেখে সবাই ছুটে আসে ওর কাছে, সেই আগুনেই ও পুড়িয়ে মারবে সবাইকে। দূর করবে ওর আপনজনকে, নিজেকে ছোট করবে। মা, ছোট মুখে বড় কথা বলছি। মহাদেবের তুলনা দিয়ে বলছি, তাঁর দুই চোখে যত জ্বালা, তাঁর আর এক চোখে তত হাসি। রাজেন আমার মহাদেব নয়। কিন্তু ওরা সবাই মিলে যে বিষ নাশের ব্রত নিয়েছে, সেই ব্রত তো শুধু রাগ আর ঘৃণা নয়। ভালবাসা কই! যে মূল ধরে তুই এসেছিস, তোর সেই মূলটাকেই গেলি ভুলে। তাই বলি, এ আমার ভয় মা। ওযে দূরটাকে দেখতে পাচ্ছে না, শুধু কাছের সবকিছুই বড় করে দেখছে, তাতে ওর সব হারাবে। ভয় করে মা, তোকেও হারাবে।

সুমিতা তেমনি ভীরু-উৎকণ্ঠায় বলল, না না, আমাকে হারাবার কিছুই নেই। হারালে আমিই হারাব।

সুধাময়ীর দু'চোখে জল। নিঃশব্দে ঘাড় দোলাতে লাগলেন। ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন, না-না-না-না।

তারপর পরিষ্কার গলায় বললেন, আমি জানি, আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে। আমি চলে যাব। তাছাড়া আমার উপায় নেই। এর পরে যা হবে তা আমি চেয়ে দেখতে পারব না, তাই চলে যাব। তোমাকে একটি কথা বলে রাখি মা। তুমি ছাড়া বোধ হয় আর কেউ ওর চোখ ফোটাতে পারবে না।

সুমিতা বলল, না না, আমার সে সাহস নেই, আমি তত বড়ও নই। আপনি তো জানেন, যা ও নিজে দেখতে পারে না, জোর করে তা কেউ দেখাতেও পারবে না। তা ছাড়া আমারও যে অনেক সন্দেহ, কতটুকুই বা আমি জানি।

বলতে বলতে সুমিতা উঠে দাঁড়াল। বলল, আমি একটু যাই।

—একটু যাবে? একটু কোথায় যাবে?

সুমিতার চোখে জল দেখা দিল। কিন্তু কথা বলতে পারল না।

সুধাময়ী বললেন, বুঝেছি। কোথায় যেতে হবে জান তো?

—খুঁজে নেবো।

দু'পাশের ঘর-চাপা সেই স্যাঁতা-গলি পার হয়ে দরজা অবধি সুমিতাকে এগিয়ে দিয়ে গেলেন সুধাময়ী।

কলকারখানা ছুটি হয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগেই। চারদিকে কারখানার মানুষের ভিড়। দেয়ালে দেয়ালে আসন্ন ধর্মঘটের পোস্টার পড়েছে। রাজনৈতিক ধর্মঘট। কেউ একবার তাকিয়েও দেখছে না প্রাচীর পত্রগুলির দিকে। যেন কোন্ এক একলা ঝড়োপাখীর শাণিত নাদে পোস্টারের লেখাগুলি চীৎকার করছে। কিন্তু কেউ শুনছে না কান পেতে। সবাই নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। তাই দেখে—যেন বিক্ষুব্ধ রাজেন ফুটে রয়েছে দেয়ালে দেয়ালে। জামার বোতাম আঁটা নেই। সারা কপালে ঝাঁপিয়ে পড়েছে রুক্ষ চুলের গোছা। আহার নেই, স্নান নেই, দৃষ্টি নেই কোনোদিকে।

অনেকখানি হেঁটে, গলির মধ্যে এসে দাঁড়াল সুমিতা, একটি ঘরের কাছে। খোলার ছাউনি দেওয়া নীচু ঘর। একদিন রাজেন তাকে নিয়ে এসেছিল এখানে। কাঁচা মাটির মেঝে। প্রায়ান্ধকার সেই ঘরে একরাশ মানুষের নিশ্বাসে, রাস্তার ধুলোয়, বিড়ির ধোঁয়ায় এক ভয়ঙ্কর পরিবেশ। ঘরের শেষ সীমান্তে একটি নড়বড়ে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাজেন। যে মূর্তি ভেবেছিল সুমিতা, তার চেয়েও দুর্দশাগ্রস্ত দেখাচ্ছে ওকে। দেখে সুমিতার বুকের মধ্যে টনটন করে উঠল।

যারা বসেছিল, তারা অনেকেই এখন চেনে সুমিতাকে। তাকে ঢোকবার পথ করে দিলে সবাই। কিন্তু সমস্ত ঘরটা যেন কিসের উত্তেজনায় থম্‌থম্ করছে। সুমিতা রাজেনের কাছে এল।

রাজেন একবার চোখ তুলে তাকাল। বলল, তুমি এখানে?

সুমিতা তাকিয়েছিল রাজেনের চোখের দিকে। ওর নিজের দুই চোখের কোলে দুর্জয় অভিমান ফুটে উঠছিল। দেখল, রাজেনের চোখের কোল বসা। বোঝা যাচ্ছে, কিছুই খায়নি সারাদিন। সুমিতা নীচু গলায় বলল, সারাদিন বসেছিলুম তোমার পথ চেয়ে। দু'দিন ঘুরে গেছি, আজ না এসে পারলুম না।

কিন্তু রাজেনের কঠিন গম্ভীর মুখ তেমনি রইল। বলল, একটু বোস, আমাদের হয়ে গেছে।

একজন মধ্যবয়স্ক মজুর উঠে দাঁড়াল। বোঝা যাচ্ছে, কারখানা থেকে সে বাড়ি ফেরেনি। মেহেদী মাখা দাড়িতে তার তখনো লেগে রয়েছে পাটের ফেঁসো। মুখ তার গম্ভীর, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। ভাঙা বাংলায় বলল, তবে এইটাই হুকুম রাজেনদাদা।

রাজেনের চোখ বিদ্যুৎ-কষা। সমস্ত মুখ যেন আগুনের মত দপ্‌দপ্‌ করছে। সুস্পষ্ট গম্ভীর গলায় জবাব দিল, হুকুম নয়, নির্দেশ।

আমাদের আর নতুন করে কিছু ভাববার অবসর নেই। মনপ্রাণ দিয়ে কেবল ধর্মঘটের প্রস্তুতি।

কয়েক মুহূর্ত সবাই স্তব্ধ। রাজেনের মূর্তি দেখে সুমিতার বুকের মধ্যে গুরু গুরু করে উঠল।

রাজেন আবার বলল, কালকেও আমরা বসছি। যারা আজ আসেনি—কাল সবাইকে খবর দিতে হবে।

তবু যেন কি একটা হয়ে রইল। সকলেই নিশ্চুপ। তারপর একে একে বেরিয়ে গেল সবাই মাথা নীচু করে। রইল শুধু সেই মধ্যবয়স্ক দাড়িওয়ালা, আর একটি যুবক। রাজেন বেরুবার সময় বলল, সোলেমান, আমি যাচ্ছি।

দাড়িওয়ালা সোলেমান অন্যদিকে মুখ রেখে বলল, রাজেনদাদা, তুমি এই ইলাকাটার কথা আর একবার শোচ কর, তার বাদ আখেরি রাস্তায় চল। রাজেন বলল, আমি ভেবেছি সোলেমান। জানি, ভীরুর দল পড়ে থাকবে পিছনে, যার শক্তি আছে, সে আগে বেড়ে যাবে ঠিক।

সোলেমান চুপ করে রইল।

পথে পথে আলো জ্বলেছে। দোকানে দোকানে ভিড়।

সুমিতা বলল, বাড়ি চল, উনি বসে আছেন।

রাজেন বলল, এখন যেতে পারব না সুমিতা। আমি একটু ফাঁকা জায়গায় কোথাও বসতে চাই। বাড়ি যাব খাবার জন্যে তো। সেখানে খেতেও ইচ্ছে করে না। মা আমার সঙ্গে কথা বলে না।

তারপর প্রসঙ্গ পাল্‌টে বলল, সুমিতা, কালকের সভাতেও প্রায় পঞ্চাশজন মজুর এসেছিল, আজকে তার অর্ধেকও আসেনি।

রাজেনের দিকে তাকিয়ে সুমিতার মনে মনে যত অভিমান, তত বেদনা। বলল, তবে কেন চেষ্টা করছ?

—এইটাই আমরা সকলে মিলে সাব্যস্ত করেছিলুম। আমাদের শক্তি বৃদ্ধির জন্যে এইটাই এখন আশু প্রয়োজন।

—তোমরা যা ঠিক করেছ, তাতো ভুলও হতে পারে।

রাজেন এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে বলল, সুমিতা, যে রাস্তা দিয়ে চলেছ, একবার এই পথের দিকে তাকিয়ে দেখ। ধাঙড় বস্তির মধ্যে এগুলো শুয়োরের খাঁচা নয়, মানুষেরই বাসস্থান। এদের যার সঙ্গে খুশি তুমি কথা বলে দেখ, সকলের মনে অসীম ঘৃণা, প্রচণ্ড ক্রোধ। তবে কেমন করে ভাবো, আমার ভুল?

সুমিতা বলল, আমি তো সব বুঝিনে। কিন্তু এরাই যে তোমার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। আর—

—বল। থামলে কেন। এসব ছাড়া যে আমার মাথায় আর কিছু আসছে না। কন্‌কনিয়ে উঠল সুমিতার বুক। জানে, তা জানে সুমিতা। শুধু সুমিতার কথা শোনবার অবকাশ আর একদিনও আসেনি রাজেনের। বলল, ওদের ক্রোধ আছে, ঘৃণা আছে জানি। সে কি শুধু তোমাদের ইচ্ছেতেই হঠাৎ বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়বে? ওদের সংসার নেই, ঘর গৃহস্থালি নেই, আনন্দ ভালবাসা নেই। তুমি তো আমার চেয়ে ওদের ভাল করে চেনো। তবু আমার ভয় হয়, তোমরা যা চাও, তার সময় আসেনি। শুধুই রাগে ফুঁসছো।

—ফুঁসছি, হ্যাঁ ফুঁসছি। জীবনের নীচের দিকে তাকিয়ে এ দেশের কোন্ মানুষটা আনন্দে খল্‌খল্ করে হাসতে পারে আমি জানিনে। কিন্তু তুমি যা বলছ, তা ভুল। আমি বিশ্বাস করি, জীবনের এই ভাঙা মরা ঝরা কাঠামোটা কেউ রাখতে চাইছে না। এই পচা ঘুণ ধরা পুরনো জীবনটাকে সবাই ফেলে দিতে চাইছে।

—এখুনি? এই মুহূর্তে?

জবাব দিতে গিয়ে যেন থতিয়ে গেল রাজেন। হঠাৎ কিছু বলতে পারল না। কেবল তার সারা মুখে মূক অস্থিরতা।

সেই জায়গাটিতেই আজো এসেছে রাজেন, সেই গঙ্গার ধারে। অন্ধকার নির্জন উঁচু তট। আশে পাশে ছড়ানো কালকাসুন্দে আর বিষকাটারির

ঝাড়। শরতের কৃষ্ণপক্ষ কুচকুচে আকাশ জুড়ে নক্ষত্রের ভিড়। ওপারে খিদিরপুরের স্বল্পালোক তটরেখা, উত্তর ঘেঁষে বন্দরের জাহাজ-মাস্তুলের মেলা।

সুমিতা দেখল, রাজেন দু'চোখ মেলে তাকিয়ে আছে গঙ্গার বুকে। উদ্দীপ্ত চোখে যেন নিশির ঘোর। ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল রাজেন, হ্যাঁ সুমিতা, এখুনি এই মুহূর্তে। আমি সেই স্বপ্নই দেখি।

একেবারে যেন নতুন মানুষ রাজেন। গম্ভীর কঠিন, কিছু নয়। শিশুর সারল্য ও উদ্দীপনা। সমাজের নীচুতলাকে সে আলোময় আসনে এনে দাঁড় করানোর সফল স্বপ্ন প্রত্যাশা করছে এই মুহূর্তেই।

সুমিতা বলল, কিন্তু তোমার স্বপ্ন যদি সত্যি না হয়!

—সেই তো আমার মৃত্যু পণ।

শিউরে কেঁপে উঠল সুমিতা। রাজেনের একটি হাত নিজের মুখে চেপে রোরুদ্যমান কান্নায় উঠল ফুলে। বলল, সেই তো আমার ভয়, তোমার মৃত্যু দিয়েও স্বপ্ন হয়তো সার্থক হবে না। রাজেন, তোমার বিশ্বাসই আমার বিশ্বাস। কিন্তু এখুনি নয়, এ পথে নয়। তুমি একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখ, তোমার মানুষদের একবার দেখ। স্বপ্নের পিছনে ছুটো না।

রাজেনের বুকের মধ্যে চম্‌কে চম্‌কে উঠল। যেন মনে হয়, মায়ের আর এক রূপ ধরে সুমিতা এসেছে। সোলেমানের কথাগুলিই বলছে আর এক রকম করে। বলল, আমি কি মিথ্যে স্বপ্ন দেখি সুমিতা।

—না সত্যি , শুধু তুমি যেভাবে চাও, সেভাবে নয়। যখন চাও, তখন নয়। রাজেন তুমি যে মেজদিকে চিঠি লিখেছিলে, একবার সেই চিঠির কথা ভাবো। তুমি এই দেশের সুদূরতল পর্যন্ত দেখতে পেয়েছিলে।

তুমি কেন আরো বেশী দেখছ না।

সেইটিই রাজেনের জীবনের সবচেয়ে বড় কথা। প্রত্যক্ষ রাজনীতির চেয়েও অন্তরে ওর বড় ছিল জীবনধর্ম। কিন্তু শিক্ষিত প্রাণটাকে তো ফেলে আসতে পারেনি বুদ্ধির কচকচিতে। সেখানে ঠাসা আগুন। মহামানবের সুদূরতল দেখতে গিয়ে যতটুকু দেখেছে, তাইতেই ওর সমস্ত বিবেক রাগে দুঃখে অপমানে অন্ধ হয়ে উঠেছে। খোঁজ নেয়নি, আরো তল আছে। আরো, আরো। আরো অনেক জটিল, ভয়াল। রাজেন যত নিষ্ঠুর ভেবেছে, তার চেয়ে আরো অনেক নিষ্ঠুর, কঠিন কঠোর। জগদ্দল পাথরটাকে দেখেই সে

ক্ষুব্ধ। তাকে টলানো আরো কঠিন, সেটুকু ভাবেনি। এ ওর অহংকার নয়, দুর্বুদ্ধি নয়, দুঃসাহসও নয়। ওর প্রজ্জ্বলিত বিবেক।

সেই বিবেক তো আজ কারুর কথা শুনবে না। এই বিবেকের রীতি, সে নিজেই নিজের পথে আসবে।

তবু অনেকদিন পর স্থগতাকে লেখা সেই চিঠিটার কথা মনে পড়তে মনটা থমকে গেল রাজেনের। স্থমিতার দু' হাত নিজের মুঠিতে নিয়ে চুপ করে রইল সে। দু' বছর আগের সেই মনটাকে যেন যাচাই করতে লাগল আপনি আপনি।

গঙ্গার ছলছলানি কেমন যেন একটি মায়া সৃষ্টি করছে অন্ধকারে। নদীর বুকে এখনো শেষ মরসুমের মাছমারা মাঝিদের নৌকা দেখা যায়।

অন্ধকারে রাজেন তাকাল স্থমিতার মুখের দিকে। বলল, আমি তো চোখ বুজে থাকিনে স্থমিতা। তোমার কথা আমার মনে রইল। আমি দেখেছি তুমি যার কথা বলছ। আরো দেখব।

একটু চুপ করে থেকে রাজেন স্থমিতার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, কি দেখছ?

স্থমিতা যেন কোন্ দূর থেকে ধীরে ধীরে বলল, যা দেখতে আসি। তবুও তো সব সময় দেখা পাইনে। একটা কথা রাখবে?

—বল।

—যদি পারতুম, যদি সময় হত, তবে একেবারেই চলে আসতুম তোমার কাছে। কিন্তু, কিন্তু—

গলার স্বর চেপে এল স্থমিতার, তোমার কাছে আমাকে আসতে দিও। আমাকে দূরে সরিয়ে দিও না।

রাজেন বিস্ময়ে চমকে বলল, তোমাকে তো আমি দূরে সরিয়ে দিতে চাইনি।

রুদ্ধ গলায় প্রায় যেন চুপিসাড়ে বলল স্থমিতা, চেয়েছ, চেয়েছ, মিথ্যুক, একবারও কি নিজের মুখের দিকে, বুকের দিকে তাকিয়ে দেখ নি। আমি সেখানে কতটুকু। তোমার নীতি যে আমাকে শুধুই শাসায়।

আবার কথা আটকে গেল রাজেনের। শুধু স্থমিতার দু'টি হাত ধরে ফিরে তাকাল নদীর দিকে।

চলে গেছে সুমিতা। আবার এসেছে। এসেছে, গেছে। এই যাওয়া আসার মাঝে দেখে শুধু জীবন-প্রকৃতির প্রতিশোধের বাসনা। সবদিকে সেই জীবনের লীলা। সেই লীলাই বহন করে নিয়ে আসে সুজাতার চিঠিতে। বাবাকে লেখে সুমিতাকেও লেখে।

"রুমনি, বাবাকে যেন বলিস্‌নে, আমার এই বম্বেতেও বড় খারাপ লাগে এক এক সময়। অনেকের সঙ্গে আমার চেনাশোনা, অনেকেই আসে আমার বাড়িতে। তবু মনটা অষ্টপ্রহর কেমন যেন খা খা করে। এত লোকজন, তবু যেন কথা বলার মানুষ পাইনি। তার ওপরে আমি তো মেয়েমানুষ। একলা থাকি, নানান ভয়। যত ভয়, ততই নির্ভয়ের ভান করে চলি। ঝুমনোটার কথা মনে হলে আমার আর মাথার ঠিক থাকে না। পুরনো কথা আমি আর ভাবিনে। কিন্তু ঝুমনোর কথা মনে হলে দরজা বন্ধ করে দিই। কেউ না আবার আমার চীৎকার শুনে ফেলে। আর তখুনি বাবার মুখটা ভেসে ওঠে আমার চোখের সামনে। আমি দু' হাতে চোখ ঢেকে থাকি।

"যখন কিছু ভাল লাগে না, সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাই। আশ্চর্য! সমুদ্রের সেই শেষে যেখানে আকাশটা নেমেছে, সেখানে আমি আমার সব চেনা মুখগুলো দেখতে পাই। ওইখানে যাওয়ার জন্যে আমার প্রাণটা ছটফট করে ওঠে।

"রুমনি, পরীক্ষা হলে তুই চলে আসিস্‌ বেড়াতে।"

বাবাকে লেখে, "বাবা, তোমার জন্যেই যা মনটা খারাপ লাগে। নইলে ভালই আছি। কিছু ভেবো না।"

এইরকম চিঠি আসে প্রায়ই।

বিভূতি আসে প্রায় প্রত্যহই। আশ্চর্য শান্ত, কোমল, গম্ভীর মানুষ বিভূতি। সব সময়েই যেন কী ভাবে, কী দেখে। এমন আত্মভোলা মানুষ—সুগতাকে দেখা মাত্রই একটি বিচিত্র স্নিগ্ধ-লজ্জায় কেমন হয়ে যায়। লাল হয়ে ওঠে কান দু'টি। দু'জনে ছাড়া তৃতীয় মানুষটি থাকলে আর কিছুতেই তাকাতে পারে না সুগতার দিকে। সুমিতা বিভূতির আঙুল-জামা-কাপড় খুঁটিয়ে দেখে। কোথাও রং-এর দাগ আছে কিনা। এত যে ছবি আঁকে, দাগ কোথায়। তবে, আঙুলগুলি যেন কেমন ধূসর মতোই দেখায়। মানুষটিকে দেখে অবাক হয়ে ভাবে, আশ্চর্য! এই মানুষটিরই হাতের তুলির

টানে অমন বলিষ্ঠ তীব্র রেখায় যাদু কেমন করে ফুটে ওঠে। আর বিভূতির অধিকাংশ ছবিই পথের ধারের বাসিন্দা। খেটে খাওয়া মানুষ আর সংগ্রামী জনতার।

মেজদিই কথা বলে, বিভূতি শোনে। কখনো কখনো কথা বলে, কিন্তু খুব আস্তে। সুগতার আঁচলের আড়ালে আড়ালে চলে যেন।

সুগতা এখন প্রতিদিনই উত্তর চব্বিশ পরগনার শ্রমিকাঞ্চলে যায়। সেখানেই এখন ওর কাজ। ইচ্ছেটা ভবিষ্যতে ওখানেই আস্তানা করবে। বিভূতি প্রতিদিনের সঙ্গী।

আর আসে আশীষ। জীবনের লীলাটা এইখানে সব চেয়ে ভয়ংকর। আশীষ মাঝে মাঝে সঙ্গে করে আনে একজন মহিলাকে। বয়স ওঁর বছর পঁয়তাল্লিশ। পরিচয় দেয় বান্ধবী বলে। বোঝে না সুমিতা, কেন ওই মহিলাকে আলাপ করিয়ে দিয়েছে আশীষ সুমিতার সঙ্গে। চব্বিশ বছরের আশীষ, পঁয়তাল্লিশ বছরের মহিলার সঙ্গে কথা বলে তুমি তুমি করে। বড় অবাক হয়েছে সুমিতা প্রথম প্রথম। ভদ্রমহিলাকে দেখে মনে হয় শান্ত। কিন্তু কী এক বিচিত্র কটাক্ষে দেখেন তাকিয়ে সুমিতাকে। গান করেন মাঝে মাঝে। শুনে মনে হয়েছে, ওঁর জীবনের কোথায় একটি বেদনা আছে লুকিয়ে। বিধবা, ছেলে আছে আশীষের সমবয়সী।

কিন্তু দু'জনের সম্পর্কের মধ্যে বড় বিচিত্র গভীরতা।

আশীষ এর মধ্যেই আরো মোটা হয়েছে, চেহারার মধ্যেও এসেছে একটা ভারিক্কী ভাব। সুমিতার দিকে এখন তাকায় যেন, ফুঁচকে মেয়েটা। যার দেহের কোনো রন্ধ্রই নেই ওর অজানা।

ভয় করে, ভয় করে সুমিতার। আশীষের বিদ্রূপ বেড়েছে। গোটা সংসারটাকে যেন ফিরছে করুণা করে।

তারপর একদিন আশীষই বলেছে, প্রেম হয়েছে ওদের দু'জনের মধ্যে। এ যুগের এক বিরাট জটিল করুণ আত্মাকে ও দেখতে পেয়েছে ওই মহিলার মধ্যে। ওরা বিয়ের কথাও ভাবছে।

সুমিতা চম্‌কে উঠেছে, শিউরে উঠেছে। আশীষ নিঃশব্দে হেসেছে ভ্রূ টান করে। ওর বন্ধুরা বলেছে, এ যুগে এমন যুগান্তকারী প্রেম নাকি আর একটিও হয়নি। এ যুগের মতই নাকি তা মহৎ আর জটিল।

শুধু খিল্ খিল্ করে হাসে পাশের বাড়ির তাপসী। বলে, কে? তোর আশীষ। ভ্যাখ্, ও শীগগিরই সম্বন্ধ করে বিয়ে করল বলে।

স্নিতা মনে মনে কামনা করে, তাই যেন হয়, তাই যেন হয়। মুখে বলে, কি করে জানলি তুই?

তাপসী বলে ঠোঁট টিপে হেসে, আমার চেয়ে তোরই তো বেশী জানার কথা। বেচারীর এ সর্বনাশটা তো তুই করলি।

স্নিতার মনের মধ্যে চমকে চমকে ওঠে একটি অতি সূক্ষ্ম অপরাধ বোধ। বলে, আমি?

তাপসী হাসে। কপালে থাকে ওর কুঙ্কুমের টিপ, সিঁদুর টকটকে সিঁথি। যেখানে বিয়েতে ওর মন চায়নি, সেখানেই বিয়ে হয়েছে। সর্বাঙ্গে গহনা, অষ্টপ্রহরই থাকে সেজেগুজে। হাসিটা যে কী পরিমাণ বেড়েছে। এখন বাবা মা, কারুর ভয়ই যেন নেই ওর।

তাপসী বলে, আশীষেরই বন্ধু কৃষ্ণ রায় বলেছে। তোর কথা কিছু বলেনি। আশীষের কথাই বলেছে, ব্যাপারটা সত্যি হলে, মহৎ কতখানি হত জানিনে। কিন্তু এর ভেতরে যে এক সুগভীর বেদনা দু'জনের অন্তরকে ব্যাকুল করে তুলত, সেটাকে অস্বীকার করা যেত না। ভদ্রমহিলাকে দেখে কষ্টই হয়, ওর দিক থেকে ব্যাপারটা সত্যি করুণ। আশীষের ব্যাপারটাও বেদনাদায়ক, কেননা ওটা ওর মনের গভীরের বিকৃতি ছাড়া আর কিছু নয়। সাময়িক ব্যর্থতায় মানুষের কত রকমের বিকৃতি দেখা দেয়। কেউ মদ খায়, পাগল হয়, ইনস্যানিটি গ্রো করে। আর সিনিসিজম এখনকারদিনে প্রায় স্বাভাবিকতার পর্যায়ে এসে গেছে। আশীষ রাগে দুঃখে যেন ছেলেমানুষের মত গোটা সমাজটাকে কাঁচকলা দেখিয়ে বেড়াচ্ছে, আর চলতি নিয়মের প্রেম, ভালবাসা, ইন্‌টেলেকট্, সবকিছুকে দেখিয়ে বেড়াচ্ছে ওই মহিলার সঙ্গে ওর প্রেম। সবাইকে যেন বিদ্রূপ করে, ভয় দেখিয়ে বলছে, 'তোমরা আর যাই কর, এতদূর আসতে পারবে কি?' সবাই যত বিস্মিত, ও ততই তৃপ্ত।

আসলে ওটা ওর যত যন্ত্রণার আর বিদ্বেষের একটা আউটবার্স্ট। কিন্তু এ আর ক'দিন। ওকে যারা সবচেয়ে ভাল করে চেনে, ওর সেই বাবা মার বিস্ময় নেই, কোনো দুশ্চিন্তাও নেই। অসম জীবনের এতবড় দ্বন্দ্বকে আশীষ হজম করবে কেমন করে। তেমন সাহস ওর নেই। দেখো, ও একটা ছোট্ট

মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে এল বলে। বলেই তাপসীর আবার হাসি। বলে, তাই বলছি, ও বিয়ে করল বলে। তুই না ছাড়লে তোর সঙ্গেই হত।

সুমিতা বলে, আমি কাউকেই ছাড়িনি তাপসী। এইটাই বোধহয় আমার জীবন, যাদের কাছে আমি যাব, তারাই শুধু আমাকে দূরে সরিয়ে দেবে।

তাপসী তবুও হাসে। হাসিটা যখন সবচেয়ে বেশী অবারিত হয়ে ওঠে, তখন ওর চোখ দিয়ে জল এসে পড়ে।

যে তাপসীকে আগে কত কি মনে হত, ভয় করত, সেই তাপসীকে বুকে জড়িয়ে ধরতে চায় সুমিতা। ওর কান্না পায়।

সবাই ওকে বলে 'ককেট'। আরো কত কি! ওকে নিয়ে ওর স্বামীর বন্ধুরা, আশপাশের আর সমাজের যুবকেরা একটু নোংরা কথা বলে আনন্দ পায়। আড়ালে ওকে মন্দ বলে সবাই। কাছে এলে ওর শ্যামলী রূপের বলিষ্ঠ শরীরের প্রতিটি তরঙ্গে সবাই দুলতে থাকে। ওর কাজল চোখে, রং-ঠোঁটে স্থির বিদ্যুৎশিখা, চোখ রাখা যায় না।

শুধু ওর স্বামী কিছু বলে না। তাপসী বলে সুমিতাকে, তোর দুঃখের অনেক মানে আছে ভাই রুমনি। আমার কাছে খুবই বড় মানে। আমার তো কোনো দুঃখ নেই।

কেন?

—আমি হলুম সাজানো বারান্দায় টবে দাঁড়ানো পাতাবাহারের গাছ। আমার দুঃখ কি। তবু হাসে তাপসী। আর ধুয়ে যায় চোখের কাজল।

সুমিতা ওর মুখখানি তুলে ধরে বলে, তুই হাসিস্ কেন বল্‌তো?

সুমিতার কানে কানে বলে তাপসী, বদ্‌মাইশী করব বলে।

তারপরে আর সত্যি হাসতে পারে না। অনেকক্ষণ পর বলে, কিন্তু রুমনি, তোকে দেখে আমার যত ভয়, তত বিস্ময়। কেমন করে তুই রাজেনকে পেলি।

সুমিতা তখন রুদ্ধ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে, ওরে না, না, মিথ্যে। ওকে পাওয়া যায় না।

পাওয়া যায় না, তবু যায় সুমিতা। যাওয়া আসা শেষ হয় না।

আর দিন যায়। সুমিতা যায় ওর জীবনের উজানে।

রাজেনের নেতৃত্ব মুখ থুবড়ে পড়ে মাটিতে। ধর্মঘট অসফল শুধু নয়, ওকে সারা দিনরাত্রি ঘিরে থাকত কলকারখানায় যারা ওর আশা ভরসা, সেই সব মজুরদের কাজ গেছে। পুলিসের জুলুম চলছে অনেকের উপর দিয়ে। ধর্মঘট মেনে নেয়নি কেউই। হাওড়ার সমস্ত অঞ্চলে প্রতিক্রিয়া হয়েছে ভয়ংকর।

আজ ওরই উপর সবাই খড়্গহস্ত। মারমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছে সবাই ওরই মুখোমুখি।

সুধাময়ী চলে গেছেন বৃন্দাবন। যাওয়ার আগে বলে গেছেন সুমিতাকে, ওর ওপর আমার কোনো মায়াদয়া নেই। লোকে আমাকে মন্দ বলবে? বলবে, এ তোমার কেমন মায়ের প্রাণ? বলুক, আমি এমনি মা। আমারো প্রাণ পণ, যাকে আমার প্রাণ সায় দেয়নি, তার সঙ্গে আমার আপোস নেই। ও আমাকে বুজরুক বলুক, ধর্মের গোঁড়ামি বলুক, ওর নীতিবাদ নিয়ে থাকুক ও। বেকার লোকগুলোর বাড়ি গিয়ে আমি দেখে এসেছি তাদের অবস্থা। দেখতে গিয়ে কেবলি মনে হয়েছে, কেন আমি ওর মা হয়েছিলুম। ওর দিকবিদিক জ্ঞান নেই। মানুষের সঙ্গে ওর ব্যবহার যে পুলিসের চেয়েও খারাপ। জীবনের জন্যে লড়াই করবে বলে, তারা কি রাজেনের চাকর? ও কে? ওর কথাই কি সব? বাকী মানুষগুলো কেউ নয়। শুধু যে এতখানি করেছে, সে শুধু তাদের ভালোবাসা, বিশ্বাস রাজেনদাদা তাদের ভগবান। ছি ছি ছি……

সুমিতা যেতে দিতে চায়নি সুধাময়ীকে। কিন্তু আটকাতে পারেনি। তবে এটুকুনি শুনেছে, বৃন্দাবন যাওয়ার নাম করে হাওড়াতেই নাকি কোন আত্মীয়ের বাড়ি লুকিয়ে রয়েছেন।

সুমিতা যেন আঁচল উড়িয়ে যায়। হেঁকে নিয়ে আসবে রাজেনকে। কিন্তু রাজেন, তার সে সব খেয়াল নেই। যত স্বাস্থ্য ভেঙেছে, শ্রীহীন হয়েছে, চোখের কোল বসছে, ততই ওর চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ খরো হয়ে উঠেছে। শ্বাপদ-তীক্ষ্ণ সেই চোখে কিসের জ্বালা। ওর এখনো আশা মরেনি। উল্টে, সুমিতাকেই যেন কঠিন গলায় যুক্তি দিতে চায়। বলে, মনে হয়, আমারই সাহসের অভাব সুমিতা। আমার ওপর যত ভরসা করতে পারবে, ততই সবাই অগ্রসর হবে।

সুমিতা বলে, রাজেনের দু'টি হাত ধরে বলে, রাজেন, তুমি সেই রাজেন। তুমি কেন এত অধৈর্য, কেন মরণের আর মারবার তপস্যায় ডুবে গেলে তুমি।

শুনবেনা, শুনবেনা তো রাজেন। প্রেম ভালবাসা, সংগ্রাম শিক্ষা, সব যে ওর এক চাওয়ার নেশায়, স্বপ্নের নেশায় মাতাল করে দিয়েছে।

তারপর একদিন কারা ওকে অন্ধকারে প্রহার করে ফেলে রেখে গেল। মাথা ফাটিয়ে, হাত ভেঙে একটা ভয়ংকর আক্রোশের হিংস্র দাগ রেখে গেল সর্বাঙ্গে।

(৩৭)

এমনি একটা ভয়ংকর কিছু ঘটবে, এই আশঙ্কাই করছিল সুমিতা। কিন্তু সে আশঙ্কা যে সত্যে পরিণত হবে, তা ওর অন্তর মানতে চায়নি। মানতে না চাইলে কি হবে। সুমিতা তো রাজেনদের মত ভিতরে বসে সব কিছু দেখেনি। বাইরে থেকে দেখেছে। কিন্তু বাইরের মানুষের মন নিয়ে দেখেনি। জীবন-মন-প্রাণ সবই পড়েছিল ওখানে। তাই মিথ্যে আশঙ্কা করেনি সুমিতা।

সুমিতা যখন এল, সেই ভাঙা পুরনো বাড়িটার চেহারাও যেন বদলে গেছে। শরৎ গিয়ে আবির্ভাব হয়েছে হেমন্তের। উঠোনের আগাছাগুলি এর মধ্যেই হয়েছে কাঠিসার। বড় বড় গাছের পাতা ঝরতে আরম্ভ করেছে এর মধ্যেই। বাড়িটাকেও যেন দেখাচ্ছে আরো পুরনো।

রাজেন শুয়েছিল তার ঘরের সেই তক্তপোশে। আরো দু'জন ছিল সেই ঘরে। তার মধ্যে একজন অবাঙালী। শ্রমিক নয়, এ অঞ্চলের দু'জন সহকর্মী রাজেনের।

দরজার কাছে এসে দাঁড়াতেই সুমিতার বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল। চেনা যায় না রাজেনকে। নিঃশব্দ, অনড় বন্ধ-চোখ করুণ রাজেন। সহসা মনে হয়, যেন প্রাণ নেই মানুষটির। মাথায় আর হাতে ব্যাণ্ডেজ। বোতাম খোলা পাঞ্জাবিটার ফাঁকে তার প্রশস্ত বুকে হাড় দেখা দিয়েছে, উঁকি দিয়েছে কণ্ঠা।

একটা অব্যক্ত বেদনা টনটন করে উঠল সুমিতার বুকের মধ্যে। ওর সমস্ত অন্তর আকুলিবিকুলি করে উঠল রাজেনের গায়ে একটু হাত দেবার জন্যে। ওই খোলা বুকে, ক্লান্ত মুখে, আহত স্থানে। কিন্তু মনের সব সঙ্কোচ কাটিয়ে অতটা পারল না সুমিতা! রাজেনের বন্ধুদের দিকে ফিরে কথা

জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে কথা ফুটল না ওর গলায়। বুকের সমুদ্র মন্থন করে এল চোরাবান দুই চোখের তটে তটে।

রাজেনের বন্ধুদের চোখেও আগুন। ওদের চোখে মুখে শীর্ণতা, বেশে পোশাকে দীনতা। কিন্তু কী আগুন জ্বলছে ওদের অন্তরে। বহিরঙ্গে শুধু তাই ধক্‌ধকানি।

একজন বলল, আসুন।

সুমিতা নীচু গলায় জিজ্ঞেস করল, কেমন আছে?

—ভাল। হাতের চোটটা একটু বেশী।

রাজেন তাকাল চোখ মেলে। প্রথমেই চোখোচোখি হল সুমিতার সঙ্গে। যে মুহূর্তে দু'জনের চোখে চোখ পড়ল, সেই মুহূর্তে আর বাধা মানল না সুমিতার চোখের জল।

রাজেন আবার চোখ বুজল। কিন্তু মুখে একটুও বিকৃতি দেখা গেল না। সে ডেকে বলল, বিশু, এখনো যাওনি?

বিশু বলল, তোমাকে ফেলে যেতে পারিনি রাজেনদা।

রাজেনের মুখ শক্ত হয়ে উঠল। বলল, তোমার কাজের চেয়ে কি আমি বড় হয়ে উঠেছি। এই দুঃসময়ে তুমি মাঠে নেই, সভা হবে কেমন করে?

বিশু সঙ্কুচিত হয়ে তাকাল তার সঙ্গীর দিকে। বলল, এইবার চলে যাচ্ছি।, তোমার মাথার কাছেই ওষুধ রেখেছি, খেও। রাত্রি আটটার সময় এসে ডাক্তার আবার ইনজেকশন দিয়ে যাবে।

রাজেন আবার বলল, রামদেও কেন যায়নি? ভয় পেয়েছে ও, না?

লজ্জায় ও অপমানে রামদেওয়ের মুখখানি কালো হয়ে উঠল। বলল,—নহি নহি রাজিনদাদা, ডরাবে কেন? আপনার তখলিফ—

রুগ্ন আহত সত্ত্বেও রাজেন যেন গর্জে উঠল চাপা গলায়, মিছে কথা বলোনা রামদেও। ভয় পেয়েছ তুমি, আমার তখলিফের বাহানা করে পড়ে আছ এখানে।

রামদেওয়ের চোখে রক্ত ছুটে এল। তার সারা চোখ মুখ যেন জ্বলে উঠল দপ্‌ দপ্‌ করে। মাথা নীচু করে বেরিয়ে গেল সে বিশুর সঙ্গে।

শুনতে পারে না এসব সুমিতা, দেখতে পারে না, ওর সারা অন্তর, সর্বাঙ্গ যেন কাঁটা দিয়ে ওঠে। বন্ধুদের সঙ্গে এই কি রাজেনের ব্যবহার। সবাইকে সে শাসন করতে, হুকুম দিতে উদ্যত। সমস্ত কিছুর মধ্যে একটা ভয়ংকর

বুরোক্রাট যেন শাসিয়ে উঠছে। দেখে যেন স্থমিতারও ভয় করে রাজেনের সঙ্গে কথা বলতে।

কিন্তু রাজেনের মুখের দিকে, শরীরের দিকে তাকিয়ে প্রাণ মানে না ওর। দু' হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করল রাজেনকে। রাজেনের বুকে মুখে হাত বুলিয়ে চাপা ভাঙা গলায় বলল, আমাকে কি কিছু বলবে না, কিছুটি নয়?

রাজেন স্থমিতার একটি হাতের উপর হাত রেখে বলল, কি বলব স্থমিতা?

রুদ্ধগলায় বলল স্থমিতা, এ কি করেছ তুমি, কত সর্বনাশ করতে চাও।

রাজেন বলল, আমাকে আঘাত করেছে বলেই এটা সর্বনাশ নয়, নতুনও নয় স্থমিতা। এইভাবে ওরা অনেককে খুন করেছে, আরো করবে।

কেঁপে উঠল স্থমিতার বুকের মধ্যে। বলল, জানি জানি রাজেন। আজ মায়ের কথাই মনে পড়ছে আমার বারবার। 'ধরে রাখা যাবে না তোমাদের কাউকেই। এইটাই তোমাদের জীবন।' কিন্তু রাজেন, জীবন কি এতই ছোট? সত্য মিথ্যে যাচাই করবে না?

স্থমিতার হাতধরা মুষ্টি শিথিল হল রাজেনের। অমনি ভয়ে ও বেদনায় গুর্‌গুর্ করে উঠল স্থমিতার বুক। এমনি করেই আজ শিথিল করে নিতে চায় রাজেন নিজেকে। এমনি করেই সরে যেতে চায় দূরে। স্থমিতা নিজে শক্ত করে ধরে রাখল রাজেনের হাত।

রাজেন বলল, স্থমিতা, তোমার শুধুই সংশয়। এত সংশয় আমার ভাল লাগে না।

এর পরে কি বলবে রাজেন! চলে যেতে বলবে স্থমিতাকে। থাক্ থাক্ আর কিছু বলবে না স্থমিতা। কিন্তু নিজের কণ্ঠকে বারবার চাপতে গিয়েও না বলে পারল না, সংশয় নয়, এ যেন আমার বিশ্বাস রাজেন।

রাজেন বলল, কি তোমার বিশ্বাস?

স্থমিতার প্রাণে ভয়, তবু অন্তর থেকে কে যেন আপনি কথা বলে গেল। বলল, রাজেন, তোমার এ অবস্থা দেখে আমি আর স্থির থাকতে পারছিনে। তোমার প্রাণের মূল্যের কথা আমি বললে, তুমি উড়িয়ে দেবে জানি। যতই উড়িয়ে দাও, যা-ই ভাবো আমাকে, আমি নিশ্চিন্ত হতে পারব না কিছুতেই। তাই আমার বিশ্বাসের কথা আমি বারে বারে না বলে পারিনে।

রাজেন যেন মন-প্রাণ-দেহ, সব শক্ত করে রেখেছে। বলল, নানাভাবে সেকথা তুমি অনেকবার বলেছ।

—বলেছি, অনেকবার বলেছি। আজকে আবার নতুনভাবে বলতে চাই।

সুমিতার সুদীর্ঘ রুক্ষ বেণী পড়েছে লুটিয়ে রাজেনের গায়ে। ওর সর্বাঙ্গ ভয়ে ও স্নেহে স্পর্শ করেছে রাজেনের কূলে কূলে। বলল, আমি রাজনীতি হয়তো বুঝিনে, কিন্তু চারদিকের অবস্থাটা কি একটুও বুঝিনে? আমি তো বিলেত থেকে আসিনি, এ দেশের মানুষের একটুখানি তো বুঝি। তোমার কাছে এলেই আমি মজুরদের দিকে তাকিয়ে দেখেছি। সেখানে তারা আজ তোমাকে চায় না। তোমার নীতি, তোমার কাজ, তুমি, সবকিছুকে আজ তারা এড়িয়ে চলতে চায়। আমি দেখছি, তুমিই শুধু তোমার দল নিয়ে ছুটে চলেছ একদিকে, তারা রয়েছে আর একদিকে। কেন এমন হবে? কেন? তুমি যদি 'সত্য' তবে তারা নেই কেন তোমার কাছে?

—সে কথা তো তোমাকে বলেছি সুমিতা। তারা যখন দেখবে, আমাদের উপর নির্ভর করা যায় তখুনি তারা আসবে।

—তোমরা ভরসা দেবে, তবে তারা আসবে? কেন? তাদের নিজেদের কি কোন ভরসা নেই।

—আপাত অবস্থায় এইটাই তো দেখছি 'সত্য'।

—সে তো তুমি দেখছ, তোমরা কয়েকজন দেখছ। কিন্তু সেটা তো 'সত্য' নয়।

—তবে কি তুমি যেটা দেখছ, সেটাই 'সত্য'?

রুক্ষ হয়ে উঠছে রাজেনের গলা। সুমিতার বুকের মধ্যে তীক্ষ্ণ তীরের মত বিঁধছে রাজেনের উষ্ণতা। বিদ্যুতের মত চিক্‌চিক্ করে উঠছে আশীষের মূর্তি। সেই অসহিষ্ণু, মর্মান্তিক বিদ্রূপভরা মুখ। আকাশ-পাতাল তফাত দু'জনে। বিশ্বাসে, ব্যবহারে, জীবনধারণে, ধ্যান-আদর্শ-দর্শন, সব কিছুতে। তবু আশীষের মুখ মনে পড়ে সুমিতার। কিন্তু সেখানে সুমিতা নীরব থাকতে পেরেছিল। প্রাণ যদিও ওর উঠছে ছটফট করে, তাকে রাখতে পেরেছে চাপা দিয়ে। এখানে তা পারবে না। বলল, সত্য কি না জানিনে, আমি ঘটনার কথা বলছি। যা আমি দেখতে পাই আমার দু' চোখ ভরে।

—সুমিতা, তুমি যেখান থেকে এসেছ, সেখান থেকে শুধু কিছু ঘটনাই দেখা যায়। কিন্তু 'সত্য'কে উপলব্ধি করা যায় না।

চকিত স্তব্ধ সুমিতা পাংশু হয়ে উঠল। এইবার রাজেন ওকে চরম আঘাত করতে উদ্যত হয়েছে। সুমিতাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছে, সমাজের কোন্ স্তর থেকে এসেছে ও। অধিকারকে সীমাবদ্ধ করে দিতে চাইছে। অসহ্য যন্ত্রণায় ওর কণ্ঠরোধ হল। চুপি চুপি বলল, একথা একদিন তুমি বলবে, আমি জানতুম। একথার জবাব দেবার আমার সময় আসেনি। সত্যি, আমাদের ওই সমাজটার ঘরে বাইরে অনেক মিথ্যেয় ভরা। কিন্তু, তুমি তো রাজেন, তুমি তো সেই রাজেন। তোমাকে না বলে আমি পারব না, তুমি যে জ্বলছো, সেটা আমার মিথ্যে আগুন বলে মনে হচ্ছে। তোমার কথা দিয়েই তোমাকে বলছি, দেহ ও মনে শুধু তুমি সংগ্রাম করলেই হবে না। তুমি কে ?

রাজেন মুখ ফিরিয়ে নিল অন্যদিকে। শুনতে চায় না যেন আর।

সুমিতা তবু বলল, কিন্তু তুমি যাতে বিশ্বাস করেছ, তাতে প্রাণ দিতে পেছ পা নও, জানি। আমার ভয়, তোমাদের নীতিতে, এদেশের নীচু তলার মানুষের নীতি এসে একত্র হয়নি আজো। বড় ভয় রাজেন, আজকে তোমার সংশয় বোধ হয় আমার চেয়ে বেশী। তাই নিজের বন্ধুদের কটু কথা বলতে তোমার আটকায় না, তাদের সততা, সাহসকে সন্দেহ করতে বাধে না। এ যে ব্যর্থতা, ব্যর্থতা।

রাজেন বলল, এত বড় কথাটা এমন সহজ আবেগে বলো না সুমিতা।

সুমিতা উঠে পড়েছিল রাজেনের তক্তপোশ ছেড়ে। বলল, প্রাণের এ কোন্ আবেগ, তা জানিনে। আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমরা শুধু রক্তপাত করবে। কর। কিন্তু সে বৃথা যাবে, একেবারেই বৃথা। শুধু যাদের বুক খালি হবে তাদের ভরবার আর কিছুই থাকবে না।

চলে যাবে বলে পা বাড়িয়েছিল সুমিতা। কিন্তু দাঁড়াল দরজার কাছে। সন্ধ্যা ঘনায়মান। অন্ধকার নামবে এখুনি। হেমন্তের সন্ধ্যাকাশ যেন অশেষ মূকবেদনায় ভরা। আশ্চর্য ! মনে হয়, বাসায়-ফেরা পাখীরা বুঝি গান করে এ সময়ে, ডাকে কিচিরমিচির। সুমিতা দেখল, জীর্ণ বাগানের গাছে গাছে অনেক পাখী। কিন্তু সবাই নীরব। সারা আকাশব্যাপী কি এক সন্ত্রাস যেন দেখছে দু' চোখ মেলে। আসন্ন অন্ধকারের ত্রাসে বোবা হয়ে গেছে

পাখীগুলি। জীবজগতের এইটিই বিচিত্র। বাতি জ্বালতে শেখেনি ওরা। এবার অন্ধ হয়ে যাবে।

সুমিতা এগিয়ে এসে জ্বেলে দিল টেবিল ল্যাম্প। ওর জুঁই ছড়ানো নীল ছিটের জামার রং আরো গাঢ় হয়ে উঠল। ছোট একটি কুমকুমের টিপ দিয়েছিল কপালে। হেমন্তের ধুলো লেগে সে টিপ যেন বাসি রক্ত-বিন্দুর মত দেখাচ্ছে। এখানে আসবার আগে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রায় নিজেরই অজ্ঞাতসারে কেন যেন টিপ দিয়েছিল কপালে। বাতি জ্বালাল সুমিতা। কিন্তু আসন্ন-অন্ধকার বিষাদ-মৌন পাখীর মত ওর দু' চোখে ব্যথিত ত্রাস।

রাজেনের দিকে তাকাল সুমিতা। চুপ করে পড়ে আছে রাজেন। কিছু বলবে না আর সুমিতাকে, কিছু বলবে না। কিন্তু ওই আহত মূর্তি, বন্ধুদের প্রতি রূঢ় সন্দেহান্বিত, দুর্জয় রাগে নিরন্তর ফোঁসা মানুষটিকে বড় অসহায় বোধ হল ওর। ইচ্ছে হয়, যা খুশি তাই করুক রাজেন। দুর্বিনীত শিশুকে কোলে করে রাখার মত রাজেনের কাছে বসে থাকবে সুমিতা। কিন্তু সে সুমিতার ইচ্ছে। রাজেন তো তা দেবে না। সত্যি, কী পাষাণ সুধাময়ী। উপযুক্ত মা আর ছেলে।

রাজেনের কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে নীচু গলায় বলল সুমিতা, রাজেন, আমি চলে যাচ্ছি।

রাজেন তাকাল। এক বিচিত্র বাসনায় হঠাৎ সুমিতার বুকের রক্তধারা তোলপাড় করে উঠল। এমন আর কোনদিন হয়নি। জীবনকে যখন ব্যর্থ মনে হচ্ছে, তিক্ত মনে হচ্ছে, সেই মুহূর্তে এ কি বিচিত্র বাসনার উল্লাস রক্তের কোষে কোষে। চোখের জলের মাঝে এমন করে আর কোনদিন সুমিতার নারী-প্রবৃত্তি তো ব্যাকুল হয়ে ওঠেনি। কেন, কেন এমন হয়। আশ্চর্য! সন্ধিক্ষণের সমস্ত জিজ্ঞাসা, বিস্ময় আজো পুঞ্জীভূত হয়ে রইল ওর অন্তরে। ঠোঁট দু'টি কেঁপে উঠল থর্‌থর্‌ করে। যেন সেই কম্পন থামাবার জন্যেই রাজেনের হাত টেনে নিয়ে মুখে চাপল সুমিতা। রাজেনের আইডিন-গন্ধ কপালে স্পর্শ করল ঠোঁট।

রাজেন বলল, সুমিতা, রাগ করে যেও না। আমার এই নীতি যদি বিচ্যুতির পথ হয়, আন্দোলনের পথে যদি আমি সন্ত্রাসের রাস্তা নিয়ে থাকি, তবে যে পথ দিয়ে চলেছি, তারই ভয়ংকর পথে আমাকে ফিরে আসতে

হবে। আজ আমি নিজেকে যেখানে সঁপেছি, তার শেষ না দেখে আর আমার ফেরার উপায় নেই।

স্মিতা চাপা গলায় বলল, যাক্ যাক্ রাজেন, বলো না আর ওকথা। জানি, আমি জানি, তোমার ফিরে আসা তোমার হাতে। শুধু একটু সাবধানে চলাফেরা করো।

ছায়ার মত যেন ভেসে গেল স্মিতা। পড়ো বাগানে মিলিয়ে গেল ওর ছায়া।

তারপর শুধু পড়া। পড়া আর পড়া। কিন্তু নিশ্চিন্তে অনার্স দেবে, এমন ভাগ্য করেনি স্মিতা। নিজেকে ও অনেকখানি নিরাসক্ত করতে চেয়েছে, রাজেনের দিক থেকে। বাইরে হয়তো পেরেছে, পারেনি ভিতরে।

একই ভাব সকলের। মহীতোষও সেরকম ভাবই দেখান। নিরাসক্ত নির্লিপ্ত, যেন কোন্ এক অজানালোকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছেন সংসার থেকে। চাকরির ব্যাপারেও অনিয়মিত হয়ে পড়েছেন। কোনোদিন যান, যান না কোনোদিন।

জিজ্ঞেস করলে বলেন, ও চাকরির মেয়াদ তো আর বেশিদিন নেই। আয়ু শেষ হয়ে এসেছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে, নতুন ছেলেরা নামছে নির্বাচনে, মিউনিসিপ্যালিটিকে তারা আর সুপারসিডেড করে রাখতে দেবে না। আমাদের মত বাইরের এড্‌মিনিস্ট্রেটরদের স্থানীয় লোকেরা দেখে বড় হীন চোখে। ওসব আর পারিনে। আর কী-ই বা দরকার!

যেন, এতদিন অনেক দরকার ছিল। তাই তাঁর সময় ছিল না। এখন সকালে বিকালে বাইরে যান। ফেরেন নিজের ইচ্ছে মত। তাপসীর বাবার কাছেও যান না। বরং যেন বিরক্তিই বোধ করেন।

শুধু স্মিতার সঙ্গে যখন চোখোচোখি হয়, তখন কি একটি প্রশ্ন উঁকি দেয় তাঁর চোখে। হাতের ছড়িটা মাটিতে ঠুকে ঠুকে কি যেন ভাবেন। তারপরে বলেন, যেন হঠাৎ মনে পড়েছে, পাশ করবে তো?

স্মিতা বলে, দেখি।

মহীতোষ একটা সুদীর্ঘ হুঁ দেন। গানের ইচ্ছেটা যায়নি। প্রায়ই গুন্‌গুন্ করেন। যেন কতই নিমগ্ন আছেন আপন মনে। বিলাসকে বলেন,

তুই তো আচ্ছা শয়তান। দেশে গিয়ে মাকে দেখে আসিস্‌নে কেন? অকৃতজ্ঞ কোথাকার।

বিলাস কর্তার সোহাগ কেড়ে বলে, সময় পাইনে যে হুজুর, নইলে মায়ের কাছে যেতে কার না প্রাণ চায়।

—ইস্‌! কি রাজকার্য করতে হয় যে যাস্‌নে?

—এই যে, বাড়ির কাজ?

—ছুটি নিতে পারিস্‌নে?

—তবে রাঁধবে কে?

মহীতোষ তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকেন। তারপরে বলেন, ও।

—হ্যাঁ, মায়ের জন্যে প্রাণটা বড় কাঁদে বড়সাহেব।

যেন কি এক অভাবিত কথা শুনে বিস্মিত হন মহীতোষ।

হেমন্তের পরে শীত, তারপরে বসন্ত। পরীক্ষা হয়ে গেল সুমিতার। পরীক্ষার পরে যেদিন রাজেনের কাছে গেল, সেদিন সুমিতার শেষ যাওয়া। বৈশাখের প্রচণ্ড তাপে সুমিতা দেখল, রাজেন অপরিচিত হয়ে গেছে যেন! আজ আর ওর কেউ নেই। ওর কর্মীবন্ধুরা। জুটেছে কয়েকজন অল্পবয়সী ছাত্র। কিন্তু তাদের কোনো ক্ষমতা নেই। সহকর্মীরা অনেকেই জেলে। পর পর অসফল আন্দোলনে, অনেকেই বেকার হয়ে, কাজের ধান্দায় চলে গেছে নানান জায়গায়। কিন্তু রাজেন দাঁড়িয়ে আছে এক জায়গাতেই। ঠিক যেন বৈশাখের রুদ্র দাপটে দগ্ধ শ্রীহীন গাছটা। কালো মূর্তি, ছেঁড়া জামাকাপড়। শীর্ণ শরীর, কোটরাগত চোখ। শুধু মাথায় রুক্ষ পিঙ্গল চুল যেন দাউ দাউ করে জ্বলে আগুনের মত। নিজেদের রাজনৈতিক নীতি ও কৌশলের প্রতি কী ভয়াবহ নির্মম সততা আর আনুগত্য। যাদের তা নেই, তারা বহিষ্কৃত, পরিত্যক্ত।

আত্মনাশের এমন ভয়ংকর মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার দিন ফুরিয়েছে। শুধু বাড়িটার ভিতরদিকে তাকিয়ে সুধাময়ীর জন্য, সুধাময়ীর বুকে একটু আশ্রয় নেওয়ার জন্য প্রাণটা হাহাকার করে উঠল সুমিতার। আর ভাবল, ছেলের অদর্শনে যিনি গান করেন আপন মনে, তিনি কীভাবে দিন কাটাচ্ছেন। সুমিতা যেন পরিষ্কার দেখতে পেল, এই সর্বচরাচরের অন্তরালে,

উঁকি দিয়ে আছেন সুধাময়ী। তাঁরো শীর্ণ শরীর, কোটরাগত চোখ, আলুলায়িত চুল। যেন বলছেন ধ্যানস্থ হয়ে, হে মহাপ্রাণ, হে মহাজীবন, তোমার পায়ে সঁপে দেওয়া ছেলেকে তুমি অন্ধ নীতি থেকে মুক্তি দাও, ওকে বৃহৎ সংসারের দিক ফিরাও।

রাজেন ডাকল সুমিতাকে, বলল, পরীক্ষা কেমন দিলে?

সুমিতা হেসে বলল, আমি যেমন দিই। আমার জীবনে তো শুধু ফেল।

রাজেন চুপ করে রইল। ফিরে এল সুমিতা।

সুগতার ডাইভোর্স হয়ে গেছে। সে এখন উত্তর চব্বিশ পরগনাতেই বাসা নিয়েছে। কিন্তু সেখানে যে থাকতে পারবে না সুগতা, সেটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। ওর আশা ছিল প্রচুর, শ্রমিক আন্দোলন করবে। কিন্তু সে সব যেন নিভে যাচ্ছে। জীবনের ও মনের কোথাও আজ আর কোন মিল খুঁজে পায় না শহরতলীর কারখানা অঞ্চলে। শ্রমিক মেয়েদের নিয়ে স্কুল চালায়, সঙ্গে থাকে শিশুরা। কিন্তু পড়া হয় না। সেরকম অর্থ নেই বিদ্যালয় চালাবার মত। সুগতার সামনেই সবাই ফস্ ফস্ করে বিড়ি ধরায়, সুযোগ পেলে শিশুরাও যোগ দেয়। কারখানার বিষয় আলোচনা হয় মাঝে মাঝে। সুগতা কিছু বললে, তাকিয়ে থাকে বড় বড় চোখে। তারপর জিজ্ঞেস করে সুমিতাকে, তার মরদ আছে কিনা।

সুগতার মনে পড়ে, বিভূতিকে এরা সব সময়েই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দেখে। বলে, আছে।

মেয়েরা বলে, তবে ওই যাদুটাই শিখিয়ে দিক সুগতা তাদের। মরদ থাকবে, তবু বাচ্চা হবে না।

বলে খিল্‌খিল্ করে সবাই হাসে। সুগতা লাল হয়ে ওঠে লজ্জায়। বোঝে না, এই মানুষগুলি কখন দপ্ করে জ্বলে ওঠে, নেভে কখন। মন বলে, হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে। কিন্তু কোথায় যাবে। সামনে তাকিয়ে দেখে বিভূতিকে। নিরলস শিল্পী। গোটা উত্তর চব্বিশ পরগনাটাই যেন তার ক্যানভাসে আলাদা আলাদা হয়ে ফুটে উঠছে। আর তার সুদূর-প্রদীপ্ত চোখে আঁকা সুগতা।

সুমিতা চিঠি লিখল—

রাজেন,

জীবন নিয়ে তোমাকে নাটকের কথা লিখেছি ইতিপূর্বে। নাটকটা ওপরের বিষয়। প্রতিমুহূর্তে মানুষের জীবনের গভীরে যা ঘটে চলেছে, তা হঠাৎ বাইরে রূপ ধরলেই নাটকীয় হয়ে ওঠে। কিন্তু মানুষ কোনদিন তার ভিতরটাকে খুলে দেখাতে পারেনি, এমন কি পুরোপুরি প্রকাশ করতেও পারেনি, তাই নাটকটা আঙ্গিকমাত্র। সেখানে মহানাটক, যেখানে কোনো সাজ-সজ্জা-রং কিছুই নেই।

তোমার কাছে আমি কেন গিয়েছি বারবার? অনেকে ভাববে হয়তো, দিদিদের দেখে, আমি সাহস করে তোমার কাছে গিয়েছি। সেকথা সত্যি নয়। আমার ভালবাসা আমাকে সাহস দিয়েছে।

তোমার কাছে যাওয়ার সাহস কিসের? তুমি গরীবের রাজনীতি কর বলেই? না, শুধু তাই নয়। তোমার জীবন যে মহাসমুদ্রে ধাবিত, আমি সেইখানে যেতে চেয়েছি তোমার সঙ্গে। রবিদার ভাষায়, তুমি সেই সাহসী নাবিক, আমাদের সমাজের ছোটখাটো সুখের দিকে যে ফিরে তাকায় না, যে জানতেও পারল না সমাজের একটা শ্রেণী, যার কিছু সীমিত শিক্ষা, অভিমান অহঙ্কার, একটু কায়দাদুরস্ত জীবন, কিছু সম্মান, আরাম-আয়েশ-আনন্দ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কী নিদারুণ লালায়িত। সেদিকে তুমি ফিরেও তাকাওনি। সমাজের অধিকাংশের সঙ্গে সুখ ও দুঃখকে ভাগ করে নেওয়ার সঙ্কল্প ও ব্রত নিয়েছ তুমি। আমি যে আমার দেহমন-প্রাণ, সব নিয়ে গিয়েছি তোমার কাছে, আসলে তোমার সেই জীবনবোধকেই আমি সঁপে দিয়েছি আমাকে। হয়তো দিদিদের জীবন অদৃশ্যে কিছু কাজ করেছে। কিন্তু তোমার কাছে যাওয়া. তোমাকে পাওয়া, সে যে আমার কত বড় অহঙ্কার। বড় অহঙ্কার, তাই বোধহয় বড় অভিমান আমার। তাই বলছি, তোমার সেই জীবনবোধেই যদি আমি আস্থা না পাই, তাতেই যদি ফাঁক থাকে, তবে কোন্ রাজেনের কাছে গিয়ে আমি তোমাকে কলুষিত করব। করব না তা, যাবো না আমি আর তোমার কাছে। তোমার ভিতর দিয়ে, জীবনের যে মহাব্যাপ্তিকে আমি দেখেছিলুম, তা যদি না রইল, তবে আর আমাদের কি রইল। সেই বৃহৎ সুদূরব্যাপ্ত জীবন আজ নীতি কৌশলের কারায় বন্দী

করেছ তোমরা। আমার মনে হয়েছে, জীবনবাদ থেকে অন্ধ যান্ত্রিক নিয়তির পথ ধরেছ। এই অংশের ভাগিদার আমি হতে পারলুম না, তাই বোধহয় এ জীবনে তোমাকে আমার পাওয়া হল না। এই আমার প্রেমের ভাগ্য। তোমার রাজনীতির সঙ্গে আমার ততক্ষণ সম্পর্ক, যতক্ষণ পর্যন্ত তা জীবনের অনর্গল মুক্ত প্রবাহে চলমান। সেইজন্যে প্রত্যহের রাজনীতির মধ্যেও আমার বড় গ্লানির আশঙ্কা।

আমি জানি, তুমি রুষ্ট হচ্ছ, হয়তো এই অর্বাচীন মেয়েটাকে পলাতকা ভেবে হাসছ রাগে ও বিদ্রূপে। সেদিন 'আমাদের সমাজের' কথা বলেছিলে, এই অবিশ্বস্ত উচ্চ মধ্যবিত্ত ঠুনকো প্রাণীদের কথা। ঠিকই, কিন্তু আমি আমার নিজেকে খাটো মনে করতে পারলুম না। জানি, আমি কিছুই করলুম না, আসলে তুমিই বাঁচলে। বাঁচো। আমি বিবাগিনী হবো না। কিন্তু মেয়ে বলেই কিনা জানিনে, জীবনবোধকে পার হয়েও তুমি যেখানটায় খচ্ খচ্ করবে, সেখানটাকে নিয়ে যে কি করব! —সুমিতা।

চিঠিটা শেষ করে টেবিলের উপর বুক চেপে রাখল সুমিতা। সেখানে একটা ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের জন্য কী এক প্রচণ্ড দাহ্য পদার্থ ফুলছে ফানুসের মত।

এমন সময়, মাথায় হাতের স্পর্শ পেতেই চমকে ফিরে তাকাল সুমিতা। মহীতোষকে দেখেই চোখে জল এল।

মহীতোষ যেন এখনো নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত। অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে রইলেন। তারপর স্বরহীন গলায় বললেন, আমার সামনে এরকম করে কেঁদো না রুমনো।

সুমিতা ভেজা গলায় বলল, কাঁদিনি বাবা।

কি আশ্চর্য কথা। মানুষ এমন কথাই বলে এক একসময়।

মহীতোষ আবার বললেন, রুমনো, তোমার শরীরটা যে একেবারে গেল।

সত্যি, তাই। সুমিতার শরীরেও শীর্ণতা দেখা দিয়েছে। এবাড়ির ছোট মেয়ে রুমনি ও, ওর দিগন্ত জুড়েও নেমেছে অন্ধকার।

সুমিতা বলল, কিছু নয় বাবা, দু'দিন গেলেই সেরে যাবে।

মহীতোষ বললেন, না, রুমনো, আমাকে কেন ফাঁকি দাও। তোমাকে দেখলে আমার কষ্ট হয়।

—বাবা, তোমার শুধু কষ্ট।

—মানুষ যখন অক্ষম হয়, তখন তার কষ্ট কেউ বোধ করতে পারে না। কিন্তু তোমাদের সেকথা বললে হবে না। উমনোটা অনেকদিন একলা রয়েছে, আর পারে না। তোমার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, তুমি যাও ওর কাছে।

দু' চোখে আলো ফুটে উঠল সুমিতার। হ্যাঁ, বড়দি, এবার বড়দির কাছে যেতে হবে। পরমুহূর্তেই চমকে, লজ্জায় ও ব্যথায় বলে উঠল, তা কি করে যাব বাবা। তুমি? তোমাকে কে দেখবে?

মহীতোষ সুমিতাকে কাছে টেনে বললেন, আমার জন্যে তুমি ভেবো না। ঝুমনো কাছেই আছে। তা ছাড়া, রুমনো, আমার জীবনের কাল গেছে। তোমার কাল বয়ে যাবে, আমি তা দেখতে পারিনে। তাতে আমার অচল জীবনেও দুঃখ। রুমনো, যাও, চিঠিটা যার, তাকে পাঠিয়ে দাও। দু' একদিনের মধ্যেই যাবার ব্যবস্থা কর।

—বাবা!

—রুমনো, আমি তোমাদের বাবা। তোমাদের জন্য আমাকে বেঁচে থাকতে দাও।

তারপর জানালার দিক তাকিয়ে বললেন, তা ছাড়া আর কি রুমনো। জীবনকে তো এত অচেনা, লুকনো ছড়ানো মনে হয়নি কখনো। তোমাদের জন্যে ভবিষ্যতে আরো কি অপেক্ষা করছে, জানিনে। রুমনো, তাই অন্ধের মত জীবনের সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছি মা, অবোধ শিশুর মত মাথা নত করে আছি, নমস্কার করছি। বলছি, আমার সন্তান ক'টিকে শান্তি দাও!

সুমিতাও অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে যেন সেই জীবনের সন্ধানেই তাকাল জানালার দিকে।

তারপর তিনদিন পরেই সুমিতাকে মহীতোষ নিজে তুলে দিয়ে এলেন বোম্বে মেলে। বললেন, অমন করে যেওনা রুমনো, একটু হেসে যাও।

বাপ মেয়ে দু'জনের হাসি-কান্নার দোলায় দোলায়িত গাড়ি চলে গেল।

(৩৮)

বাড়ি ফিরে এলেন মহীতোষ। গেটের কাছে এসে, অন্ধকার বাড়িটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়ালেন থমকে। তারপর আবার পায়ে পায়ে হেঁটে চলে

গেলেন অ্যাভিন্যুর দিকে। কিন্তু গলি রাস্তাটা ছোট, অ্যাভিন্যুটাও ছোট। সারা কলকাতাই ছোট। দিগ্‌দিগন্তহীন যে জীবনের থৈ পাওয়া যায় না, মনে হয়, সে জীবনও বড় ছোট। মহীতোষের মনে হয়, ওঁরা হলেন জীবন-রথের চোখে ঠুলি আঁটা অশ্ব। সারথীর চাবুক রথ নির্দেশ করছে নিয়ত। তারই চাবুক-কষা আবার এনে হাজির করল ওঁকে গেটের কাছেই। সেখানে এসে আবার পা ঘষতে লাগলেন। যেন শুনতে পেলেন, সারথী নয়, গাড়োয়ান শাসাচ্ছে, ওরে বুড়ো ঘোড়া, জীবনভর তোকে আমি চালিয়ে নিয়ে এসেছি। মিছেই তুই বেয়াদপি করছিস আজ। মরণ তোর সামনে, তুই তাকেই স্মরণ কর।

কিন্তু মানুষের মন! যতই বাঁধা পড়ুক জালে, সে তো অনিত্যকালের নয়, নিত্য প্রবহমান। মরণের সামনে দাঁড়িয়েও ফাঁক খোঁজে সে।

তাই গেটের কাছে এসেও পালাতে চান মহীতোষ। কিন্তু উপায় নেই। যারা কাছে থাকলে দুঃখ, তারা দূরে গেলেও ব্যথা লাগে। জীবনের মাঝে এ যে কোন্ খেলোয়াড়ের কায়দা, কে জানে। জীবন বলে, এ একাকীত্ব সবচেয়ে কষ্টের। কিন্তু মূল্য অনেক। যাকে অচেনা লেগেছে, ভয় লেগেছে, সেই জীবনের সঙ্গে এইবার দেখা করতে হবে।

লোহার দরজা ঠেললেন মহীতোষ। একটি অস্ফুট দীর্ঘ শব্দ হল। এই শব্দটি কতদিন কতরকম ভাবে এ বাড়ির সবাই শুনতে চেয়েছে, শুনেছে। সুজাতার কোর্টে যাওয়ার দিন সুমিতা এই শব্দটি শোনার জন্য কেঁদে মরেছে মনে মনে।

সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে চেনা সুইচটা টিপে দিলেন। আলো জ্বলল। বেল টিপে দিলেন। বিলাস এসে খুলে দিল দরজা। ওর চোখ লাল। বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ঘরে ঢুকে বিলাসকে বললেন, অন্ধকার কেন ঘরগুলো। আলো জ্বেলে দে সব ঘরের।

বিলাস আলো জ্বেলে দিল সব ঘরের। মহীতোষ কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন বাইরের ঘরে। নিঃশব্দ, ভয়ংকর নিঃশব্দ লাগছে চারদিক। কালকেও হয় তো এমনিই ছিল, পরশুও। অনেকদিনই, তবু এত ভয়ংকর মনে হয়নি। হাতের ছড়িটা রেখে দিয়ে, অর্গ্যানের সামনে বসে ঢাকা খুললেন। তারপর বাজাতে লাগলেন। বেলো ফাটা হলেও শব্দটা কিছু আস্তে হচ্ছিল না। কিন্তু

সন্তুষ্ট হচ্ছিলেন না মহীতোষ। পা' দিয়ে জোরে জোরে চাপ দিতে লাগলেন। স্বরটা গলায় এল না। সেটা গুন্ গুন্ করতে লাগল মনের মধ্যেই, 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে।'

শুধু বিলাস দাঁড়িয়ে রইল পর্দাটা ধরে। ওর ঘুম-চোখে রাজ্যের বিস্ময়।

বম্বে শহরের ঠিক কান ঘেঁষা উপকণ্ঠে সুজাতার বাস। সেখানে শুধু ট্রাম লাইনটাই নেই। আর সবই আছে। বেলা প্রায় দু'টোর সময় ট্যাক্সিটা সমতল থেকে হঠাৎ একটা টিলার ঢালুপথে উঠে দাঁড়াল একটি বাড়ির সামনে। দরজায় লেখা রয়েছে 'হ্যাপী লজ।' বহুবার খামের উপর ওই নামটি লিখতে হয়েছে ওকে। কিন্তু কোন সাড়া শব্দ নেই। টেলিগ্রাম করে এসেছে সুমিতা। পায়নি নাকি।

সিল্ক শাড়ি পরা, একটি মারাঠী মেয়ে এসে দরজা খুলে দিল। দু'পাশে তার বিনুনি দোলানো। মুখে একটু হাসির আভাস নিয়ে জিজ্ঞেস করল সুমিতাকে, মিস্ সুমিতা?

—হ্যাঁ। আপনি?

মেয়েটি সঙ্কুচিত হয়ে জানাল, মেমসাহেবের সে নোকরানী। টেলিগ্রামটা এসেছে একটু আগেই, তার আগে মেমসাহেব অফিসে চলে গেছেন। টেলিগ্রাম সে নিজেই পড়ে নিয়েছে এবং অপেক্ষা করছে সুমিতার। সুমিতা আসুক ভিতরে। সে জানে, সুমিতা মেমসাহেবের ছোট বোন। চেহারা দেখেও বুঝতে পেরেছে সে। ড্রাইভারের সাহায্যে মালপত্র তুলল সে ঘরে। নিজেই জানাল সে, নাম তার চম্পা, চম্পা জ্যাকসন্। ধর্মে সে খৃষ্টান।

হ্যাপী লজ দেখে মনটা খুশি হলেও কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে রইল সুমিতা। ভেবেছিল, স্টেশনেই পাবে বড়দিকে। বাড়ি এসেও পাওয়া গেল না। কিন্তু কোনকিছু ভাববার আগে চান করবার জন্যে পাগল হয়ে উঠল ও। ব্যবস্থা করে দিল সব চম্পা। স্নান করে এসে দেখল, খাবার প্রস্তুত।

দু'রাত্রি ও দু'দিনের পথের গ্লানি ও ক্লান্তিতে এখন অঘোরে ঘুমোবার কথা। কিন্তু একটুও ঘুম এল না সুমিতার। ঘুরে ঘুরে, খুঁটে খুঁটে বড়দির 'বাসা' দেখতে লাগল। বড়দির জামাকাপড়, টেবিল চেয়ার, খাট-বিছানা। সবকিছুতেই কলকাতার চেয়ে এখানে জাঁকজমক যেন বেশী। র‍্যাক্ ভরতি বাংলা বই। তারপর হঠাৎ নজরে পড়ে, টেবিলের ওপর একটি

সিগারেটের প্যাকেট। ছাইদানিতে অনেকগুলি পোড়া সিগারেট। কে খায়? কই, কোথাও তো কোনো পুরুষের ছাপ নেই এঘরে।

হঠাৎ কেমন যেন ভয় করতে লাগল সুমিতার। বড় ক্লান্ত, তবু মনের মধ্যে একটি অসহ্য যন্ত্রণা হতে লাগল। কী আছে ওর সামনে। এতদিনের সমস্ত জীবনটা কি অতীত হয়ে গেল। ছিন্ন হয়ে গেল এতদিনের সব সূত্র। জীবনের সমস্ত যুক্তিতর্ক, আদর্শ, নিষ্ঠা, বিশ্বাস, হঠাৎ যেন সব অর্থহীন মনে হতে লাগল বম্বের এই হ্যাপী লজে। এ কি ভয়ংকর হাহাকার মনের মধ্যে। এত বড় একটা শূন্যতা নিয়ে বাঁচবে কেমন করে সুমিতা।

বিকেলে এল সুজাতা। পায়ের শব্দে সুমিতা ফিরে তাকাতেই, দু'জনে নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে গেল এক মুহূর্ত। সুজাতার অস্ফুট গলায় খালি শোনা গেল, রুমনি।

পরমুহূর্তেই দু'জনে ছুটে গেল দু'জনের কাছে। সুসংবাদ দুঃসংবাদের কোনো প্রশ্ন দাঁড়াল না ওদের সামনে। কোনো কথা জোগাল না মুখে। আনন্দে না দুঃখে, ওরা দু'জনের কেউই জানে না, শুধু কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল অশেষ কান্নায়।

সুজাতা বারবার বলতে লাগল, সত্যি এসেছিস্, সত্যি।

সুমিতা কেবলি ডাকতে লাগল, বড়দি, বড়দি।

দুই বোনের মিলন দেখে, আড়ালে চম্পার চোখেও কেন যেন জল এসে পড়ল।

তারপর সুজাতা প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, বাবা কেমন আছেন রুমনি।

সুমিতা বলল, বুঝতেই পারছ। ভাল কেমন করে থাকবেন।

—শরীরটা কেমন?

—মোটামুটি।

কি জিজ্ঞেস করতে গিয়ে হঠাৎ গলার স্বর চেপে এল সুজাতার। বলল, ঝুমনো? ঝুমনোটা কেমন আছে রে?

সুমিতা বলল, মেজদি ব্যারাকপুরের দিকে আছে। কলকাতায় আসে প্রায়ই।

—তুই যে বিভূতির কথা লিখেছিলি, তার কিছু হয়েছে নাকি?

সুমিতা জানাল, একরকম ধরেই নেওয়া যায়। সুমিতা যতটুকু বুঝেছে, তাতে মনে হয়েছে, বিভূতি মানুষ হিসেবে অনেক বড়। সৎ, সরল, ভাবুক শিল্পী। প্রেমিক হিসেবে ওর কোনো হিরোইজম্ নেই। জীবনের কাজ ও

ভাবনা, সমস্তকিছুর সঙ্গে সে মেজদিকে মিশিয়ে ফেলেছে। মেজদি যদি তাকে আজ ছেড়ে দেয়, তবে বিভূতি একটি কথাও বলবে না। কিন্তু মনের যেখানটা তার শূন্য হবে, সেখানটা পূরণ করতে পারবে না৷ বোধহয় বিভূতি সারা জীবন ছবি এঁকেও।

সুজাতা বলল, কেন, ঝুমনোর সেরকম কোন ইচ্ছেও আছে নাকি?

সুমিতা বড়দির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। বলল, বড়দি, তুমি কেন একথা বলছ? ইচ্ছেই যদি সব করত, তবে আজ এমন হল কেন? ইচ্ছের পথে গিয়েও অনিচ্ছার পথে পালাতে হয় মানুষকে। তার জন্যে যে কি অবস্থা হয়, তাতো আমরা কম দেখলুম না। বড়দি, আমার বড় ভয়, মেজদি যদি বিভূতিকে ছাড়ে, তার চেয়ে দুঃখের আর কিছু নেই।

সুজাতা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ সুমিতার মুখের দিকে। তারপর চিবুক ধরে ওর মুখ তুলে বলল, তোর কথাগুলো শুনে আমার বড় ভয় লাগছে রুমনি।

শুকনো হেসে বলল সুমিতা, তবে থাক্ সেকথা বড়দি।

সুজাতা বলল, অন্য কোনো ভয় নয় রুমনি। নানান কথা এসে জড়ো হয় মনের চারপাশে। জীবনের যে নানান কথা আছে, প্রথম বয়সেই এড়িয়ে গেছি তাকে। কিন্তু সে ছেড়ে কথা কয়নি। মনে করেছি, দু' হাত বাড়িয়ে নেব যতখানি পারি। কিন্তু কোন্ ফাঁক দিয়ে সে কোথায় বেরিয়ে গেছে কখন। রুমনি তুই আমার ছোট, কিন্তু তোর কাছে আমার কোনো লজ্জা নেই। প্রাণের ইচ্ছে আর মনের ফাঁকি, দু'টোই আমাকে বড় মার মেরেছে। তোর কথাগুলো শুনলে সে-সবই আমার তোলপাড় করে ওঠে। কিন্তু রুমনি—

—বল।

—তোকে কেন এমন দেখছি রে?

—আমাকে আবার কেমন দেখছ?

সুমিতার সর্বাঙ্গে একবার চোখ বুলিয়ে বলল সুজাতা, যেমন এসেছিস্, তেমনি দেখছি। পরীক্ষা দিয়েছিস্, পাশ করেছিস্ অনার্স নিয়ে, শুধু সেইজন্যেই বুঝি এমনি শুকিয়েছিস্?

চোখোচোখি হতে, চোখ নামিয়ে বলল সুমিতা, শুকিয়েছি কোথায়?

সুজাতা ওর চুলের গোছা ধরে সামনে টেনে এনে বলল, রুমনি!

—বল।

—আমি যে জানতুম, তোর বড় সাহস। তুই যে মনপ্রাণের ফাঁকিটাকে দু'হাতে সরিয়ে ছুটে গিয়েছিলি? তার কি হল? তুই যে কোনো-কিছুকে পরোয়া না করে অনেক বড় জীবন চেয়েছিলি?

সুমিতা বলল, পারলুম না বড়দি। কোন দুঃখকে আমি ভয় পাইনি। তবু না।

—কেন?

—সেখানেও জীবনটা বড় ছোট। যত সে ছোট, ততই সে ক্রুর, নিষ্ঠুর অন্ধ। প্রথম দেখে যাকে আমার অনেক বড় মনে হয়েছিল, দেখলুম তার সঙ্কীর্ণতাও কম নয়। বড়দি, রাজেনের ত্যাগ ছোট নয়, কিন্তু নীতির সঙ্কীর্ণতা জীবনের মর্যাদা থেকে দূরে সরিয়ে দেয় মানুষকে। সেটা আমি সইতে পারলুম না।

সুজাতা অন্তহীন বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল সুমিতার দিকে। দু' চোখে ওর জল। বলল, তুইও যে বড় নিষ্ঠুর রুমনি। রাজেনকে যে তুই ভালবেসেছিস্। জীবনবোধের জন্য তাকে ছেড়ে এলি কি করে তুই?

সুমিতা রুদ্ধ গলায় বলল, আমি ছাড়িনি, রাজেনই আমাকে ছাড়িয়েছে বড়দি। যেখানে বিশ্বাস নেই, সেখানে ভালবাসা দু' দিন বাদে অপমানের নামান্তর হত। তাই আমি সরে এসেছি, ও থাক্, ওর জীবন নিয়ে। সেখানে আমার স্থান নেই।

এক ঘরে, এক বিছানায় পাশাপাশি দিন যায় দুই বোনের। দিনের পর দিন যায়।

অনেক লোকজন আসে সুজাতার বাড়িতে। যেন মৌচাক বাড়িটা। মক্ষীরানী ওরা দুই বোন। বোম্বে কারদোজা অফিসের ম্যানেজার, আর্টিস্টেরা আসে। আসে অনেক চেনাশোনা বাঙ্গালী ছেলেরা। মেয়েরা আসে কম। বিশেষ বাঙ্গালী মেয়েরা। তারা বরং দুর্নাম করে বেড়ায় সারা বোম্বেতে দু' বোনের নামে। এক সুজাতার নামের সঙ্গেই যে কত লোকের নাম জড়িয়েছে ওরা, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু যারা আসে, তারা সবাই ওদের বাইরের জীবনের মানুষ। পশুপক্ষীর জগতের মত এই পুরুষেরা পেখম খুলে, কেশর ফুলিয়ে যেন ভোলাতে আসে ময়ূরী, সিংহিনীদের। সামান্য ব্যাপারে আত্মদ্বন্দ্বে মাতে নিজেরা।

আর ওরা দু'টি মেয়ে, দু'টি বোন জীবনের ঘূর্ণি আবর্তে পাক খেয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরছে। সেখানে ওদের কোন সঙ্গী নেই, পরস্পরকে ছাড়া।

একজন আসে অনেকদিন পর পর। লোকটির নাম সুন্দরলাল বাকায়া। সুমিতা বোঝে, ওই লোকটি বড়দির পুরোপুরি বাইরের নয়, আবার ভিতরেরও নয়। দেশ ছিল পাঞ্জাবে। অধ্যাপক ছিল লাহোরের এক কলেজে। দেশ বিভাগের পর এসেছে বোম্বেতে। স্ত্রী ছিল, মারা গেছে। প্রায় মধ্যবয়সী লোক। কানের পাশে চুল সাদা হয়ে উঠেছে। চোখ দু'টি সব সময়েই যেন ছায়াঘেরা। কেউ নেই লোকটির। এখন একটি বিলিতী কোম্পানীর টুরিং এজেণ্টের চাকুরি করে। মধ্য ও দক্ষিণ ভারত ঘুরতে বেরোয় প্রায়ই। কোম্পানীর অ্যাডভারটাইজমেণ্টের ব্যাপারেই কারদেজোর অফিসে যাতায়াত, সেই সূত্রেই আলাপ বড়দির সঙ্গে।

প্রথমে জানত সুমিতা, বাকায়া কথা বলে কম। কিন্তু তা নয়। বাকায়া অনেক কথা বলে। শুধু বড়দির সঙ্গে বলে।

সুজাতা বলে, বাকায়া বড় অদ্ভুত মানুষ। আলাপের প্রথম দিনেই বুঝলুম, ও একটা পাকা বোহেমিয়ান। বাউল-বৈরাগীও বলা যায়। টুরিং-এর কথা এমনভাবে গল্প করে, এত বিচিত্র আর আশ্চর্য, মনে হয় যেন গান করে বলছে। আর বড় নির্বিরোধী, কারুর সঙ্গে ওর টক্কর লাগে না কখনো। এমনিতেও একটু ভিড় বাঁচিয়ে চলে।

সুমিতা দেখে, যখন লোক থাকে, তখন বাকায়া নীরব। সবাই চলে যাওয়ার পর, বাকায়া মুখ খোলে। সেটা যে ওর স্বার্থপরতা কিংবা সঙ্কীর্ণতা, তা নয়। কে কি মনে করবে, কি ভাবে নেবে, সেই ভাবনা। ওরই সিগারেটের প্যাকেট পড়ে থাকে বড়দির ঘরে। ছাইদানিটা কিনে এনে রেখেছে বড়দি। প্রথম প্রথম সুমিতার সামনে সঙ্কোচ করত বাকায়া। মাস দু'য়েক পর সেটা কেটেছে আস্তে আস্তে।

কত জায়গার কথা, কত মানুষের কথা যে বলে বাকায়া। সামান্য বাংলা জানে। ইংরেজী বাংলা মেশানো, বাকায়ার কথার ভঙ্গিটি সুন্দর। সেই কথার ভিতর দিয়ে ফুটে ওঠে একটি সহৃদয় অভিজ্ঞ কথাশিল্পী। ওই দিয়েই বাকায়া মুগ্ধ করেছে বড়দিকে।

সুমিতা দেখে, বাকায়ার সুদূর চোখের ওপারে যেন একটি সকরুণ আবেদন মাথা কুটছে। কিন্তু কোনোদিন কোনো ব্যবহারে, কথায় সেটুকু প্রকাশ

করেনি। শুধু কেমন করে যেন বুঝেছে, বড়দির প্রাণে আছে এক গোপন বেদনা। বাকায়া তার গল্প ও বিবরণ নিয়ে হাজির হয় বড়দির সেই অন্ধকার প্রাণের কাছে। তাকেও টেনে এনে ছড়িয়ে দেয় অচিন মানুষ ও জনপদের মাঝে।

বাকায়া নিজের দুঃখের কথা কিছু বলে না। খুঁচিয়ে উসকে তোলে না অপরের দুঃখ। এর পরিণতি কি হবে। মেয়ে হয়ে সুজাতা কি বাকায়ার যাওয়া-আসার মর্মোদ্ধার করতে পারে না!

পারে বৈকি। সুজাতা বলে, সুন্দরলালকে আমার কোনো ভয় নেই। ও যে আমাকে নির্ভয় করেছে, সেইজন্যেই ওর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। পরিণতি? মানুষ সব সময় পরিণতি কেন খোঁজে? বাকায়ার এই নিরন্তর যাওয়া-আসা, এই নিরন্তর কথা আর সুজাতার শোনা, এই তো পরিণতি। বাকায়ার সঙ্গে আমার ওইটুকু ভিতরের চেনাশোনা। এর কম হলে দু'জনের কারুর প্রাণে সইবে না। বেশী হলে, অপমান আর ঘৃণা এসে বাসা বাঁধবে।

তারপর আবার ওরা দুই বোন দাঁড়ায় মুখোমুখি। তখন আর কোনো সুন্দরলাল বাকায়া থাকে না। থাকে না অন্যান্য পরিচিতেরা। শুধু দুই বোন, আর একটি রুদ্ধ যন্ত্রণা।

সুজাতা বলে, রুমনি, তোকে যে আর চেয়ে দেখতে পারিনে। দিনে দিনে তুই শুধু শুকোচ্ছিস্।

বাবাকে আমি কি কৈফিয়ত দেব?

সুমিতা বলে, কি যে বলো বড়দি। চল, আজ একটু ইণ্ডিয়া গেটে ঘুরে আসি।

কিন্তু 'সত্য'কে চাপবে কেমন করে সুমিতা। মনের সব যন্ত্রণা ওর হারিয়ে গেছে রক্তে। এমনিই তো হয়। মনের আগুন এমনি করেই ধীরে ধীরে রক্ত-মাংসের মানুষটিকে নিয়ে পড়ে, এমনি করে নিঃশেষ করে। জড় দেহটা তো কিছু নয়। তার ভিতরের চৈতন্য যাকে মারে, উপায় কি তার বাঁচার।

সুমিতা যে লিখেছিল রাজেনকে, 'জীবনবোধকে পার হয়েও তুমি যেখানটায় খচ্‌খচ্‌ করবে, তাকে নিয়ে কি যে করব।' সেই খচখচানিতেই রক্ত ঝরছে সুমিতার। রাজেনের খবর কাউকে ও জিজ্ঞেস করতে পারে না, কেউ দেয়ও না। চিঠি লিখবে সুমিতা? কে জবাব দেবে। রাজেনের

আর ওরা দু'টি মেয়ে, দু'টি বোন জীবনের ঘূর্ণি আবর্তে পাক খেয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরছে। সেখানে ওদের কোন সঙ্গী নেই, পরস্পরকে ছাড়া।

একজন আসে অনেকদিন পর পর। লোকটির নাম সুন্দরলাল বাকায়া। সুমিতা বোঝে, ওই লোকটি বড়দির পুরোপুরি বাইরের নয়, আবার ভিতরেরও নয়। দেশ ছিল পাঞ্জাবে। অধ্যাপক ছিল লাহোরের এক কলেজে। দেশ বিভাগের পর এসেছে বোম্বেতে। স্ত্রী ছিল, মারা গেছে। প্রায় মধ্যবয়সী লোক। কানের পাশে চুল সাদা হয়ে উঠেছে। চোখ দু'টি সব সময়েই যেন ছায়াঘেরা। কেউ নেই লোকটির। এখন একটি বিলিতী কোম্পানীর টুরিং এজেন্টের চাকুরি করে। মধ্য ও দক্ষিণ ভারত ঘুরতে বেরোয় প্রায়ই। কোম্পানীর অ্যাডভারটাইজমেণ্টের ব্যাপারেই কারদেজোর অফিসে যাতায়াত, সেই সূত্রেই আলাপ বড়দির সঙ্গে।

প্রথমে জানত সুমিতা. বাকায়া কথা বলে কম। কিন্তু তা নয়। বাকায়া অনেক কথা বলে। শুধু বড়দির সঙ্গে বলে।

সুজাতা বলে, বাকায়া বড় অদ্ভুত মানুষ। আলাপের প্রথম দিনেই বুঝলুম, ও একটা পাকা বোহেমিয়ান। বাউল-বৈরাগীও বলা যায়। টুরিং-এর কথা এমনভাবে গল্প করে, এত বিচিত্র আর আশ্চর্য, মনে হয় যেন গান করে বলছে। আর বড় নির্বিরোধী, কারুর সঙ্গে ওর টক্কর লাগে না কখনো। এমনিতেও একটু ভিড় বাঁচিয়ে চলে।

সুমিতা দেখে, যখন লোক থাকে, তখন বাকায়া নীরব। সবাই চলে যাওয়ার পর, বাকায়া মুখ খোলে। সেটা যে ওর স্বার্থপরতা কিংবা সঙ্কীর্ণতা, তা নয়। কে কি মনে করবে, কি ভাবে নেবে, সেই ভাবনা। ওরই সিগারেটের প্যাকেট পড়ে থাকে বড়দির ঘরে। ছাইদানিটা কিনে এনে রেখেছে বড়দি। প্রথম প্রথম সুমিতার সামনে সঙ্কোচ করত বাকায়া। মাস দু'য়েক পর সেটা কেটেছে আস্তে আস্তে।

কত জায়গার কথা, কত মানুষের কথা যে বলে বাকায়া। সামান্য বাংলা জানে। ইংরেজী বাংলা মেশানো, বাকায়ার কথার ভঙ্গিটি সুন্দর। সেই কথার ভিতর দিয়ে ফুটে ওঠে একটি সহৃদয় অভিজ্ঞ কথাশিল্পী। ওই দিয়েই বাকায়া মুগ্ধ করেছে বড়দিকে।

সুমিতা দেখে, বাকায়ার সুদূর চোখের ওপারে যেন একটি সকরুণ আবেদন মাথা কুটছে। কিন্তু কোনোদিন কোনো ব্যবহারে, কথায় সেটুকু প্রকাশ

করেনি। শুধু কেমন করে যেন বুঝেছে, বড়দির প্রাণে আছে এক গোপন বেদনা। বাকায়া তার গল্প ও বিবরণ নিয়ে হাজির হয় বড়দির সেই অন্ধকার প্রাণের কাছে। তাকেও টেনে এনে ছড়িয়ে দেয় অচিন মানুষ ও জনপদের মাঝে।

বাকায়া নিজের দুঃখের কথা কিছু বলে না। খুঁচিয়ে উসকে তোলে না অপরের দুঃখ। এর পরিণতি কি হবে। মেয়ে হয়ে সুজাতা কি বাকায়ার যাওয়া-আসার মর্মোদ্ধার করতে পারে না!

পারে বৈকি। সুজাতা বলে, সুন্দরলালকে আমার কোনো ভয় নেই। ও যে আমাকে নির্ভয় করেছে, সেইজন্যেই ওর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। পরিণতি? মানুষ সব সময় পরিণতি কেন খোঁজে? বাকায়ার এই নিরন্তর যাওয়া-আসা, এই নিরন্তর কথা আর সুজাতার শোনা, এই তো পরিণতি। বাকায়ার সঙ্গে আমার ওইটুকু ভিতরের চেনাশোনা। এর কম হলে দু'জনের কারুর প্রাণে সইবে না। বেশী হলে, অপমান আর ঘৃণা এসে বাসা বাঁধবে।

তারপর আবার ওরা দুই বোন দাঁড়ায় মুখোমুখি। তখন আর কোনো সুন্দরলাল বাকায়া থাকে না। থাকে না অন্যান্য পরিচিতেরা। শুধু দুই বোন, আর একটি রুদ্ধ যন্ত্রণা।

সুজাতা বলে, রুমনি, তোকে যে আর চেয়ে দেখতে পারিনে। দিনে দিনে তুই শুধু শুকোচ্ছিস্।

বাবাকে আমি কি কৈফিয়ত দেব?

সুমিতা বলে, কি যে বলো বড়দি। চল, আজ একটু ইণ্ডিয়া গেটে ঘুরে আসি।

কিন্তু 'সত্য'কে চাপবে কেমন করে সুমিতা। মনের সব যন্ত্রণা ওর হারিয়ে গেছে রক্তে। এমনিই তো হয়। মনের আগুন এমনি করেই ধীরে ধীরে রক্ত-মাংসের মানুষটিকে নিয়ে পড়ে, এমনি করে নিঃশেষ করে। জড় দেহটা তো কিছু নয়। তার ভিতরের চৈতন্য যাকে মারে, উপায় কি তার বাঁচার।

সুমিতা যে লিখেছিল রাজেনকে, 'জীবনবোধকে পার হয়েও তুমি যেখানটায় খচ্‌খচ্‌ করবে, তাকে নিয়ে কি যে করব।' সেই খচখচানিতেই রক্ত ঝরছে সুমিতার। রাজেনের খবর কাউকে ও জিজ্ঞেস করতে পারে না, কেউ দেয়ও না। চিঠি লিখবে সুমিতা? কে জবাব দেবে। রাজেনের

জীবনের চারপাশে একটা পরিবেশ কল্পনা করতে পারে ও। কে জানে, আবার কেউ সেরে রেখে গেল কি না। কেমন আছে শরীরটা, কোথায় খায়, কোথায় আছে।

জীবন থেকে বিদায় করেছে রাজেন সুমিতাকে। কিন্তু বেঁচে থাকবে, তো মানুষটা। কে জানে, এতদিনেও ফিরেছেন কিনা সুধাময়ী।

ওরা দু'জনে ইণ্ডিয়া গেটে যায়। সেখান থেকে একটু হেঁটে মেরীন-ড্রাইভ। এদিকে সমুদ্র, ওদিকে সমুদ্র। কূল বড় ছোট। আর চারদিক অকূল হয়ে আছে।

সুমিতার মনে পড়ে বড়দির সেই চিঠির কথা, 'সমুদ্র আর আকাশ যেখানে মিশেছে, সেখানে দেখি আবার চেনা-অচেনা মানুষের ভিড়। আমার যেতে ইচ্ছে করে সেখানে।' সুমিতা বুঝি স্বার্থপর। ও একজনকেই দেখতে পায়, একজনই ছড়িয়ে থাকে সারা আরব সাগরের আকাশ জুড়ে। ওরও যেতে ইচ্ছে করে।

কখনো যায় জুহু সৈকতে, জুহুর নারকেল কুঞ্জে। সেখানে আকাশের যত ব্যাপ্তি, মোহিনীময়ী আরব সাগরের যত খিল খিল হাসি, নারকেল বীথির যত দীর্ঘশ্বাস, স্বপ্নলোকে সেখানে অকরুণ দুর্মর মিলন ও চুম্বনের হাহাকার তত। ঠোঁটের ধনুকে, কটাক্ষের তীরে, হাসির নিক্কণে সমুদ্র ততই মাতাল।

পালিয়ে যায় দুই বোন। সাতবাংলার নির্জন সৈকতে যায়। কখনো সময় বেশি নিয়ে ছুটে যায় কারজাত পাহাড়ে, পুনার পশ্চিমঘাট পর্বতমালার জটিল আবর্তে।

ওদিকে পর্বতের জটলা আদিগন্ত, এদিকে অকূল সমুদ্র। তাড়িয়ে নিয়ে আসে আবার হ্যাপী লজে। কি আশ্চয নাম বাড়িটার। এসে খোঁজে চিঠি, কলকাতার চিঠি।

'কেমন আছ মা তোমরা। সাবধানে থাকবে। মন খারাপ না করে সব সময় প্রফুল্ল থাকতে চেষ্টা করবে। আমি এখন কি করে যাব? পরে অনেক সময় আসবে। ঝুমনো আর বিভূতি আছে ভালই। কলকাতায় আসাটা ওদের বেড়েছে। বোঝা যাচ্ছে, মফস্বল ওদের ধরে রাখতে পারছে না, কিংবা ওরাই পালিয়ে আসছে। ভাল আছি, চিন্তা করো না। আশীর্বাদ জেনো। তোমাদের—বাবা।'

তাপসী লেখে চিঠি। সমস্ত চিঠিতে তীক্ষ্ণ, তীব্র হাসি থাকে ছড়ানো। শুধু ঢাকা থাকে না নোনা স্বাদটুকু। একটা চিঠিতে লিখেছে তাপসী সুমিতাকে, 'তোর আশীষ আর একটা বড় চাকরি পেয়েছে, আর সাতপাক ঘুরিয়ে বরণকুলো ছুঁইয়ে নিয়ে এসেছে একটি অষ্টাদশী। কলকাতার বন্দরের মিঃ জনদের মত তার কোমর ধরে নিয়ে বেড়ায়। মুখপুড়ি, ঠকে গেলি তো। শ্যাম রাখতে গিয়ে কুল হারালি। শুনেছি, সেই ভদ্রমহিলা এখন বরানগরের এক দূর-আত্মীয়ের বাড়িতে মাথা গুঁজে আছেন।'

তারপরেই তাপসী লিখেছে, 'ভাবি, এই হৃদয়হীন ভণ্ড আত্মসুখপরায়ণ মিথ্যে সংসারটার ওপর বজ্রাঘাত হবে কবে।'

শিবানী একটা চিঠি লিখেছে, 'ছোট পিসি— তোমাদের তিন বোনের কথা ভাবতেও আমার ভয় হয়। সেজদাদু তোমাদের এত স্বাধীনতা দিয়েছিলেন যে, তোমাদের জীবনকে কখনো আমরা ভাল চোখে দেখতে পারিনি। তোমাদের কত খারাপই না ভেবেছি। তাই তোমাদের দুঃখ না-হয় কপালে ছিলই। কিন্তু আমার, আমার কি হল? সম্বন্ধ, বিয়ে, ভালবাসা, স্বামী পুত্র সংসার আমার জন্যে সবাই যা চেয়েছিল, আমিও চেয়েছিলুম। সব পেয়েও আমি কেন আমার ঘরের সুখ ও দুঃখ নিয়ে সুগৃহিণী হতে পারছিনে। ছোট পিসি, তোমাকে বলতে তো আমার বাধা নেই, আমার শরীরে যতদিন সৌষ্ঠব ছিল, ততদিন আমি সুখী ছিলুম। মনে হয়, মেয়েদের দেহ যখন মরে, মন তখনই জাগে। এখন আমি জেগে দেখছি, আমাদের এই ঘরে, ভালবাসা, সন্তান জন্মানো ঘরকন্নাটা শুধু একটা অভ্যাসের বিষয়। কি হবে আমার ছোট পিসি! কেন আমার মনে এই সব জাগছে?—'

চিঠি পড়ে দুই বোন। তারপর আবার মুখোমুখি দাঁড়ায়। জীবনের সমস্ত ধারা শুধু পাক খায়, আবর্তিত হয়।

সুজাতা বলে, রুমনি, একটু ভাল জামাকাপড় পর, হাতে পায়ে একটু সাজ। তোকে যে আমার চেয়ে বড় লাগে।

চোখের কালিতে বিচিত্র হাসি ফুটিয়ে বলে সুমিতা, কত তো সাজি।

—এই কি সাজ? এ তো সন্ন্যাসিনীর বেশ।

—কি যে বলো বড়দি।

—রুমনি, রাজেনকে একটা চিঠি লেখ্।

স্থমিতা চম্‌কে ওঠে। তারপর শান্ত হয়ে বলে, চিঠি লেখার পাট শেষ করে এসেছি। বড়দি, ওসব কথা বলো না।

শুনতে পারে না স্থমিতা। যে মন প্রতি মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়তে চাইছে, উজান ছেড়ে ভেসে যেতে চাইছে ঢলে, তার কথা শুনতে নেই।

দেখতে দেখতে আবার এল শীত। তবে বোম্বের শীত অকূল দরিয়ার বাতাসে, সূর্যাস্তের বিলম্বে বসন্তের নামান্তর যেন।

স্থজাতা ভাবে, এত ছেলে আসে, রুমনি এত হাসে, বকে, কিন্তু মনটা তো ওর মুক্তি পায় না। স্থমিতাকে না জানিয়ে চিঠি লেখে মহীতোষকে, 'বাবা, রুমনিকে তুমি কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে নাও। ওকে দেখে আমার মনও ভেঙ্গে যেতে চায়।'

স্থজাতা যখন বাড় থাকে না, অফিসে যায়, তখন একটি লোক আসে, নিঃসাড়ে পা টিপে টিপে, এই হ্যাপী লজে। নাম তার মিঃ জ্যাকসন্‌, কুচকুচে কালো, ছেঁড়া প্যাণ্ট শার্ট, নেশাখোর মগুপ। চম্পার স্বামী।

স্থমিতা লুকিয়ে দেখে, চম্পাকে সে মারে। নিঃশব্দে মারে, পয়সা আদায় করে, তারপরে কাঁদে, তারপরে আদর করে চম্পাকে। দরজা বন্ধ করার স্থযোগটুকুও দেয় না। তখন চম্পাও কাঁদে, আদরও করে স্বামীকে।

অবাক হয় স্থমিতা। বুকের মধ্যে কেমন করে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখে নিজেকে। অনেক যেন লম্বা হয়েছে স্থমিতা, কৃশ হয়েছে। সোনা পুড়ে পুড়ে তার সব স্থুলত্ব হারিয়ে ভিন্ন রূপ ধরেছে। এ রূপ কি গলে গলে নিঃশেষ হবে না।

দুপুরেও পায়চারি করছিল স্থমিতা বন্ধ ঘরে। খোলা চুল। জামাটাও অগোছালো। স্থজাতা গেছে অফিসে।

চম্পা দরজায় করাঘাত করল। স্থমিতা দরজা খুলল। চম্পা বলল, একজন বাঙ্গালী বাবু ছোটা মেমসাহেবকে সেলাম জানাচ্ছে বাইরের ঘরে।

বিরক্ত হল স্থমিতা। সন্ধ্যার আসরের কেউ দুপুরের ফাঁকে একলা এসেছে নিশ্চয়। বলল, বসতে বল।

চম্পা চলে গেল। স্থমিতা আবার ঘরের মধ্যে দাঁড়াল এসে। একি হেয় বাসনা পুরুষের। মেয়েদের অপমানটুকুও কি বোঝে না। জামাকাপড় একটু ঠিক করে, স্থমিতা এসে দাঁড়াল বাইরের ঘরের দরজায়।

এক মাথা রুক্ষ চুল নিয়ে মুখ নীচু করে বসে আছে একজন। সুমিতার মনে হল, সর্বাঙ্গে একটা ভয়ংকর বিদ্যুৎ কষায় একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেছে। একটি অস্ফুট শব্দ করে, নিজের পতনকে বাঁচালো শক্ত করে দরজা ধরে।

রাজেন ফিরে তাকাল। দাঁড়াল উঠে, বলল, যেন অনেক দূর, কোন সুগভীর তলের চাপা জলস্রোতের মত, 'এসে পড়লুম।'

'এসে পড়লুম।' কি বিচিত্র কথা! এসে পড়েছে, এসে পড়েছে! মাথার মধ্যে সহসা অনেক কোলাহল কেমন যেন জট পাকিয়ে যেতে লাগল সব। কি এসেছে। শুধু মানুষটি এসেছে, না জীবন এসেছে? সুমিতার এলো খোপা এলিয়ে পডল, আঁচল পড়ল লুটিয়ে।

রাজেনের গলা তেমনি সুদূর, চাপা। বলল, সুমিতা এস, একটু বসো। আমি এইমাত্র বোম্বে মেল থেকে নেমে এসেছি।

তাই তো, এই তো সেই সময়। এমনি সময়েই তো সুমিতা এসে উঠেছিল হ্যাপী লজে।

রাজেন আবার বলল, বিরক্ত করব না। শুধু বলতে এসেছি কয়েকটি কথা। তোমাকে না বললে চলে না, চিঠিতেও লেখা যায় না। তাই এসেছি, তুমি একটু বসো।

বড় ভয়, আজ বড় ভয়। কি বলতে এসেছে। রাজেন কোন্ নীতির কথা বলতে এসেছে সশরীরে সুমিতার সামনে, এমন সবনাশের মূর্তি ধরে। সবনাশই তো। সুমিতার বুকের মধ্যে যে কাঁপছে থর্‌থর্‌ করে।

ধীরে ধীরে এল সুমিতা। চোখ তুলতেই দেখতে পেল সেই মূর্তি। এই যেন প্রথম দেখা। আর দেখামাত্রই বিস্মিত ব্যথায় চমকে উঠল। এ যে চেহারায় একেবারে অচেনা। চোয়াল উঁচুনো, সুগভীর পরিখা চোখের কোলে, শীর্ণকায় রাজেন। যেন এইমাত্র ঝড়ের ঝাপ্‌টা থেকে এসে ঢুকেছে বদ্ধ ঘরে। যেন, দু'দিন হল কঠিন রোগ থেকে আরোগ্যের পর ফিরেছে মুক্তি-স্নান করে।

ঠোঁটে ঠোঁট টিপে নিজেকেই নিজে বারবার বলতে লাগল চোখের জলে, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে অন্ধ করো না, আমার দৃষ্টি স্বচ্ছ রাখ, হৃদয়কে নিরাবেগ কর।

রাজেন বসল। পাশে একটি বড় ক্যাম্বিসের ব্যাগ। ওর সারা মুখের মত ব্যাগটিও ধুলো-মাখা।

রাজেন বলল, সুমিতা, আমার নীচুতলার বন্ধুরা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তারা দেখেছে, বুঝেছে, আমি অযোগ্য।

সুমিতার গলায় একটি অস্ফুট শব্দ শোনা গেল, তারপরেই জল এসে পড়ল চোখে।

রাজেন বলল, আমি বলে নিই সুমিতা।

রাজেনের গলাও বোধহয় ধরে এসেছিল। একটু চুপ করে থেকে বলল, তারা দেখেছে, আমি অন্ধরাগে ফুঁসেছি শত্রুর বিরুদ্ধে। আমি সংগ্রাম করেছি আমার নিজের নীতির জয়ের জন্যে, তাদের জন্যে নয়, তাই তারা আমাকে ত্যাগ করেছে, জবাব দিয়েছে।

সুমিতার মনে হল, ওর নিজেরই বুক ফেটে যাবে। চাপা গলায় শুধু উচ্চারণ করতে লাগল, রাজেন···রাজেন···

রাজেন বলল, তারা দেখেছে, আমি নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছি, বন্ধুত্বের মর্যাদা দিইনি, অপমান করেছি, অনেকের অনেক ক্ষতি করেছি। বুঝেছে, বলেছে তারা, আমি মূর্খ বিপ্লবী, যে শুধু নিজেদেরই কবর খোঁড়ে। দেখা গেছে, তাদের সঙ্গে আমার জীবনের গোড়াতেই অপরিচয়। আমাদের পরস্পরের জীবনবোধে চেনাশোনা হয়নি আজো। জীবনবোধের মধ্যে যে বিজ্ঞান, তা আমার আয়ত্ত হয়নি, অন্ধ আক্রোশে পাঁকে মুখ গুঁজেছে সে। মহাজীবনের ব্যাপ্তি আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। সুমিতা—

রাজেন সোফা থেকে উঠে এসে সুমিতার কাছে জানু পেতে বসল। সুমিতার দু'টি হাত টেনে নিয়ে বলল, সুমিতা আমার ভুল হয়েছে, আমি জীবন সন্ধানে যাব, তাই তোমার কাছে এসেছি।

সুমিতা দু' হাতে রাজেনের রুক্ষ-চুল মাথাটি জড়িয়ে ধরে, মুখ চেপে, কান্নাচাপা গলায় বলল, এমন করো না রাজেন, এমন করো না! তুমি যে অনেক বড়, অনেক, তুমি এমন করে ধুলোয় বসো না।

রাজেন বলল, ধুলো আমার ঠাঁই সুমিতা। মিথ্যেকে আমি টের পেয়েছি। তোমার কাছে নত হতে যে আমার কোনো সঙ্কোচ নেই।

সুমিতা রুদ্ধ গলায় বলল, 'না না, অমন কথা বলো না রাজেন। তোমার ভিতরে আগুন, তাইতেই পুড়ে পুড়ে যে তুমি তোমার পথে এসেছ। জানতুম, আমি জানতুম, তোমার জীবনের পথে তুমি নিজে আসবে। তোমার সেই অগাধ ব্যাপ্তিতে ভেসে যাব আমি, এই আমার সাধ, এই তো আমার বাঁচা।

রাজেন বলল, সুমিতা তুমি রাজনীতি করনি। আমার মা করেনি। আমার মায়ের ধর্ম-বিশ্বাস আছে, থাকবেই। কিন্তু মানুষকে তোমরা ভালবেসেছ। তাই মহাজীবনের একটি দিক তোমাদের কাছে চিরদিন খোলা। সেদিকে তোমরা আমার গুরু।

সুমিতা রাজেনের মুখে হাত চাপা দিয়ে, ত্রাস-রুদ্ধ হয়ে বলল, চুপ, চুপ, এসব বলে আমাকে দূরে রেখো না।

রাজেন বলল, না দূরে নয়, তুমি আমার অগণিত গুরুর এক গুরু। এবার চল অগণনের মধ্যে। তোমাকে নিয়ে ফিরে যাব আমি।

সুমিতা বলল, যাব, যাব, যাব বৈকি। এবার বলো মায়ের কথা, তিনি কোথায়।

রাজেন বলল, মা ফিরে এসেছে। তোমার চিঠি পড়ে বললে, সর্বনেশে, ভাগ্যে চাস্ তো শীগ্গির যা, তাকে নিয়ে আয়।

মেঘলাভাঙা রোদের মত স্নিগ্ধ হাসি দেখা দিল সুমিতার ঠোঁটে।

সুমিতা বলল, বড়দি যাই?

সাতদিন পর বিদায় নিচ্ছে সুমিতা। সুন্দরলাল বাকায়াও এসেছে বিদায় দিতে।

সুজাতার চোখে জল। বলল, তুই না গেলে যে আমি মরব। তোর কথা ভেবে যে বাঁচবো রে রুমনি এ যাত্রা। ঝুমনোও তাই, দেখিস্। বলে রাজেনের চুলের মুঠি ধরে বলল, আবার এসো।

রাজেন বলল, না বললেও আসব।

সুজাতা হাসতে গিয়ে কেঁদে বলল, তা আমি খুব জানি। তোমাদের আর চিনিনে?

সুন্দরলাল দু'জনের হাত চেপে ধরে বয়োজ্যেষ্ঠের মতো আদর করল। বলল, যেখানে যাবে, জীবনেরই পথে যাবে তোমরা। এ শুধু আরব সাগরের কূল থেকে বঙ্গোপসাগরের কূল বদল।

গাড়ি ছেড়ে গেল ওদের। আরবসাগর থেকে বঙ্গোপসাগরে, জীবনে, মহাজীবনে, জীবনারণ্যের জটিল জটলায় পথ করে।

সুজাতা আর বাকায়া তাকিয়ে রইল গাড়ির লাল আলোটির দিকে।